بسم الله الرحمن الرحيم

وما ينطق عن الهوى – ان هو الا وحى يوحى – (القران)

"আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এ সবই ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" -(ইরশাদে ইলাহী জাল্লাজালালুহু)

انى تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ابدا كتاب الله و سنتى

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তুকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনো গোমরাহ্ হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব (আল-কুরআন) আর আমার সুন্নাত (আল-হাদীছ) - (ইরশাদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

সহীহ মুসলিম শরীফ

মূলঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ)

(প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)
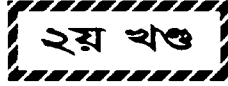
হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা
আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম
শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর
সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ ভূঞা
ফাযিলে দারুল উলূম হাটহাজারী (প্রথম) এম.এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া।
বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সিনিয়র ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিছ, শরীআতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর।

কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশনায়

আল-হাদীছ প্রকাশনী

৫৭ চকবাজার, ঢাকা-১২১১

মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ
আল-হাদীছ প্রকাশনী
২৯২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুন্সীহাটী,
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১৩১০।

প্রথম সংস্করণঃ
শাওয়াল, ১৪১৩ হিজরী, ১৯৯৩ইং, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

দ্বিতীয় সংস্করণঃ
রমযান, ১৪১৮ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ইং।

তৃতীয় সংস্করণঃ
মহররম, ১৪২৭ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ইং

বিনিময় ঃ ১৮০.০০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ

* **মোহাম্মদী লাইব্রেরী**
  চকবাজার, ঢাকা-১২১১।

* **নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী**
  ৫৯, চকবাজার, ঢাকা-১২১১।
  ও
  ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা।

SAHIH MUSLIM SHARIF: 2nd volume translated with essential explanation into Bengali by Mowlana Muhammad Abul Fatah Bhuiyan and published by Al-Hadith Prokashony, 292 Waise Quarni Road, Mohammad Nagar, Munshihati, Ashrafabad, Kamrangirchar, Dhaka-1310, Bangladesh, 2002, Price: Tk. 180.00 US$ 5.00

অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ

মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ ভূঞা ১৩৫৩ বাংলা সনের ২৭শে ফাল্গুন বুধবার ভোর সাড়ে তিনটায় সাবেক ত্রিপুরা ও কুমিল্লা বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলাধীন কসবা থানার অন্তর্গত সৈয়দাবাদ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম আলহাজ্জ মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান ভূঞা বিন বদিউজ্জামান ভূঞা বিন ওয়াহেদ আলী ভূঞা বিন হাজী মাহমূদ ভূঞা। আর তাহার মাতার নাম আকীকুন নিসা বিনতে মৌলভী ধনু মোল্লা। তিনি তাহার পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন।

প্রাথমিক শিক্ষাঃ

পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার পিতা তাহাকে নিজ গ্রামের দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সৈয়দাবাদ ছানী ইউনুছিয়া জামেউল উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি করাইয়া দেন। ছোটবেলা হইতেই তিনি লেখা পড়ায় অতীব মনোযোগী ছিলেন। এই মাদ্রাসা হইতেই প্রাইমারী শিক্ষাসহ জমাতে পাঞ্জম পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তাহার উস্তাদগণের মধ্যে হযরত মাওলানা নূরুল হক, হযরত মাওলানা আবদুল মতীন খান, হযরত মাওলানা আক্রাম আলী ও হযরত মাওলানা আবদুল মতীন প্রমুখ ছিলেন।

উচ্চ শিক্ষাঃ

সৈয়দাবাদ ছানী ইউনুছিয়া জামেউল উলূম মাদ্রাসা হইতে জমাতে পাঞ্জম পর্যন্ত কৃতিত্বের সহিত শেষ [illegible] পর তিনি ঐতিহ্যবাহী জামিআ আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রামে ভর্তি হন। সেই স্থানে ফনূনাতসহ সিহাহ সিত্তাহ-এর পাঠ শেষ করেন। সিহাহ্ সিত্তাহ্ তথা দাওরায়ে হাদীছ -এর সর্বশেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার সুযোগ্য উস্তাদগণের মধ্যে হযরত মাওলানা আব্দুল ওহ্হাব (রহ.), শায়খুল হাদীছ মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম (রহ.), হযরত মাওলানা আব্দুল আযীয (রহ.), শায়খুল ফনূন হযরত মাওলানা আবুল হাসান (প্রণেতা তানযিমুল আশতাত) (রহ.), হযরত মাওলানা হামেদ (রহ.), হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী (রহ.) শায়খুল আদব হযরত মাওলানা নজীর আহমদ (রহ.), হযরত মাওলানা হাফিযুর রহমান (রহ.), হযরত মাওলানা নাদিরুজ্জামান (রহ.), মুফতি আযম হযরত মাওলানা আহমদুল হক (দাঃ বাঃ) ও হযরত মাওলান আহমদ শফী (দাঃবাঃ)প্রমুখ ছিলেন।

সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা হইতে তিনি কামিল তাফসীর ও কামিল হাদীছ বিভাগে পাশ করেন। তাঁহার উস্তাদগণের মধ্যে প্রফেসর ড. আইয়ূব আলী, প্রফেসর মাওলানা ইয়াকুব শরীফ, হযরত মাওলানা উবায়দুল হক, হযরত মাওলানা মিয়া মুহাম্মদ কাসেমী, হযরত মাওলানা মাহবুবুল হক, হযরত মাওলানা আব্দুল হক, হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ প্রমূখ।

অতঃপর ১৯৭২ইং ও ১৯৭৪ ইং সনে যথাক্রমে এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি. পরীক্ষাদ্বয়ে উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৮৫ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ. (অনার্স) -এ ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববদ্যািলয় হইতে ১৯৭৭ইং সনের বি.এ. (অর্নাস) এবং ১৯৭৮ ইং সনের এম.এ. পরীক্ষাদ্বয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাহার সুযোগ উস্তাদগণের মধ্যে প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ ইসহাক,প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান চৌধুরী, প্রফেসর আ.ন.ম. আব্দুল মান্নান খান, প্রফেসর আলী হায়দর, প্রফেসর ডঃ আবূ বকর সিদ্দীক, প্রফেসর, মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ও প্রফেসর মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন প্রমুখ।

অধিকন্তু সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ করিতে গিয়া তিনি তাহার শ্বশুর আব্বা প্রখ্যাত মুফাস্সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (দাঃ বা) হইতে হাদীছ শাস্ত্রে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেন।

অধ্যাপনাঃ

দারুল উলুম মঈনূল ইসলাম হাটহাজারী হইতে ফারিগ হইয়া তিনি আড়াইবাড়ী সিনিয়র মাদ্রাসায় দুই বৎসর শিক্ষকতা করেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় সর্বশেষ পরীক্ষা দিয়া হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (রহ.)-এর প্রতিষ্ঠিত বাহাদুরপুর শরীয়াতিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় এক বৎসর মুহাদ্দিছ পদে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা -এর কেন্দ্রীয় মসজিদে পেশ ইমাম পদে নিযোগ হন। একই সাথে মুহাম্মদিয়া মাখযানূল উলূম বুয়েট কেন্দ্রীয় মসজিদের মুহতামিম পদে এবং স্বীয় প্রতিষ্ঠিত জামিয়া ইসলামিয়া মহিলা মাদ্রাসার মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন।

সমাজ কল্যাণ ঃ

তিনি মানবতার সেবায় নিজেকে ব্রত রাখার জন্য ১৩৯৪ বাংলা সনে "দুঃস্থ মানব কল্যাণ তহবিল সৈয়দাবাদ" প্রতিষ্ঠা করেন। এই তহবিলে জমাকৃত অর্থ দ্বারা সৈয়দাবাদ গ্রামের আর্তপীড়িত, অভাবগ্রস্থ ও কন্যাদায়গ্রস্থ লোকদের জরুরী প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

তাঁহার রচনাবলীঃ

(১) সহীহ মুসলিম শরীফ-এর ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ।

(২) কুরআন মজীদ- এর বঙ্গানুবাদ,

(৩) ইখতিলাফে উম্মত আওর সীরাতে মুসতাকীম- এর বঙ্গানুবাদ উম্মতে মতবিরোধ ও সরল পথ।

(৪) ইকরামূল মুসলিমীন।

(৫) তফসীরে জালালাইন -এর আমপারার বঙ্গানুবাদ।

(৬) গীবত কি?

(৭) সহজ নামায শিক্ষা।

প্রকাশক

মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্

আল হাদীছ প্রকাশনী

৫৯, চকবাজার, ঢাকা।

সূচী পত্র

কিতাবুল ঈমান-এর অবশিষ্ট অংশ

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

তৃতীয় খণ্ডে কিতাবুল ঈমান-এর অবশিষ্ট অংশ

بسم الله الرحمن الرحيم

সহীহ্ মুসলিম শরীফ

باب الامر با لا يمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء اليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এবং শরীআতের অনুশাসনের প্রতি ঈমান আনিবার নির্দেশ এবং ইহার প্রতি মানুষকে আহবান করা এবং যাহার নিকট দ্বীন পৌঁছে নাই তাহার কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া ঃ

(٣٢) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِى جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ بْنَ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى وَاللفظُ لَهُ قَالَ اَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عباسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عليه وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَقَدْحَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَا نَخْلُصُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَعْمَلُ بِهٖ وَنَدْعُوا اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَ نَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ فَقَالَ شَهَادَةَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَاغَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ زَادَ خَلَفٌ فِى رِوَايَتِهٖ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً –

(হাদীছ)- ২৩ঃ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হযরত খালাফ বিন হিশাম (রহ.) ------- এবং হযরত ইয়াহইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া (রহ.) তাহারা উভয়ই ------- হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেনঃ আব্দুল কায়েস (বিন আফছা) গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল[১] রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্। আমরা রবীআ গোত্রের লোক। আমাদের এবং আপনার মধ্যবর্তী স্থানে 'মুযার[২] গোত্রের কাফেররা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (তাহাদের শত্রুতার ভয়ে) আমরা "শাহরুল হারাম'[৩] (অর্থাৎ সম্মান জাতীয় মাস যেমন- যুকায়দা, যুলহিজ্জা, মহররম এবং রজব) ব্যতীত আপনার খিদমতে নিরাপদে হাযির হইতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদিগকে এমন কিছু বিষয় শিক্ষা দিন যাহা আমরা আমল করিতে পারি এবং আমাদের অন্যান্য লোকদিগকেও সেই দিকে আহবান করিতে পারি। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আমি তোমাদিগকে চারিটি বিষয় পালনের আদেশ করিতেছি এবং চারটি বিষয় করিতে নিষেধ করিতেছি।

টীকাঃ -১, وفد অর্থ প্রতিনিধি দল, কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নির্বাচিত বা মনোনীত লোকদের সমন্বয়ে গঠিত দলকে আরবী ভাষায় 'ওয়াফদ' বলা হয়। সাধারণত এই প্রকার গঠিত দল বিশেষ জরুরী কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে রাজা - বাদশাহ্, মন্ত্রী বা কোন নেতার নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে। আবদুল কায়েস এক ব্যক্তির নাম। তাহার বংশধরকে বনী আবদিল কায়েস বলা হয়। আরবের পার্শ্ববর্তী বাহরাইন নামক স্থানে তাহারা বসবাস করিত। আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত ইয়া রসূলাল্লাহ্ সম্বোধন, মুযার গোত্রের কাফিররা ইত্যাদি উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাহরা মুযার গোত্রের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইসলামী শরীআতে সর্ব প্রথম জুমুআর নামায মসজিদে নববীর পর মসজিদে আবদিল কায়েস - এ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

টীকার বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়

একক আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সামনে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা প্রদানে বলিলেন ঃ এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, নিঃসন্দেহে একক আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ তথা উপাস্য নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্ তা'আলার রসূল। নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং তোমাদের গণীমতের (যুদ্ধ লব্ধ সামগ্রীর), খুমুস' (অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ) আদায় করিবে। আর আমি তোমাদিগকে' দুব্বা' (অর্থাৎ কদুর খোলা বা লাউয়ের খোলা হইতে তৈরী পাত্র), 'হানতা' (অর্থাৎ তৈলাক্ত সবুজ রং-এর কলস,) 'নাকীর' (অর্থাৎ খেজুর গাছের কাণ্ডমূল ছিদ্র করিয়া তৈরীকৃত পাত্র) এবং 'মুকাইয়্যার' (অর্থাৎ আলকাতরা জাতীয় পদার্থের প্রলেক দেওয়া পাত্র) ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেছি।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِى مَسْجِدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى مسجِدِ عبدِ القيسِ بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ- অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মসজিদের পর সর্ব প্রথম জুমুআর নামায বাহরাইনের অন্তর্গত জওয়াছাঁ নামক স্থানে মসজিদে আবদুল কায়েস-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।" - (ফতহুল মুলহিম)

ওয়াফ্দ আবদিল কায়েস দুই বার "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়াছিলেন। প্রথম বার মক্কা বিজয়ের পূর্বে ৫ম হিজরী সনে অথবা ৫ম হিজরীর পূর্বে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় ১৩ অথবা ১৪ জন লোক ছিলেন। ফতহুল বারী ও উমদাতুল ক্বারী কিতাবে তাহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয়বার এই ওয়াফদ ৮ম অথবা ৯ম হিজরী সনে নবী সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় ওয়াফ্দটি ৪০ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ছিল। (তফহীমুল মুসলিম)

টীকা-২ঃ مضر (মুযার) আরবের একটি কাফির গোত্রের নাম। গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা মুযার বিন নুযার বিন মা'আদ বিন আদনান। এই গোত্রকে মুয়ারাল হামরাও বলা হয়। তাহাদের বাসভূমি বনী আবদিল কায়েস ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। বাহরাইনের অধিবাসীরা মুযার গোত্রের বাসভূমির উপর দিয়া ছাড়া মদীনা আসিবার অন্য কোন রাস্তা ছিল না। ফলে সেই রাস্তা দিয়াই মদীনায় আসিতে হয়। যাতায়াতের সময় তাহারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিত। এই প্রতিবন্ধকতা বিবিধ কারণে হইতে পারে। প্রধানত ঃ বনী আবদিল কায়েসের ইসলামের বিষয়ে জানিয়া অথবা জাহিলিয়াত যুগে আশহুরে হারাম ব্যতীত অন্যান্য সময়ে আরবের মুশারিকরা একে অন্যের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ, রক্তপাত, কাঁটাকাটি, হানাহানি, ইত্যাদিতে লাগিয়াই থাকিত এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সফরকারী বণিক দলের উপর হামলা করিয়া হত্যা - লুণ্ঠন করিত। ফলে রাস্তা চলাচল নিরাপদ ছিল না। মোট কথা জান ও মালের কোন নিরাপত্তা ছিল না।

টীকা-৩ঃ شهر الحرام "সম্মানিত মাস'। অন্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে الشهر الحرام। এই উভয় বাক্যের মর্ম হইতেছে جنس জাতি। অর্থ হইবে সম্মান জাতীয় মাস। কেননা, আল আশহুরুল হুরুম (সম্মানিত মাস সমূহ) চারিটি- যুলকায়দা, যুলহিজ্জা, মুহররম এবং রজম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يومَ خلقَ السمٰوٰتِ والارضَ منها اربعة حرم- অর্থাৎ ' নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট (চন্দ্র) মাসসমূহের সংখ্যা বারটি। আকাশসমূহ ও যমীন সৃষ্টির দিনই আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে নির্ধারিত। উহার মধ্যে চারটি মাস হইতেছে সম্মানিত।"-(সূরা তাওবা-৩৬)

শরীআতের বিধান সর্বদা সর্বক্ষেত্রেই বার মাসে বৎসর। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর ধর্মে সম্মানিত মাস ছিল যুল কায়দা, যুলহিজ্জা, মুহাররম ও রজব এই চারিটি মাস। এই মাসগুলিতে রক্তপাত ও যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম ছিল। তখন হইতেই এই কয়েকটি মাসে আরবের লোকেরা শান্তি ও নিরাপত্তা মানিয়া চলিত। যাহাতে পৃথিবীর মানুষ নিরাপদে বায়তুল হারামের যিয়ারত করিতে পারে।

কালক্রমে আরবের লোকেরা একত্ববাদকে ভুলিয়া কুফরী ও শিরকীতে লিপ্ত হয়। কিন্তু সেই জাহিলিয়াত যুগেও আরবের লোকেরা উল্লিখিত চারিটি মাসকে সম্মান করিত। আর অন্যান্য মাসসমূহে তাহারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ,

খালাফ (বিন হিশাম (রহঃ)) তাঁহার বর্ণনায় আরও কিছু অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছেনঃ এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, নিঃসন্দেহে একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ বা মা'বুদ নাই (বলিবার সময়) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আবদুল কায়েস গোত্রের ১৪ জন সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হন। এই দলের নেতা ছিলেন আশাজ্জ আল আছরী এবং দলের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেনঃ মযীদাহ বিন মালেক আল মুহারিবী, ওবাইদাহ বিন হুমাম আল মুহারিবী, ছুহার বিন আব্বাস আল মুররী, আমর বিন মাহরুম আল আছরী, আল হারেছ বিন শুয়াইব আল আছরী, আল-হারেছ বিন জনদুব। অন্যান্যদের নাম অনুসন্ধানের পরও জানা যায়নি।

তাহাদের আগমনের কারণ ছিল যে, বনী গনম বিন ওদীআ সম্প্রদায়ের মুনকিয বিন হইয়ান নামক এক ব্যক্তি জাহেলিয়্যাত যুগে অধিকাংশ সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করিতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিবার পর একবার মুনকিয কয়েকখানা চাদর ও হাজার নামক স্থানের কিছু খেজুর লইয়া ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করিলেন। একদা মুনকিয রাস্তায় বসিয়াছিলেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সম্মানার্থে মুনকিয দাঁড়াইয়া গেলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনকিযকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনকিয বিন হইয়ান! তোমার গোত্রের সকল লোক কেমন আছে? অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করিয়া একে একে সকলের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনকিয রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজেযা প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং সেই মুহূর্তেই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। ইসলাম গ্রহণ করিবার পর সর্বপ্রথম তিনি সূরাতুল ফাতিহা এবং ইক্‌রা শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি হাজার অভিমুখে যাত্রা করিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মারফত আবদুল কায়েসের লোকদের নামে একখানা পত্র প্রেরণ করেন। তিনি পত্রখানা নিয়া গেলেন কিন্তু নানা কথা চিন্তা করিয়া বেশ কিছুদিন পবিত্র পত্রখানা গোপন রাখিলেন। অতঃপর মুনকিযের স্ত্রী স্বীয় স্বামীর নিকট রক্ষিত পত্র সম্পর্কে অবহিত হইলেন। মুনকিযের স্ত্রীর পিতার নাম ছিল মুনযির বিন আয়েয। মুনযিরই হইলেন আশাজ্জ। মুনযিরের কপালে একটি ক্ষত চিহ্ন ছিল বলিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নাম পরিবর্তন করিয়া আশাজ্জ (আল আছরী) রাখেন।

মুনকিয (রাযিঃ)-এর স্ত্রী স্বীয় স্বামীর নামায আদায় ও কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার পিতা মুনযির বিন আয়েযকে জানাইলেন এবং বলিলেন, আমার স্বামী ইয়াছরব (মদীনা) হইতে প্রত্যাবর্তনের পর এক আশ্চর্য অবস্থা হইয়া গিয়াছে। সে হাত-পা ধুইয়া এক দিকে (কিবলামুখী হইয়া) কখনো পৃষ্ঠ ঝুকায় (রুকু করে) আর কখনও যমীনে কপাল রাখে (সিজদা করে)। ইহা তাহার দ্বীন। মুনকিয যখন তাহার

কাটাকাটি, হানাহানি, হত্যা-লুণ্ঠন, রক্তপাত ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত থাকিত। মুসাফির ও বনিকদের মাল-সম্পদ লুণ্ঠন করিত। কিন্তু শাহরুল হারামের মধ্যে তাহারা সকল প্রকার সন্ত্রাসী কর্ম হইতে বিরত থাকিত। ফলে উল্লেখিত মাসসমূহে মুসাফিররা নিরাপদে যাতায়াত করিতে সক্ষম হইত। এমন কি শত্রুদের উপরও আক্রমণ করা হইত না। এই কারণেই ওয়াফদ আবদিল কায়েস নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আরয করিয়াছেন, পথিমধ্যে শত্রুর ভয় থাকিবার দরুন 'শাহরুল হারাম' ব্যতীত অন্য সময়ে আপনার খেদমতে উপস্থিত হওয়া আমাদের জন্য নিরাপদ নহে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে উল্লেখিত চারিটি মাসে যুদ্ধ করা হারাম তথা নিষেধ ছিল। পরে এই হুকুম 'মুশরিকদের যেখানে পাও সেই স্থানেই সেই অবস্থায় হত্যা কর' দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। তাই কাফিরদের সহিত সকল মাসেই জিহাদ করা যাইবে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মারামারি, ঝগড়া, ফাসাদ ইত্যাদি করা সকল মাসেই গুনাহ। বর্তমানে কাফিররা যদি শাহরুল হারামের সম্মানে মুসলমানদের উপর প্রথমে আক্রমণ না করে তবে মুসলমান তাহার উপর আক্রমণ না করাই উচিত।

শ্বশুর মুনযির বিন আয়েয (আশাজ্জ)–এর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন উভয়ের মধ্যে (ইসলাম সম্পর্কে) আলাপ আলোচনা হয়। আলোচনার পর আশাজ্জ–এর অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যায় এবং মুনকিযের নিকট রক্ষিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পবিত্র চিঠি খানা লইয়া তিনি স্বীয় গোত্রের লোকদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পবিত্র পত্রখানা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। পত্র পাঠ শুনিয়া গোত্রের সকল লোকদের অন্তর ইসলামের আলোকে আলোকিত হইয়া গেল এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। অতঃপর তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া আশাজ্জ–এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খেদমতে প্রেরণ করেন। তাহারা যখন মদীনার নিকটবর্তী স্থানে পৌছিলেন তখন ওহী দ্বারা অবগত হইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেনঃ তোমাদের সম্মুখে ওয়াফ্দ আবদিল কায়েস আগমন করিতেছে। তাহারা পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের মধ্যে উত্তম। তাহাদের সহিত তাহাদের নেতা আশাজ্জ আল আছরীও রহিয়াছেন। (ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে আবদুল কায়েস গোত্রের সকলই ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী পতাকাতলে সমবেত হইয়াছেন) তাহারা ফিরিয়া যাওয়ার মত লোক নহে এবং সন্দেহ সংশয় পোষণকারীদের মধ্যেও নহে। (নববী)

'ঈমান বিল্লাহ'–এর মধ্যে রিসালাতের বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اَلْاِيْمَانُ بِاللهِ "একক আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান"–এর ব্যাখ্যায় দুই বিষয়ে যুগপৎ সমন্বয় করিয়াছেন অর্থাৎ একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ তথা উপাস্য নাই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সত্য রসূল এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া। এই ব্যাখ্যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার সত্য রসূল বলিয়া দৃঢ়রূপে মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া লওয়াকে একক আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনয়নেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গণ্য করা হইয়াছে। কাজেই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসে মানিয়া লওয়া ব্যতিরেকে কেবল তাওহীদ অর্থাৎ একক আল্লাহ তা'আলাকে ইলাহ তথা উপাস্য বলিয়া স্বীকার করাকেই একক আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান গ্রহণ বলিয়া গণ্য করা হইবে না। বলাবাহুল্য যেই সকল হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতাইনের اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ উল্লেখ না করিয়া কেবল তাওহীদ উল্লেখ করিয়াছেন সেই সকল স্থানে শাহাদাতাইন–ই মর্ম হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

চারিটি বস্তু পালনের আদেশ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগত ওয়াফ্দ আবদিল কায়েসকে চারিটি বস্তু পালন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তাওহীদ, নামায, যাকাত ও গণীমতের সম্পদে 'খুমুস' আদায়। বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করিবার পূর্বে সংখ্যা উল্লেখ করিবার হেকমত হইতেছে যে, প্রথমতঃ যাহাতে শ্রোতার মনে বিস্তারিত বিবরণ জানিবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ যেই সকল বিষয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য উহা সংরক্ষিত রাখা। কেননা বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার সময় কোন একটি বাদ পড়িলে সংখ্যা উল্লেখ থাকিবার কারণে স্মরণ হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে শ্রোতাদের সামনে পেশ করিবার পর উহার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া একটি দার্শনিক পদ্ধতি।

আলোচ্য হাদীছে 'সাওম' এর উল্লেখ নাই। কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফ ও মুসনাদে আহমদ–এর এক রিওয়ায়াতে এবং সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী ২৪ নং হাদীছে صَوْمُ رَمَضَانَ -'রমযানের রোযা' উল্লেখ রহিয়াছে।

কাযী আয়্যায (রহঃ) প্রমুখের মতেঃ বর্ণনাকারীর অজ্ঞাতে আলোচ্য বর্ণনা হইতে 'সাওম' শব্দটি বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আর ওয়াফ্দ আবদিল কায়েস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খেদমতে উপস্থিত হইবার

সময় পর্যন্ত হজ্জ ফরয হয় নাই। হজ্জ ফরয হইয়াছে তাহাদের আগমনের পরবর্তী সময়ে। তাই হজ্জের কথা উল্লেখনাই।

বলাবাহুল্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বোধিত ব্যক্তিদের জ্ঞান, অবস্থা ও অধিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দ্বীনে শরীআতের আহকাম বর্ণনা করিতেন। ইহা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর হেকমতপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই প্রত্যক্ষ করা যায় যে, আলোচ্য হাদীছে চারিটি নির্দেশিত বস্তুর মধ্যে গণীমতের মালের খুমুস আদায় সংক্রান্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ ওয়াফ্‌দ আবদিল কায়েস ইসলাম গ্রহণের কারণে মুযার কাফেরদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ ও সংঘাত হওয়া স্বাভাবিক। ফলে গণীমতের মালের ব্যাপারে শরীআতের হুকুম জ্ঞাত হওয়া তাহাদের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। এই জন্য উহাকে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ ইহা যাকাতেরই এক প্রকার।

অপরদিকে কেবলমাত্র মদ্য তৈরী ও রাখিবার চারি প্রকারের পাত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ এই সকল পাত্রের চাইতে অধিক মারাত্মক হারাম বস্তুও শরীআতে রহিয়াছে যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে করা হয় নাই। তাহা ছাড়া মদ্য ও নেশা জাতীয় বস্তুর প্রতি মুসলমানের অন্তরে ঘৃণা বদ্ধমূল হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই সকল পাত্রের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। অতঃপর যখন মদ্য ও নেশা জাতীয় বস্তুর প্রতি মুসলমানদের অন্তরে ঘৃণা ও বিমুখিতা বদ্ধমূল হইয়া যায় তখন এই সকল পাত্র ব্যবহারের অনুমতিও প্রদান করা হইয়াছে।

ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরীআতের যাবতীয় আহকাম তাহাদের সামনে বর্ণনা উদ্দেশ্য নহে। কারণ আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খেদমতে ইসলাম ও ঈমানের মধ্যকার সম্পর্ক অর্থাৎ উভয়টি এক অথবা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে ইত্যাদি বিষয় অবহিত হইবার জন্য আগমন করেন নাই। বরং তাহারা আগমন করিয়া এমন কিছু আমল জানিতে চাহিয়াছিলেন যাহা পালন করিলে নাযাত পাওয়া যায়। কাজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের আরয ও প্রয়োজন মুতাবিক একটি সংক্ষিপ্ত আমল পদ্ধতির বর্ণনা দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে হাদীছে জিব্রাঈল (আঃ)। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের পৃথক পৃথক প্রকৃতি জিজ্ঞাসার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। যাহাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর রেসালত জীবনে অবতীর্ণ দ্বীনে শরীআতের যাবতীয় বিষয়ের সারনির্যাস সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জ্ঞাত হইতে পারেন। ফলে জিব্রাঈল (আঃ)–এর জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত কিছু আ'মাল বর্ণনা যথার্থ ছিল না। কারণ ইহা তা'লীম তদরীসের মজলিস। তা'লীমের মজলিসে শিক্ষকের উদ্দেশ্য হইতেছে জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ স্পষ্ট এবং পরিষ্কার বর্ণনা করিয়া দেওয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতেই হাদীছে জিব্রাঈল (আঃ)–এর মধ্যে শরীআতের সারনির্যাস উল্লেখিত হইয়াছে।

অপর দিকে ওয়াফদ আবদিল কায়েস গোত্রের মজলিস ছিল উপদেশ প্রদান করা। ওয়ায নসীহতের ক্ষেত্রে আহকামকে সহজ সরলভাবে সম্বোধিত লোকদের সামনে পেশ করা যাহাতে তাহাদের অন্তরে দ্বীনের আহকাম পালনের প্রবল ইচ্ছা সৃষ্টি হইয়া যায়। দ্বীনের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হইলে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরীআতের যাবতীয় আদেশ নিষেধ পালন করিবে। **(ফতহুল মুলহিম)**

চারি প্রকার পাত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে চারি প্রকার পাত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেনঃ

(১) 'দুব্বা' কদু বা লাউ অধিক পাকিলে উহার উপরের অংশ শক্ত হইয়া যায়। অতঃপর পাকা কদুর ভিতরের অংশ ফেলিয়া দিলে সেই খোলসকে পাত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় এবং উহাকে আরবী ভাষায় 'দুব্বা' বলে।

(২) 'হানতাম' হানতামের ব্যাখ্যায় আলেমগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। বিশুদ্ধ অভিমত হইতেছে যে 'হানতাম' তৈলাক্ত মাটির তৈরী সবুজ রং–এর কলসকে বলা হয়। স্বয়ং সহীহ মুসলিম শরীফের كتاب الأشربة

পান করা অধ্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছে উল্লেখিত ব্যাখ্যা বিদ্যমান। আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল এবং অধিকাংশ ভাষাবিদগণ এই ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ), সাঈদ বিন জুরাইব (রাযিঃ) এবং আবূ সালমা (রাযিঃ) বলেন, সকল প্রকার কলস বা মটকাকে 'হানতাম' বলা হয়। হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) এবং ইবন আবী লাইলা বলেনঃ 'হানতাম' লাল রং-এর কলস যাহা মিসর হইতে আসিত এবং ইহার ভিতরের দিক তৈলাক্ত হইত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, 'হানতাম' লাল রং-এর কলস। ইহার দ্বারা মিসর হইতে মদ্য আসিত। ইবন আবী লাইলা বলেনঃ এই কলস দিয়া তায়েফ হইতে মদ্য আসিত এবং কোন কোন ব্যক্তি এই সকল কলসে খেজুর ও আঙ্গুর ভিজাইয়া নাবীয তৈরী করিত। আতা বলেনঃ 'হানতাম' সেই কলসকে বলা হয় যাহা মাটি, চুল এবং রক্ত দ্বারা প্রস্তুত হইত।

(৩) 'নকীর' খেজুর গাছের কাণ্ডমূল হইতে তৈরী পাত্র অথবা পাথর ছিদ্র করিয়া তৈরী পাত্র।

(৪) 'মুকাইয়্যার' মুকাইয়্যার এবং মুযাফ্‌ফাত একই বস্তু। মুকাইয়্যার শব্দটি ক্বার হইতে উৎপত্তি। আর ক্বার-ই হইতেছে যাফত। যাফত অর্থ আলকাতরা। সুতরাং মুকাইয়্যার হইল বার্ণিশ বা আলকাতরা জাতীয় পদার্থের প্রলেপ দেওয়া পাত্র। (নববী ফতহুল মুলহিম)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত চারি প্রকার পাত্র ব্যবহার করিত নিষেধ করিবার অর্থ হইতেছে এই চারি প্রকার পাত্রে পানি রাখিয়া খেজুর, যব বা আঙ্গুর ইত্যাদি ভিজাইয়া নাবীয[১] বা শরবত তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহার কারণ হইল এইঃ

(১) এই সকল পাত্র খুব শক্ত ও মোটা হওয়ার কারণে পানি স্পর্শ করে না এবং বায়ু নির্গত হয় না। ফলে এই সকল পাত্রে খেজুর, যব বা আঙ্গুর ইত্যাদি ভিজাইলে অল্প সময়ের মধ্যে নেশা তথা মাদকতা আসিয়া মদ্য রূপ লাভ করে। যাহা পান করা হারাম, নাপাক এবং সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় না। সুতরাং এই সকল পাত্রে নাবীয তৈরী করিলে হয়ত মাদকতা সৃষ্টি হইবে। আর অজ্ঞতাবশতঃ উহা পান করার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে চামড়ার থলি বা মশক ইত্যাদি হাল্কা তথা সূক্ষ্ম হইবার কারণে অধিক সময় ব্যতীত মাদকতা সৃষ্টি হয় না। তাহা ছাড়া চামড়ার তৈরী পাত্র সাধারণতঃ মাদকতার তীব্রতা তথা তেজস্ক্রিয়তায় ফাটিয়া যায়।

এই নিষেধাজ্ঞা মদ্য হারাম হইবার প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। পরবর্তী সময়ে যখন মুসলমানগণের স্বভাব ও অন্তরে মদ্য ও শূরার প্রতি ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়া যায় তখন পাত্রসমূহ ব্যবহার করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সহীহ মুসলিম শরীফের অন্য রিওয়ায়াতে আছেঃ

عَنْ بُرَيْدَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاِنْتِبَاذِ اِلَّا فِى الْاَسْقِيَةِ فَانْتَبِذُوْا فِىْ كُلِّ وِعَاءٍ وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا ـ

"হযরত বুরায়দা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি তোমাদিগকে চামড়ার থলি তথা মশক ইত্যাদি ব্যতীত অন্যান্য পাত্রে নাবীয বা শরবত ভিজাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন হইতে সকল প্রকারের পাত্রে ভিজাইতে পার। তবে নেশা সৃষ্টিকারী শরবত পান করিবে না।"

এই হাদীছ দ্বারা চারি প্রকার পাত্র ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা রহিত হইয়া গিয়াছে। ইহাই জমহুরে ওলামার অভিমত। আল্লামা খাত্তাবী বলেনঃ নিষেধাজ্ঞা রহিত হওয়ার অভিমতই অধিক সহীহ। (নববী)

টীকা-১· "نبيذ" নাবীযঃ খেজুর, যব, আঙ্গুর ইত্যাদি পানির মধ্যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখিলে যে সুস্বাদু শরবত তৈরী হয় উহাকে 'নাবীয' বলে। ইহা পান করা জায়েয। কিন্তু ইহাতে নেশা তথা মাদকতা সৃষ্টি হইলে মদ্য হইয়া যায়। উহা পান করা হারাম।

(২) কেহ কেহ বলেনঃ আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত চারিটি পাত্র সাধারণতঃ মদ্য ও শূরা পাত্র হিসাবে ব্যবহার হইত। মদ্য হারাম হইবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল পাত্রও ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। ইহার কয়েকটি কারণ হইতে পারেঃ (ক) এই সকল পাত্র ব্যবহারের দ্বারা মদ্য পানের সদৃশ হয় এবং পূর্ব স্বভাবের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথবা (খ) এই সকল পাত্রে মদ্য এর চিহ্ন বা ক্রিয়া বিদ্যমান ছিল। অতঃপর চিহ্ন বা ক্রিয়া চলিয়া যাইবার পর উক্ত পাত্রসমূহ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। অথবা (গ) মদ্য হারামের প্রাথমিক পর্যায়ে কঠোর নির্দেশ জারী করা উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে মুসলমানগণ পাত্রসহ মদ্যকে কঠোরভাবে বর্জন করে। নির্দেশ যথাযথ কার্যকরী হইবার পর এবং মুসলমানদের স্বভাবে মদ্য ও শূরা জাতীয় বস্তুর প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি হইয়া বদ্ধমূল হইবার পর পাত্রসমূহ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আর মদ্য ও শূরা জাতীয় বস্তু চিরকালের জন্য হারাম বলবৎ রহিয়াছে।

ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) ও ইসহাক (রহঃ) প্রমূখের অভিমত যে, আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত চারি প্রকার পাত্রে নাবীয তৈরী করিবার নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রহিয়াছে। কেননা,হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর নিকট নাবীয তৈরী করা সম্পর্কে ফতোয়া চাহিলে তিনি এই হাদীছ (২৩ নং) বর্ণনা করিলেন। যদি নিষেধ রহিত হইত তাহা হইলে তিনি এই হাদীছ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করিতেন না। ইহার উত্তর এই যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর নিকট হয়ত নিষেধ রহিত হইবার বিষয়টি তখনও পৌছে নাই। সূতরাং যাহারা রহিত হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইয়াছেন তাহাদের বিরুদ্ধে ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর এই ফতোয়া দলীল হইবে না। (ফতহুল মুলহিম)

٢٤ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة
قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن أبي جمرة
قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد
القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا
ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة و
إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر
به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال
هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم
والمزفت قال شعبة وربما قال النقير قال شعبة وربما قال المقير وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم
وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير۔

হাদীছ–২৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বকর বিন আবী শায়বাহ (রহঃ), মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) এবং মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহঃ)। আর তাঁহাদের সকলের রিওয়ায়াতে শব্দসমূহ কাছাকাছি। আবূ বকর (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন গুনদার

(রহঃ) তিনি শু'বা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর শেষোক্ত দুইজন রাবী বলেনঃ আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন জা'ফর (রহঃ) (গুন্‌দার (রহঃ)–এর নামই হইতেছে মুহাম্মদ বিন জা'ফর (রহঃ)। প্রথম রাবী লকব উল্লেখ করিয়াছেন এবং শেষোক্ত রাবীদ্বয় নাম উল্লেখ করিয়াছেন। রাবীত্রয়ের নাম ও লকব উল্লেখের বিষয়টি ইমাম মুসলিম (রহঃ) প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার হাদীছ বর্ণনায় অত্যধিক সর্তকতার নিদর্শন)। মুহাম্মদ বিন জা'ফর বলেনঃ আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হযরত শু'বা (রহঃ)। তিনি হযরত আবূ জমরাহ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। (রাবীত্রয়ের বর্ণনাসূত্র হযরত আবূ জমরাহ (রহঃ)–এর নিকট একত্রিত হইয়াছে)।

হযরত আবূ জমরাহ[১] (রহঃ) বলেনঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) ও তাঁহার মজলিসে উপস্থিত লোকদের মধ্যবর্তী হইয়া তাহাদের মুখপাত্র রূপে (অন্যান্যদের কথাকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বুঝাইবার লক্ষ্যে এবং হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর আরবী ভাষাকে আগত উপস্থিত লোকদের ভাষায় রূপান্তর করিয়া বুঝাইবার জন্য) দোভাষী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতাম।[২] (একদা) জনৈকা মহিলা তাঁহার (ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর) নিকট আগমন করিয়া কলসীর (তৈরী) নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

টীকা–১· আবূ জমরাহ (রহঃ)–এর নাম নসর বিন ইমরান (রহঃ)।

টীকা–২· كنت اترجم - অর্থাৎ আমি দোভাষী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতাম। সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতে আছে–

كُنْتُ اَقْعُدُ مَعَ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض يُجْلِسُنِىْ عَلٰى سَرِيْرِهٖ ، فَقَالَ اَقِمْ عِنْدِىْ حَتّٰى اَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِىْ فَاَقَمْتُ مَعَهٗ شَهْرَيْنِ۔ (الحديث)

"আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ)–এর সহিত বসিয়াছিলাম। আমাকে তাঁহার খাটের উপর বসানো হইয়াছিল। অতঃপর তিনি বলিলেনঃ আপনি আমার নিকট অবস্থান করুন, আপনাকে ইহার বিনিময়ে আমার সম্পদের এক অংশ প্রদান করিব। অতঃপর আমি তাহার নিকট দুই মাস অবস্থান করিলাম।"

ترجمة - (অনুবাদ) শব্দের অর্থ সম্পর্কে শায়খ আবূ আমর ইবনুস সিলাহ (রহঃ) বলিয়াছেনঃ ইহার দ্বারা প্রকৃত অর্থ হইতেছে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় রূপান্তর করা। তবে আমার মতে এখানে সাধারণ অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর কথা যাহাদের নিকট পৌঁছিত না তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং তাহাদের কথাকে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া। ইহা সম্ভবতঃ মজলিসে জন কোলাহল হওয়ার জন্য অথবা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর কথা অনুধাবন করিতে তাহারা সক্ষম ছিল না। হাফেয ইবন হাজার স্বীয় ফতহুল বারী কিতাবে লিখিয়াছেন, দ্বিতীয়টি অধিক প্রকাশ্য। ইহার কারণ হইতেছে যে, আবূ জমরাহ (রহঃ) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর খাটেই বসিতেন। ফলে লোক কোলাহলের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কারণ যাহা আবূ জমরাহ শুনিতেন তাহা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) শুনিতেন। তবে ইহাতে সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) খাটের প্রধান অংশে বসিতেন এবং আবূ জমরাহ (রহঃ) অপর পার্শ্ব যাহা জনতার অধিক নিকটে রহিয়াছে উক্ত স্থানে বসিতেন। জনতার কথা তিনি শ্রবণ করিয়া হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেনঃ সম্ভবতঃ হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর বক্তব্য মজলিসে উপস্থিত জনতার মধ্যে যাহাদের নিকট পৌঁছিত না তিনি তাহাদের পৌঁছাইয়া দিতেন। কারণ আবূ জমরাহ (রহঃ)–এর কণ্ঠস্বর হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর কণ্ঠস্বর হইতে উচ্চ ছিল। আর কেহ কেহ বলেনঃ আবূ জমরাহ (রহঃ) ফারসী ভাষা জানিতেন। তাই ফারসী ভাষী লোকদের কথা আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর নিকট বলিতেন।

ইবনুত তাইন (রহঃ) ইহা হইতে মাসআলা নিগত করিয়াছেন যে, তা'লীম তথা শিক্ষা প্রদানের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয। তাহার প্রমাণ উপরোল্লেখিত সহীহ বুখারী শরীফের হাদীছ। (ফতহুল মুলহিম)

করিলেন।[১] তখন তিনি (হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ)) বলিলেনঃ আবদুল কায়েস সম্প্রদায়ের একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ এই প্রতিনিধি দল কোন গোত্রের পক্ষে অথবা (তিনি বলিয়াছেন কোন) সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আগত? তাহারা বলিলেন (আমরা) রবীআ গোত্রের। (প্রাথমিক পরিচয়াদির পর) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ মুবারকবাদ সম্প্রদায়কে[২] অথবা (তিনি বলিয়াছেন) প্রতিনিধি দলকে। (কারণ তোমরা আনন্দচিত্তে স্বতঃস্ফূর্ত মুসলমান হইয়া আগমন করিয়াছ, ফলে তোমাদেরকে পার্থিব জগতে) লাঞ্ছিত, অপমানিত হইতে হইল না (কারণ, যুদ্ধের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলে লাঞ্ছিত, অপমানিত হইতে হইত,) আর (আখিরাতে) লজ্জিত হইতে হইবে না (কারণ বিচারদিনে কাফিরদের লজ্জার সীমা থাকিবে না। তাহাদের মস্তক অবনত থাকিবে। অধিকন্তু দুনিয়াতেও যদি তোমরা যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিতে তবে দাস-দাসীরূপে থাকিতে এবং আমার সাক্ষাতে লজ্জাবোধ করিতে। কিন্তু যুদ্ধ ব্যতীত ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে আজ তোমাদের স্বাগতম, ধন্যবাদ। তোমরা সম্মানিত) রাবী বলেনঃ অতঃপর তাহারা (প্রতিনিধিদল) আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা বহু দূরাঞ্চল হইতে সফর করিয়া আপনার খিদমতে উপস্থিতহইয়াছি।[৩] আমাদের এবং আপনার মধ্যবর্তী স্থানে (আমাদের শত্রু) মুযার কাফির (প্রসিদ্ধ যুদ্ধবাজ) গোত্র রহিয়াছে। তাই 'শাহরুল হারাম' ব্যতীত (অন্য কোন মাসে কাফের মুযার গোত্রের মুকাবিলা করিয়া) আমরা আপনার খেদমতে উপস্থিত হইতে অপারগ। অতএব আপনি আমাদিগকে ইসলামী শরীআতের সুস্পষ্ট বিধান সম্পর্কে নির্দেশ দান করুন। যেন আমরা আমাদের পশ্চাতের লোকজনকে (অর্থাৎ আমাদের গোত্রের যে সকল লোক প্রতিনিধি দলের সহিত আগমন করেন নাই তাহাদিগকে) অবহিত করিতে পারি এবং আমরা (উপস্থিত ও অনুপস্থিত) সকলে তদানুযায়ী আমল করিয়া (আল্লাহ তা'আলার রহমতে) জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারি। রাবী

টীকা-১. فَاَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ تَسْئَلُهُ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ অর্থাৎ জনৈকা মহিলা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর দরবারে হাযির হইয়া কলসীতে তৈরী নাবীয সম্পর্কে শরীআতের হুকুম জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা পান করা জায়েয কিনা? আল্লামা নববী (রহঃ) বলেনঃ ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, (পর্দাসহ) মহিলাগণ দ্বীনের বিষয়ের ফতোয়া বেগানা পুরুষের নিকট জিজ্ঞাসা করা জায়েয এবং প্রয়োজনে মহিলার জন্যে বেগানা পুরুষদের কণ্ঠস্বর এবং পুরুষের জন্য বেগানা মহিলাদের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা জায়েয।

মহিলার জিজ্ঞাস্যের জবাবে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) ওয়াফদ আবদিল কায়েসের হাদীছ পেশ করিবার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর মতে উল্লেখিত পাত্রসমূহে নাবীয তৈরী করিবার নিষেধাজ্ঞা রহিত হয় নাই বরং উহার হুকুম বলবৎ রহিয়াছে। (নববী)

(এই বিষয়টি সম্পর্কে ২৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

টীকা-২. " مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ " মুবারকবাদ কওম। - مَرْحَبًا - শব্দটি فعل مضمر এর مفعول হইবার কারণে منصوب - 'যবর' হইয়াছে। صادفت رحبًا অর্থাৎ رحب শব্দের অর্থ উন্মুক্ত, অবকাশ ও বিস্তৃত ইত্যাদি। আর কোন কোন সময় উহার সহিত اهلًا । শব্দ ব্যবহৃত হয়। اهلًا । এর মর্মার্থ আপনজন আসিয়াছ, উত্তম স্থানে আসিয়াছ, ভয়ের কোন কারণ নাই। আরববাসীগণ আগত মেহমান বা সাক্ষাৎকারীগণের প্রতি দুআ ও সৌজন্য প্রকাশপূর্বক স্বাগত জানাইবার মর্মে مرحبًا অর্থাৎ 'মুবারকবাদ' শব্দ ব্যবহার করেন।

হাদীছের আলোচ্য অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আগত মেহমান বা সাক্ষাৎকারীগণকে মুবারকবাদ দিয়া অভ্যর্থনা জানানোর মাধ্যমে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করা মুস্তাহাব। (নববী, ফতহুল মুলহিম)

টীকা-৩. مِنْ شُقَّةٍ بَعِيْدَةٍ - شُقَّةٍ শব্দটি " ش " বর্ণে পেশ দিয়া পঠিত। ইহাই অধিক বিশুদ্ধ এবং ش বর্ণে যের দিয়া شقة ও পড়া যায়। ইহা দূরাঞ্চল সফর করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। উহার সহিত بعيدة শব্দটি সংযোজন করিয়া দূরত্বের উপর مبالغة অর্থাৎ অতিশয়োক্তি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বহু দূরাঞ্চল হইতে সফর করিয়া আগত।

(ফতহুল মুলহিম)

বলেনঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে চারিটি বিষয় আমল করিবার নির্দেশ দিলেন এবং চারিটি বস্তু (ব্যবহার) করা হইতে নিষেধ করিলেন। একঃ একক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান স্থাপনের নির্দেশ দিলেন এবং বলিলেনঃ তোমরা কি জান যে, একক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান স্থাপন কিরূপে হয়? তাহারা (জবাবে) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রসূলই (এই বিষয়ে) অধিক জ্ঞাত।[১] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ তথা মা'বূদ নাই এবং নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সত্য রসূল। **দুইঃ** নামায (যথাযথ) কায়েম করা। **তিনঃ** যাকাত আদায় করা এবং **চারঃ** রমযানের (পূর্ণ রমযানের (পূর্ণ এক মাস) রোযা রাখা। (আর একটি বিষয় হইতেছে যে,) গণীমত (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদের এক পঞ্চমাংশ (বায়তুল মালে জমা) প্রদান করিবে।

আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে দুব্বা, হানতাম এবং মুযাফ্‌ফাত (পাত্রসমূহ ব্যবহার করা) হইতে নিষেধ করিলেন। শু'বা বলেনঃ (মুযাফফাত-এর পর চতুর্থ পাত্রটি সম্বন্ধে) প্রায় নিশ্চিত যে, তিনি নাকীর ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং শু'বা (ইহাও) বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ রাবী (মুযাফফাত-এর সহিত) মুকাইয়্যার শব্দ বলিয়াছেন। (এই সকল বিষয় বর্ণনা করিবার পর) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তোমরা বর্ণিত বিধান সমূহ গুরুত্ব সহকারে যথাযথ হেফাযত তথা সংরক্ষণ করিও এবং তোমাদের পশ্চাতে যাহারা রহিয়াছে (অর্থাৎ তোমাদের সম্প্রদায়ের যেই সকল লোক তোমাদের সহিত আসেন নাই) তাহাদিগকে এই সকল বিধান জানাইয়া দিও।

আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) তাঁহার রিওয়ায়াতে مِنْ وَّرَاءِ كُمْ এর স্থলে مَنْ وَرَاءَكُمْ বলিয়াছেন। مِنْ এবং مَنْ এই উভয়ের অর্থে তেমন তফাৎ নাই এবং তাহার রিওয়ায়াতে " مُقَيَّرٌ " - মুকাইয়্যার শব্দনাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

অত্র হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণনার মধ্যে চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বর্ণনা করিয়াছেন পাঁচটি বিষয়ের ইহার কারণ কি? মুহাদ্দেছগণ এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়াছেন।

(১) ইবন বাত্তাল (রহঃ) বলেনঃ প্রকৃত উদ্দেশ্য চারিটি বিষয়ই বর্ণনা করা। অর্থাৎ তাওহীদ, নামায, যাকাত এবং রমযানের রোযা। কিন্তু একটি কথা অতিরিক্ত বলিয়াছেন যে, গণীমতের (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর) এক পঞ্চমাংশ আদায় করা। ইহা এই জন্য বলিয়াছেন যে, আবদুল কায়েস গোত্রের লোকেরা মুযার কাফের গোত্রের নিকটে বসবাস করিতেন এবং কাফেরদের সহিত তাহাদের জিহাদ করিতে হইত এবং জিহাদের ফলে গণীমতের মাল লাভ করিতেন। কাজেই তাহাদের জন্য গণীমত সামগ্রীর শরীআতের বিধান জানা প্রয়োজন ছিল। তাই উহার বিধান বর্ণনাকরিয়াছেন।

(২) ইবনুস সিলাহ (রহঃ) বলেনঃ وَاَنْ تُؤَدُّوْا এর আতফ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - এর উপর নহে। বরং ইহার আতফ - بِاَرْبَعٍ এর উপর। এই হিসাবে মর্ম হইবে আমি তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছি চারিটি বিষয়ের এবং অন্য আর একটি বিষয়ের নির্দেশ দিতেছি।

(৩) নামায এবং যাকাত এক নম্বর-এর মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। কেননা পবিত্র কুরআনে উভয়টি এক সাথে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই হিসাবে চারিটিই হইল।

টীকা-১. قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ অর্থাৎ তাহারা আরয করিলেনঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার প্রেরিত রসূল এই বিষয়ে ভাল জানেন। আবদুল কায়েস প্রতিনিধিদলের এই বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাহারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হইবার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(৪) গণীমত সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ আদায় করা যাকাতের সাধারণ অর্থে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কারণ যাকাত ও খুমুস উভয়ই সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ বায়তুল মাল বা অনাথ, দুঃস্থদের প্রদান করিতে হয়।

(৫) চারিটি বিষয় এইভাবে গণনা করিবে (ক) নামায কায়েম করা (খ) যাকাত আদায় করা (গ) রমযানের রোযা রাখা ও (ঘ) গণীমত সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ আদায় করা এবং শাহাদাতাইনের উল্লেখ কেবল বরকতের জন্য করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, এই সকল ব্যাখ্যাবলী ছাড়াও অন্যান্য জবাব রহিয়াছে। তবে সকল জবাবের মধ্যে আল্লামা ইবনুস সিলাহ (রহঃ)-এর জবাবই অধিক উত্তম যাহা (২) নম্বরে প্রদান করা হইয়াছে। (ফতহুল মুলহিম)

(আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যা ২৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

২৫ وحدثنى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا أَبِى ح وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَقَالَ أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِى الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَ زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ فِى حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ.

হাদীছ-২৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) এবং আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ওবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহঃ)....(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন নসর বিন আলী আল জাহযমী (রহঃ)....তাহারা হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হযরত শু'বা (রহঃ)-এর বর্ণিত (২৪ নং হাদীছের) অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন এবং (হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর এই বর্ণনায় কথাটি এইরূপ বলা হইয়াছে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি তোমাদিগকে সেই নাবীয (পানির মধ্যে খেজুর, যব ও কিসমিস ইত্যাদি ভিজাইয়া প্রস্তুত পানীয়) হইতে নিষেধ করিতেছি যাহা দুব্বা, নাকীর, হানতাম এবং মুযাফ্ফাত পাত্রসমূহে তৈয়ার করা হয়। (ব্যাখ্যা ২৩ নং হাদীছে দেখুন) ইবন মুআয (রহঃ) তাহার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীছে আরও কিছু অতিরিক্ত শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের নেতা আশাজ্জ (মুনযির বিন আয়েয)কে বলিলেন, তোমার মধ্যে এমন দুইটি বিশেষ গুণ রহিয়াছে যাহা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন-বুদ্ধিমত্তা ও গাম্ভীর্যতা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

তরজমানে সুন্নাহে যুরকানী (রহঃ) শরহে মাওয়াহেব গ্রন্থে বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে বলিলেনঃ এখন তোমাদের নিকট একটি প্রতিনিধি দল আগমন করিতেছেন যাহারা পূর্বাঞ্চলীয় সকল লোকদের মধ্যে উত্তম। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাদিগকে দেখিবার জন্য মজলিস হইতে উঠিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন তাহারা ১৩জন ব্যক্তির একটি দল। (নববী ১৪ জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হয়তঃ নেতাসহ ১৪ জন এবং নেতা ব্যতীত ১৩ জন ছিলেন।) হযরত ওমর (রাযিঃ) প্রতিনিধি দলের নিকট পৌঁছিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুসংবাদ শুনাইলেন। অতঃপর তাঁহার সহিত তাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন প্রতিনিধিদল দূর হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যক্ষ করিলেন তখন ব্যাকুল হইয়া সাক্ষাতের বাসনায় স্বীয় মালপত্র এলোমেলো অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির

হইলেন এবং তাঁহার পবিত্র হস্ত মুবারকে চুম্বন করিলেন। কিন্তু দলের নেতা আশাজ্জ পশ্চাতে রহিয়া গেলেন। তিনি প্রথমে সাথীদের মালপত্র গুছাইয়া উষ্ট্রগুলি বাঁধিলেন। অতঃপর সফরের ময়লাযুক্ত কাপড় পরিবর্তন করিয়া পরিস্কার সাদা কাপড় পরিধান করিয়া অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পবিত্র হস্ত মুবারকে চুম্বন করিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে পার্শ্বে বসাইলেন এবং তাহার দিকে দৃষ্টি করিলেন। তখন আশাজ্জ (রাযিঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মানুষের মূল্য শুধু ঠাট দ্বারাই হয় না। বস্তুতঃ মানুষের মূল্য দুইটি ছোট হইতে ছোট অঙ্গ দ্বারা হইয়া থাকে অর্থাৎ জিহ্বা ও অন্তর। তাহার কথা শ্রবণ করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তোমার মধ্যে দুইটি স্বভাবগত গুণ রহিয়াছে যাহা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। একটি বুদ্ধিমত্তা তথা বিচক্ষণতার সহিত ভদ্রতার গুণ আর দ্বিতীয়টি গাম্ভীর্য তথা কোন কাজে তড়িঘড়ি না করিয়া অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সহিত সম্পাদন করিবার গুণ। আশাজ্জ (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার মধ্যে কি এই গুণ দুইটি জন্মসূত্রে অথবা আমার উপার্জন দ্বারা লাভ হইয়াছে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ জন্মসূত্রে।

মুসনাদে আবূ ইআলী-এর মধ্যে বর্ণিত হইয়াছেঃ

أَنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ . . . الحديث. قَالَ يَا رَسُوْلَ! كَانَا فِيَّ اَمْ حَدَثَا قَالَ بَلْ قَدِيْمٌ. قَالَ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَبَلَنِىْ عَلٰى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا .

"যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাজ্জকে বলিলেনঃ তোমার মধ্যে দুইটি গুণ রহিয়াছে....(আল হাদীছ) আশাজ্জ (রাযিঃ) বলিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার মধ্যে সেই দুই গুণ আগে হইতে ছিল, না কি নতুন সৃষ্টি হইয়াছে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ বরং আগে হইতেই ছিল। তখন আশাজ্জ বলিলেনঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাকে এমন দুইটি গুণের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা তিনি পছন্দ করেন।

বলাবাহুল্য প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা ও গাম্ভীর্য এই দুইটি গুণই হইতেছে যাবতীয় সৌন্দর্য্যের মূল। অনেক লোক বুদ্ধিমান বটে কিন্তু দ্রুতগামী। এই প্রকারের লোক অধিকাংশই ভুলভ্রান্তি করে, অতঃপর লজ্জিত হয়। উৎকৃষ্ট কথা এই যে, কাজ করিবার পূর্বে ভালভাবে চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উহার উপকার ও অনিষ্টসমূহের প্রতি দৃষ্টি করিবে। অতঃপর উপকার অধিক হইবার বিষয়টি অনুধাবিত হইলে এবং উহার পরিণাম উত্তম হইলে করিবে। আর যদি নিজের পক্ষে উহার ভালমন্দ অনুধাবনে অপারগ হও তবে বুদ্ধিমান বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া করিবে।

দার্শনিকগণ বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি কোন কাজ করিবার কল্পনা করিয়াই চিন্তা ব্যতীত সম্পাদন করে সে এবং জন্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। জন্তুদের স্বভাব বুদ্ধি এই পরিমাণ যে, উহাদের দৃষ্টি যাহাতে পড়ে উহার দিকেই দৌড়ায়। চিন্তা ফিকর এবং পরিণামের কোন বিবেচনা করে না।

ওলামাগণ বলিয়াছেনঃ এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফিতনা হইতে নিরাপদ হইলে মানুষের সামনা সামনি প্রশংসা করা জায়েয। (ফতহুল মুলহিম)

আর যেই স্থলে ফিতনার সম্ভাবনা রহিয়াছে সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কাহারও সামনা সামনি প্রশংসা করিলে প্রশংসাকারীর মুখে মাটি ছুঁড়িয়া দাও। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

٢٦ حدثنا يحيى بن ايوب قال نا ابن علية قال نا سعيد بن ابى عروبة عن قتادة قال حدثنى من لقى الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة ابا نضرة عن ابى سعيد الخدرى فى حديثه هذا ان اناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبى الله انا حى من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر لا نقدر عليك الا فى اشهر الحرم فمرنا بامر نامر به من وراءنا وندخل به الجنة اذا نحن اخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امركم باربع وانهاكم عن اربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واقيموا الصلوة واتوا الزكوة وصوموا رمضان واعطوا الخمس من الغنائم وانهاكم عن اربع عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير قالوا يا نبى الله ما علمك بالنقير قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء قال سعيد او قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى اذا سكن غليانه شربتموه حتى ان احدكم او ان احدهم ليضرب ابن عمه بالسيف قال وفى القوم رجل اصابته جراحة كذلك قال وكنت اخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففيم نشرب يا رسول الله قال فى اسقية الادم التى يلاث على افواهها قالوا يا رسول الله ان ارضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها اسقية الادم فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم وان اكلتها الجرذان وان اكلتها الجرذان وان اكلتها الجرذان قال وقال نبى الله صلى الله عليه وسلم لاشج عبد القيس ان فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والاناة .

হাদীছ-২৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হযরত ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব (রহঃ)। তিনি....হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন সেই ব্যক্তি যিনি প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন যেই প্রতিনিধিদল আবদুল কায়েস গোত্রের পক্ষ হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়াছিলেন। সাঈদ (রহঃ) বলেনঃ হযরত কাতাদাহ আবূ নযরাহ[১] এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং আবূ নযরাহ (রহঃ) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)[২] হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল কায়েস গোত্রের কয়েকজন লোক (প্রতিনিধি দল স্বরূপ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেনঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ! আমরা রবীআ সম্প্রদায়ের একটি শাখা গোত্রের লোক। আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তী যাতায়াত পথে (আমাদের শত্রু) মুযার গোত্রের কাফেররা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই আমরা আপনার খেদমতে 'আশহুরুল হুরুম' (যিল কায়দাহ, যিলহিজ্জা, মুহাররম ও রজব মাস) ব্যতীত অন্য কোন সময়ে আসিতে পারি না। অতএব আপনি আমাদিগকে এমন কাজের নির্দেশ দান করুন যাহাতে আমরা আমাদের (গোত্রের

টীকা-১. "আবূ নযরাহ"-এর নাম মুনযির বিন মালেক বিন কিতআতা আল-আওযাকী।

টীকা-২. আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিঃ)-এর নাম সা'আদ বিন মালিক বিন সিনান। তিনি বনী খুদরাহ-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহার পিতা হযরত মালিক (রাযিঃ) সাহাবী ছিলেন। ওহুদের জিহাদে তিনি শহীদ হইয়াছিলেন।

(ফতহুল মুলহিম)

অনাগত) পশ্চাতের লোকদিগকে (উক্ত নির্দেশিত বিষয়াবলী) অবহিত করিতে পারি এবং যাহা (যথাযথ) আমল করিয়া (আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন পূর্বক তাঁহার রহমত ও অনুকম্পায়) আমরা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আমি তোমাদিগকে চারিটি বিষয় পালন করিবার আদেশ করিতেছি এবং চারিটি বিষয় হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ প্রদান করিতেছি। [যে চারিটি বিষয় পালন করিবার আদেশ করিতেছি তাহা হইতেছে। (১) তোমরা একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী করিবে এবং তাঁহার সহিত অন্য কোন বস্তুকে অংশীদার করিবে না। (২) নামায (যথাযথ) কায়েম করিবে। (৩) যাকাত আদায় করিবে। এবং (৪) রমযান শরীফের রোযা পালন করিবে। আর (একটি বিষয়ের নির্দেশ দিতেছি যে,) তোমরা গণীমত সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ প্রদান করিবে।] আর আমি তোমাদিগকে চারিটি পাত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেছি (উহা হইতেছে) (১) দুব্বা, (২) হানতাম, (৩) মুযাফ্ফাত এবং (৪) নাকীর। তাহারা আরয করিলেনঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ! নাকীর দ্বারা আপনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? (ইহা তো আমাদের জানা নাই) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ হ্যাঁ, নাকীর হইতেছে খেজুর গাছের কাণ্ডমূল খোদাই করিয়া তৈরী পাত্র। ইহাতে 'কুতাইয়া' (একপ্রকার ছোট খেজুর যাহাকে শুহ্রীর বলা হয়) নামক খেজুর রাখ। আবূ সাঈদ (রাযিঃ) বলেন অথবা তিনি বলিয়াছেন, খেজুর রাখ। (উভয়টির একটি বলিয়াছেন) অতঃপর উহাতে পানি ঢালিয়া দাও। (পানি ঢালিবার পর জোশ দিয়া থাক)। জোশ স্তব্ধ হইয়া যাইবার পর উহা পান করিয়া থাক। ফলে তোমাদের কেহ অথবা তাহাদের কেহ (নেশাগ্রস্ত হইয়া) আপন চাচাত ভ্রাতাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিয়া বসিবে। রাবী (আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)) বলেন (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা এরশাদ করিবার সময়) উপস্থিত লোকগণের মধ্যে নেশা অবস্থায় আঘাত প্রাপ্ত এক ব্যক্তি (তাহার নাম জুহম, তিনি পায়ের গোছায় আঘাত প্রাপ্ত ছিলেন) ছিলেন। তিনি বলেনঃ কিন্তু আমি লজ্জায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আঘাতের বিষয়টি (উল্লেখ করা হইতে) গোপন করিয়াছিলাম। আমি আরয করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! (যখন নাকীর ব্যবহার নিষিদ্ধ) তাহা হইলে আমরা কোন্ পাত্রে (তৈরী নাবীয বা শরবত) পান করিব? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ পাকা চামড়ার তৈরী পাত্রসমূহে যাহার মুখ রশি (বা চামড়ার লম্বা টুকরা) দ্বারা বাঁধিয়া বন্ধ করা হয়। (অর্থাৎ মশক ইত্যাদি)। তাহারা আরয করিলেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আমাদের অঞ্চলে ইঁদুরের উপদ্রব খুব বেশী। সেখানে চামড়া পাত্র অক্ষত রাখা যায় না। (কারণ ইঁদুর কাটিয়া নষ্ট করিয়া দেয়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যদিও উহা ইঁদুরে কাটে, যদিও উহা ইঁদুরে কাটে, যদিও উহা ইঁদুরেকাটে।[১] (তবুও চামড়ার পাত্রে তৈরী নাবীয বা শরবত পান কর, যাহাতে নাবীয মদ্য না হইয়া যায়)।

রাবী (আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)) বলেনঃ অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের (নেতা) আশাজ্জ সম্পর্কে বলিলেনঃ তোমার মধ্যে দুইটি বিশেষ গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন—বুদ্ধিমত্তা ও গাম্ভীর্যতা।[২]

টীকা—১· গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিবার দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিদের অন্তরে বিষয়টি বদ্ধমূল হইয়া যায়।

টীকা—২· (২৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

২৭ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِيَ ذَلِكَ الْوَفْدَ وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ وَتَذِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ أَوِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ وَلَمْ يَقُلْ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ .

হাদীছ–২৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ) এবং ইবন বাশ্‌শার (রহঃ) তাহারা উভয়ই---হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেনঃ আমার নিকট একের অধিক লোক (যাহাদের আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাঁহারা) বলিয়াছেন এবং সূত্রের (এক ব্যক্তির) নাম আবূ নযরাহ (রহঃ) বলিয়া হযরত কাতাদাহ উল্লেখ করিয়াছেন। (অর্থাৎ হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) আবূ নযরাহ হইতে রিওয়ায়াত গ্রহণ করিয়াছেন) আবূ নযরাহ বলেনঃ আমার নিকট হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেনঃ যখন আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খেদমতে হাযির হইলেন। অতঃপর তিনি হাদীছ শরীফ খানার বাকী অংশ ইবনে উলাইয়্যা (রহঃ)–এর বর্ণিত রিওয়ায়াত (হাদীছ নং–২৬) –এর অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই রিওয়ায়াতে -- -- -- فتقذفون এর স্থলে- تذيفون শব্দ রহিয়াছে। অর্থাৎ উক্ত (নাকীর পাত্রের) মধ্যে কুতাইআ (এক প্রকার ছোট) খেজুর এবং পানি সংমিশ্রণ কর। আর - قال سعيد أو قال من التمر বাক্য বলা হয় নাই।

২৮ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ أَخْبَرَهُ وَحَسَنًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الأَشْرِبَةِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ أَوَ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ قَالَ نَعَمِ الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ وَلاَ فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْحَنْتَمَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى .

হাদীছ–২৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন বাককার আল বাসরী (রহঃ)----(সূত্র পরিবর্তন) এবং হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন রাফে। তিনি----হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হইলেন তখন তাহারা আরয করিলেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। আমাদের জন্য কোন্ প্রকার পাত্রে পান করা বৈধ? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ তোমরা নাকীর পাত্রে পান করিবে না। তাঁহারা বলিলেন, হে আল্লাহ তা'আলার নবী! আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, নাকীর সম্পর্কে আপনার কি জানা আছে? (অর্থাৎ নাকীর দ্বারা আপনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেন। হ্যাঁ, নাকীর এক প্রকার পাত্র যাহা খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডমূল বা কাঠ

খুদিয়া তৈরী করা হয়। তিনি আরও বলিলেনঃ দুব্বা, হানতাম পাত্রেও পান করিবে না। (কারণ এই সকল পাত্র মদ্য তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়।) তোমরা (চামড়ার তৈরী মশক ইত্যাদি) ব্যবহার করিবে যাহার মুখ রশি দিয়া বাঁধিয়া বন্ধ করা হয়।[১]

ফায়দাঃ ইমাম নববী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীছ শরীফসমূহে বহু মাসআলা বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত আহকামসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে পুনরায় পেশ করা হইল।

(১) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে নেতৃস্থানীয় এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করাজায়েয।

(২) আবেদন বা প্রশ্ন করিবার পূর্বে ওযর খাহী ও ক্ষমা প্রার্থনা করা বৈধ।

(৩) হজ্জ ব্যতীত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলনীতি বর্ণনা করা। অবশ্য অধিকাংশের অভিমত অনুযায়ী আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমনের পূর্বে হজ্জ ফরয হয় নাই। (লোকের প্রয়োজন ও অবস্থার প্রেক্ষিতে আহকামে শরীআতের বর্ণনা করা যায়। সকল ক্ষেত্রে এক সঙ্গে সকল আহকাম বর্ণনা অত্যাবশ্যক নহে)।

(৪) লোকদিগকে বুঝানোর জন্য কোন আলেম অন্য কাহারও সাহায্য-সহযোগী রূপে গ্রহণ করা জায়েয। যেমন আবূ জমরাহ (রহঃ) দোভাষী হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)কে সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

(৫) অনুবাদ, ফতোয়া ও খবর-এর মধ্যে এক ব্যক্তির কথা যথেষ্ট হয়।

(৬) আগত মেহমান বা সাক্ষাৎকারীগণকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে অভ্যর্থনা জানানো মুস্তাহাব। তাহাদের প্রশংসা করা যায়।

(৭) ফেতনার (আত্মগর্ব ইত্যাদির) আশংকা না থাকিলে কোন লোকের সাক্ষাতে সামনা সামনি প্রশংসা করা বৈধ। অবশ্য ফেৎনার (অহঙ্কার, আত্মগর্বের) আশংকা থাকিলে মুখামুখী প্রশংসা করিবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। (লোক ভেদে হুকুম বিভিন্ন হইয়া থাকে।)

বলাবাহুল্য অতিশয়োক্তিহীন, বাস্তব ও সুসংবাদজনিত প্রশংসামূলক অনেক উক্তি আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত আছে। যেমন হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ اُمَّتِىْ خَلِيْلاً لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً ـ

অর্থাৎ "যদি আমি আমার উম্মতের মধ্যে কাহাকেও মাহবুব হিসাবে গ্রহণ করিতাম তাহা হইলে আবূ বকর (রাযিঃ)কে মাহবুব বানাইতাম। (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহাকেও মাহবুব হিসাবে গ্রহণ করি নাই বলিয়া তাহা করা হইল না।)"

অন্য হাদীছে আছে-

قَالَ لَهٗ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ اِى مِنَ الَّذِيْنَ يُدْعَوْنَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ ـ

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর (রাযিঃ) সম্পর্কে বলিলেন, আমার আশা যে আপনি ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থাৎ যাহাদিগকে জান্নাতের দরজা হইতে আহবান করা হইবে।"

অন্য হাদীছে আছে-আমার পরে নবী হইলে আবূ বকর (রাযিঃ) হইত। (কিন্তু আমার পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না। আমি সর্বশেষ নবী)

টীকা-১ (২৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

হযরত ওমর (রাযিঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন-

قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ وَرَاَيْتُ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا قَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الخ

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি (মেরাজের রাত্রিতে) জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন একটি চমৎকার প্রাসাদ প্রত্যক্ষ করিলাম। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই প্রাসাদ কাহার জন্য নির্মিত। ফেরেশতাগণ বলিলেনঃ হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)-এর জন্য---।"

হযরত ওছমান (রাযিঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন-

قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِئْتَمِ لِعُثْمَانَ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ ওছমানের জন্য উন্মুক্ত এবং তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর।"

হযরত আলী (রাযিঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন-

قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْتَ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْكَ ـ

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ) সম্পর্কে বলিলেনঃ তুমি আমার এবং আমি তোমার।"

হযরত বিলাল (রাযিঃ) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ فِى الْجَنَّةِ ـ

অর্থাৎ "আমি তোমার পাদুকাদ্বয়ের শব্দ জান্নাতে শ্রবণ করিয়াছি।"

ইহা ছাড়াও আনসার, মুহাজির ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) সম্পর্কে অসংখ্য প্রশংসা করিবার প্রমাণরহিয়াছে।

ঐ সকল ক্ষেত্রে সামনা সামনি প্রশংসা করার নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে যে স্থানে অতিশয়োক্তি, আত্মগর্ব, অহঙ্কার ইত্যাদির সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৮) প্রশ্নকারী যদি জবাব বুঝিতে সক্ষম না হইবার কারণে পুনরায় প্রশ্ন করে তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া জবাব দেওয়া চাই। তাহাদিগকে ধমক দেওয়া উচিত নহে।

(৯) রমযান মাস উল্লেখ না করিয়া কেবল 'রমযান' উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

(১০) দ্বীনের কোন বিষয় উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য আলেমকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করা যায়।

(১১) গুরুত্বপূর্ণ কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখপূর্বক তাকীদ করিবার দ্বারা অধিক ক্রিয়াশীল হয়।

(১২) 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গ করুন।' এইরূপ বলা জায়েয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তাঁহার জন্যই সকল প্রশংসা।

(নববী)

بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ

অনুচ্ছেদঃ মানবজাতিকে তাওহীদ ও রিসালতের শাহাদত এবং ইসলামের বিধি–বিধানের দিকে আহবান করা।

২৯ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

হাদীছ–২৯. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) এবং আবূ কুরাইব (রহঃ) এবং ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। তাঁহারা সকলেই–হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ হযরত মুআয (রাযিঃ) বলিয়াছেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (ইয়ামানের শাসনকর্তা[১] বা বিচারক নিযুক্ত করিয়া) পাঠাইলেনঃ (রওয়ানার সময় আমি সওয়ারীর উপর আরোহিত অবস্থায় এবং তিনি (সওয়ারীর পার্শ্বে দাঁড়ানো অবস্থায় আমাকে কিছু উপদেশমূলক কথা) বলিলেন, তুমি (লেখাপড়া জানা) আহলে কিতাব[২] সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছ। (তোমাকে অত্যন্ত পারদর্শিতার সহিত কাজ করিতে হইবে। অতএব) তাহাদের সহিত সাক্ষাতে (সর্বপ্রথম) কলেমা শাহাদাতের দিকে আহবান জানাইবে[৩] যে, "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং আমি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সত্য রসূল।[৪] যদি তাহারা উহা মানিয়া লয় (অর্থাৎ ঈমান গ্রহণ করে) তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা (জানের মালিক বিধায়) তাহাদের উপর দিবারাত্রিতে (মোট) পাঁচ (ওয়াক্ত শারীরিক ইবাদত) নামায ফরয করিয়া দিয়াছেন। যদি তাহারা উহা গ্রহণ করে তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা (সম্পদের প্রকৃত মালিক বিধায়) তাহাদের (নিসাব পরিমাণ সম্পদের) উপর যাকাত ফরয করিয়াছেন, যাহা (নিসাব পরিমাণ মালিক) ধনীদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে এবং তাহাদের দরিদ্রদের মধ্যে উহা বন্টন করা হইবে। যদি তাহারা উহা মানিয়া লয় (এবং যাকাত আদায় করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায় তবে যাকাত উসূল করিবার সময়) সাবধান! (যাকাত হিসাবে) তোমরা তাহাদের নিকট হইতে বাছাই করিয়া উত্তমগুলি লইবে না (বরং মধ্যম সম্পদ গ্রহণ করিবে। অবশ্য তাহারা স্বতঃস্ফূর্ত উত্তমগুলি প্রদান করিলে করিতে পারে) এবং মযলুম তথা অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ–দু'আ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এবং মযলুমের দু'আর মধ্যবর্তী কোন অন্তরায় থাকে না।

টীকা–১. হযরত মুআয (রাযিঃ) ইয়ামানের হাকিম অর্থাৎ প্রশাসক অথবা কাযী অর্থাৎ বিচারক হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এই বিষয়ে ইবন আবদিল বার্ (রাযিঃ) দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে কাযী হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং হযরত গাসসানী (রহঃ) বলেন, তাঁহাকে ওলী বা হাকিম অর্থাৎ প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

হিজরতের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছিলেন। তবে প্রাথমিক অবস্থায় মক্কার কাফিরদের নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের মুখে মুসলমানগণ শংকিত ছিলেন। অতঃপর হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে সেই অসুবিধা দূরীভূত হইয়া গেল। সন্ধির শর্তগুলির অধিকাংশই মুসলমানদের পক্ষে ছিল না। অবশ্য ইহা যথার্থ যে, এই সন্ধির মাধ্যমেই মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। পবিত্র কুরআনে এই সন্ধিকে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন। বাস্তবে তাহাই হইল। হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে পৃথিবী জুড়িয়া ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হইতে থাকে। চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় ধ্বনি কম্পিত হইয়া উঠে।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

হযরত মুআয (রাযিঃ)কে কখন ইয়ামানে প্রেরণ করিয়াছিলেন এই সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। (ক) হাফেয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হযরত মুআয (রাযিঃ)কে বিদায় হজ্জের পূর্বে হিজরী ১০ম সনে ইয়ামান দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় সহীহ বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাযীতে অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। (খ) ওয়াকেদী (রহঃ) ও ইবন সা'দ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের জিহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হিজরী ৯ম সনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ইবন সাদ (রহঃ) হইতে ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে যে, হযরত মুআয (রাযিঃ) হিজরী ১০ম সনে রবিউল আওয়াল মাসে ইয়ামানের দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন। (গ) কেহ কেহ বলেন মক্কা বিজয়ের বৎসর অর্থাৎ হিজরী ৮ম সনে হযরত মুআয (রাযিঃ)কে ইয়ামান দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য হযরত মুআয (রাযিঃ)কে ইয়ামান দেশে প্রেরণের সঠিক সন তারিখ নির্ধারণে বিভিন্ন অভিমত থাকিলেও এই বিষয়ে সকলই ঐক্যমত রহিয়াছেন যে, হযরত মুআয (রাযিঃ) ইয়ামান দেশে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)-এর খেলাফত যুগ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। অতঃপর তিনি শাম দেশে চলিয়া যান এবং সেই স্থানেই ইহলোক ত্যাগ করেন। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-২· اهل الكتاب। আহল কিতাব ঐ সকল সম্প্রদায় যাহাদের নিকট আসমানী কিতাবসহ কোন পয়গাম্বর প্রেরণ করা হইয়াছে। যেমন ইয়াহুদীদের নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর নিকট 'তাওরাত' কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল, খ্রীষ্টানদের নবী ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নিকট 'ইনজীল' কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং আদ সম্প্রদায়ের পয়গাম্বর হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর নিকট 'যাবুর' কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত পৃথিবীর মানুষের জন্য সাধারণভাবে ছিল। পূর্বেকার নবীগণের ন্যায় বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা জাতির জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। তিনি সমগ্র পৃথিবীর জন্য পয়গাম্বর হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বীন পূর্ববর্তী সকল দ্বীনকে রহিত করিয়া দিয়াছে। তাহার পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না। তিনি সর্বশেষ নবী। সূর্য উদিত হইলে বাতির প্রয়োজন হয় না।

টীকা-৩ فَادْعُوهُمْ 'অতঃপর তাহাদিগকে (শাহাদাতাইনের দিকে) আহবান করিবে' ইবনুল মুলক বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধের পূর্বে কাফিরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু ইহা ঐ সময় যখন তাহাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত না পৌছে। যদি তাহাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়া থাকে তাহা হইলে যুদ্ধের পূর্ব মূহূর্তে পুনরায় ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব নহে। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মুছতালিকের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন অথচ তাহারা অসতর্ক অবস্থায়ছিল। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-৪ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ 'এবং আমি আল্লাহ তা'আলার রসূল' হাদীছের আলোচ্য অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান হিসাবে গণ্য হইবার জন্য কেবল কলেমা শাহাদত لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই" এর সাক্ষ্য দেওয়াই যথেষ্ট নহে বরং মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রসূল হওয়ার সাক্ষ্য দিতে হইবে। শাহাদাতাইনের সাক্ষ্য দেওয়ার পর মুসলমান হিসাবে গণ্য হইবে। ইহাই জমহুরে ওলামার অভিমত। (ফতহুল মুলহিম)

এই সময়ই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)কে ইয়ামান দেশের শাসক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রেরণ মুহূর্তে হযরত মুআয (রাযিঃ)কে কিছু অমূল্য উপদেশ দিয়া বলিলেনঃ তুমি আহলে কিতাবদের নিকট প্রেরিত হইতেছ। তাহাদের অধিকাংশ শিক্ষিত। সুতরাং তাহাদের সহিত জ্ঞানীসুলভ আচরণই কাম্য। তাহাদিগকে প্রথমে তাওহীদ রিসালতের দিকে আহবান করিবে। উহাতে সম্মত হইলে নামায ও যাকাতের বিষয় অবহিত করিবে।

হাফেয ইবন হাজার (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছে রোযা ও হজ্জের কথা উল্লেখ নাই। অথচ হযরত মুআয (রাযিঃ)কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ইহকালীন জীবনের শেষ সময়ে ইয়ামানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইবনুস সিলাহ (রহঃ) উহার উত্তর দিয়াছেন যে, ইহা রাবীগণের সংক্ষিপ্ততা মাত্র। আল্লামা কিরমানী (রহঃ) উহার জবাব দিয়াছেন যে, আইন প্রবর্তক অধিকাংশ সময় ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে নামায ও যাকাতকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। কুরআন মজীদেও উহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ইহার কারণ ইহাও হইতে পারে যে, নামায ও যাকাত কোন অবস্থাতে বা সময়ে মুকাল্লাফ (নির্দেশিত ব্যক্তি) হইতে সাকিত অর্থাৎ পতিত বা ক্ষমা হয় না। পক্ষান্তরে রোযা এবং হজ্জ, মাযূর তথা অপারগ অবস্থায় রোযার পরিবর্তে ফেদিয়া আদায় এবং হজ্জের পরিবর্তে বদলী হজ্জ জায়েয। তবে হজ্জের ব্যাপারে ইহাও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, তখন হজ্জ ফরয হয় নাই।

ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার হযরত আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহঃ) এর অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন যাহার সারমর্ম এইঃ বিধান প্রবর্তক–এর রীতি হইতেছে যখন 'আরকানে ইসলাম' বর্ণনা করিয়া থাকেন তখন সকল রুকনকে পরিব্যাপ্ত ভাবে বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত করেন। যেমন হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)–এর বর্ণিত হাদীছে ইসলামের পাঁচটি রুকন এক সাথে بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ ـ উল্লেখ করা হইয়াছে। আর যখন দাওয়াত ও তবলীগ উদ্দেশ্য হয় তখন ঈমান, নামায ও যাকাত এই তিনটি রুকন উল্লেখ করেন। যদিও তখন রোযা ও হজ্জ ফরয হইয়াছিল। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেনঃ

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ـ

অর্থাৎ "অতঃপর যদি তাহারা তওবা করিয়া লয় এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও।" (সূরা তাওবাহ–৫)

এই আয়াতখানা সূরা বরয়াত–এর দুই স্থানে উল্লেখ হইয়াছে। আর সূরা বরয়াত রোযা ও হজ্জ ফরয হইবার পরবর্তী সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। অথচ আয়াতে রোযা ও হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয় নাই।

অনুরূপ হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ ـ

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি যতক্ষণ না তাহারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার রসূল এবং নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় আদায় করে।"

আরও বহু হাদীছে কেবল তাওহীদ, রেসালাত, নামায ও যাকাতের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার হেকমত হইতেছে যে, ইসলামের পাঁচটি রুকন তিন শ্রেণীভুক্ত। (১) যাহা আকীদার সহিত সম্পর্কিত উহা হইতেছে শাহাদত তথা ঈমান। (২) আর বান্দার শরীরের সহিত সম্পর্কিত হইলে উহা হইতেছে নামায। এবং (৩) বান্দার সম্পদের সহিত সম্পর্কিত হইলে উহা হইতেছে যাকাত। এই তিনটি রুকনই অধিক গুরুত্ববহ। কারণ ইসলামের

অন্যান্য যাবতীয় বস্তু এই তিনটিরই শাখা প্রশাখা। সুতরাং ইসলামী শরীআতের দিকে দাওয়াত ও তবলীগের সময় এই তিনটি রুকনের উপরই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ অবশিষ্ট দুইটি রুকন ইহাদেরই শ্রেণীভুক্ত। রোযা কেবল শারীরিক ইবাদত এবং হজ্জ শারীরিক ও মালী ইবাদত। অধিকন্তু কলেমা শাহাদত ইসলামের মূল ভিত্তি যাহা কাফেরদের উপর অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য। আর নামায পুনঃ পুনঃ আদায়ের দরুন তাহাদের জন্য খুবই ভারী ও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আর যাকাত আদায়ও তাহাদের জন্য অনেক ভারী হয়। কেননা মানুষের স্বভাবগত প্রকৃতিই হইতেছে সম্পদের মহব্বতে নিপতিত হওয়া। অতএব ইসলামের এই তিনটি রুকনের উপর যখন মানুষ আমল করিতে সক্ষম হয় এবং উহার উপর দৃঢ়তা অর্জন করিতে পারে তখন অন্যান্য ইসলামী শরীআতের রুকন ও আদেশ পালন করা তাহার জন্য খুবই সহজ হইয়া যায়।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবতঃ ইসলামী শরীআতের 'আরকান' রুকনসমূহের সংখ্যা নির্ণয় এবং উহার আহকামের পরিব্যাপ্ততা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে। কারণ হযরত মুআয (রাযিঃ) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ইসলামের আরকান সম্পর্কে পূর্ব হইতেই অবহিত রহিয়াছেন। বিশেষভাবে রোযা ও হজ্জ ইত্যাদি যাহা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)কে ইসলামের দিকে মানব জাতিকে আহবান তথা দাওয়াত ও তবলীগ করিবার পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথমেই যদি মানুষের সামনে ইসলামের যাবতীয় বিষয় স্তুপীকৃতভাবে পেশ করা হয় তবে তাহারা ইহাকে দুঃসাধ্য মনে করিয়া দূরে থাকিবে। কাজেই দ্বীনের দাওয়াতের মধ্যে হেকমত হইতেছে সহজ সরলভাবে ক্রমান্বয়ে আদেশ নিষেধের প্রতি আকৃষ্ট করা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে স্বভাব প্রকৃতি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সেই চাহিদা মুতাবিক তাহাদের সামনে নীতিগত বস্তু ধীরে ধীরে ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নহে। তাই কুরআন ও হাদীছে শরীআতের বিধি-বিধান বাস্তবায়নে মানব প্রকৃতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)কে বলিয়া দিলেন যে, ইয়ামানের আহলে কিতাবের অধিকাংশ লোক শিক্ষিত। ফলে তাহাদের সম্মুখে বিষয়ের উপস্থাপন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত হইতে হইবে। তুমি প্রথমে তাহাদিগকে কেবল কলেমা শাহাদতের দিকে আহবান করিবে এবং উহার প্রকৃত মর্ম শিক্ষা দিবে। বিভিন্ন দলীল প্রমাণের মাধ্যমে উহার বুনিয়াদী হাকীকতকে তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে দৃঢ়ভাবে মজবুত করিবে। যখন কলেমার প্রকৃত মর্ম তাহাদের মস্তিষ্কে স্থায়ীত্ব লাভ করিবে এবং প্রকৃত ঈমান গ্রহণ করিবে তখন তাহাদিগকে বলিবে যে, বান্দার জানের মালিক যেহেতু মহান প্রতিপালক সেহেতু তিনি তোমাদের উপর দিবারাত্রে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। নামাযের দর্শন ও উহার মুনাফা তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে। যখন তাহারা নামাযের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আমলকারী হিসাবে আনুগত্য গ্রহণ করিবে তখন তাহাদিগকে বলিবে যে, বান্দার জানের মালিক যেমন আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ সম্পদের প্রকৃত মালিকও তিনিই। সুতরাং উহার সুষম বন্টন ও সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে দুঃস্থ মানবতার সেবায় তোমাদের সম্পদশালী ব্যক্তিদের নেসাব পরিমাণ সম্পদের উপর বৎসরান্তে যাকাত ফরয করিয়াছেন। যাহা ধনীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া দুঃস্থ ও অনাথ ব্যক্তিদেরকে প্রদান করা হইবে। ইহার দ্বারা তোমাদের দরীদ্র ভাইদের সাহায্য এবং তোমাদের সম্পদ পবিত্র হইবে। ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাকাতের বিধান। সুতরাং তুমি তাহাদের উত্তম সম্পদগুলি ছাটাই বাছাই করিয়া লইবে না। কারণ ইহাতে ধনীদের প্রতি যুলুম হইবে। হ্যাঁ, তাহারা যদি স্বতঃস্ফূর্ত উত্তমগুলি প্রদান করে তাহা হইলে তাহাদের জন্য উত্তম পরিণাম রহিয়াছে। কিন্তু সরকারীভাবে বাধ্যতামূলক মধ্যম সম্পদ গ্রহণ করিবে। নিম্নমানের সম্পদ কিন্তু গ্রহণ করিবে না। স্মরণ রাখিবে যে, যাকাতের উদ্দেশ্য হইতেছে কাহারও ক্ষতি না করা এবং উহার দ্বারা কল্যাণ সাধন করা। সুতরাং কাহারও প্রতি যেন যুলুম না হয়। ক্ষমতার দাপট কখনও দেখাইবে না এবং ক্ষমতার অপব্যবহারও করিবে না। অধীনস্থদের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিকতার মনোভাব প্রদর্শন করিবে। আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করিয়া চলিবে। ইসলামের প্রধান তিনটি রুকনের বাস্তবায়নের পর উপযুক্ত বিন্যাসের সহিত রোযা, হজ্জ, ছদকা, ফিৎর এবং জিহাদ ইত্যাদি যাবতীয় আহকাম সময়োপযোগী ক্রমশঃ শিক্ষা দান করিবে। এই

বিষয়টির প্রতি মহান করুণাময় ইঙ্গিত করিয়া কুরআন মজীদে এরশাদ করিয়াছেনঃ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থাৎ "আপনি আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে (মানুষদিগকে) আহবান করুন জ্ঞান–গর্ভ কথা ও উত্তম উপদেশ সমূহের মাধ্যমে, আর তাহাদের সহিত উত্তম রীতিতে বিতর্ক করুন।" (সূরা নহল–১২৫)

হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ)কে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى .

অর্থাৎ "অতঃপর তোমরা উভয়ই তাহার সাহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ নম্র কথা বলিও, হয়তঃ সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে।" (সূরা তাহা–৪৪)

বলাবাহুল্য আলোচ্য হাদীছে ইসলামের সকল রুকন ও আহকামকে পরিব্যাপ্তরূপে বর্ণনা উদ্দেশ্য নহে। কাজেই রোযা ও হজ্জের উল্লেখ না থাকিবার কারণে কোন প্রশ্ন উথাপিত হয় না। বরং এই হাদীছে ইসলামের দিকে আহবানকারী ও মুবাল্লিগগণের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত একটি আমল পদ্ধতি ও তবলীগের নিয়মাবলীর প্রশিক্ষণ দান উদ্দেশ্য। উদাহরণতঃ শাহাদাতাইন, নামায ও যাকাতের উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাতে সম্বোধিত ব্যক্তিগণ ইসলামকে অনুধাবন করিতে সক্ষম হয়। ইসলাম সম্পর্কে অনুধাবিত হইলে অন্যান্য আমল আদায় করা তাহাদের জন্য সহজ হইবে। (ফতহুল মুলহিম)

কাফিররা ইসলামী আহকামের শাখা প্রশাখার সম্বোধিত কি না?

আলোচ্য হাদীছের বাক্য فَإِنْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ যদি তাহারা ঈমান গ্রহণ করে তবে ইসলামী আহকাম পালনের নির্দেশ দিবে। আল্লামা হাফেয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ হাদীছের এই অংশ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, কাফিররা ইসলামী আহকামের শাখা প্রশাখা যেমন– নামায, রোযা ইত্যাদির সম্বোধিত নহে। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)কে বলিয়া দিয়াছেন, সর্ব প্রথম তাহাদিগকে কেবল ঈমান গ্রহণের দাওয়াত দিবে। অতঃপর আমলের দিকে আহবান করিবে। এবং " ف " বর্ণ দ্বারা ক্রমবিন্যাস করা হইয়াছে যেমন فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ "যদি তাহারা তাওহীদ রিসালতের প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করিয়া ঈমান গ্রহণ করে তবে ফরয নামাযের বিষয় জানাইবে" ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি তাহারা ঈমান গ্রহণ না করে তবে তাহাদের উপর শরীআতের অন্য কোন আ'মাল ওয়াজিব হইবে না।

বলাবাহুল্য এই প্রমাণে মতভেদ রহিয়াছে। কারণ ইহা বিপরীত মর্ম গ্রহণে দলীল দেওয়া হইয়াছে যাহা যথার্থ নহে। তাই কেহ কেহ বলিয়াছেন এইরূপ দলীল উথাপন যঈফ। কারণ ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার মধ্যে তরতীব হিসাবে বর্ণিত হইবার মর্ম এই নহে যে, ওয়াজিব হইবার মধ্যেও তরতীব হইবে। বরং নামায ও যাকাত ওয়াজিব হইবার মধ্যে কোন তরতীব তথা ক্রমবিন্যাস নাই। সুতরাং আলোচ্য হাদীছে নামাযকে যাকাতের পূর্বে তরতীব হিসাবে বর্ণিত হইবার কারণে এই কথা বলা যাইবে না যে, কোন ব্যক্তি যদি নামায আদায় না করে তবে যাকাত তাহার জিম্মা হইতে সাকিত তথা দূর হইয়া যাইবে।

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেনঃ নামাযের পর যাকাতকে তরতীব হিসাবে বর্ণনার কারণ হইতেছে যে, যাকাত কেবল সম্পদশালী ব্যক্তিদের উপর ফরয। আর উহা পুনঃ পুনঃ আদায় করিতে হয় না। পক্ষান্তরে নামায সকলের উপর ফরয এবং উহা দৈনিক পুনঃ পুনঃ আদায় করিতে হয়। কাজেই নামায অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হইবার কারণে যাকাতের পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেনঃ শামছুল আয়িম্মা স্বীয় কিতাবের بيان موجب الامر فى حق الكفار

অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন যে, এই বিষয়ে সকলই ঐক্যমত যে, কাফিররা ঈমানের সম্বোধিত। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দলমত নির্বিশেষে মানব জাতিকে ঈমানের দিকে আহবানের লক্ষ্যেই প্রেরিত হইয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেনঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا -

অর্থাৎ "আপনি ঘোষণা করিয়া দিন, হে মানুষ সকল। নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রসূল।" (সূরা আরাফ-৫৮)

আর এই বিষয়েও ঐক্যমত রহিয়াছে যে, কাফিররা عقوبات অর্থাৎ শাস্তির সম্বোধিত এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেনের সম্বোধনে তাহারা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আর ইহাতেও ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হইয়াছে যে, কাফিররা শরীআতের বিধান পালনের সম্বোধিত যাহাতে আখেরাতে জিজ্ঞাসিত ও পাকড়াও হইবার বিষয় অন্তর্ভুক্তরহিয়াছে।

তবে মতানৈক্য রহিয়াছে যে, আহকামে দুনিয়ার আদায় তাহাদের জন্য ওয়াজিব কিনা? ইরাকী ওলামাগণের অভিমত যে, কাফিররা দুনিয়ার আহকামের সম্বোধিত এবং উহা আদায় করা তাহাদের উপর ওয়াজিব। আমাদের দেশের মাশায়েখগণের অভিমত হইতেছে, যেই সকল ইবাদত কোন কোন অবস্থায় সাকিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই সকল ইবাদতে কাফিররা সম্বোধিত নহে।

আল্লামা ইবন আবেদীন (রহঃ) স্বীয় 'রদ্দুল মুখতার' কিতাবে জিযিয়ার অধ্যায়ে শরহে মিনার হইতে উদ্ধৃতি বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাফিররা যেইরূপ ঈমান গ্রহণের জন্য সম্বোধিত অনুরূপ শাস্তির প্রতিও সম্বোধিত। তবে হদ্দে শুরব অর্থাৎ মদ্যপানের শাস্তি এবং মুআমলাত অর্থাৎ লেনদেন উহার বহির্ভূত।

কাফিররা ইবাদতের সম্বোধিত কিনা এই বিষয়ে সমরকন্দী ওলামাগণ বলেনঃ কাফিররা ইবাদতের প্রতি আকীদা এবং আদায়ের সম্বোধিত নহে। আর বুখারার ওলামাগণ বলেন, তাহারা কেবল ইবাদত আদায় করিবার সম্বোধিত নহে।

ইরাকী ওলামাগণের অভিমত হইতেছে মুআমলাত অর্থাৎ লেন-দেন এবং ইবাদত উভয়েরই কাফিররা সম্বোধিত। ঈমান গ্রহণ না করিবার কারণে যেমন শাস্তি হইবে তেমন মুআমলাত ও ইবাদত না করিবার দায়ে আযাব দেওয়া হইবে। তাহাদের দলীল পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ -

অর্থাৎ "এবং এইরূপ মুশরিকদের জন্য ভীষণ দুর্দশা, যাহারা যাকাত প্রদান করে না।"

(সূরা হামীম সিজদাঃ ৬-৭)

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছেঃ

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ -

অর্থাৎ "তাহারা বলিবে, আমরা নামায আদায়কারীদের মধ্যে ছিলাম না।" (সূরা মুদাসসির-৪৩)

সারকথাঃ কাফিররা নামায ইত্যাদির বিশ্বাস ও আদায় উভয়টি ত্যাগ করিবার দায়ে আযাবে নিপতিত হইবে। ইহা ঐ সকল ওলামাগণের অভিমত অনুযায়ী যাহারা বলিয়াছেন যে, পার্থিব জগতে কাফিররা ইবাদতের প্রতি বিশ্বাস ও আদায় উভয়ের সম্বোধিত। যদিও ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবস্থায় বর্জিত নামাযসমূহের কাযা আদায় করা ওয়াজিব নহে।

আর যাহারা কাফিরদের সম্বোধনের সম্পর্ক শুধু اعتقاد। অর্থাৎ বিশ্বাসকে গণ্য করেন, তাহাদের নিকট শুধু বিশ্বাস ত্যাগ করিবার দায়ে আযাবে পতিত হইবে। আর যাহারা ইবাদত ও মুআমলাতের সম্বোধনের সম্পর্ক

কাফিরদের সহিত অস্বীকার করেন, তাহাদের মতে আকীদা তথা বিশ্বাস ও আদায় বর্জনের দায়ে কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়া হইবে না বরং তাহারা তাওহীদ ও রিসালতের উপর ঈমান স্থাপন না করিবার দায়ে আযাবে পতিত হইবে।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহঃ) বলেনঃ ইহা বলা যে, কাফিররা মুআমলাত অর্থাৎ লেনদেন এর মধ্যে সম্বোধিত। যদি উক্ত সম্বোধন দ্বারা আখেরাতের ছাওয়াব ও আযাবের সম্বোধনের মর্ম নেওয়া হয় তবে ইহা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। আর যদি আহকামে দুনিয়ার মধ্যে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হিসাবে সম্বোধনের মর্ম নেওয়া হয় তাহা হইলে আমার মতে এই সম্বোধন সাধারণভাবে হইবে না। এই বিষয়ে হিদায়া কিতাবে বিবরণ রহিয়াছে যে, কাফিররা সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে অথবা কোন কাফির ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করিলে তাহা তাহাদের ধর্ম মতে শুদ্ধ। অতঃপর স্বামী স্ত্রী উভয়ই ইসলাম গ্রহণ করিলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাবে তাহাদের বিবাহ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইবে। কারণ শরীআতের হারাম তাহাদের জন্য প্রযোজ্য নহে। কেননা তাহারা হকূকে শরাহ-এর সম্বোধিত নহে। ফলে তাহাদের আকীদা না থাকিবার দরুন ইদ্দত পালন দাবী করা যায় না।

শায়খ ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেনঃ মুসলমান যদি হারবী ব্যক্তির নিকট মৃত জন্তু অথবা শুকর বিক্রয় করে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিবার জন্য প্রদান করে এবং মূল্য গ্রহণ করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর অভিমতে উহা হালাল। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হিসাবে যদি কাফেররা সম্বোধিত হইত তাহা হইলে প্রথম অবস্থায় বিবাহ এবং দ্বিতীয় অবস্থায় মূল্য গ্রহণ করা হালাল হইত না। এইরূপ অনেক উদাহরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। (এই বিষয়ের বিস্তারিত মাসআলা ফিকহের কিতাব দ্রষ্টব্য))। (ফতহুল মুলহিম।

বলাবাহুল্য ইসলামী শরীআতের নির্দেশিত সৎ কর্মসমূহের কোন কর্ম যেমন- দান, জনসেবা ইত্যাদি কোন কাফির করিলে পরজগতে কোন না কোন প্রতিফল পাইবে অর্থাৎ শাস্তি হাল্কা হইবে। তবে এই বিষয়টি কোন মৌল নীতি নহে। ইহা মহান করুণাময় আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, আবূ তালিব আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সদ্ব্যবহার করিবার কারণে এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালিবের শাস্তি হাল্কা করিবার সুপারিশের প্রেক্ষিতে তাহার উপর আযাব হাল্কা হইবে।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহঃ) বলেনঃ কাফির সৎ কর্মের দ্বারা আখেরাতে উপকৃত হইবে। অর্থাৎ আযাব হাল্কা হইবে। কিন্তু কাফির কখনো নাযাত পাইবে না। পরজগতে রূহহীন আমলেও কিছু না কিছু প্রাপ্ত হইবে। কেননা পরজগতে ন্যায়নিষ্ঠাবান কাফির ও অত্যাচারী কাফিরদের মধ্যকার আযাবে পার্থক্য হওয়া প্রকাশ্য বিষয়। অবশ্য ঈমানের সহিত আমল না করিবার দিক দিয়া উভয়েই সমান এবং ঈমান ব্যতীত আমল পরিত্রাণের হেতু হইবে না। (তফহীমুল মুসলিম)

দিবারাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)কে ইয়ামান দেশে প্রেরণের সময় বলিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা ঈমান গ্রহণ করিলে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করিবার জন্য নির্দেশ দিবে। হাদীছের এই অংশ দ্বারা বিৎর নামায ওয়াজিব না হইবার প্রমাণ দেওয়া সহীহ নহে। যেমন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতাবলম্বীগণ বলিয়া থাকেন যে, হাদীছে কেবল পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের কথা বলা হইয়াছে। কাজেই বিৎর ওয়াজিব নহে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা কিরূপে বিৎর নামায ওয়াজিব না-হওয়ার দলীল দেওয়া হয়। আলোচ্য হাদীছে রোযা ও হজ্জের কথা উল্লেখ নাই। অথচ রোযা ও হজ্জ ইসলামের রুকন হওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। হাদীছে রোযা ও হজ্জ উল্লেখ না থাকিয়াও যখন সর্বসম্মতিক্রমে ফরয বলিয়া স্বীকৃত তখন

বিৎর উল্লেখ না থাকিয়া ওয়াজিব হইতে পারিবে না কেন? রোযা ও হজ্জ যেমন অন্য হাদীছ দ্বারা রুকন প্রমাণিত অনুরূপ বিৎর অন্য হাদীছ দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হইয়াছে।

শায়খ বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলিয়াছেন, আলোচ্য হাদীছ বিৎর ওয়াজিব হওয়া অথবা না হওয়ার কোন বিষয়েরই প্রমাণ বহন করে না। (ফতহুল মুলহিম)

যাকাত সম্পদশালীদের নিকট হইতে উসূল করিবে

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)কে নির্দেশ দিয়াছেনঃ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ "তুমি তাহাদের ধনীদের নিকট হইতে যাকাত উসূল করিবে" হাদীছের এই অংশে প্রধান দুইটি আলোচনা বিদ্যমানরহিয়াছে।

প্রথম আলোচনাঃ হাফেয ইবন হাজার (রহঃ) বলেনঃ হাদীছের আলোচ্য অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম তথা শাসনকর্তাকে যাকাত উসূল এবং ব্যয় করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। হয়তঃ তিনি নিজেই উসূল করিবেন অথবা তাহার প্রতিনিধির মাধ্যমে আদায় করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি যাকাত প্রদানে অস্বীকার করে তবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উসূল করিবেন।

এই সম্পর্কে সঠিক অভিমত হইতেছে যে, জীবজন্তুর যাকাত এবং জমিনে উৎপন্ন দ্রব্যাদির এক দশমাংশ (উশর) আদায় করিবার জন্য ইমামের সকল প্রকার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। আর নগদ টাকা পয়সার যাকাত হইলে উহা আদায়কারী স্বীয় রীতি মাফিক গোপনে আদায় করাই যথেষ্ট।

হাফেয ইবন হাজার (রহঃ) বলেনঃ এই মাসআলায় ফকীহগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। কতকের মতে সম্পদের মালিক স্বীয় গোপন সম্পদসমূহের যাকাতও ইমামের নিকট প্রদান করা ওয়াজিব।

ইবনুল মুনযির (রহঃ) বলেনঃ আহলুল ইলমের ইজমা তথা ঐক্যমত রহিয়াছে যে, সমুদয় যাকাত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রদান করিতে হইবে এবং তাঁহার প্রতিনিধি, তাঁহার কর্মচারী এবং তিনি যাহাকে যাকাত উসূলের নির্দেশ দেন তাহার নিকট প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু অন্যান্য শাসনকর্তাদের নিকট যাকাত প্রদানের বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

ইমাম আওযায়ী, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও অধিকাংশ ওলামাগণের মতে যাকাত (ইসলামী দেশের) প্রশাসকের নিকট প্রদান করিতে হইবে। হযরত আতা (রহঃ), ছাওরী ও তাউছ (রহঃ) এই শর্ত করিয়াছেন যে, ইমাম তথা প্রশাসক যদি যাকাতের অর্থ সহীহ খাতে ব্যয় করিবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেন তবে তাহার নিকট যাকাত প্রদান করা যাইবে।

দ্বিতীয় আলোচনাঃ আল্লামা তায়্যেবী (রহঃ) বলেনঃ উহাতে (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ তাহাদের সম্পদশালীদের নিকট হইতে যাকাত উসূল করা হইবে) প্রমাণিত হয় যে, শিশুদের সম্পদে (নেসাব পরিমাণ হইলে) যাকাত ওয়াজিব হইবে। কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اَغْنِيَائِهِمْ - (তাহাদের সম্পদশালী) ব্যাপক ভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং ছোট ও বড় সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই অভিমত যথার্থ নহে কারণ اَغْنِيَائِهِمْ শব্দে هُمْ সর্বনামটি - مُكَلَّفِيْنَ (শরীআতের নির্দেশের আওতাধীন ব্যক্তিবর্গ) এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে। অর্থ হইবে তুমি তাহাদের শরীআতের নির্দেশের আওতাধীন সম্পদশালীদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিবে। শিশুরা مُكَلَّفٌ بِالشَّرْعِ শরীআতের নির্দেশের আওতাধীন নহে। তাই শিশুদের সম্পদের যাকাত ওয়াজিব হইবেনা। (মেরকাত)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেনঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মাযহাব হইতেছে যে, শিশুদের সম্পদ নেসাব পরিমাণ হইলে যাকাত ওয়াজিব হইবে। কারণ যাকাত প্রকৃত প্রস্তাবে শিশুদের উপর নহে বরং তাহাদের

সম্পদের উপর। কাজেই তাহাদের সম্পদের যাকাত ওয়াজিব হইবে। অনুরূপ পাগলের সম্পদেও যাকাত ওয়াজিব।

শাফেয়ী (রহঃ)–এর মাযহাবের দলীলঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ اَلَا مَنْ وَلِىَ يَتِيْمًا لَهٗ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيْ مَالِهٖ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَاكُلَهُ الصَّدَقَةُ -

"হযরত আমর বিন শুয়াইব স্বীয় পিতা হইতে, তিনি দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিলেন অর্থাৎ নছীহত করিয়া বলিলেনঃ হুশিয়ার! যে কেহ সম্পদশালী ইয়াতীমের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত তাহার উচিত যে, ইয়াতীমের সম্পদ ব্যবসায় নিয়োজিত করা। তাহাদের সম্পদ বেকার রাখিয়া দিবে না যাহার ফলে সদকা তথা যাকাতে তাহাদের সমূদয় সম্পদ ভক্ষণ করিয়া ফেলে।"

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইয়াতীম শিশুদের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব।

আমরা তথা আহনাফ বলিব যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য আকেল ও বালেগ হওয়া শর্ত। কাজেই শিশু এবং পাগলের উপর যাকাত ওয়াজিব নহে।

হানাফী মাযহাবের দলীলঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلٰثَةٍ - عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يُفِيْقَ -

"হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তিন প্রকার ব্যক্তি হইতে কলম উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। (অর্থাৎ তাহাদের কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয় না) (১) নিদ্রিত ব্যক্তির যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়। (২) শিশুর যতক্ষণ না সে বালেগ হয়। (৩) পাগল ব্যক্তির যতক্ষণ না সে সুস্থ মস্তিস্ক লাভ করে।

শিশু, পাগল ও নিদ্রিত ব্যক্তি শরীআতের নির্দেশ পালনের বহির্ভূত থাকে। তাই শিশু ও পাগলের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হইবে না।

শাফেয়ী মাযহাবের প্রদত্ত দলীল তিরমিযী শরীফের রিওয়ায়াত যাহা আমর বিন শুয়াইব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। উহার সনদ যঈফ। কারণ উক্ত হাদীছের সনদ সূত্রে মুছান্না বিন আস সাব্বাহ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) লিখিয়াছেনঃ

وَفِىْ اِسْنَادِهٖ مَقَالٌ لِاَنَّ الْمُثَنّٰى بْنِ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ -

অর্থাৎ আর এই হাদীছের সনদসূত্রে সমালোচনা রহিয়াছে। কেননা, মুছান্না বিন আস–সাব্বাহ হাদীছ বর্ণনায় যঈফ।

ইমাম নাসায়ী (রহঃ) তাহাকে 'মতরুকুল হাদীছ' বলিয়াছেন এবং আল্লামা ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেনঃ তিনি কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিই নহেন।

ইমাম তিরমিযি (রহঃ) বলেনঃ ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব কিনা এই সম্পর্কে আহলে ইল্‌ম অর্থাৎ শরীআত বিশেষজ্ঞগণের মতবিরোধ রহিয়াছে।

(১) এক জামাআত আহলে ইল্‌মের অভিমত যে, ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব। এই অভিমত পোষণকারীগণের মধ্যে রহিয়াছেন হযরত ওমর (রাযিঃ), হযরত আলী (রাযিঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা

(রাযিঃ), ইবন ওমর (রাযিঃ) এবং ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ইমাম আহমদ (রহঃ) ও হযরত ইসহাক (রহঃ)।

(২) অন্য এক জামাআত আহলে ইল্মের অভিমত হইতেছে যে, ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব নহে। এই অভিমত পোষণকারীগণের মধ্যে রহিয়াছেন হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ), আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ), ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) ও তাঁহার সহচরবৃন্দ, আবূ ওয়ায়েল, সাঈদ বিন যুবাইর (রাযিঃ), নখয়ী, শায়বী এবং হাসান বসরী প্রমুখ এবং বর্ণিত আছে যে, ইহার উপর সাহাবাগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সাঈদ বিন আল-মুসাইয়্যেব (রাযিঃ) বলেনঃ

لَاتَجِبُ الزَّكٰوةُ اِلَّا عَلٰى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالصِّيَامُ

অর্থাৎ "যাহার উপর নামায ও রোযা ফরয নহে তাহার উপর যাকাত ওয়াজিব তথা ফরয নহে।"

হযরত হুমাইদ বিন যনজুইয়া আন-নাসায়ী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর মাযহাব। মবসূত কিতাবে লিখিত আছে যে, ইহা হযরত আলী (রাযিঃ)-এরও অভিমত। (ফতহুল মুলহিম)

এক শহরে আদায়কৃত যাকাতের অর্থ অন্য শহরে স্থানান্তর-এর হুকুম

আলোচ্য হাদীছের বাক্য فَتُرَدُّ فِىْ فُقَرَائِهِمْ "অতঃপর তাহাদের দরিদ্রদের প্রদান করা হইবে"। কেহ কেহ ইহা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, এক শহরের উসূলকৃত যাকাতের অর্থ অন্য শহরের দরিদ্রকে প্রদান করা জায়েয নহে।

আল্লামা আইনী (রহঃ) বলিয়াছেন, যাকাতের অর্থ স্থানান্তর না করিবার পক্ষে হাদীছের এই বাক্য দ্বারা দলীল দেওয়া সহীহ হইবে না। কারণ " فقرائهم " শব্দের "هم" সর্বনামটি فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ (অর্থাৎ মুসলমানগণের দরিদ্র)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে। কাজেই যাকাতের অর্থ যে কোন শহরের মুসলমান দরিদ্রকে প্রদান করা যাইবে।

হাফেয ইবন হাজার (রহঃ) বলেনঃ এই মাসআলায় ওলামাগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

(১) ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ), আল্লামা লাইছ (রহঃ) এবং উভয়ের আসহাবগণের মতে এক শহরের উসূলকৃত যাকাতের অর্থ অন্য শহরের দরিদ্রদিগকে প্রদান করা জায়েয। ইবনুল মুনযির (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর একটি অভিমত ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) শাফেয়ী, মালেকী ও জমহুরের অভিমত হইতেছে যে, এক শহরের যাকাত অন্য শহরে স্থানান্তর না করা। কিন্তু কেহ যদি স্থানান্তর করে তবে মালেকী মাযহাবের অধিক সহীহ অভিমত অনুযায়ী জায়েয হইবে। আর শাফেয়ী মাযহাবের অধিক সহীহ অভিমত হইতেছে যে, যেই শহরের যাকাত উসূল করা হইয়াছে সেই শহরে যদি হকদার অর্থাৎ দরিদ্র না থাকে তবে অন্য শহরে স্থানান্তর করা জায়েয।

ইমাম তাইয়্যেবী (রহঃ) বলেনঃ এই বিষয়ের উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, যদি যাকাতের অর্থ স্থানান্তর করা হয় এবং আদায় করা হয় তবে যাকাত আদায়কারীর জিম্মা তথা দায়িত্ব হইতে ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) খুরাসান হইতে শ্যাম দেশে স্থানান্তরকৃত যাকাতের অর্থ প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্বস্থান খুরাসানে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে মুল্লা আলী কারী (রহঃ) বলিয়াছেন, হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) খুরাসানের উসূলকৃত যাকাতের অর্থ খুরাসানের দরিদ্রের মধ্যে প্রদানের নির্দেশটি ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী হয় নাই বরং তাঁহার নির্দেশটি ছিল পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং লোভ-লালসার পথ বন্ধ করা।

হেদায়া কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হাদীছে মুআয (রাযিঃ) না হইলে আমরা অর্থাৎ আহনাফ যাকাতের অর্থ যিম্মীদের প্রদান করা জায়েয বলিতাম। যেমন যাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদকা যিম্মীদেরকে দেওয়া জায়েয।

ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সম্পদশালীগণের জন্য সদকার অর্থ হালাল নহে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেনঃ ধনী গাযীদের জন্য সদকার অর্থ গ্রহণ করা জায়েয। হাদীছে মুআয (রাযিঃ) শাফেয়ী মাযহাবের বিপরীত আহনাফের দলীল। (যাকাতের বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহু তা'আলা যথাস্থানে আসিবে)। (ফতহুল মুলহিম)

অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আ আল্লাহ তা'আলার দরবারে তৎক্ষণাৎ কবুল হয়

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)কে যাকাত উসূল করিবার সময় যেন ধনীদের প্রতি যুলুম না করা হয় সেই দিকে সতর্ক করিয়া বলিলেনঃ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ "অত্যাচারিত ব্যক্তি ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।" অন্য একটি হাদীছে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ وَاِنْ كَانَ فَاجِرًا -

অর্থাৎ "মযলুম তথা অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আ তৎক্ষণাৎ কবুল হইয়া যায়, চাই সে ফাসেক ও ফাজের হউক না কেন।" কোন কোন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছেঃ وَاِنْ كَافِرًا 'চাই যে কাফের হউক না কেন'

সূতরাং যুলুম হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। মযলুমের দু'আ কবুল হয় প্রত্যাখ্যান হয় না। কবি বলেনঃ

بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن

اجابت از درحق بہر استقبال می آید

অর্থাৎ "অত্যাচারিত ব্যক্তিরা দু'আর জন্য অগ্রসর হইয়া অভিযোগ করা হইতে ভয় কর। কেননা, আল্লাহ তা'আলার দরবারে সম্বর্ধনারূপে তাহাদের দু'আ মকবূল হইয়া থাকে।"

ফায়দাঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফ হইতে শরীআতের বহু বিষয় প্রমাণিত হয়ঃ

(১) ইমামের পক্ষে কোন ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ উসূলের জন্য প্রেরণ জায়েয।

(২) খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য। উহার উপর আমল করা ওয়াজিব। কিন্তু সাহেবে তলবীহ (রহঃ) বলেনঃ

فِيْهِ نَظَرٌ - এই অভিমতে আপত্তি আছে। কেননা হযরত মুআয (রাযিঃ)কে একা ইয়ামান দেশে প্রেরণ করা হয়নি বরং তাঁহার সহিত হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) ও ছিলেন। কাজেই ইহা খবরে ওয়াহিদ নহে।

আবূ ওমর বিন আবদিল বার্ (রহঃ) বলেনঃ তাহারা পাঁচ জন সাহাবা ছিলেন। (১) হযরত খালেদ বিন সাঈদ (রাযিঃ) (২) হযরত মুহাজির বিন ওমাইয়া (রাযিঃ) (৩) হযরত যিয়্যাদ বিন লবীদ (রাযিঃ) (৪) হযরত মুআয (রাযিঃ) এবং (৫) হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ)। (ফতহুল মুলহিম)

আল্লামা আবদুল বার্ (রহঃ) স্বীয় কিতাব ইসতিআবে লিখিয়াছেন, উপরোল্লেখিত পাঁচজন ইয়ামানের পাঁচটি অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেনঃ فِيْ نَظَرِهٖ نَظَرٌ - অর্থাৎ সাহেবে তলবীহের আপত্তির উপর আপত্তি রহিয়াছে। কেননা হযরত মু'আয (রাযিঃ)কে প্রেরণের বিষয়টি খবরে ওয়াহিদের বহির্ভূত নহে।

(৩) যুদ্ধের পূর্বে কাফিরদিগকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া সুন্নাত।

(৪) শাহাদাতাইনের সাক্ষ্য দেওয়া ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে মুসলমান বলিয়া হুকুম দেওয়া যায় না।

(৫) যাকাত উসূলকারীগণ কেবল উত্তম সম্পদ বাছাই করিয়া যাকাত হিসাবে আদায় করা হারাম। বরং মধ্যম সম্পদ আদায় করিবে। অপরদিকে সম্পদশালী ব্যক্তি কেবল মন্দ সম্পদ যাকাত হিসাবে প্রদানও হারাম।

(৬) যাকাতের অর্থ কাফিরদের দেওয়া জায়েয নহে। অনুরূপ কোন ধনী লোককেও দেওয়া জায়েয নহে।

(৭) দাওয়াত ও তবলীগের ক্ষেত্রে সকল আহকাম একসাথে বর্ণনা করা জরুরী নহে।

(৮) যুলুম করা মহাপাপ। ইমাম স্বীয় কর্মচারীদেরকে যুলুম হইতে বিরত থাকিতে এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করিতে নসীহত করিবেন।

(৯) ইমাম তথা রাষ্ট্রপতি স্বীয় কর্মকর্তাগণকে ন্যায় নিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দান আবশ্যক।

(১০) শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে দ্বীনের বিষয়ে সম্বোধনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক রীতি অবলম্বন করাচাই।

(১১) স্থান, কাল, পাত্র হিসাবে মানুষকে দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন।

(১২) প্রজাবর্গের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার এবং সাম্যের নীতি অনুসরণ বাঞ্ছনীয়।

(১৩) অত্যাচারিতদের দু'আ আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাৎক্ষণিকভাবে মকবুল হয়। (ফতহুল মুলহিম, নববী)

৩০ حدثنا ابن ابى عمر حدثنا بشر بن السرى قال نا زكريا بن اسحق ح وحدثنا عبد بن حميد قال انا ابو عاصم عن زكريا بن اسحق عن يحيى بن عبد الله بن صيفى عن ابى معبد عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك ستاتى قوما بمثل حديث وكيع -

হাদীছ—৩০. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইবন আবী ওমর (রহঃ)[১]...(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবদ বিন হুমাইদ[২] (রহঃ)। তাহারা উভয়...যাকারিয়া বিন ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি...ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (বিন জাবাল) (রাযিঃ)কে ইয়ামানের দিকে (কাযী বা প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া) প্রেরণ করিলেন।[৩] অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত মুআয (রাযিঃ)কে) বলিলেনঃ নিশ্চয় তুমি এমন এক জাতি তথা সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছ...হাদীছ শরীফের অবশিষ্ট অংশ হযরত ওয়াকী (রহঃ)—এর রিওয়ায়াতের (২৯নং হাদীছের) অনুরূপ।

টীকা-১· ابن ابى عمر - ইবন আবী ওমর (রহঃ)। তাহার নাম মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন আবী ওমর মাদানী আবূ আবদিল্লাহ। তিনি মক্কা শরীফে বসবাস করিতেন। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-২· عبد بن حميد আবদ বিন হুমাইদ। তিনি হইতেছেন মুসনাদে হুমাইদীর সংকলক প্রসিদ্ধ ইমাম। তাঁহার উপনাম আবূ মুহাম্মদ (রহঃ)। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-৩· الى اليمن - হযরত মুআয (রাযিঃ)কে ইয়ামানে পাঠাইলেন। সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতে আছে وبعث كل واحد منهما على مخلاف ইয়ামানের পরিভাষায় 'মেখলাফ' বলা হয় দেশের সমস্ত ভূখণ্ডের এক অংশকে। ইয়ামানে দুইটি মেখলাক ছিল। অর্থাৎ তাহাদের উভয়কে এক একটি মেখলাফের প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছিল। আল্লামা ইবন আবদিল বার্ (রহঃ) স্বীয় ইসতিয়াব গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামান দেশকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক অংশে একজন প্রশাসক নিয়োগ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। হযরত খালিদ বিন সাঈদ (রাযিঃ)কে সানআ, হযরত মুহাজির বিন ওমাইয়া (রাযিঃ)কে কান্দাহ, হযরত যিয়াদ বিন লবীদ (রাযিঃ)কে হাযরামউত, হযরত মুআয (রাযিঃ)কে জানদ এবং হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ)কে যাবীদ ও

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

٣١ - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ -

হাদীছ—৩১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন উমাইয়্যা বিন বিসতাম আল আইশী (রহঃ)[১] তিনি…হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)কে ইয়ামানের প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবার সময় নসীহতরূপে বলিয়াছিলেনঃ দেখ! তুমি আহলে কিতাবগণের নিকট যাইতেছ। তুমি সর্বপ্রথম তাহাদিগকে (অন্য কাহাকেও শরীক ব্যতীত শুধু একক) মহান মহিমাময় আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দিকে আহবান করিবে। অতঃপর যখন তাহারা আল্লাহ তা'আলাকে (একক এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সর্বশেষ রসূল হইবার বিষয়টি) চিনিয়া নিবে, তখন (দ্বিতীয় পর্যায়ে) তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর দিবারাত্রে (মোট) পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর যখন তাহারা উহা (পাঁচ ওয়াক্ত নামায) পালন করিবে তখন (তৃতীয় পর্যায়ে) তাহাদিগকে বলিয়া দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর যাকাত ফরয করিয়া দিয়াছেন যাহা তাহাদের (মধ্যে নেসাব পরিমাণ মালিক সম্পদশালী ব্যক্তিদের) সম্পদ হইতে আদায় করা হইবে। অতঃপর তাহাদেরই দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। অতঃপর তাহারা যদি উহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে (অর্থাৎ যাকাত প্রদানে প্রস্তুত হয়) তবে তাহাদের নিকট হইতে উহা আদায় করিবে। কিন্তু সাবধান। তাহাদের উত্তম সম্পদ ছাটাই বাছাই করিয়া লইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)কে ইয়ামানের প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণের সময় বলিয়া দিয়াছিলেনঃ তুমি আহলে কিতাবগণের নিকট প্রেরিত হইতেছ, কাজেই সর্বপ্রথম তাহাদিগকে যেই বিষয়ের দাওয়াত দিবে তাহা হইতেছে একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত। عِبَادَةُ اللهِ দ্বারা মর্ম হইল তাওহীদ রিসালতে বিশ্বাস। অর্থাৎ তাহাদিগকে তাওহীদ রিসালতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

আদন অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। হাফেয ইবন হাজার (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, জানদ অঞ্চলে হযরত মুআয (রাযিঃ)-এর নির্মিত একটি প্রসিদ্ধ মসজিদ বর্তমান যুগেও স্বীয় ঐতিহ্যসহ বিদ্যমান রহিয়াছে।

(ফতহুল মুলহিম)

অত্র পৃষ্ঠার টীকা

টীকা-১. بسطام বিস্তাম। পারস্য দেশের কোন এক বাদশার নাম বিসতাম বা বাসতাম ছিল। কাইস বিন মাসউদ স্বীয় পুত্রের নাম উক্ত বাদশার নামে রাখিয়াছিলেন। জাওহারী স্বীয় সিহাম কিতাবে লিখিয়াছেন, বিসতাম আরবী নাম নহে। এই কারণেই সম্ভবতঃ উহাকে 'গাইরে মুনছারিফ' পড়া হয়। العيشى - আল আইশী। বনী আয়েশ বিন মালিক বিন তাইমুল্লাহ বিন ছায়লাবা-এর দিকে সম্পর্কিত। মূলে উহা عائشى ছিল, পঠনে হাল্কা হওয়ার জন্য العيشى করা হইয়াছে।

(ফতহুল মুলহিম)

করিবে। কেননা তাওহীদ ও রিসালতে বিশ্বাস স্থাপন দ্বীনের মূল ভিত্তি। এতদুভয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত দ্বীনের কোন আমলই সহীহ বলিয়া গৃহীত হইবে না।

উল্লেখ্য যে, আহলে কিতাবীগণ এক পর্যায়ে তাওহীদেরই বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তাহাদের স্বীয় নবী ইহকাল ত্যাগের পর যুগের অতিক্রম হইতে হইতে এক সময় স্বীয় নবীর প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। যেখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে একক অদ্বিতীয় সেই স্থানে তাহারা মহান আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীতে অংশীদার সাব্যস্ত করিয়া ইবাদত করিতে আরম্ভ করে। শধু তাহাই নহে আসমানী কিতাবকে তাহারা মনগড়াভাবে রদবদল করিতেও দ্বিধা করে নাই।

আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহঃ) স্বীয় শরহে তিরমিযী কিতাবে লিখিয়াছেন যে, কালক্রমে খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকে এবং ইয়াহুদীরা হযরত ওযাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলিয়া ধারণা পোষণ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপ শিরকি আকীদা পোষণকারীরা সর্বশেষ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর যুগেও বিদ্যমান ছিল। তবে এই কথা ঠিক যে, আহলে কিতাবগণের সকলের বিশ্বাস এইরূপ ছিল না। কেবল তাহাদের মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোকের এইরূপ ভ্রান্ত আকীদা ছিল। এই সম্পর্কে আল্লামা শাব্বীর আহমদ (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, আমাদের একজন নির্ভরযোগ্য বুজুর্গ আলহাজ আমীর শাহ খান (রহঃ) বলিয়াছেন যে, আমি আহলে কিতাবদের আকীদা 'হযরত ওযাইর আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র' (নাউযুবিল্লাহ) এই বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছি। আমার এই অনুসন্ধানের ফলশ্রুতিতে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে, অধিকাংশ ইয়াহুদীরা এই অমূলক ভ্রান্ত আকীদার বিশ্বাসী নহে। অবশ্য তাহাদের ক্ষুদ্র একটি দল এই ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে। উল্লেখ্য যে, বায়তুল মুকাদ্দিসে কিছু সংখ্যক ইয়াহুদী ওলামার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাহাদের নিকট তাহাদের আকীদা 'ওযাইর আল্লাহর পুত্র' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহাদের একটি ক্ষুদ্র দল ব্যতীত অন্য কেহ এই আকীদা পোষণ করে না। শুধু সেই ক্ষুদ্র দলটিই (নাউযুবিল্লাহ) হযরত ওযাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করে। শুধু তাহাই নহে বরং তাহারা হযরত ওযাইর আলাইহিস সালাম বর্তমানেও আছেন বলিয়া ধারণা পোষণ করে। তবে এই ভ্রান্ত ও অজ্ঞদের সংখ্যা পৃথিবীতে সর্বমোট এক লক্ষের অধিক হইবে না। তাহাদেরকে ফিরকায়ে ওযাইরিয়া বলে। 'ফিরকায়ে ওযাইরিয়া' অত্যন্ত অপদস্থ ও লাঞ্ছনায় নিপতিত।

হযরত আমীর শাহ খান (রহঃ) আরও বলিয়াছেন যে, আমি সেই ওযাইরিয়া দলের সহিতও মিলিত হইয়াছি। তাহাদের আকীদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে জবাবে উহাই বলিয়াছে যাহা ইয়াহুদীদের ওলামাগণ বলিয়াছেন।

এই আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আহলে কিতাবীগণ কালক্রমে দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। এই কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)কে নসীহত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আহলে কিতাবদের যাহারা তওহীদ তথা একত্ববাদের বিশ্বাসী নহে তাহাদিগকে একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দিকে আহবান করিবে অর্থাৎ শাহাদাতাইনের দিকে আহবান করিবে। আর যাহারা তওহীদের বিশ্বাসী তাহাদিগকে তওহীদের সহিত রিসালতের স্বীকারোক্তির দাবী করিবে। কারণ রিসালতের প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত তাওহীদের বিশ্বাসী হওয়া যায় না। উভয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে যখন তাহারা আল্লাহ তা'আলাকে চিনিতে সক্ষম হইবে তখন পর্যায়ক্রমে নামায ও যাকাতের বিষয় বলিবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ فَإِذَا عَرَفُوا اللّٰهَ - 'অতঃপর যখন তাহারা আল্লাহ তা'আলাকে চিনিয়া নিবে' এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে আহলে কিতাবীগণ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করিলেও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, যদিও তাহারা মারেফাতে এলাহীর দাবী করে। মারেফাতে এলাহীতে সক্ষম হইলে তাহারা অংশীদারহীন ইবাদত করিত।

মহান আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও কাফিরদের ইবাদতের অবস্থা সম্পর্কে কুরআন মজীদে এরশাদ

করিয়াছেনঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى -

অর্থাৎ "আমরা তো তাহাদের উপাসনা কেবল এই জন্য করিতেছি যেন তাহারা আমাদিগকে আল্লাহ তা'আলার ঘনিষ্ট করিয়া দেয়।" (সূরা যুমার-৩)

বলাবাহুল্য পৃথিবীতে এমন অজ্ঞ দলের আবির্ভাব খুব কমই হইয়াছে যাহারা আল্লাহ তা'আলার সত্তায় অংশীদার করিয়াছে। তবে অধিকাংশ ভ্রান্ত দলসমূহ কেবল ইবাদতের মধ্যেই শরীক করিয়াছে। ফলে আম্বিয়া কেরামের দাওয়াতের মূলবস্তু ইহাই ছিল যে, মানুষকে ইবাদতে অংশীদার করা হইতে বাঁচাইয়া রাখা। অর্থাৎ শিরক-এর মূল কর্তন করিয়া নিরঙ্কুশ একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত শিক্ষা দেওয়া।

এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হইয়াছেঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ -

অর্থাৎ "আর আমি আপনার পূর্বে এমন কোন রসূল প্রেরণ করি নাই যাহার প্রতি আমি এই অহী অবতীর্ণ না করিয়াছি যে, আমি ভিন্ন অন্য কেহ মাবুদ নাই। অতএব আমারই ইবাদত করিতে থাক।" (সূরা আম্বিয়া-২৫)

হতভাগা আহলে কিতাবগণ যদি তাহাদের পয়গাম্বরের শিক্ষাকে ভুলিয়া না যাইত তাহা হইলে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বাগ্রে পয়গাম্বর হিসাবে মানিয়া লইত। কেননা পূর্বেকার সকল আসমানী কিতাবে সর্বশেষ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল। তাহাদের পয়গাম্বরগণ পরিষ্কারভাবে স্বীয় উম্মতগণকেও বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নবীগণের ওফাতের পর তাহারা আসমানী কিতাবকে মনগড়াভাবে পরিবর্তন পরিবর্ধন করিয়াছে। এতদ্বসত্বেও আহলে কিতাবগণ আল্লাহ তা'আলার সত্তায় একক বলিয়া বিশ্বাস করিত। তবে ইবাদতের দিক দিয়া কোন না কোন ক্ষেত্রে অংশীদার সাব্যস্ত করিত। কাজেই আহলে কিতাবীগণকে নিরঙ্কুশ একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দিকে আহবান করা যথার্থ ছিল।

একটি ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতে শাব্দিক পার্থক্য থাকিলেও মর্মার্থ এক

হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)কে ইয়ামানের শাসক বা বিচারক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণের মুহূর্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদত্ত নসীহত বিষয়ক পবিত্র হাদীছখানা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনা একটি অথচ মূল হাদীছ শরীফে সামান্য শাব্দিক পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন, অধিকাংশ রাবী বর্ণনা করিয়াছেনঃ

فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا بِذَالِكَ -

অর্থাৎ "অতঃপর তুমি তাহাদিগকে এই কথার সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি আহবান জানাইবে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রসূল।"

আর কোন কোন রাবী এই শব্দে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يُّوَحِّدُوا اللَّهَ فَإِذَا عَرَفُوْا ذَلِكَ -

অর্থাৎ "অতঃপর তুমি তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলাকে একক বলিয়া বিশ্বাস করিবার প্রতি দাওয়াত দিবে। অতঃপর যখন তাহারা আল্লাহ তা'আলাকে চিনিয়া নিবে।"

আর কোন কোন রাবী এই শব্দে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ -

অর্থাৎ "সর্ব প্রথম তুমি তাহাদিগকে যে বিষয়ে দাওয়াত দিবে তাহা হইতেছে মহান মহিমাময় আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দিকে আহবান করা। যখন তাহারা আল্লাহ তা'আলাকে চিনিবে।"

হাফেয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় ফতহুল বারী কিতাবের তাওহীদ ও যাকাতের অধ্যায়ে হযরত মুআয (রাযিঃ)কে ইয়ামানে প্রেরণের ঘটনাটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীছের সমন্বয় সাধনে লিখিয়াছেন যে, এই সকল বর্ণনায় শাব্দিক কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও মর্মার্থ এক। উক্ত রিওয়ায়াতসমূহের সমন্বয় এইরূপে হইবে যে,- عِبَادَةٌ - ইবাদত শব্দের দ্বারা মর্ম হইতেছে তাওহীদ। আর তাওহীদ অর্থাৎ একত্ববাদের মর্মার্থ শাহাদাতাইনের সাক্ষ্যসহ স্বীকার করা। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী فَإِذَا عَرَفُوا اللّٰهَ। -এর মর্মার্থ فَإِذَا عَرَفُوا يُوَحِّدُنَ اللّٰهَ অর্থাৎ অতঃপর যখন তাহারা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ তথা একত্ববাদকে বুঝিতে সক্ষম হইবে এবং মারেফাত দ্বারা মর্ম হইল স্বীকার ও আনুগত্য অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা একক অদ্বিতীয় হইবার বিষয়টি স্বীকার করা। ইহাই হইতেছে একটি ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনার সমন্বয়। (ফতহুল মুলহিম)

باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله - و يقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم وان من فعل ذلك عصم نفسه وماله الا بحقها ووكلت سريرته الى الله تعالى وقتال من منع الزكوة اوغيرها من حقوق الاسلام واهتمام الامام بشائر الاسلام

অনুচ্ছেদঃ মানুষের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার নির্দেশ যতক্ষণ না তাহারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রসূল এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শরীআত নিয়া প্রেরিত হইয়াছেন তৎসমূদয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আর যে ব্যক্তি শরীআতের বিধান পালন করিবে সে তাহার জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করিবে। তবে শরীআত সম্মত কোন কারণ ব্যতীত। মানুষের অন্তরের বিষয় আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ। আর যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারী অথবা ইসলামী শরীআতের অন্যান্য বিধানের অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং ইমামকে ইসলামী শরীআতের বিধি বিধানের প্রতিষ্ঠায় অত্যধিক গুরুত্বারোপ করিবার নির্দেশ

٣٢ حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ اَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِاَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُولُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ ـ

হাদীছ—৩২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হযরত কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ)। তিনি····হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) খলীফা মনোনীত হইলেন তখন আরবের যাহারা কাফির হইবার ছিল তাহারা কাফির হইয়া গেল।[১] নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর আরবের নও মুসলিম, যাহাদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ছিলনা তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। কিছু সংখ্যক লোক পুনরায় মূর্তি পূজায় প্রত্যাবর্তন করিয়া মুরতাদ হইয়া গেল। আর আহলে ইয়ামামারা

টীকা-১· আবূ মুহাম্মদ বিন হাযম (রহঃ) স্বীয় 'মিলাল ও নিহাল' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর আরবের লোকেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একঃ একটি বিরাট জামাআত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় যেইরূপ ইসলামের উপর ছিলেন সেইরূপ যথাযথ সুদৃঢ়ভাবে শরীআতের উপর রহিলেন। এই জামাআতের লোক সংখ্যাই সর্বাধিক। (তাহারাই জমহুরে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)) দুইঃ

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

মিথ্যুক মুসাইলামা এবং আহলে সানাআরা মিথ্যুক আওয়াদে আনাসীর অনুসারী হইয়া মুরতাদ হইল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-এর সর্বসম্মত মতে ইসলামী আহকামের প্রথম সংরক্ষক হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) মুরতাদদের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া ইসলামকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। অপর কিছু সংখ্যক লোক বাহ্যিকভাবে মুসলিম থাকিলেও যাকাত আদায় অস্বীকার করিয়া বসিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ইসলামকে সুসংহত, সুদৃঢ় ও পূতপবিত্র রাখিবার স্বার্থে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার যথার্থ ফায়সালা করিলে] হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর নিকট আরয করিলেন, আপনি তাহাদের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করিবেন, অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি যতক্ষণ না তাহারা এই কথার স্বীকার করে যে, একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নাই। অতঃপর যে ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ "একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই" এই কথার স্বীকার করিবে (অর্থাৎ আমাকে যে শরীআত দিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে, উহার যাবতীয় বস্তুর প্রতি যে ঈমান গ্রহণ করিয়া মানিয়া লইবে) সে আমার হইতে তাহার জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করিল। তবে হ্যাঁ, শরীআতসম্মত কোন কারণ (যেমন কিসাস, দিয়াত ও রজম ইত্যাদি) থাকিলে ভিন্ন কথা, (এখন রহিল এই কথা যে, তাহার স্বীকার আন্তরিক অথবা মৌখিক এই বিষয়ের) হিসাব তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পন[১] (কারণ অদৃশ্য জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রহিয়াছে।)

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

দ্বিতীয় জামাআত ইসলামের উপর বহাল ছিল কিন্তু তাহারা বলিলেন আমরা শরীআতের সকল আহকামের উপর আমল করিব কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) অথবা অন্য কাহারও নিকট যাকাত প্রদান করিব না। এই জামাআতের লোক সংখ্যা অধিক হইলেও প্রথম জামাআতের লোক সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। তিনঃ তৃতীয় জামাআত প্রকাশ্যভাবে কাফির মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। যেমন আসহাবে তুলাইহা, সাজ্জাজ এবং আসওয়াদে আনাসী ও মুসাইলামার অনুসারীরা। এই জামাআতের লোক সংখ্যা উল্লেখিত দুই জামাআতের তুলনায় অল্প। চারঃ চতুর্থ জামাআত উপরোল্লেখিত তিন দলের কোন দলে যোগদান না করিয়া তাওয়াক্কুফ তথা বিলম্ব করিয়া রহিলেন যে, কাহারা বিজয়ী বা প্রাধান্য পায়। যাহারা প্রাধান্য তথা বিজয় লাভ করিবে তাহাদের সহিত মিলিত হইবে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আসওয়াদে আনাসী ও মুসাইলামার বিরুদ্ধে মুসলিম সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধে আসওয়াদে আনাসী ও মুসাইলামা পরাজিত ও নিহত হয়। আর তুলাইহা ও সাজ্জাজ পুনরায় ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চতুর্থ জামাআত ও অন্যান্য যাহারা মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল তাহারা সকলেই পুনরায় ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। ইহা মুসলমানদের উপর শয়তানের একটি বিরাট চক্রান্ত ছিল। (ফতহুল মুলহিম)

অত্র পৃষ্ঠার টীকা

টীকা-১: وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالٰى "আর হিসাব তো আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পণ" ইমাম তাইয়্যেবী (রহঃ) বলেনঃ হাদীছের এই অংশের মর্ম হইল, যে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ - বলিয়া ইসলাম প্রকাশ করিবে, তাহার সহিত যুদ্ধ পরিত্যাগ করিব। আর সে আন্তরিকভাবে তাওহীদ রিসালতে বিশ্বাসী হইয়াছে কিনা উহা অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। অন্তরের খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কাজেই এই বিষয়টি তাঁহার উপরই সোপর্দ। আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন, হাদীছের এই অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যিন্দীকের (অর্থাৎ যে প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে আর অন্তরে কুফরীর উপর রহিয়াছে) তওবা গ্রহণযোগ্য। ঈমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতাবলম্বীদের নিকট যিন্দীক তথা শরীআতের অস্বীকারকারী ব্যক্তির তওবা গ্রহণীয় কিনা এই বিষয়ে পাঁচটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। একঃ তাহাদের তওবা কবুল হইবে। ইহাই অধিক সহীহ ও সঠিক। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর একটি অভিমত ইহাই। দুইঃ তাহাদের তওবা গ্রহণযোগ্য নহে বরং তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে। হ্যাঁ, সে যদি প্রকৃতভাবে তওবা করিয়া থাকে তবে আখেরাতে নাজাত পাইবে। ইহা ইমাম মালেক (রহঃ) এবং ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর দ্বিতীয় অভিমত। তিনঃ যিন্দীক তথা বেদ্বীন ব্যক্তির প্রথম বারের তওবা মকবূল কিন্তু পুনরায় যদি কুফরী অবলম্বন করে তবে তাহার তওবা মকবূল হইবে না। চারঃ সে যদি স্বীয় কর্মে অনুতপ্ত-লজ্জিত হইয়া নিজে নিজে তওবা করে তবে গ্রহণযোগ্য। আর যদি তলোয়ারের ভয়ে তওবা করে তবে গ্রহণযোগ্য নহে। পাঁচঃ যদি সে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে ভ্রষ্টতার দিকে আহবানকারী হয় তবে তাহার তওবা কবুল হইবে না, না হয় কবূল হইবে। (নববী, ফতহুল মুলহিম)

অতঃপর (হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর প্রদত্ত দলীল শ্রবণের পর) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার কসম, আমি সেই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করিব যাহারা নামায এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে (নামাযকে ফরয বলিয়া স্বীকার করে আর যাকাতকে ফরয মনে না করে অথচ উভয়টিই ইসলামের প্রধান রুকন এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ দুইটি ফরয। নামায ও যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নাই) কেননা, নিশ্চয় (নামায যেইরূপ শারীরিক ইবাদত সেইরূপ) যাকাত মালের হক[১] (অর্থাৎ মালী ইবাদত। কাজেই নামায অস্বীকার করিলে যেমন মুরতাদ হইবে অনুরূপ যাকাত অস্বীকারকারীও মুরতাদ হইবে। অতএব) আল্লাহ তা'আলার কসম; যদি তাহারা আমাকে একটি উটের রশিও[২] প্রদান করিতে অস্বীকার করে যাহা তাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যাকাত হিসাবে প্রদান করিত, উহা হইতে বিরত থাকিলেও আমি অবশ্যই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। অতঃপর হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম; ইহার পর আমার বুঝিবার আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ জাল্লা জালালুহূ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন (অর্থাৎ তাঁহার অন্তরে এই সিদ্ধান্ত ঢালিয়া দিয়াছেন) সুতরাং আমিও উপলব্ধি করিলাম যে, ইহাই হক অর্থাৎ তাঁহার ফায়সালাই সঠিক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) খলীফা নির্বাচিত হইলে আরবের কিছু সংখ্যক লোক (যাহাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ়তা লাভ করে নাই তাহারা) কাফির হইয়া গিয়াছিল। ইমাম তাইয়্যেবী (রহঃ) বলেনঃ মদীনার আশে পাশের বসতি গোত্রসমূহের মধ্যে আবাস, যুবইয়ান, বনূ কিনানা, বনূ সূলাইম, গাতফান ও কযারা প্রমুখ গোত্রসমূহ কাফির হইয়া গিয়াছিল।

আল্লামা কাযী আয়্যায (রহঃ) প্রমুখ বলেনঃ যাহারা মুরতাদ হইয়াছিল তাহারা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। **প্রথম শ্রেণীঃ** নতুন নড়বড়ে ঈমান গ্রহণকারী মুসলিম হিসাবে পরিচিত ব্যক্তিরা ইসলাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মূর্তি পূজা আরম্ভ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীঃ অপরিপক্ক নও মুসলিমরা কাফির মিথ্যুক মুসাইলামা ও আসওয়াদে আনাসীর অনুসারী হইয়া যায়। মুসাইলামা ও আসওয়াদে আনাসী উভয়ই মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার ছিল। ইয়ামামা বাসী ও অন্যান্য কিছু

টীকা-১। فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ المال "কেননা নিশ্চয় যাকাত মালের হক" হাফেয ইবন হাজার (রহঃ) বলেন, হাদীছের এই বাক্যে নামায ও যাকাত এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য না থাকার দলীলের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। উহা এইভাবে যে, নিশ্চয় জানের হক নামায আর মালের হক যাকাত। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করিবে সে স্বীয় জানকে নিরাপদ করিল আর যে যাকাত আদায় করিবে সে স্বীয় মালকে নিরাপদ করিল। কাজেই যে নামায আদায় করিবে না তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইবে। আর যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করিতে সম্মত হইবে না তাহার নিকট হইতে বল প্রয়োগে যাকাত উসূল করিতে হইবে। যদি সে বল প্রয়োগের সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় তবে তাহার বিরুদ্ধে জিহাদ করা হইবে। -
(ফতহুল মুলহিম)

টীকা-২। - عِقَالًا শব্দটি সহীহ মুসলিম শরীফে যেমন বর্ণিত হইয়াছে অনুরূপ সহীহ বুখারী শরীফেও বর্ণিত হইয়াছে। আর কোন কোন রিওয়ায়াতে عقال শব্দের স্থলে عناق শব্দ বর্ণিত হইয়াছে। عناق বলা হয় ঐ সকল বকরীর বাচ্চাকে যাহাদের মাতার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। উভয় বর্ণনাই সহীহ। কেননা হয়ত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) এই কথাটি দুইবার বলিয়াছেন। প্রথমবার عقال এবং দ্বিতীয়বার عناق বলিয়াছেন। عقال দ্বারা কি মর্ম এই বিষয় বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। কাহারও মতে عقال দ্বারা এক বৎসরের যাকাত মর্ম। আর কাহারও মতে عقال. ঐ রশিকে বলা হয় যাহা দ্বারা উষ্ট্রীকে বাঁধা হয়। ইমাম নববী (রহঃ) عقال দ্বারা রশি মর্ম গ্রহণই অধিক সহীহ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ এখানে কঠোরতা ও অতিশয়োক্তির স্থান। তাই عقال. - দ্বারা নিকৃষ্ট বস্তু মর্ম নেওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ যাকাতের উষ্ট্রী প্রদানে অস্বীকার তো দূরের কথা উক্ত উষ্ট্রী বাঁধিবার রশিকে প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেও জিহাদ ঘোষণা করা হইবে।

লোক ভণ্ড মুসাইলামার আনুগত্য করিল এবং সানাআ বাসী ও অন্যান্য কিছু ব্যক্তিরা ভণ্ড আসওয়াদে আনাসীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। উল্লেখ্য যে, মিথ্যুক মুসাইলামা ও আসওয়াদে আনাসী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর জীবদ্দশায়ই নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করিয়াছিল। উভয় মিথ্যুককে আল্লাহ তা'আলা অবমাননা ও লাঞ্ছনার সহিত নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছেন। মিথ্যাবাদী আসওয়াদে আনাসীকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ওফাতের কিছু সময় পূর্বে হত্যা করা হইয়াছিল। আর তাহার অনুসারীদের যাহারা জীবিত ছিল তাহাদেরকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর খেলাফত যুগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কর্মচারীগণ হত্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) স্বীয় খেলাফত যুগে মুসাইলামার বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার জন্য হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রাযিঃ) সহ একদল মুসলিম সেনা প্রেরণ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধে মুসাইলামা পরাজিত ও নিহত হয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেনঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ ثَلَاثُوْنَ دَجَّالًا۔ كُلُّهُمْ يَدَّعُوا النُّبُوَّةَ۔

অর্থাৎ "আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে না যতক্ষণ না ত্রিশজন দাজ্জাল অর্থাৎ মিথ্যুকের আবির্ভাব হইবে। তাহারা সকলই নবী হইবার দাবী করিবে।"

এই পবিত্র হাদীছে উল্লেখিত ত্রিশজনের দুইজন মিথ্যুক হইতেছে মুসাইলামা ও আসওয়াদে আনাসী। তাহাদের পরে বেশ কয়েকজন মিথ্যুক ভণ্ড, নবী হইবার দাবী করিয়াছে। চৌদ্দশত হিজরী শতকে প্রকাশিত মিথ্যুক ও ভণ্ড গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও হাদীছ শরীফে উল্লিখিত ত্রিশজনের একজন। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এই মিথ্যুক দাজ্জালদের কবল হইতে হিফাযত করুন।

তৃতীয় শ্রেণীঃ ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা বাহ্যতঃ ইসলামের উপর ছিল কিন্তু যাকাত আদায়ে অস্বীকার করিল। তাহারা অভিমত প্রকাশ করিল যে, যাকাত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর যুগের জন্য নির্দিষ্ট। এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত মানুষের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিবার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ও হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর মধ্যে প্রথমে মতানৈক্য হইয়াছিল যাহা আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

বলাবাহুল্য মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী গোত্রসমূহের মধ্যে আবাস, যুবইয়ান, বনূ সুলাইম, গাতফান ও ফযারা প্রভৃতি গোত্র যদিও ঈমান গ্রহণ করিয়া বাহ্যিকভাবে মুসলমানগণের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল কিন্তু ইসলামের সকল আহকাম পূর্ণ ও দৃঢ়তার সহিত তাহাদের মস্তিষ্কে বিদ্যমান ছিল না। কুরআন মজীদের ভাষায় প্রযোজ্য ইসলাম তাহাদের মধ্যে বর্তমান ছিল না। তাহারা হয়তঃ ইসলামের বিজয় লাভ ইত্যাদি অবলোকন করিয়াই ঈমান গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ওফাতের পর বেশ কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ হইয়া যায়। যেমন উপরোল্লেখিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত লোকেরা। তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর মধ্যে কোন প্রকার দ্বিমত ছিল না।

আর উপরে বর্ণিত তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত লোকেরা ইসলামের মধ্যেই ছিল বটে কিন্তু ইসলামের আহকামসমূহ ভালভাবে অনুধাবন করিতে সক্ষম হয় নাই। বিশেষ করিয়া যাকাতের বিষয়ে তাহাদের মস্তিষ্কে পরিষ্কার বুঝ ছিল না এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দান করিবার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারে নাই। এই শ্রেণীভুক্ত লোকেরা আবার দুইভাগে বিভক্ত ছিল। (১) ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যাহারা বলিত যে, আমরা নামায কায়েম করিব কিন্তু যাকাত আদায় করিব না। তাহাদের ধারণা এই ছিল যে, যাকাত আদায়ের নির্দেশ শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তাঁহার ওফাতের পর বর্তমানে এই হুকুম নাই। তাহাদের দলীল হইতেছে যে, কুরআন মজীদের আয়াতে কেবল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া যাকাত উসূলের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেমন–

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ سَكَنٌ لَهُمْ -

অর্থাৎ "আপনি তাহাদের সম্পদ হইতে যাকাত গ্রহণ করুন যাহা দ্বারা আপনি তাহাদিগকে পাক-পবিত্র করিয়া দিন এবং তাহাদের জন্য দু'আ করুন, নিশ্চয় আপনার দু'আ হইতেছে তাহাদের জন্য শান্তির কারণ।" (সূরা তাওবা-১০৩)

তাহারা আরও বলিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর বর্তমানে এমন কোন ব্যক্তি নাই যাহার নামায আমাদের জন্য سَكَنٌ শান্তিদায়ক হয়। কাজেই আমরা কাহারও নিকট যাকাত প্রদান করিবনা।

(২) ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যাহারা বলিত যে, আমরা যাকাত প্রদান করিব কিন্তু মদীনায় নিতে দিব না। মদীনায় যাকাতের অর্থ প্রেরণ তাহাদের নিকট এক প্রকার অত্যাচার বলিয়া মনে হইত। তাহাদের দলীল ছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ -

অর্থাৎ "তাহাদের সম্পদশালীদের নিকট হইতে যাকাত উসূল করা হইবে এবং তাহাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হইবে।"

এই হাদীছের উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা বলিল যে, আমরা যাকাত প্রদান করিব বটে কিন্তু মদীনায় নিতে দিব না। বরং স্বীয় গোত্রের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করিব। ইবন হাযম (রহঃ) এই সকল লোকদের সম্পর্কে লিখিয়াছেনঃ

وَطَائِفَةٌ بَقِيَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُمْ "نُقِيمُ الصَّلٰوةَ" وَشَرَائِعَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنَّا لَا نُؤَدِّي الزَّكٰوةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَا نُعْطِي طَاعَةً لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থাৎ "আর একদল ইসলামের উপর বহাল ছিল কিন্তু তাহারা বলিয়া উঠিল, আমরা নামায কায়েম করিব এবং অন্যান্য আহকামে শরীআতও পালন করিব কিন্তু যাকাত হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাযিঃ)-এর নিকট প্রদান করিব না। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে অন্য কাহারও নিকট ছাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করিব না।" (আলমিলাল ওয়ান নিহালঃ ২য় খণ্ড পৃঃ ২২)

যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীরা প্রথমে স্বীয় ব্যাপারে আলোচনা করিবার লক্ষ্যে একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করিল। প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করিয়া প্রথমে খলীফার সামনে উপস্থিত না হইয়া অন্যান্য দায়িত্বশীলগণের সহিত আলোচনা করিল এবং এই ব্যাপারে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর নিকট সুপারিশ করিবার জন্য আরয করিল।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) বিশেষভাবে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) সেই সময়কার আরবের সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর নিকট আরয করিলেন যে, ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যাহারা যাকাত আদায় করিতে সম্মত নহে তাহাদেরকে সেই অবস্থায় থাকিতে দিন। এই পরিস্থিতিতে তাহাদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ হয়তঃ সঠিক হইবে না। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-এর ধারণা ছিল যে, তাহারা নওমুসলিম, ইসলামের আহকাম সম্পর্কে অনবহিত। তাহা ছাড়া দ্বীনের মহব্বতও তাহাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় নাই। কাজেই ইসলামী শরীআতের অনুশাসনের উপর সম্যক জ্ঞান লাভের পর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের প্রতি সুদৃঢ় মহব্বত সৃষ্টি হইবার পর স্বতঃস্ফূর্ত যাকাত আদায়ে সম্মত হইবে। এই কথা বিবেচনা করিয়া

হযরত ওমর (রাযিঃ) আরয করিলেনঃ

يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ تَأَلَّفِ النَّاسَ وَارْفُقْ بِهِمْ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ তা'আলার রসূলের খলীফা! আপনি লোকদের সহিত হৃদয়গ্রাহী ও সহজ সরল ব্যবহার করুন।"

আবেদন শ্রবণের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) অত্যন্ত আড়ম্বর গৌরব পূর্ণ স্বরে বলিলেনঃ

اَجَبَّارٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارٌ فِى الْاِسْلَامِ -

অর্থাৎ "হে ওমর! তুমি তো জাহেলিয়্যাত যুগে অত্যন্ত শক্ত স্বভাবের ছিলে আর ইসলামের মধ্যে এইরূপ নরম হইয়া গেলে?"

অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেনঃ

تَمَّ الدِّيْنُ وَانْقَطَعَ الْوَحْىُ اَيَنْقُصُ وَاَنَا حَىٌّ وَاللهِ لَاُجَاهِدَنَّهُمْ وَلَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالًا -

অর্থাৎ "দ্বীনে শরীআত পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ওহী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দ্বীনের আহকাম কম করা হইবে আর আমি জীবিত বসিয়া থাকিব? (ইহা কখনও সম্ভব নহে) আল্লাহ তা'আলার কসম; যদি তাহারা যাকাতের একটি রশিও প্রদানে অস্বীকার করে তবে অবশ্যই আমি তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিব।"

বস্তুতঃ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ)–এর এই ফয়সালার মাধ্যমেই দ্বীনে শরীআতের মর্যাদা এবং উহার ভিত্তিকে সুদৃঢ় রাখিয়াছিল। সে সময় প্রশাসনিক দুর্বলতা প্রকাশ পাইলে দ্বীনের ঐতিহ্য সুরক্ষিত হইত না।

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেনঃ কতক রাফেযী এই ধারণা পোষণ করিত যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)ই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলমানগণকে বন্দী ও হত্যা করিয়াছিলেন। অথচ তাহারা যাকাতের বিষয়ে জটিল ব্যাখ্যা করিত এবং বলিত যে, কুরআন মজীদে বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং গোনাহ হইতে পবিত্র করা, আত্মশুদ্ধী এবং নামায তথা দু'আ যথার্থভাবে অন্য কাহারও দ্বারা অর্জিত হয় না।

আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেনঃ এইরূপ ধারণা ঐ সকল লোকদের যাহাদের সহিত দ্বীনে শরীআতের কোন সম্পর্ক নাই। তাহা ছাড়া রাফেযীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে মিথ্যা, অপবাদ ও সলফে সালেহীনগণের কুৎসা রটনা করা। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, দ্বীন ইসলাম হইতে প্রত্যাবর্তনকারী মুরতাদ কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কিছুসংখ্যক লোক দ্বীনে শরীআত পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যুক মুসাইলামা ও আসওয়াদে আনাসীর অনুসারী হইয়া যায়। আর কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নামায, রোযা, যাকাত এবং শরীআতের যাবতীয় আহকাম পরিত্যাগ করিয়া মূর্তি পূজায় ফিরিয়া যায়। এই সকল লোকদিগকে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) সর্বসম্মতিক্রমে মুরতাদ কাফির জানিতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহাদের মহিলা ও শিশুদেরকে বাঁদী ও গোলাম বানাইয়াছেন। এই বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর মধ্যে কোন দ্বিমত ছিল না। খোদ হযরত আলী (রাযিঃ) বনূ হানীফার বন্দীদের মধ্য হইতে এক মহিলাকে দাসী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার উদর হইতে মুহাম্মদ হানীফা জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর যুগেই এই কথায় ঐক্যমত হইয়াছেন যে, মুরতাদদেরকে বন্দী না করিয়া হত্যা করাই বাঞ্ছনীয়।

আর যেই সকল লোক যাকাত প্রদান অস্বীকার করিয়াছিল তাহারা বাহ্যতঃ মুসলমান ছিল কিন্তু বাগী তথা বিদ্রোহী। অবশ্য তাহাদের কেহ কেহ যাকাত প্রদানে সম্মত ছিল। কিন্তু নেতাদের কারণে প্রদান করিতে পারে নাই। যেমন বনূ ইয়াববুর লোকেরা যাকাতের অর্থ একত্রিত করিয়া মদীনার দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে মালেক বিন নুওয়াইরা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে যাকাত প্রদানে বিরত থাকিতে বাধ্য

করিয়াছিল। এই সকল কারণ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে কাফির বলা যায় না, যদিও উহা একপ্রকার মুরতাদ ছিল। কারণ তাহারা মুরতাদদের সহিত অংশীদার ছিল। দ্বীনে শরীআতের কোন অংশকে স্থগিত তথা অস্বীকারকারীর উপর মুরতাদের হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকন্তু পূর্বেকৃত কর্ম হইতে প্রত্যাবর্তনকারীকেও মুরতাদ বলা হয়। কাজেই তাহারা নেক কাজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কারণে তাহাদের সহিত মুরতাদ সংযোজন হইয়াছে। তাহাদের হইতে দ্বীনদারী বিদায় হইয়া গিয়াছে।

যাকাত অস্বীকারকারীদের প্রদত্ত দলীলের জবাবঃ

যাকাত অস্বীকারকারীরা কুরআন মজীদের যেই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছে সেই আয়াতের মর্ম তাহারা বুঝিতে পারে নাই। আর বুঝিয়া থাকিলেও স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে জটিল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়াছে। কারণ কুরআন মজীদে এমন অনেক আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে যাহাতে কেবল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হইয়াছে। আর উক্ত সম্বোধনে তাঁহার উম্মতকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ -

অর্থাৎ "সূর্য ঢলিবার পর আপনি নামায কায়েম করুন।" (সূরা বনি ইসরাইল–৭৮)

এই আয়াতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সম্বোধনের মধ্যে তাঁহার উম্মতও শামিল রহিয়াছেন। যাকাত উসূলের আয়াতখানাও এই শ্রেণীভুক্ত।

উল্লেখ্য যে, কুরআন মজীদে প্রধানতঃ তিন প্রকারের সম্বোধন রহিয়াছে।

(১) সাধারণ তথা ব্যাপক সম্বোধন। যেমন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ -

অর্থাৎ "হে মুমেনগণ! যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াও....।" (সূরা মায়েদা–৬)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ -

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! রোযা তোমাদের জন্য ফরয করা হইয়াছে।" (সূরা বাকারা–১৮৩)

(২) বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এই সম্বোধনে অন্য কেহ শরীক নাই। তবে যে সকল স্থানে কেবলমাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বোধিত সেই সকল স্থানে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, ইহা কেবল পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর জন্য নির্দিষ্ট।

যেমন এরশাদ হইয়াছে–

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ -

অর্থাৎ "এবং রাত্রের কিছু অংশের মধ্যেও, অনন্তর উহাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করুন যাহা আপনার জন্য নফল কাজ।" (সূরা বনী ইসরাঈল–৭৯)

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ "এই সকল (হুকুম) কেবল আপনার জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে অন্যান্য মুমিনদের জন্য নহে।" (সূরাআহযাব–৫০)

(৩) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলকে সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু সম্বোধনের মধ্যে রসূল ও উম্মত সকলই সমভাবে শামিল রহিয়াছেন। যেমন–

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ -

অর্থাৎ "সূর্য ঢলিয়া যাওয়ার পরই আপনি নামায কায়েম করুন।" (সূরা বনী ইসরাঈল-৭৮)

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

অর্থাৎ "অতঃপর আপনি যখন কুরআন মজীদ পড়িতে আরম্ভ করেন তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন।"

এই ধরনের সম্বোধন যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করা হইয়াছে কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নির্দিষ্ট নহে। বরং উম্মতও উহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

এইরূপ সম্বোধন হইতেছে- خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً -

অর্থাৎ "আপনি তাহাদের ধনসম্পদ হইতে যাকাত উসূল করুন।" ....।

সুতরাং যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন তিনিই এই দায়িত্ব পালন করিবেন।

এখন রহিল তাহাদের দলীলের দ্বিতীয় অংশ যে, তাতহীর ও তাযকিয়া এবং দু'আ অন্য কাহারো দ্বারা হয় না। ইহার উত্তরে আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) লিখিয়াছেনঃ তাতহীর অর্থাৎ গোনাহ হইতে পবিত্র করা, তাযকিয়া অর্থাৎ পবিত্রতা এবং দু'আ প্রত্যেক ইমাম তথা প্রশাসকই যাকাত দাতার জন্য করিতে পারেন। দান, সদকা ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য হয়। উহা ছাওয়াবের কর্ম। যে ছাওয়াব যেই আমলের জন্য বর্ণিত হইয়াছে উহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই। বরং বর্তমানেও বহাল রহিয়াছে আর কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে।

ইমাম এবং যাকাত উসূলকারী যাকাত দাতার জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব। তাহারা দাতার সম্পদের উন্নতি ও বরকতের জন্য দু'আ করিবেন। আশা করা যায় যে, তাহাদের দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবূল করিবেন। (ফতহুল মুলহিম)

যাকাত অস্বীকারকারী দ্বিতীয় দলের পেশকৃত হাদীছ শরীফের উত্তর হইতেছে যে, فُقَرَائِهِمْ এর هُمْ সর্বনামটি মুসলমানদের দিকে প্রত্যাবর্তিত অর্থাৎ - فقراء المسلمين "মুসলিম দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হইবে।" কাজেই পৃথিবীর যে কোন স্থানের মুসলিম দরিদ্রদিগকে যে কোন স্থান হইতে আদায়কৃত যাকাতের অর্থ বন্টন করা যাইবে। ইহা দলীল যে, মুসলিম দরিদ্রগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও যাকাত দেওয়া জায়েয নাই। (বিস্তারিত দেখুন হাদীছ নং ২৯ এর ব্যাখ্যা)

একটি প্রশ্নের জবাব

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর খেলাফতকালে যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে বাগী অর্থাৎ বিদ্রোহী হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। অনুরূপ বর্তমান যুগে যদি কোন মুসলমান ব্যক্তি যাকাতকে অস্বীকার করে তাহা হইলে তাহার হুকুম কি বাগী অর্থাৎ বিদ্রোহীদের ন্যায় হইবে?

উহার উত্তর এই যে, বর্তমান যুগে যদি কোন মুসলমান ব্যক্তি যাকাতকে অস্বীকার করে তবে উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বসম্মত মতে কাফির হইয়া যাইবে।

বর্তমান যুগে যাকাত অস্বীকার করা আর খলীফা সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ)-এর যুগে যাকাত অস্বীকার করিবার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে যে, খলীফার যুগের যাকাত অস্বীকারকারীদের জন্য উযর ছিল। বর্তমানে সেই উযর নাই।

উক্ত উযর এই (১) ইসলামী শরীআতের প্রাথমিক যুগ ছিল বলিয়া উহার বিধি–বিধান রহিত হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। (২) তাহারা দ্বীনের বিষয়াবলীতে অজ্ঞ ছিল এবং তাহাদের যুগ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা হইবার কারণে সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ ছিল। ইহাই তাহাদের উযর অর্থাৎ অপারগতা। কিন্তু বর্তমান যুগে দ্বীনে শরীআতের প্রচার পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। শরীআতের আহকামসমূহ সকল মুসলমানের নিকট পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। শুধু বিশেষ মুসলমানই নহে বরং বিশেষ, সাধারণ, আলেম, মুর্খ সকল উম্মতই যাকাত ফরয হইবার বিষয়ে জ্ঞাত। কাজেই জটিল ব্যাখ্যার মাধ্যমে যাকাত আদায় না করিবার কোন কারণ উদ্ভাবন করিবার অবকাশ নাই। ফলে বর্তমান যুগে উযর অবশিষ্ট নাই।

অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি ঐরূপ বিষয়ের অস্বীকার করে যাহা দ্বীনে শরীআতে ফরয, ওয়াজিব হইবার বিষয়ে উম্মতের ইজমা রহিয়াছে, আর উহা সেই ব্যক্তি অবহিত আছে। যেমন–পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত, রমযানের রোযা, ফরয গোসল, যিনা হারাম হওয়া, মদ্যপান হারাম হওয়া ও মুহাররমাতের সহিত বিবাহ হারাম ইত্যাদি যে কোন একটি আহকামকে অস্বীকার করিলে কাফির হইয়া যাইবে। তবে যদি কোন নওমুসলিম শরীআতের আহকাম সম্পর্কে অনবহিত, সে যদি অজ্ঞতাবশতঃ উহার কোন একটি আহকামকে অস্বীকার করে তবে কাফির হইবে না।

আর যে সকল শরীআতের বিষয়সমূহে উম্মতের ইজমার উপর বিশেষ ও সাধারণ সকল মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ নহে, যেমন–ফুফী ও ভাগিনী বিবাহে একত্রিত করা, খালা ও ভাইজীকে বিবাহে একত্রিত করা, ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হইতে বঞ্চিত হওয়া, দাদী এক ষষ্ঠাংশ উত্তরাধিকারী হওয়া প্রভৃতি আহকামের অনুরূপ কোন আহকামকে অস্বীকার করিলে কাফির হইবে না। বরং উহা উযর অর্থাৎ অপারগতা ধরা হইবে। কারণ এই সকল আহকাম সাধারণ ব্যক্তিবর্গ অবহিত নহে।

দ্বীনে শরীআতের কোন একটি অংশের অস্বীকার সম্পূর্ণ দ্বীনের অস্বীকার করারই নামান্তর। শায়খাইনের মতানৈক্য এবং উহার কেন্দ্রবিন্দু।

দ্বীনে ইসলামের ঐ সকল আহকাম যাহা অকাট্য ও মুতাওয়াতির প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত উহার মধ্যে পার্থক্য করিবার কোন অবকাশ নাই। ঐ আহকামসমূহের কোন একটি হুকুমকে অস্বীকার করিবার মানেই হইতেছে সম্পূর্ণ দ্বীন অস্বীকার করা। অর্থাৎ পূর্ণ দ্বীন অস্বীকারকারী যেমন কাফির তেমন একটি আহকাম অস্বীকারকারীও কাফির।

এই কারণেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার বিষয়ে কোন সন্দেহে ছিলেন না। পক্ষান্তরে হযরত ওমর (রাযিঃ) প্রথমে এই ব্যাপারে দ্বিধা সন্দেহে পতিত হইয়াছিলেন। উভয়ের মতানৈক্যের কারণ কেবল ঘটনার প্রকৃতি নিরূপণেই ছিল। প্রকৃত মাসআলায় উভয়ের মধ্যে কোন মতপার্থক্য ছিল না। হযরত ওমর (রাযিঃ) বুঝিয়াছিলেন যে, যাকাত অস্বীকার করা কেবলমাত্র একটি বিদ্রোহমূলক গোনাহ। সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় বাগী তথা বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা যথার্থ হইবে না। তাই তিনি খলীফার সমীপে আরয করিয়াছিলেন তাহাদিগকে স্বীয় অবস্থায় থাকিতে দিন। কিন্তু খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর দৃষ্টিতে যাকাত অস্বীকারকারীরা মুরতাদের পর্যায়ভুক্ত ছিল। এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন যে, নামায অস্বীকার করা এবং যাকাত অস্বীকার করিবার মধ্যে পরিণামে কি পার্থক্য রহিয়াছে? নামায শারীরিক ইবাদত আর যাকাত মালী ইবাদত। 'ইবাদত' এবং 'ফরয' হওয়ার মধ্যে উভয়ই সমপর্যায়ের। উম্মতের সর্বসম্মত মতে নামায অস্বীকারকারী মুরতাদ। তদ্রুপ যাকাত অস্বীকারকারীও মুরতাদ হইবে।

বলাবাহুল্য উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য এই বিষয়ে ছিল না যে, মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাইবে অথবা যাইবে না? বরং হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর নিকট তাহারা মুরতাদ হওয়া প্রমাণিত নহে। কেননা হাফেয যাইলায়ী (রহঃ) উক্ত মতপার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু নির্ণয়ে লিখিয়াছেন–

وَقَدْ يُقَالُ اَنَّ عُمَرَ رَضِ لَمْ يَتَحَقَّقْ رِدَّتَهُمْ يَدُلُّ عَلٰى ذٰلِكَ فِى الْقِصَّةِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِ لَمَّا اسْتَشَارَ فِيْهِمْ قَالَ لَهٗ عُمَرُ رَضِ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ قَوْمٌ مُؤْمِنُوْنَ وَاِنَّمَا شَحُّوْا بِاَمْوَالِهِمْ۔

অর্থাৎ "এই মতবিরোধের ব্যাখ্যায় এই কথা বলা যায় যে, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)–এর নিকট যাকাত অস্বীকারকারীরা এখনও মুরতাদ হওয়া প্রমাণিত হয় নাই। যেমন উক্ত ঘটনায় তাহাদের কথাবার্তায় প্রকাশিত হইয়াছে। যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাহাদের সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করিলেন তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ তা'আলার রসূলের খলীফা। তাহারা তো মুমিন লোক, শুধু সম্পদ দান করিবার ক্ষেত্রে কৃপণতা করিতেছে।"

এই আলোচনা দ্বারা অনুধাবিত হয় যে, মতপার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে যে, তাহারা কি মুমিন ছিল অথবা মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল? আলোচ্য হাদীছেও হযরত ওমর (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পবিত্র হাদীছ দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন যে, মুমিনগণের সহিত যুদ্ধ করা যায় না। অতঃপর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ)–এর মন্তব্য শ্রবণ করিবার পর হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর নিকট যখন তাহাদের বাস্তব অবস্থা ও ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়ে তখন বুঝিলেন যে, বস্তুতঃ তাহারা মুরতাদ হইয়া গিয়াছে। তাই তিনিও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর ফায়সালায় মতৈক্য পোষণ করিলেন। শুধু তিনিই নহেন বরং অন্যান্য সকল সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর ফায়সালা সর্বসম্মতিক্রমে মানিয়া নিলেন।

আল্লামা হাফেয ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) লিখিয়াছেন–

فَعُمَرُ وَافَقَ اَبَا بَكْرٍ رَضِ عَلٰى قِتَالِ اَهْلِ الرِّدَّةِ مَانِعِى الزَّكٰوةِ وَكَذٰلِكَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ۔

(منهاج السنة ج ٢ ص ٢٣٢)

অর্থাৎ "অবশেষে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) ও সকল সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) যাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার বিষয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর সহিত ঐক্যমত হইলেন।"

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) বলিতেনঃ হে হযরত সিদ্দীক (রাযিঃ)। আপনি আমার সমস্ত জীবনের ইবাদতের বিনিময়ে কেবল আমাকে আপনার এক রাত্র ও এক দিনের ইবাদত প্রদান করিয়া দিন "গারে সূরে অবস্থানের রাত্রির এবং মুরতাদদের ফিৎনার দিনের।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেনঃ

قَائِمٌ فِى الرِّدَّةِ مَقَامَ الْاَنْبِيَاءِ۔

অর্থাৎ "ফিৎনায়ে মুরতাদদের বিষয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) পয়গাম্বরগণের ন্যায় স্বীয় সিদ্ধান্তে সুদৃঢ় ছিলেন।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলেনঃ

كَرِهْنَاهٗ فِى الْاِبْتِدَاءِ وَحَمِدْنَاهُ عَلَى الْاِنْتِهَاءِ۔

অর্থাৎ "আমরা প্রথমে যাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা অপছন্দ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবার পর আমরা সকলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)–এর শুকর গোজারী আদায় করিয়াছি।"

জিযিয়া কর প্রদানকারী ও যাহাদের সহিত নিরাপত্তা চুক্তি হয় তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা যাইবে না কেন?

আলোচ্য হাদীছের পরম্পরায় এই বিষয়টির আলোচনা প্রয়োজন যে, যখন হাদীছ শরীফে ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত মানুষের সহিত জিহাদ করিবার কথা বলা হইয়াছে তবে জিযিয়া (ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমের উপর নির্ধারিত কর বা টেক্স) প্রদানকারী এবং যাহাদের সহিত নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহারা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না কেন?

উত্তর এই যে, (১) জিযিয়া গ্রহণ ও নিরাপত্তা চুক্তি করিবার অনুমতি জিহাদের হাদীছের পরের। কাজেই অনুমতির হাদীছ দ্বারা জিহাদের হাদীছ রহিত হইয়া গিয়াছে।

(২) যুদ্ধের নির্দেশ সাধারণ তথা ব্যাপক। উহা হইতে জিযিয়া প্রদানকারী ও নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিতকে জিহাদের আওতাধীন হইতে বাহির করা হইয়াছে।

(৩) "أُقَاتِلَ النَّاسَ" "মানুষের সহিত জিহাদ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি" এর হুকুম সাধারণ এবং উহার দ্বারা মর্ম হইল বিশেষ অর্থাৎ النَّاسَ দ্বারা মর্ম শুধু মুশরিকরা, যাহারা আহলে কিতাব নহে। যেমন নাসায়ী শরীফের রিওয়ায়াতে এই শব্দেই বর্ণিত হইয়াছেঃ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِيْنَ 'আমি মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।'

(৪) কিতাল অর্থাৎ যুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে যে, ইসলামের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং বিরুদ্ধবাদীদের নতশির করা। ইহা কখনও জিহাদ দ্বারা লাভ হয়। আর কখনও জিযিয়া উসূল করা দ্বারা আর কখনও নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে লাভ হয়।

(৫) قِتَال অর্থাৎ যুদ্ধ দ্বারা যুদ্ধ মর্ম অথবা উহার স্থলাভিষিক্ত জিযিয়া ইত্যাদি মর্ম হইতে পারে।

(৬) জিযিয়া তথা টেক্স নির্ধারণের উদ্দেশ্য হইল তাহাদিগকে ইসলামের দিকে টানিয়া লওয়া। কারণের কারণ কারণ হয়। কাজেই উহার মর্ম এই হইবে যে, হয়তঃ তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবে অথবা জিযিয়া তাহাদের উপর নির্ধারণ করা হইবে যাহা ইসলামের দিকে নিয়া আসে। ইহা দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

ফায়দাঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফ হইতে অনেক বিষয় জানা যায়। (১) কিয়াস শরীআতের দলীল, (২) নামায, যাকাত বা অন্য কোন শরীআতের আহকামকে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা জায়েয। (৩) বাগী তথা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অনুমতি। (৪) ইমাম তথা প্রশাসককে প্রয়োজনে ইজতেহাদ করা বৈধ। (৫) ইমাম তথা প্রশাসকের সহিত ন্যায় সঙ্গত তর্ক বিতর্ক করা জায়েয।

٣٣ وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ -

হাদীছ—৩৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ তাহির হারমালা বিন ইয়াহইয়া এবং আহমদ বিন ঈসা (রহঃ)....হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি যতক্ষণ

না তাহারা এই কথার স্বীকৃতি তথা সাক্ষ্য দিবে যে, একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। সুতরাং যে কেহ– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলিবে (অর্থাৎ দ্বীনে শরীআতকে স্বীকার করিয়া নিবে) সে আমার হইতে স্বীয় জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করিবে। তবে হ্যাঁ, শরীআতসম্মত কোন কারণ (যেমন কিসাস, দিয়াত ইত্যাদি) থাকিলে ভিন্ন কথা; (উল্লেখ্য যে, তাহার বাহ্যিক ঘোষণা ও আচরণসমূহ গৃহীত হইবে। কারণ, অন্তরের খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। ফলে সে আন্তরিকভাবে ঈমান গ্রহণ করিয়াছে কিনা?) তাহার হিসাব নিকাশ একক আল্লাহ তা'আলার সমীপে ন্যস্ত থাকিবে।

ফায়দাঃ কলেমা শাহাদাত - لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর মধ্যে রেসালাত এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত দ্বীনে শরীআতের যাবতীয় বস্তু রহিয়াছে। (বিস্তারিত ৩৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

٣٤ **حدثنا** أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ ح وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ نَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ -

হাদীছ–৩৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আহমদ বিন আবদাতায্ যাব্বিয়্য (রহঃ)···(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন উমাইয়্যা বিন বিসতাম (রহঃ)···উভয় সূত্রে হযরত আলী (রাযিঃ)–এর নিকট একত্রিত হইয়াছে। তিনি···হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি যতক্ষণ না তাহারা এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং আমার রেসালতের প্রতি ও আমি (ইসলামী শরীআতের) যাহা কিছু নিয়া প্রেরিত হইয়াছি উহার প্রতি ঈমান আনিবে। যদি তাহারা এইগুলি মানিয়া নেয় তবে তাহারা তাহাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করিবে। কিন্তু শরীআতসম্মত কোন কারণ (যেমন কিসাস, দিয়াত ইত্যাদি) থাকিলে ভিন্ন কথা। আর তাহাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহ তা'আলার নিকট ন্যস্ত (কেননা একমাত্র তিনিই জানেন যে, তাহারা কি প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে না প্রদর্শনমূলক।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য রিওয়ায়াতসমূহে أَقْتُلَ শব্দের স্থলে أُقَاتِلَ শব্দ ব্যবহার করিবার দ্বারা ঐ যুদ্ধকে বুঝানো উদ্দেশ্য যাহা কেবল মুসলমানগণের একক দায়িত্বে নহে বরং কাফির মুশরিকদেরও বিরাট হাত রহিয়াছে। অর্থাৎ যখন মুশরিকদের সহিত কোন কারণবশতঃ যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইবে তখন উহাকে বন্ধ করিবার নিশ্চিত পথ শুধু আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ এবং সকল পয়গাম্বর আলাইহিস্ সালামকে সত্য বলিয়া স্বীকারোক্তিসহ আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর রেসালাত স্বীকার করিয়া নেওয়া, নামায ও যাকাত আদায় করিবার স্বীকার করা। উহার নামই হইতেছে ইসলাম। ইসলাম ব্যতীত কেবল ধর্ম পরিবর্তনের দ্বারা যুদ্ধ বন্ধ করা হইবে না। অধিকন্তু ইসলামী শরীআতের কোন একটি আহকাম অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধেও ইসলামী যুদ্ধাস্ত্র পরিচালিত হইবে।

সন্ধিপত্র ও জিযিয়া যদিও যুদ্ধ বন্ধ করিবার কারণ হয় কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই দুই পক্ষের সম্মতির উপর রুদ্ধ। কাফির দল যদি সন্ধিচুক্তির আবেদন করে অথবা জিযিয়া প্রদান মানিয়া নেয় তবে তাহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা

যাইতে পারে কিন্তু যুদ্ধ পূর্ণভাবে সমাপ্ত করিবার অকাট্য বস্তু যাহা কাফির মুশরিকদের হস্তে রহিয়াছে উহা হইতেছে যে, তাহাদের ইসলাম গ্রহণ করা। ইসলাম গ্রহণের পর যুদ্ধ করিবার কোন কারণ অবশিষ্ট থাকিবে না। হ্যাঁ, তাহাদের ইসলাম গ্রহণ কি প্রকৃত না বাহ্যাড়ম্বর সেই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। বরং কলেমা পাঠের মাধ্যমে দ্বীনে শরীআতকে স্বীকার করিলেই মুসলিম বলা হইবে।

ইসলামী যুদ্ধের উদ্দেশ্য ফিৎনা ফাসাদ বন্ধ করা, ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ নহে

আলোচ্য হাদীছে বলা হইয়াছে যে, লোকেরা ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অথচ কুরআন মজীদের আয়াতে এরশাদ হইয়াছেঃ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নাই।"

বাহ্যিকঃ দৃষ্টিতে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইলেও গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রশ্ন যথার্থ নহে। কেননা, ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করিবার জন্য দেওয়া হয় নাই। বাধ্য করিবার জন্য হইলে হাদীছ শরীফের أُقَاتِلَ শব্দ এর স্থলে أَقْتُلَ শব্দ ব্যবহৃত হইত। অধিকন্তু জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফিরদেরকে নিজ দায়িত্বে নিয়া আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলাম ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধ ফিৎনা ফাসাদ নিপাত করিবার নিমিত্তে নির্ধারণ করা হইয়াছে। কারণ ফিৎনা ফাসাদ আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। আর কাফির মুশরিকরা কেবল ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টির চিন্তায়ই ব্যস্ত থাকে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেনঃ

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ -

অর্থাৎ "আর তাহারা (কাফির মুশরিকরা) ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় আর আল্লাহ তা'আলা অশান্তি বিস্তারকারীদিগকে অপছন্দ করেন।" (সূরা মায়েদা-৬৪)

এই কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা জিহাদ এবং কিতালের মাধ্যমে কাফির ও মুশরিক ব্যক্তিদের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। সে মতে জিহাদের মাধ্যমে অনাচারী যালিমদিগকে হত্যা করা সাপ, বিচ্ছু ও অন্যান্য পীড়াদায়ক জীবজন্তু হত্যা করিবারই সমতুল্য।

ইসলাম জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছে। আর যাহারা জিযিয়া কর প্রদানের মাধ্যমে আইন মান্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই সকল লোকদিগকে হত্যা করা হইতে বিরত করিয়াছে।

ইসলামের এই কর্ম পদ্ধতিতে অনুধাবন করা যায় যে, জিহাদ ও কিতালের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে নাই। বরং ইহার দ্বারা ভূমণ্ডল হইতে অন্যায় অত্যাচার দূর করিয়া ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দিয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেসালত জীবনে এমন একটি ঘটনাও ঘটে নাই যাহাতে তিনি বল প্রয়োগে ইসলাম পেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নহে। কারণ ঈমানের সম্পর্ক অন্তরের সহিত বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত নহে। আর জিহাদের মাধ্যমে কেবলমাত্র বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয় অন্তরে কোন প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং জিহাদ দ্বারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা অসম্ভব।

এই সম্পর্কে খোদ সহীহ মুসলিম শরীফে পরবর্তী ৩৬ নং রিওয়ায়াতে আসিতেছে। সেই রিওয়ায়াতে আলোচ্য হাদীছের সহিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদের আয়াত فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ - (অতএব, উপদেশ প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনি তো কেবল একজন উপদেশ দাতা। আপনি তাহাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক তথা শাসক নহেন বা আপনাকে কাফিরদের প্রতি শক্তি প্রয়োগকারী করা হয় নাই) তেলাওয়াত করিয়াছেন।

সুতরাং এই অধ্যায়ে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহে যদি বল প্রয়োগের কোন মর্ম বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে হাদীছের সহিত পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেন না। বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেবল مُصَيْطِر (শাসক) হইতেন مُذَكِّرٌ (উপদেশদাতা) হইতেন না।

খোলাফায়ে রাশেদার সময়ও ঈমান গ্রহণের জন্য বল প্রয়োগ করা হয় নাই। উদাহরণতঃ হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) একজন নাসারা বৃদ্ধা মহিলাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়াছিলেন। তখন সেই বৃদ্ধা মহিলা উত্তর দিয়াছিল যে, أَنَا عَجُوزَةٌ كَبِيرَةٌ وَالْمَوْتُ إِلَى قَرِيبٍ 'আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাড়ানো এক প্রাচীনা বৃদ্ধা। শেষ জীবনে কি স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করিব?' এই কথা শ্রবণের পর হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করেন নাই বরং তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ "ইসলাম ধর্মে বল প্রয়োগ নাই।" ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদের হাদীছ আয়াতের পরিপন্থী নহে।

(মাযহারী, তফহীমুল মুসলিম)

বল প্রয়োগ কি

ইসলাম এবং কুফর দুইটি সমশক্তি সম্পন্ন দল পৃথিবীতে বসবাস করিয়া যাইতেছে। অধিকন্তু পৃথিবীর জন্মলগ্ন হইতে অধিক সময় কাফিরদের দাপটই ছিল বেশী। সেই অত্যাচারী দাম্ভিকদের সময়েই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামসহ নবী রসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। নমরূদের শাসনামলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে, ফেরাউনের শাসনামলে হযরত মূসা (আঃ)কে আর জাহিলিয়্যাত যুগে সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহাগ্রন্থ আল কুরআন নিয়া প্রেরিত হইয়াছেন। লোক সংখ্যা ও জনবলের দিক দিয়া শক্তি অর্জনের পর কোন সময়েই ইসলাম প্রচার হয় নাই। ইসলাম প্রচার হইয়াছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের ভিত্তিতে। বল প্রয়োগের দ্বারা হয় নাই। ইসলামী শক্তি যদি পৃথিবীর শীর্ষস্থানে পৌছিবার পর নির্ভয়ে মানুষের গ্রীবাসমূহে তলোয়ার রাখিয়া ইসলাম গ্রহণের জন্য অভিভূত করা হইত তবে উহাকে বল প্রয়োগ বলা যাইত। কিন্তু ইতিহাসের কোথাও এইরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও এইরূপ দুইটি অবস্থা উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে যে, কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করিতে না চায় এবং নিজের ধর্মেই থাকিতে আশা ব্যক্ত করে তাহা হইলে সন্ধিচুক্তি অথবা জিযিয়া উসূলের মাধ্যমে তাহাদিগকে তাহাদের ধর্মে থাকিবার ব্যবস্থা করা যাইবে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট কথা যে, 'আপোষনামা' ও 'জিযিয়া' উভয়টি সাময়িক তথা অযথার্থ বিষয়। উহাকে উদ্দেশ্যের স্থানে রাখা যায় না। কারণ জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে পৃথিবী হইতে ফিৎনা ফাসাদকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দ্বীনে ইলাহীর প্রচার করা। আপোষনামা ও জিযিয়া বস্তু অনাচার বন্ধ করিবার সাময়িক ও আনুষাঙ্গিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নহে। ইসলাম গ্রহণই হইতেছে জিহাদ ও যুদ্ধ বন্ধের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা।

দ্বীনে শরীআতের যাবতীয় আহকামকে বিশ্বাসসহ মান্য করিবার নাম ঈমান

আলোচ্য হাদীছ শরীফখানা বিভিন্ন সূত্রে ও শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতে কেবল لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ - (একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই) অর্থাৎ তাওহীদের উল্লেখ রহিয়াছে। আর কোন রিওয়ায়াতে তাওহীদের সহিত রেসালতের উল্লেখ রহিয়াছে। আর কোন রিওয়ায়াতে তাওহীদ, রেসালত ও নামায-যাকাতের উল্লেখ রহিয়াছে। বস্তুতঃ সকল রিওয়ায়াত একই উদ্দেশ্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীনে শরীআত নিয়া প্রেরিত হইয়াছেন, সে দ্বীনে শরীআতের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস ও স্বীকার না করা পর্যন্ত ঈমান লাভ হয় না। এই হাকীকতের দিকে কখনও ইসলামের দুইটি প্রসিদ্ধ রুকন নামায ও যাকাতের উল্লেখ করিয়া ইঙ্গিত করিয়া দিয়াছেন। আবার কখনও সম্পূর্ণ দ্বীনকে শাহাদাতাইনের পরিধির মধ্যে গুছাইয়া দিয়াছেন। আর কখনও শুধু কলেমা তাওহীদের উপর যথেষ্ট করা হইয়াছে। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, তাওহীদের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম–এর প্রতি ঈমান গ্রহণও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর প্রতি ঈমান তথা বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত সহীহ তাওহীদ লাভ সম্ভব নহে। আলোচ্য হাদীছখানা এই অধ্যায়ে গৃহীত রিওয়ায়াতসমূহের মুফাসসাল অর্থাৎ বিস্তারিত বর্ণনা বিশেষ। আর যে রিওয়ায়াতে শুধু তাওহীদের উল্লেখ হইয়াছে উহা মুজমাল অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং সকল রিওয়ায়াতের দাবী একই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীনে শরীআত নিয়া প্রেরিত হইয়াছেন উহার যাবতীয় বিষয়াবলী সত্য বলিয়া স্বীকার করা এবং উহার বশ্যতা মানিয়া লইলেই জান মালের নিরাপত্তা লাভ করিবে। ইহা ছাড়া ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় তাহাকে মুমিন মুসলমান বলা যায় না।

ঈমানের ভিত্তি দলীলের উপর নহে

রুহুল মাআনী গ্রন্থকার কতক মুহাক্কেকগণের অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঈমান বস্তুতঃ ঐ পূর্ব নির্ধারিত সত্যকে দৃঢ় বিশ্বাস করিবার নাম যাহা সৌভাগ্যবানদের অন্তরে এমনভাবে প্রবেশ করিয়া থাকে যাহাকে সে যদি নিজেও বাহির করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করে তবেও বাহির করিতে পারে না।

কোন কোন বাতিল ফিরকা যেমন–মুতাযিলা ও কতক মুতাকাল্লেমীন বলেন যে, দলীল প্রমাণের আলোকে তাওহীদ, রেসালতে ঈমান লাভ করা ওয়াজিব। কারণ সন্দেহ সংশয়মুক্ত ঈমান দলীল প্রমাণের জ্ঞান ব্যতীত লাভ করা যায় না। তাহাদের এই অভিমতের উপর আশ্চর্য হইতে হয়। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মুবারক যুগে কাফিরদের বিরাট বিরাট জামাআত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে কি ইসলামের ফরয ও ওয়াজিবসমূহের অন্তর্দৃষ্টি ও দলীল প্রমাণ শিক্ষা করিবার দাওয়াত দেওয়া হইয়াছিল? তাহাদিগকে নামায ও যাকাত ইত্যাদির আহকাম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাদিগকে কি কখনও বিশ্বজগত ধ্বংসশীল হওয়ার দলীলের সাধ্য আশ্রয় বাক্য ও পক্ষ আশ্রয় বাক্য সাজাইয়া সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের শর্তসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে? তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মুতাকাল্লেমগণের দলীল প্রমাণাদিও ঈমান দৃঢ় হইবার একটি কারণ হিসাবে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু ঈমান শুধু দলীল প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হওয়া কোন ক্রমেই সহীহ হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত তবে সাধারণ লোকদের ঈমান সহীহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। কেননা তাহাদের ঈমান মুতাকাল্লেমীনের প্রমাণাদির ভিত্তিতে লাভ হয় নাই। পক্ষান্তরে এমন অনেক উদাহরণ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, যাহাদের সামনে ইসলাম হক ও সত্য হইবার দলীল ও প্রমাণাদি দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল অথচ তাহারা ঈমানী দৌলত হইতে বঞ্চিত ছিল। বস্তুতঃ ঈমান ও ইয়াকীন অর্জন দলীলের উপর নির্ভরশীল নহে। কারণ ঈমান এমন একটি নূর, যাহাকে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা যথার্থতা ও সম্পূর্ণভাবে স্বীয় ফযল ও রহমতে বান্দার অন্তরে ঢালিয়া দেন। বাহ্যতঃ কারণ যাহা কিছুই হইতে পারে।

বলাবাহুল্য ঈমান যদি দলীল প্রমাণের উপর নির্ভরশীল বলা হয় তাহা হইলে উহার মধ্যে একটি সম্ভাবনা বর্তমান থাকিবে যে, দলীল বিপরীত দিকে ধাবিত হইলে ঈমানও বিপরীত দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে। ঈমানের বিপরীত কুফর ছাড়া আর কি? অধিকন্তু দলীল সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির স্থান। অতএব, দলীল প্রমাণের উপর নির্ভরশীল ঈমান সুদৃঢ় হয় না বরং উহার দ্বারা দুর্বল ঈমানই অর্জিত হয়। আল্লাহ তা'আলাই জানেন অল্প জ্ঞানের অধিকারী মানুষের দলীলের মোড় কখন কোন দিকে ধাবিত হয়।

ইয়াকীন তথা বিশ্বাসের ঐ উচ্চ অবস্থা যাহা একজন মূর্খ বৃদ্ধ ব্যক্তির অর্জিত হয়, অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় আলেম, ফাযিল এবং জ্ঞানে বিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিও উক্ত অবস্থার সহিত অপরিচিত ও নিঃসম্পর্ক থাকে।

ইসলাম প্রকাশ্যের উপরই হুকুম প্রদান করে

আলোচ্য হাদীছ শরীফের শেষ দিকে বর্ণিত হইয়াছে যে, وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ "আর (তাহার ইসলাম গ্রহণ বাহ্যিক না আন্তরিক সেই বিষয়ের) হিসাব নিকাশ একমাত্র আলেমুল গায়েব আল্লাহ তা'আলার সমীপে ন্যস্ত।" তিনিই উহার যথার্থ ফায়সালা দিবেন। আমরা যেহেতু অদৃশ্য জ্ঞানী নহি সেহেতু মানুষের আন্তরিক

নিয়্যতসমূহের এবং ভিতরের অবস্থাবলীর চর্চা করা আমাদের কোন হক অধিকার নাই। যখন কোন ব্যক্তি ইসলামী আহকাম ঠিকভাবে পালন করিতে থাকে তখন উক্ত ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহকে আলোচনাধীনে আনয়ন করা ইসলামী সহিষ্ণুতা ও উদারতার পরিপন্থী হয়।

٣٥ حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

হাদীছ—৩৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)⋯আবূ সুফিয়ান (তালহা বিন নাফি) হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে এবং আবূ সালেহ (যাকওয়ানুস সাম্মান) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা উভয়ই বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি আদিষ্ট হইয়াছি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য। হাদীছের অবশিষ্টাংশ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে ইবন মুসাইয়্যাব (রহঃ) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

٣٦ حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ

হাদীছ—৩৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)⋯(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ)⋯উভয়ই সুফিয়ান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি⋯হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি আদিষ্ট হইয়াছি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য যতক্ষণ না তাহারা এই কথার স্বীকৃতি প্রদান করিবে যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। যদি তাহারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, এই কথা স্বীকার করিয়া নেয় তবে আমার হইতে তাহাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করিবে। কিন্তু শরীআত সম্মত কোন কারণ থাকিলে ভিন্ন কথা। আর তাহাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ তা'আলার নিকট ন্যস্ত। অতঃপর তিনি কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিলেনঃ

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ - لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ -

অর্থাৎ "নিশ্চয় আপনি উপদেশ দাতা, আপনি তাহাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নহেন।" (সূরা গাশিয়া—২১—২২)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীছের সহিত কুরআন মজীদের আয়াত তেলাওয়াত করিবার দ্বারা ইঙ্গিত বহন করে যে, বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শান ও দায়িত্ব হইল সত্যবাণী ও উপদেশাবলীর মাধ্যমে মানবজাতিকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া। কিন্তু কাফির মুশরিক বড়ই ফাসাদ সৃষ্টিকারী। হয়তঃ তাহারা সত্যের আহবানে সাড়া না দিয়া ষড়যন্ত্র বা যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারে। কাফিররা যুদ্ধে লিপ্ত হইলে তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে যতক্ষণ না তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম

গ্রহণ করিলে তাহাদের অভ্যন্তরীণ গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই যে, তাহারা কি বস্তুতই ঈমান গ্রহণ করিয়াছে কি না? অন্তরের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। ফলে তিনি হিসাব নিকাশ নিবেন। প্রকৃত ঈমান গ্রহণকারীকে পুরস্কার দিবেন আর বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণকারী বেদ্বীনকে শাস্তি দিবেন। (বিস্তারিত ৩৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

৩৭ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ -

হাদীছ—৩৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ গাস্‌সান আল মিসমায়ী[১] মালিক বিন আবদিল ওয়াহিদ (রহঃ)। তিনি⋯হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি আদিষ্ট হইয়াছি (কাফির ও মুশরিক) লোকদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যতক্ষণ না তাহারা এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার রসূল এবং নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে। অতঃপর যদি তাহারা এই সকল বিষয়ের স্বীকৃতিসহ পালন করে তাহা হইলে আমার হইতে তাহারা স্বীয় জানমালকে নিরাপত্তা লাভ করিল।[২] (ইসলাম গ্রহণের পর) তাহাদের হিসাব নিকাশ আল্লাহ তা'আলার সমীপে ন্যস্ত (কেননা তিনিই জানেন যে, তাহাদের ঈমান কি হাকীকী অথবা বাহ্যাড়ম্বর?)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আসসিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন একব্যক্তি ইমাম শাওকানী (রহঃ)কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, বনে জঙ্গলে বসবাসকারী যেই সকল লোকেরা কেবল মুখে কলেমা শাহাদাত পাঠ করে কিন্তু শরীআতের কোন আহকাম পালন করে না, তাহারা কি কাফির না মুসলিম? তাহাদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণের জিহাদ করা উচিত কি না? তিনি জবাবে বলিলেনঃ যে ব্যক্তি ইসলামের রুকন ও ফরযসমূহকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে এবং তাহার মধ্যে কেবল মুখে কলেমা শাহাদাত لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলা ব্যতীত অন্য কোন শরীআতের আহকাম বিদ্যমান না থাকে, তবে সে নিঃসন্দেহে কাফির। তাহার জানমাল নিরাপত্তা লাভ করিবে না। কেননা সহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, জানমাল তখনই নিরাপত্তা লাভ করিবে যখন সে ইসলামের আহকাম ও আরকান পালন করিবে। তিনি আরও বলেনঃ এই প্রকার কাফিরদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত মুসলিমগণের উপর ওয়াজিব যে, তাহাদিগকে ইসলামের আহকামসমূহ শিক্ষা দিবে এবং উহা পালন করিবার জন্য দাওয়াত দিবে। প্রথমে সহজ সরল ভাবে তাহাদের সামনে নামায, রোযা ইত্যাদি কর্মের ছাওয়াবের বর্ণনা করিবে এবং আহকামে শরীআত পালন না করিবার শাস্তি বর্ণনা করিবে এবং বুঝাইবে। যদি তাহারা মানিয়া লয় এবং ইসলামের রুকনসমূহ আদায় করিতে আরম্ভ করে তবে ভাল আর যাহারা মানিবে না

টীকা-১ اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ আবূ গাস্‌সান আল মিসমায়ী-এর নাম মালেক বিন আবদিল ওয়াহিদ। মিসমায়ী শব্দটি মিসমা' বিন রবীআ এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। غَسَّان শব্দটি منصرف ও غير منصرف উভয়ই হইতে পারে।

টীকা-২ সহীহ মুসলিম শরীফের কোন কোন নুসখায় وَاَمْوَالَهُمْ এর পর اِلَّا بِحَقِّهَا তবে শরীআত সম্মত কোন কারণ থাকিলে ভিন্ন কথা। এই শব্দ রহিয়াছে।

এবং অস্বীকার করিবে তাহাদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণের জিহাদ করা উচিত। (অন্যান্য বিস্তারিত ৩২, ৩৪ নং হাদীছদ্বয়ের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

৩৮ وحدثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ـ

হাদীছ—৩৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন সুওয়াইদ বিন সাঈদ এবং ইবন আবী ওমর (রহঃ)—আবূ মালিক স্বীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিঃ যে ব্যক্তি "একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই" এই কথা স্বীকার করে এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে, তাহার জানমাল নিরাপদ। আর (আন্তরিকভাবে ঈমান গ্রহণ করিয়াছে কিনা? এই বিষয়ের) হিসাব নিকাশ আল্লাহ তা'আলার নিকট ন্যস্ত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

হাদীছের মর্মার্থ হইতেছে যে, যদি তাহার কর্মজীবনটি প্রথম জীবন হইতে পার্থক্য হইয়া যায়। শিরক হইতে অসন্তুষ্ট হইয়া এবং বাতিল উপাস্যদের চৌকাঠ ত্যাগ করিয়া সুমহান একক আল্লাহ তা'আলার চৌকাঠে নতশির করে তবে ইহা ঐ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, সে দ্বীনে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। ফলে তাহার সহিত আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার সহিত মন্দ ব্যবহার বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের সহিত মন্দ ব্যবহারের সমপর্যায়ের।

৩৯ وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ح حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ ـ

হাদীছ—৩৯. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)—(সূত্র পরিবর্তন) ও যুহাইর বিন হারব (রহঃ)—আবূ মালিকের সূত্রে তাঁহার পিতা (তারিক (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি (হযরত তারিক (রাযিঃ)) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে একক বলিয়া স্বীকার করে অতঃপর তিনি উপরোল্লেখিত রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ الْإِسْلَامِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْعِ وَهُوَ الْغَرْغَرَةُ وَنَسْخِ جَوَازِ الْاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشِّرْكِ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَا يُنْقِذُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الْوَسَائِلِ -

অনুচ্ছেদঃ মৃত্যু যন্ত্রণা তথা গরগরা আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত ঈমান গ্রহণযোগ্য হইবার এবং মুশরিকদের জন্য ইসতিগফার করার বৈধতা রহিত হইবার দলীল। আর যে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে সে জাহান্নামী হইবার এবং সে কোন অবস্থাতেই জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ না পাইবার দলীল।

৪০ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ -

হাদীছ—৪০· (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া আত্-তুজীবী (রহঃ) তিনি·····হযরত সাঈদ (রহঃ) স্বীয় পিতা হযরত মুসাইয়্যাব[১] (রাযিঃ)–এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত মুসাইয়্যাব (রাযিঃ) বলিয়াছেন যে, যখন জনাব আবূ তালিবের[২] মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল[৩]

টীকা–১· سعيد بن المسيب হযরত মুসাইয়্যাব (রাযিঃ) হইতেছেন, মুসাইয়্যাব বিন আল হাযম বিন আমর বিন আবিদ বিন ইমরান বিন মাখযুম আল কবশী আল মাখযুমী। আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় তিনি মুসলমান ছিলেন না। সম্ভবতঃ আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যার সহিত ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর ইসলাম গ্রহণের পর আলোচ্য রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ (রহঃ) হইলেন বিশিষ্ট তাবঈ। তিনি ফকীহ ও ইমাম ছিলেন। ইবন মাদানী (রহঃ) বলেন, "আমি তাবঈগণের মধ্যে সাঈদ (রহঃ) অপেক্ষা বড় আলেম আর কাহাকেও পাই নাই।"

টীকা–২· আবূ তালিবের নাম আবদে মান্নাফ। উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবদুল মুত্তালিব স্বীয় বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে দশটি পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পিতা আবদুল্লাহ ও আবূ তালিব একই মায়ের গর্ভজাত ছিলেন। এই কারণেই মৃত্যুর সময় আবদুল মুত্তালিব প্রিয় পৌত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর প্রতিপালনের জন্য আবূ তালিবকে ওসীয়ত করিয়া গিয়াছিলেন। হাফেয ইবন হাজার (রহঃ) এই স্থানে

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট তশরীফ নিলেন। তিনি সে স্থানে উপস্থিত হইয়া আবূ জাহল (আমর বিন হিশাম) ও আবদুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যা বিন মুগীরাকে[১] আবূ তালিবের শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট পাইলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে চাচাজান! আপনি কেবল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" কালেমাখানি বলুন। আমি মহান করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নিকট ইহা (কলেমা) লইয়া আপনার (নাজাতের) জন্য সাক্ষ্য প্রদান করিব[২] (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ জাল্লাশানুহু-এর সমীপে আরয করিব যে আবূ তালিব একত্ববাদ মুমিন ছিলেন। তাই তিনি জাহান্নামের শাস্তি হইতে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য। তিনি তো সর্বশেষ সময়ে হইলেও কলেমা তাওহীদের স্বীকার করিয়াছেন।) অতঃপর আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যা বলিলঃ হে আবূ তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হইতে ফিরিয়া যাইবে? অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিরাশ না হইয়া) তাহার সামনে পুনঃ পুনঃ পবিত্র কালেমা তাওহীদ পেশ করিতে

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

'বিস্ময়কর গঠিত মিল' এর কথা লিখিয়াছেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারজন চাচা যাহারা ইসলামী যুগ পাইয়াছিলেন তাহাদের দুইজন যাহাদের নাম মুসলমানদের নামের বিপরীত ছিল তাহারা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন নাই যেমন আবূ তালিব অর্থাৎ আবদে মান্নাফ এবং আবূ লাহাব অর্থাৎ আবদুল উজ্জা। আর দুইজন চাচা যাহাদের নাম ইসলামী নাম ছিল তাহারা মুসলমান হইয়াছিলেন, যেমন হযরত হামযা (রাযিঃ) ও হযরত আব্বাস (রাযিঃ)।

(ফতহুল মুলহিম)

টীকা-৩. لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ الوفاة যখন আবূ তালিবের মৃত্যু উপস্থিত হইল অর্থাৎ তিনি মৃত্যু শয্যায় পতিত হইয়া মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে পৌঁছিয়াছিলেন এবং তাহার উপর মৃত্যুর বিভিন্ন আলামত প্রকাশ পাইতেছিল কিন্তু তখনও মৃত্যু যাতনা তথা গরগরা শুরু হয় নাই। ইবন ফারেস (রহঃ) বলেনঃ আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স শরীফ ৪৯ বৎসর ৮ মাস ১১ দিন ছিল। আবূ তালিবের ওফাতের তিন দিন পর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীনী পবিত্রা মহিলা, নবী সহধর্মীনী, সাহায্য, সান্ত্বনা ও পরামর্শদাত্রী, মুমিনগণের আম্মাজান হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা জান্নাতের পথে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই দুইজন জাগতিক সাহায্যকারীর মৃত্যুতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে অপূরণীয় আঘাত দিয়াছিল। যাহার কারণে তিনি সেই বৎসরকে 'আমুল খুযন' (অর্থাৎ চিন্তার বৎসর) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

অত্র পৃষ্ঠার টীকা

টীকা-১. আবদুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মীনী হযরত উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ভ্রাতা ছিলেন। আবদুল্লাহ (রাযিঃ) মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেই বৎসরই হুনাইনের জিহাদে শাহাদত বরণ করেন।

(ফতহুল মুলহিম)

টীকা-২. اشهد لك بها عند الله 'আমি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দরবারে ইহা লইয়া আপনার (পরিত্রাণের) জন্য সাক্ষ্য দিব।' সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতে রহিয়াছে اُحَاجُّ بِهَا عِنْدَ اللهِ 'আমি মহান করুণাময়ের দরবারে ইহা নিয়া আপনার (মুক্তির) জন্য বিতর্ক করিব।' ইমাম তাবরানী (রহঃ) হযরত সুফিয়ান বিন হুসাইন (রহঃ)-এর রিওয়ায়াত হযরত ইমাম যুহরী (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

اَىْ عَمِّ اِنَّكَ اَعْظَمُ النَّاسِ عَلَىَّ حَقًّا اَحْسَنُهُمْ عِنْدِىْ يَدًا فَقُلْ كَلِمَةً تَجِبُ بِهَا الشَّفَاعَةُ فِيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থাৎ "হে পিতৃব্য! নিশ্চয় আপনি আমার উপর হক প্রাপ্য হিসাবে শ্রেষ্ঠতম মানুষ। সাহায্যের হাত সম্প্রসারণের দিক দিয়া মানুষের মধ্যে আপনিই অগ্রগামী। (আমার প্রতি আপনার যে সাহায্য সহানুভূতি প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা যেন আমি পরিশোধ করিতে পারি সেই পথ উন্মুক্ত করিয়া যান) সুতরাং আপনি কেবল কালেমা তাওহীদ পাঠ করুন। তাহা হইলেই এই পঠিত কালেমার বদৌলতে আপনি মুমিন হিসাবে গণ্য হইবেন। ফলে কিয়ামত দিবসে আপনার পরিত্রাণের জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য অত্যাবশ্যক হইবে।"

থাকেন। আর (অপর দিকে) সে (আবূ জাহল) আবূ তালিবের সামনে পূর্বের কথাই বলিতে থাকে।[১] অবশেষে আবূ তালিব (এই দ্বিবিধ প্রস্তাবের উপর চিন্তা করিয়া) সর্বশেষ এই কথাটি বলিলেন যে, "তিনি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরই রহিয়াছেন।"[২] এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলিতে অস্বীকার করিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমি আপনার জন্য অবশ্যই ইসতিগফার (অর্থাৎ ক্ষমার জন্য দু'আ) করিতে থাকিব যতক্ষণ না আমাকে তাহা হইতে নিষেধ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ তা'আলানাযিল করিয়াছেন।৩

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ -

অর্থাৎ "আত্মীয় স্বজন হইলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুমিনগণের জন্য সংগত নহে যখন এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা জাহান্নামী।" (সূরা তাওবা- ১১৩)

এবং বিশেষভাবে আবূ তালিবের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া নাযিল করিয়াছেন। ৪

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ -

অর্থাৎ "(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনি যাহাকে ভালবাসেন, তাহাকে সৎ পথে আনিতে (অর্থাৎ তাওফীক দিতে) পারিবেন না, বরং আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে হেদায়েত (এর তাওফীক) দেন। আর তিনিই সেই সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত যে, কে সৎ পথে আসিবে।" (সূরা কিসাস-৫৬)

টীকা-১· ويعيد له تلك المقالة 'আর সে (আবূ জাহল) আবূ তালিবের সামনে পূর্বের কথা পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে।' (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতবার কালেমা পাঠের কথা বলিয়াছেন ততবার সে 'তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করিবে?' বলিতেছিল)। সহীহ মুসলিম শরীফের অন্য নুসখায় يُعِيْدَانِ শব্দটি দুই বচনে রহিয়াছে অর্থাৎ يعيدان له تلك المقالة তাহারা উভয় (আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যা) আবূ তালিবের সামনে পূর্বের কথাই পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে।

টীকা-২· هُوَ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ "তিনি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর রহিয়াছেন" অন্য রিওয়ায়াতে আছে هُوَ عَلٰى مِلَّةِ الاشياخ "তিনি পূর্ব পুরুষদের ধর্মের উপরই রহিয়াছেন।" উভয় বাক্যের মর্মার্থ এক। এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবূ তালিব ঈমান গ্রহণ না করিয়াই মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

টীকা-৩ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ অতঃপর মহামহিয়মান আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করিলেন। হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আবূ তালিবের মৃত্যুর সময়কার ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়। আল্লামা ইবন হাজার (রহঃ) আয়াতের শানে নুযূলে প্রশ্ন করিয়াছেন? প্রথমতঃ সর্বসম্মত মতে আবূ তালিবের মৃত্যু হিজরতের পূর্বে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ইহা প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওমরা করিবার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করিয়াছিলেন তখন স্বীয় আম্মাজান আমীনার কবরের নিকট গিয়া তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা সমীপে অনুমতি চাহিয়াছিলেন। সেই সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। যেমন হাদীছ শরীফে এইরূপ শব্দ বর্ণিত হইয়াছেঃ

عن ابن مسعودؓ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس الى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه فقال ان القبر الذى جلست عنده قبر امى وانى استاذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن لى فانزل على ما كان للنبى الخ -

অর্থাৎ "হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া কবরস্থানে গমন করিলেন, আমরাও তাঁহার অনুসরণে সে স্থানে গেলাম। অতঃপর তিনি

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

জনাব আবূ তালিব স্বীয় পিতা আবদুল মুত্তালিবের ওসীয়তকে যথাযথ পূরণ করিয়াছিলেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। এমনকি তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য আপন ঔরসজাত সন্তানদেরকে পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর প্রতিপালনের মহান দায়িত্ব এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর রেসালত প্রাপ্তির পর সর্বশক্তি নিয়োগে তাঁহার সাহায্য সহানুভূতি করিয়াছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী ও রেসালত প্রাপ্তির পর বনূ হাশিম গোত্রের কিছু লোক ব্যতীত আরবের সকল মানুষ যখন বিরোধীতার সারিতে একত্রিত হইয়াছিল তখনও আবূ তালিব সাইয়্যেদুল মুরসালীনের পার্শ্বে ঢালরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। ফলে তাহার জীবদ্দশায় আরবের লোকেরা চরম বিরোধীতা সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তেমন কিছু বলিতে ও করিতে সাহস পায় নাই। কারণ আবূ তালিব কুরাইশদের স্বনামধন্য নেতা ছিলেন। নেতার প্রতিপত্তির দরুন নবীজীর প্রতি অত্যাচারের হাত সম্প্রসারিত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিলনা। আবূ তালিব স্বীয় ধর্মে অটল ছিলেন। মূর্তি পূজা করিতেন। ভিন্ন ধর্মে থাকিয়াও তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর যে সাহায্য সহানুভূতি করিয়াছেন উহার নযীর বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাহায্য করিবার কারণে তিনিও সমগ্র আরববাসীদের শত্রুতে পরিণত হইয়াছিলেন।

কুরাইশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ লক্ষ্য করিল যে, নানাবিধ বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। হযরত হামযা (রাযিঃ) ও হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর ন্যায় বীর পুরুষও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল দিক প্রত্যক্ষ করিয়া আরবের সকল দল একতাবদ্ধ হইয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করিবার জন্য তাহাদের হস্তে অর্পণ না করা পর্যন্ত বনূ হাশিমকে শহর হইতে বহিষ্কার করিবার চুক্তি করে। তাই অপারগ হইয়া আবূ তালিব স্বীয় বনু হাশিম গোত্রের সকল লোকদিগকে লইয়া পাহাড়ের একটি উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিহাসে উহাই 'শিয়াবে আবী তালেব' নামে খ্যাত। তাহারা সেই স্থানে সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাল অবরোধ অবস্থায় অসহনীয় কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতঃপর মক্কা শরীফে ফিরিয়া আসিলেন। অবরুদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র কয়েকদিন শান্তিতে বসবাস করিতে না করিতেই আবূ তালিব কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন।

যিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, শত্রুতে পরিণত হইয়াছেন, বন্দী হইয়াছেন, উপবাস সহ্য করিয়াছেন, শহর পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতকিছু করিয়াও কি তিনি মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবেন? তিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রতিদান কি পাইবার যোগ্য হইবেন না? এই নানাবিধ চিন্তা করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আশা আকাংক্ষা ও আবেগপূর্ণ অন্তরে শেষবারের মত

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

কবরস্থানের বিশেষ একটি কবরের পার্শ্বে বসিয়া দীর্ঘ সময় মুনাজাতে মগ্ন রহিলেন। অতঃপর তিনি কাঁদিলেন, তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া আমরাও ক্রন্দন করিলাম। তারপর তিনি বলিলেনঃ আমি যে কবরের পার্শ্বে বসিয়াছিলাম উহা আমার আম্মাজানের কবর। আমি আমার প্রতিপালকের সমীপে তাঁহার জন্য দু'আ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমাকে অনুমতি প্রদান করা হয় নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, আয়াত আবূ তালিবের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে নাযিল হইয়াছে। উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ আয়াত পরে নাযিল হইয়াছে এবং উহা নাযিলের কারণ পূর্বেই হইয়াছে। আর ইহাও বলা সম্ভব যে, এই আয়াতের শানে নুযুল দুইটি। প্রথমতঃ আবূ তালিব সম্পর্কে। দ্বিতীয়তঃ জনাবা আমীনা সম্পর্কে। সুতরাং একটি আয়াত নাযিলের বিভিন্ন কারণ হইতে পারে।

টীকা- ৪ إِنَّكَ لَا تَهْدِي এই আয়াত মুফাসসীরগণের সর্বসম্মত মতে আবূ তালিব সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) বলেনঃ বিভিন্ন হাদীছ ও এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। (ফতহুল মুলহিম)

কালেমার দাওয়াত নিয়া চাচাজান আবূ তালিবের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। ইহার বিবরণই আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

মৃত্যু যাতনা শুরু হইলে তাওবা ও ঈমান মকবুল নহে

মৃত্যু যাতনার গরগরা আরম্ভ হইলে তাওবা ও ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। এই অবস্থায় ঈমান গ্রহণে কোন উপকারে আসে না। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ ـ

অর্থাৎ "আর তাওবা তাহাদের জন্য নহে যাহারা আজীবন মন্দ কর্ম করে এমনকি যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে তখন বলিতে লাগিল আমি এখন তাওবা করিতেছি।" (সূরা নিসা–১৮)

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছেঃ

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ـ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ـ

অর্থাৎ "অতঃপর যখন তাহারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন বলিল, আমরা একক আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং যাহাদেরকে শরীক করিতাম তাহাদের পরিত্যাগ করিলাম। কাজেই তাহাদের এই সময়কার ঈমান তাহাদের কোন উপকারে আসিল না, যখন তাহারা আযাব প্রত্যক্ষ করিল।"

আযাব সম্মুখে আসিবার পর ঈমান গ্রহণ আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণীয় ও ধর্তব্য নহে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবা তখন পর্যন্ত কবুল করেন যতক্ষণ না তাহার উপর মৃত্যু যাতনার গরগরা আরম্ভ হয়।"

অন্য হাদীছে আসিয়াছেঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেনঃ মুমিন বান্দা যদি মৃত্যুর একমাস অথবা একদিন অথবা এক মুহূর্ত পূর্বেও গুনাহ হইতে তাওবা করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার তাওবা কবুল করিবেন। যদি আন্তরিকতার সহিত খাঁটি তাওবা করা হয়। (ইবন কাছীর)

বস্তুতঃ বান্দা ইচ্ছাধীন ঈমানে আদিষ্ট। মৃত্যু যাতনার গরগরার সময় ইচ্ছাধীন শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। গরগরা সময়ের ঈমান নিরূপায় অবস্থায় ঈমান তাই ধর্তব্য নহে। অধিকন্তু ঈমানের সম্পর্ক গায়িব তথা অদৃশ্যের সহিত। মৃত্যু যাতনার গরগরার অবস্থায় গায়িবের পর্দা উঠাইয়া নেওয়া হয়। সে পরজগতের দৃশ্যাবলী ও আযাবের ফেরেশতাগণকে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। এই কারণেই মৃত্যু কষ্ট শুরু হইলে তাওবার দরজা বন্ধ হইয়া যায়। অনুরূপ আসমানী আযাব সামনে আসিয়া যাইবার পর বান্দার তাওবা ও ঈমান কবুল হয় না।

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচাজান আবূ তালিবের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কালেমা তাওহীদ পাঠের কথা বলিতেছিলেন। অপর দিকে আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যা বিপরীত কথা বলিতেছিল। অর্থাৎ 'তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করিবে?' এই বিপরীত ধর্মী দুইটি প্রস্তাবে তিনি চিন্তা ভাবনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তিনি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মে বহাল রহিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কালেমার দাওয়াতের সময় তাহার ইচ্ছা শক্তি

বিদ্যমান ছিল এবং তখনও মৃত্যু যাতনার গরগরা শুরু হয় নাই। যদি গরগরা তথা জান কান্দান আরম্ভ হইত তবে ইচ্ছাধীনে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালিবকে ঈমান গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া মৃত্যু যাতনার গরগরা আরম্ভ হইবার পূর্ব মুহূর্তে ছিল।

হাফেয ইবন হাজার (রহঃ) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, আবূ তালিবের ঈমান গ্রহণের সময় প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আশা ছিল যে, সেই অবস্থায়ও যদি তিনি কালেমা তাওহীদের স্বীকার করেন তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষত্বের প্রভাবে তিনি লাভবান হইবেন এবং করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাহাকে পরিত্রাণ দিবেন। হাদীছ শরীফের শব্দ - اجادل لك। 'আমি আপনার ব্যাপারে বিতর্ক করিব' এবং اشفع لك।'আমি আপনার মুক্তির জন্য সুপারিশ করিব।' দ্বারা এই ব্যাখ্যার যথার্থতার প্রতিও ইঙ্গিত বহন ক'রে।

আবূ তালিব মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন

আলোচ্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা আবূ তালিবকে কলেমা পাঠের দাওয়াত দিলে তিনি সর্বশেষ যেই কথা বলিয়াছেন অর্থাৎ 'তিনি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মে বহাল রহিয়াছেন' এবং কালেমা তাওহীদ পাঠ করিতে অস্বীকার করিলেন। উহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঈমান গ্রহণ না করিয়া মুশরিক অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। অধিকন্তু হাদীছের শেষাংশে সংযোজিত কুরআন মজীদের আয়াতে - إنك لا تهدي। হে রসূল! নিশ্চয় আপনি যাহাকে ভালবাসেন ইচ্ছা করিলেই তাহাকে হেদায়েতের তাওফীক তথা গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দিতে পারিবেন না। এই আয়াত মুফাসসিরগণের সর্বসম্মত মতে আবূ তালিব সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কাজেই এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি মুমিন মুসলমান না হইয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

সহীহ বুখারী শরীফের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছেঃ

ان العباس رضى الله عنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم ما اغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك و يغضب لك قال هو فى ضحضاح من النار ولولا انا لكان فى الدرك الاسفل من النار ـ

অর্থাৎ "হযরত আব্বাস (রাযিঃ) একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে রসূলুল্লাহ! আপনার চাচা আবূ তালিব আপনার দ্বারা কি উপকার লাভ করিয়াছে? আল্লাহ তা'আলার কসম! তিনি তো পৃথিবীতে আপনাকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতেন এবং আপনার শত্রুদের সহিত সর্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তাহার পায়ের টাখনুদ্বয় কেবল দোযখের আগুনে জ্বলিবে, কিন্তু মস্তক পর্যন্ত ইহার প্রতিক্রিয়া হইবে। যদি আমি না হইতাম তবে তিনি গভীর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইতেন।"

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইবন ইসহাক কর্তৃক (আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণের স্বপক্ষে) গৃহীত হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত খানা যঈফ। উক্ত রিওয়ায়াতটি এইঃ

ان ابا طالب لما تقارب منه الموت بعد ان عرض عليه النبى صلى الله عليه وسلم ان يقول لا اله الا الله فابى قال فنظر العباس اليه وهو يحرك شفتيه فاصغى اليه فقال يا ابن اخى والله لقد قال اخى الكلمة التى امرته ان يقولها ـ

অর্থাৎ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালিবের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাহার সামনে কালেমা তাওহীদের দাওয়াত পেশ করিলে আবূ তালিব কালেমা لا اله الا الله বলিতে অস্বীকার করিবার পর মূহূর্তেই যখন তাহার মৃত্যুর সময় হইল তখন আব্বাস (তিনি ঘটনার সময় ইসলাম গ্রহণ করেন নাই) আবূ তালিবের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, তাহার ঠোটদ্বয় নড়িতেছে। হযরত আব্বাস (রাযিঃ) তাহার ঠোটদ্বয়ের নিকট কান লাগাইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেনঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আল্লাহর কসম! তুমি আমার ভাই আবূ তালিবকে যেই কালেমা পাঠ করিতে বলিয়াছিলে তিনি তাহাই পাঠকরিতেছেন।"

ইবন ইসহাক বর্ণিত হাদীছের মধ্যে রাবীর উল্লেখ নাই। তাই উহা মুনকাতি। অধিকন্তু ইবন ইসহাকও উচ্চ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। এই সকল দিকে লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তাহার বর্ণিত হাদীছখানা সহীহ নহে।

হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) বলেনঃ ইবন ইসহাক বর্ণিত এই হাদীছ যদি সহীহ সূত্রে বর্ণিত বলিয়া প্রমাণিতও হয়, তাহা হইলেও অসংখ্য সহীহ হাদীছ ইহার বিপরীত বিধায় ইহাকে সহীহ বলা যায় না। (ফতহুল মুলহিম)

বলাবাহুল্য ইবন ইসহাকের বর্ণিত হাদীছ সহীহ হইলেও আবূ তালিব ঈমান গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বলা যায় না। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কালেমা পাঠের জন্য বলিলে তিনি কালেমা পাঠ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং আবদুল মুত্তালিবের ধর্মে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পরবর্তী সময়ে হয়তঃ তাহার উপর মৃত্যু যাতনার গরগরা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। যদি গরগরা আরম্ভ না হইত তবে আব্বাস তাহার ঠোটদ্বয় নাড়াইতে দেখিয়া কান লাগাইয়া শুনিতে হইত না। পূর্বের ন্যায় স্পষ্টভাবেই বলিতে সক্ষম হইতেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত্যু যাতনার গরগরার সময় কালেমা পাঠ করিয়াছিলেন। গরগরার সময় ঈমান গ্রহণ আল্লাহ তা'আলার নিকট মকবুল নহে। ফলে তিনি মুশরিক অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

মানিবার নাম ঈমান জানিবার নাম নহে

অন্তর যদি নিজের ইচ্ছাধীনে প্রভুভক্তের অঙ্গিকারের জন্য প্রস্তুত না হয় তবে তাহার জবরদস্তী বিশ্বাস কাজে আসে না। উহার প্রমাণ আবূ তালিবের ঘটনা। আবূ তালিব যে দ্বীনে ইসলামকে সত্য বলিয়া জানিতেন উহাতে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবার কথা নহে। তাহার জান ও মাল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সফলতার জন্য সর্বদা উদ্যমশীল ছিল। দ্বীনে শরীআতের স্বীকারোক্তিও তাহার কথাবার্তা, চালচলন ও গতিবিধি ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ পাইত। বহু ঘটনা উহার প্রমাণ বহন করে। উল্লেখ্য যে, একদা তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিতে গেলে তিনি বলিলেনঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! যেই আল্লাহ তোমাকে রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার নিকট আমার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা কর। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা করিবার পর তিনি রোগমুক্ত হইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তোমার কথা শুনেন। তিনি জবাবে বলিলেন, জী হ্যাঁ। যদি আপনিও আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করেন তবে তিনি আপনার প্রার্থনাও গ্রহণ করিবেন। (ইছাবা ফী আহওয়ালিছ সাহাবা যিকরে আবূ তালিব)

আবূ তালিবের পুত্র হযরত আলী (রাযিঃ) বাল্যকালেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বালকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। আবূ তালিব যখন জানিতে পারিলেন যে, স্বীয় পুত্র আলী মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন তখন তিনি আলীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যই কি তুমি মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ? আলী উত্তরে বলিলেনঃ জী হ্যাঁ। ইহা শ্রবণ করিবার পর তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট গমন করিয়া বলিলেন বলত, তোমার এই নূতন ধর্মের মর্ম কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ

ইহা আল্লাহ তা'আলার ধর্ম। যে ধর্ম আমাদের পূর্ব পুরুষ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম পালন করিতেন, ইহা সেই ধর্ম। একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করাই এই ধর্মের মূল কথা। ইহাই ইসলাম। আমি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রসূল। চাচাজান! আমার বিনীত আরয, আপনিও শিরক তথা মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়া এই সত্য ধর্ম গ্রহণ করুন। আবূ তালিব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাণ হইতে ভাল বাসিতেন। ফলে তিনি এই কথা শ্রবণ করিয়া অসন্তুষ্ট না হইয়া কোমল সুরে বলিলেনঃ মুহাম্মদ! আমি জানি, তুমি সত্যবাদী। কিন্তু কি করিয়া পৈতৃব্য ধর্ম ত্যাগ করি বল? আমি তাহা পারি না। তবে শত্রুদের যুলুম অত্যাচার ও দাগাবাজি হইতে তোমাকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করিব। অতঃপর তিনি স্বীয় পুত্র আলী (রাযিঃ)কে ডাকিয়া বলিলেনঃ তুমি আমার সঙ্গে আস। হযরত আলী (রাযিঃ) অত্যন্ত বিচলিত হইলেন যে, আব্বা কি নির্দেশ দেয় বলা যায় না। অতঃপর হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেনঃ আব্বাজান! বেয়াদবী ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখিবেন, আল্লাহ ও রসূলের সেবায় এই জীবন সমর্পণ করিয়াছি এখন আর ফিরিতে পারি না। আপনাকে ছাড়িতে পারি, কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়িতে পারিব না। আবূ তালিব স্বীয় ছেলের কথা শুনিয়া কোন প্রকার রাগ হইলেন না, বরং মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, বেশ, তোমার যদি ইচ্ছা না হয় আসিও না। আমি জানি, মুহাম্মদ তোমাকে কখনও বিপথে পরিচালিত করিবে না।" এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রকাশ্যভাবে মানুষকে ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানাইতে শুরু করিলেন এবং মূর্তিপূজার নিন্দাবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন কুরাইশদের কতিপয় নেতা আবূ তালিবের নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিল যে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেবদেবীর অপমান করে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বলে এবং আমাদিগকে নির্বোধ বলিয়া প্রচার করে। এই সকল বিষয় আর সহ্য করা যায় না। কাজেই এখন হইতে তুমি তাহাকে সাহায্য করা হইতে বিরত থাক অথবা তুমিও কার্যক্ষেত্রে আগমন কর, যাহাতে আমাদের মধ্যে একটি মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে। আবূ তালিব দেখিলেন কুরাইশরা এখন বিরোধীতার চরমে পৌঁছিয়া গিয়াছে আর আমি একা সমস্ত কুরাইশদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কি টিকিয়া থাকিতে পারিব? নবীজীকে ডাকিয়া বলিলেনঃ প্রিয় বৎস! আমার উপর এমন কঠিন দায়িত্ব চাপাইয়া দিও না যাহা আমি বহন করিতে পারিব না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকাশ্য আশ্রয়দাতা ও রক্ষাকর্তা আবূ তালিব ভিন্ন আর কেহই পৃথিবীতে ছিল না। তিনি যখন এই কথা বলিতেছেন তখন অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে ও অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলেনঃ "চাচাজান! আল্লাহ তা'আলার শপথ; যদি তাহারা আমার এক হস্তে চন্দ্র এবং অপর হস্তে সূর্য আনিয়া দেয় তথাপি আমি আমার কর্তব্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইব না। আল্লাহ তা'আলা হয়ত এই কর্তব্য সমাধা করিবেন অথবা আমি স্বীয় প্রাণ ইহার জন্য বিসর্জন দিব।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই কথা শ্রবণের পর আবূ তালিব-এর অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল। তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেনঃ যাও, তোমার কর্তব্য পালন কর। আমি জীবিত থাকিতে কেহই তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। (সীরাতে ইবন হিশাম)

এই সকল ঘটনার বিবেচনা করিলে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, পয়গাম্বর জীবনের সফলতার জন্য তাহার দান কিরূপ ছিল? তাহা হইলে তিনি কোন্ কথা অস্বীকার করিতেছেন? কেবল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনকে অবলম্বন করার এবং তাঁহার আনুগত্য করার। আর এই আমলটি বর্তমান না থাকিবার কারণে জমহুরে উম্মত তাহাকে মুসলমান গণ্য করেন নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান কেবল জানিবার নহে বরং আন্তরিক অটল বিশ্বাস রাখিয়া আমল করিবার নাম। ঈমান মানুষের অন্তরের ইচ্ছাধীন আনুগত্যের নাম। আর ইসলামী আহকামের পাবন্দী তথা নিয়মানুবর্তীতা উক্ত আন্তরিক আনুগত্যের প্রমাণ হইয়া থাকে। অন্তর এবং মুখ দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা রঞ্জিত হইলে এবং আহকামে শরীআত নিয়মানুবর্তীতার সহিত পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেই শরীআতে বিশ্বাসী বলিয়া অভিহিত করে। যে সকল ব্যক্তি ইলম তথা জানাকে ঈমান বুঝিয়াছে তাহাদের নিকট ঐ ইলমই মর্ম যাহাতে ইচ্ছাধীন আনুগত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আবূ তালিবের মধ্যে ইসলাম সত্য হওয়ার বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল এবং দ্বীনে শরীআতের পূর্ণ পরিচিতিও তাহার সহজলভ্য ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম–এর জন্য গভীর ত্যাগও স্বীকার করিয়াছেন। সকল কিছু থাকা সত্ত্বেও দ্বীন মানিয়া আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। তাই তিনি মুসলমান হিসাবে গণ্য হইতে পারেন নাই।

কতক আহলে যাহের ধারণা পোষণ করে যে, আবূ তালিব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর জন্য যে স্নেহ, ভালবাসা ও আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন উহা বৃথা যাইতে পারে না। তাই তাহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আবূ তালিব মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের আবেগপূর্ণ মত্ততা সম্মানযোগ্য। কিন্তু কি করা যাইবে? যাহার সম্মান করিবার কারণে এই সম্মান খোদ তাঁহার পক্ষ হইতে উহার সত্যায়ন পাওয়া যায় না। অতএব আবেগ হইতে সরিয়া দায়িত্বের চাহিদায় অন্য কিছু রহিয়াছে। কিন্তু স্থান অত্যন্ত নাজুক। তাই চুপ থাকাই শ্রেয়।

বলাবাহুল্য মহান রব্বুল ইজ্জাতের উচ্চ দরবারে কে শত্রুতা করিল আর কে আত্মত্যাগ স্বীকার করিল এতদুভয় হইতে সম্পূর্ণ বেপরোয়া। হযরত ওমর ফারুকের তলোয়ার মন্দ উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিল। শানে ইলাহী তাঁহার জন্য চিরস্থায়ী পূণ্যবানের দরজা খুলিয়া দেয়। এই দিকে আবূ তালিবের আত্মত্যাগ দীর্ঘ সময় পূণ্যের দরজায় খটখটাইতে ছিল। কিন্তু শানে ইলাহী উহার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই।

আনসারগণের সহিত মহব্বত যদি এই মর্যাদায় হয় যে, তাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাহায্য করিয়াছেন তবে উহা ঈমানের আলামত। আর এই মর্যাদায় তাহাদের সহিত শত্রুতা রাখা মুনাফিকের আলামত। কিন্তু এই মর্যাদার দৃষ্টিতে না হইলে উহা ঈমানের আলামতও নহে এবং মুনাফিকের আলামতও নহে। الحب فى الله والبغض فى الله - "আল্লাহ তা'আলার জন্য মহব্বত এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য শত্রুতা" ইহার চাহিদাই হইতেছে সকলের উর্ধে এবং সকল মূলতত্ত্ব এই মূলতত্ত্ব হইতে নিসৃত। ফলে এখানে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না যে, আবূ তালিবের ত্যাগ স্বীকার কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর জন্য ছিল অথবা একজন চাচার স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য ছিল। (তফহীমুল মুসলিম)

তবে ইহা যথার্থ যে, ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মধ্যে পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার রসূলের জন্য ত্যাগ স্বীকার হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

হিদায়েতের তাওফীক আল্লাহ তা'আলার নিকট সংরক্ষিত

আলোচ্য হাদীছের সর্বশেষ সংযোজিত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহঃ) লিখিয়াছেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পিতৃব্য জনাব আবূ তালিব যাহাতে ঈমান গ্রহণ করেন সেই জন্য অনেক চেষ্টাই করিয়াছেন। সর্বশেষ মৃত্যুশয্যায় তাহার সামনে কালেমা পাঠের দাওয়াত দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কালেমা পাঠে অসম্মতি জানাইলে انك لا تهدى। আয়াত নাযিল হয়। আয়াতের মর্মার্থ হইতেছেঃ হে রসূল! যাহার সহিত আপনার মানবসুলভ স্বভাবগত মহব্বত রহিয়াছে অথবা আন্তরিক আকাংক্ষা পোষণ করেন যে, উক্ত ব্যক্তি হিদায়েত প্রাপ্ত হউক, উহা অত্যাবশ্যক নহে, অনুরূপ হইয়া যাইবে বরং আপনার দায়িত্ব কেবল হিদায়েত তথা সৎপথ প্রদর্শন করা। অতঃপর কে হিদায়েতের পথে চলিয়া গন্তব্যস্থলে পৌছিবে আর কে পৌছিবে না ইহা আপনার ইচ্ছাধীনের বহির্ভূত। হিদায়েতের তাওফীক প্রদান অর্থাৎ গন্তব্যস্থানে পৌছাইয়া দেওয়া আল্লাহ তা'আলার কুদরতি হস্তে সংরক্ষিত। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে হক গ্রহণ ও গন্তব্যস্থলে পৌছিবার তাওফীক প্রদান করেন। আল্লামা শাব্বীর আহমদ (রহঃ) বলেনঃ শাহ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইহার অতিরিক্ত এই বিষয়ে কথা বলা এবং আবূ তালিবের ঈমান ও কুফরকে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ পূর্বক বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। বিবাদপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা না করাই উত্তম (ফাওয়িদে ওছমানী)। তফসীরে রুহুল মা'আনী গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেনঃ আবূ তালিবের ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে আলোচনা, তর্ক বিতর্ক ও তাহাকে মন্দ বলা হইতে বিরত থাকা উচিত। কারণ ইহাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মনোকষ্টের সম্ভাবনা রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

٤١ وحدثنا اسحق بن ابراهيم وعبد بن حميد قالا اخبرنا عبد الرزاق قال انا معمر ح و حدثنا حسن الحلوانى وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنى ابى عن صالح كلاهما عن الزهرى بهذا الاسناد مثله غير ان حديث صالح انتهى عند قوله فانزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الايتين وقال فى حديثه ويعودان فى تلك المقالة وفى حديث معمر الكلمة فلم يزالا به -

হাদীছ—৪১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইসহাক বিন ইব্রাহীম ও আবদ হুমায়দ (রহঃ)---মা'মার (রহঃ) (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হাসান আল হুলওয়ানী (রহঃ) তিনি---সালিহ[১] হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা উভয় (মা'মার ও সালিহ (রহঃ)) হযরত যুহরী (রহঃ) হইতে এই সূত্রেই অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সালিহের বর্ণিত হাদীছ শরীফে فانزل الله فيه "অর্থাৎ অতঃপর এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন।" এই বাক্যেই সমাপ্ত করা হইয়াছে এবং তিনি (পূর্বের হাদীছে উল্লেখিত) দুইখানা আয়াত উল্লেখ করেন নাই। আর তাহার বর্ণিত হাদীছের মধ্য (المقالة। يعود له بتلك এর স্থলে) উল্লেখ করিয়াছেন يعودان بتلك المقالة "তাহারা উভয়ই উক্ত বক্তব্যটি পুনরাবৃত্তি করে।" আর মা'মার বর্ণিত হাদীছের মধ্যে المقالة। এর স্থলে الكلمة فلم يزالا به। "তাহারা উভয়ই আবূ তালিবের সামনে এই কথাটির পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে" বাক্যটি উল্লেখ রহিয়াছে।

٤٢ حدثنا محمد بن عباد وابن ابى عمر قالا حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن ابى حازم عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيمة فابى فانزل الله انك لا تهدى من احببت الاية

হাদীছ—৪২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ ও ইবন আবী ওমর (রহঃ) হইতে। তাহারা উভয়ই---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচার (আবূ তালিবের) মৃত্যুর (নিকটবর্তী) সময়ে তাহাকে বলিয়াছিলেন। (হে চাচাজান!) আপনি বলুন, لا اله الا الله "একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই।" কিয়ামত দিবসে আমি ইহা দ্বারা আপনার (মুক্তির) জন্য সাক্ষ্য দিব। কিন্তু তিনি (কালেমা শরীফ পাঠ করিতে) অস্বীকার করিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ...... إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ "(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনি যাহাকে ভালবাসেন; ইচ্ছা করিলেই আপনি তাহাকে হিদায়েত (এর তাওফীক তথা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া) দিতে পারিবেন না।" (সম্পূর্ণ আয়াত শরীফ) অবতীর্ণ করেন।

টীকা-১ صالح সালিহ হইলেন সালিহ বিন কীসান। তিনি যদিও ইমাম যুহরী হইতে বয়সে বড় ছিলেন কিন্তু ইমাম যুহরী তাহার প্রাথমিক উস্তাদ। সালিহ (রহঃ) ৯০ বৎসর বয়সে ১৪০ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। এই হাদীছে বয়োজ্যেষ্ঠ রাবী বয়োকনিষ্ঠ রাবী হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

٤٣ حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال نا يحيى بن سعيد قال نا يزيد بن كيسان قال نا ابو حازم الاشجعي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيمة قال قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك فانزل الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ـ

হাদীছ—৪৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহঃ)। তিনি—হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা (আবূ তালিব)কে বলিলেন, আপনি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলুন। কিয়ামত দিবসে আমি আপনার পক্ষে ইহার (অর্থাৎ কালেমা তাওহীদ পাঠ করিয়া মুমিন হইয়াছেন বলিয়া) সাক্ষ্য দিব। আবূ তালিব বলিলেনঃ কুরাইশরা যদি আমাকে এই কথা বলিয়া কলঙ্কিত করিবার আশংকা না থাকিত যে, "আবূ তালিব মৃত্যুর ভয়ে[১] মুসলমান হইয়া গিয়াছে" তবে আমি কালিমা তাওহীদ পাঠ করিয়া তোমার চক্ষুদ্বয় শীতল করিয়া দিতাম। (অর্থাৎ আমি কালিমা তাওহীদ স্বীকার করিয়া মুসলমান হইয়া তোমার বাসনা পূর্ণ করিয়া তোমাকে আনন্দিত ও প্রফুল্ল করিতাম। কিন্তু কুরাইশ লোকদের হইতে আমি লজ্জাবোধ করি, তাহারা বলিবে; আবূ তালিব এমন ভীত দুর্বলমনা ও অপরিপক্ক ছিল যে, সে মৃত্যুর ভয়ে স্বীয় পিতৃ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে।) এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ـ

অর্থাৎ "(হে রসূল!) আপনি যাহাকে ভালবাসেন, ইচ্ছা করিলেই তাহাকে হিদায়েত (এর তাওফীক তথা গন্তব্যস্থলে পৌছাইয়া) দিতে পারিবেন না। তবে আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে হিদায়েত (এর তাওফীক) দান করেন।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

জনাব আবূ তালিব জাগতিক ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তিনি স্বীয় পূর্বপুরুষদের ধর্মে থাকিয়াও সারা জীবন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর প্রতি যেরূপ স্নেহ—মমতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, আপদে—বিপদে সাহায্য করিয়াছেন, অবিশ্বাসী শত্রুদের অন্যায় আচরণকে যেভাবে বাধা দিয়াছেন, উহাতে তাহার চরিত্রবল, উদারতা ও সহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটিয়াছে। অপর দিকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর নিষ্কলঙ্ক মহান চরিত্র এবং উদ্দেশ্যের সততাও ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কপট হইতেন, মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা যদি তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতেন, তাঁহার সততা, সাধুতা ও সত্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আবূ তালিব স্বীয় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকিতে পারিতেন না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পিতৃব্য আবূ তালিবের তত্ত্বাবধানে ৪২ বৎসর ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে আবূ তালিব নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যবাদী হইবার এবং তাঁহার আনিত ধর্ম চিরন্তন সত্য হইবার বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিলনা।

বলাবাহুল্য আবূ তালিব ছিলেন একজন অদ্ভুত চরিত্রের অধিকারী। প্রকাশ্যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই

টীকা-১. الجزع। শব্দটি " ج " এবং " ز "এর সহিত পঠিত। উহার অর্থ মৃত্যুর ভয়। আর কেহ কেহ বলেনঃ সঠিক হইল الخرع। অর্থাৎ " خ " এবং " ر "এর সহিত পঠিত। উহার অর্থ দুর্বলতা এবং অকস্মাৎ ভয় ভীতি। (ফতহুল মুলহিম)

অথচ ইসলামের প্রতি কোন দিন অশ্রদ্ধাও প্রকাশ করেন নাই। অন্তর চায় সত্যকে গ্রহণ করিতে কিন্তু সমাজভীতি ও বদ্ধমূল কুসংস্কার আসিয়া বাধা হইয়া দাঁড়ায়। সত্যকে স্বীকার করিবার মত নির্ভীকতা ও সৎ সাহসের অভাবই হইতেছে আবূ তালিবের চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা। না হয় তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাহার অন্তর ছিল বলিষ্ঠ ও উদার। এই বিষয়টিই আলোচ্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত তাহার বক্তব্য হইতে প্রমাণিত হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট কালিমা পাঠের দাওয়াত দিলে তিনি বলিলেনঃ কুরাইশ লোকদের এই কথা বলিয়া সমালোচনা করিবার যদি ভয় না থাকিত যে, আবূ তালিব মৃত্যুর ভয়ে পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে তবে তিনি কালেমা তাওহীদের স্বীকার করিয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর বাসনা পূরণ করিয়া দিতেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর অতীব বাসনা থাকা সত্ত্বেও স্বীয় পিতৃব্য ঈমান গ্রহণ না করায় তাঁহার হৃদয়ে স্বভাবতই ব্যথা পাওয়ার কথা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলের হৃদয়ের ব্যথা দূরীভূত করিবার লক্ষ্যে ও সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আয়াত অবতীর্ণ করিলেনঃ "(হে রসূল!) আপনি যাহাকে ভালবাসেন, তাহাকে হিদায়েত (এর তাওফীক) প্রদান করিতে পারিবেন না। তবে আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে হিদায়েত (এর তাওফীক তথা গন্তব্যস্থলে পৌছাইয়া) দেন।

হিদায়েত–এর অর্থ ও উহার স্তরভেদে স্থানোপযোগী অর্থ গৃহীত হইবে

আলোচ্য হাদীছের সর্বশেষে সংযোজিত আয়াতে মহান রব্বুল আলামীন স্বীয় রসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া এরশাদ করিয়াছেনঃ "আপনি যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে হিদায়েত প্রদান করিতে পারিবেন না।" উল্লেখ্য নবী ও রসূলকে প্রেরণের উদ্দেশ্যই হইতেছে মানুষকে হিদায়েত করা। এই বিষয়টি অনুধাবনের জন্য হিদায়েতের অর্থ ও উহার স্তরসমূহ আলোচনা প্রয়োজন। কারণ হিদায়েতের অর্থ ও উহার স্তরভেদে স্থান হিসাবে অর্থ গৃহীত হইবে।

হিদায়েতের অর্থঃ "হিদায়েত" শব্দটি আরবী শব্দ। উহা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (ক) কেবল পথ দেখানো। ইহার জন্য অত্যাবশ্যক নহে যে, যাহাকে পথ দেখানো হইয়াছে সে গন্তব্যস্থলে পৌছিয়া যাইবে। (খ) পথ দেখাইয়া গন্তব্যস্থলে পৌছাইয়া দেওয়া। হিদায়েতের প্রথম অর্থের দিক দিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকল পয়গাম্বরগণ 'হাদী' অর্থাৎ পথ প্রদর্শক ছিলেন এবং এই প্রকার হিদায়েত যে তাহাদের ক্ষমতাধীন ছিল, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কারণ এই হিদায়েতই ছিল তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই প্রকার হিদায়েতের ক্ষমতা যদি তাহাদের মধ্যে না থাকে তবে তাঁহারা নবুওয়াত ও রিসালতের দায়িত্ব কিরূপে পালন করিবেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিদায়েতের উপরে ক্ষমতাশালী নহেন। ইহা হিদায়েতের দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়া বলা হইয়াছে। অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌছাইয়া দেওয়া। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কাহারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং তাহাকে মুমিন বানাইয়া দিবেন, ইহা আপনার দায়িত্বে নহে। ইহা সরাসরি মহান করুণাময় আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাধীন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে হিদায়েতের তাওফীক তথা গন্তব্যস্থলে পৌছাইয়া দেন।

হিদায়েতের স্তরঃ হিদায়েতের কয়েকটি স্তর রহিয়াছে।

(১) হিদায়েতের প্রথম স্তরে সমস্ত বিশ্বচরাচর যথা জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণীজগত, মানব ও জ্বিন জাতি প্রভৃতি সকলেই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই সাধারণ তথা ব্যাপক হিদায়েতের উল্লেখ কুরআন মজীদের এই আয়াতে أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ করা হইয়াছে। অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব দান করিয়াছেন এবং সেই অনুপাতে তাহাকে হিদায়েত দান করিয়াছেন।" (সূরা ত্বাহাঃ ৫০)

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছেঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ -

অর্থাৎ "আপনি স্বীয় মহোন্নত প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর যথাযথভাবে বানাইয়াছেন, আর যিনি (প্রত্যেক প্রাণীর জন্য তদোপযোগী বস্তুসমূহের) ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতঃপর হিদায়েত দান করিয়াছেন।" অর্থাৎ যিনি সকল জগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস-এর বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারণ করিয়াছেন এবং সেই মেযাজ ও দায়িত্বের উপযোগী হিদায়েত দান করিয়াছেন। এই সকল ব্যাপারে হিদায়েতের পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুই অতি নিপুণভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছে। যেই বস্তুকে যেই কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে সে সেই কাজ অতীব গুরুত্ব ও নিপুণতার সহিত পালন করিয়া যাইতেছে। যেমন- মুখ হইতে নির্গত শব্দ চক্ষু বা নাক শ্রবণ করিতে পারে না। যদিও উহারা খুব নিকটেই অবস্থান করিতেছে। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু কানকে এই দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন সেহেতু কানই শ্রবণ করে। এইরূপ প্রত্যেকটি বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সৃষ্টির প্রতিটি স্তর এমনকি প্রতিটি অণু পরমাণু পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী প্রাণ ও অনুভূতি শক্তি রহিয়াছে। অবশ্য ইহাদের বুদ্ধি ও অনুভূতির বেশ তারতম্য রহিয়াছে। এই তারতম্যের জন্যই সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ ও জ্বিন জাতিকেই শরীআতের হুকুম আহকামের আওতাভুক্ত করা হইয়াছে। কেননা এই দুইটি জাতিকেই পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধি ও অনুভূতি দেওয়া হইয়াছে। তবে এই কথা বলা যাইবে না যে, এই দুই জাতি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে বুদ্ধি ও অনুভূতির অস্তিত্ব নাই।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ-

অর্থাৎ "এমন কোন বস্তু নাই যাহারা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার তাসবীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাহাদের তাসবীহ বুঝিতে পার না।" (সূরা বনী ইসরাঈল-৪৪)

অন্য আয়াত আছে-

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ- وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ-

অর্থাৎ "তোমরা কি জান না যে, আসমান জমিনে যাহা কিছু রহিয়াছে সকলেই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগান বর্ণনা করে? বিশেষতঃ পাখীকুল, যাহারা দুইপাখা বিস্তার করিয়া শুন্যে উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের সকলই স্ব স্ব দু'আ তাসবীহ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদের তাসবীহ সম্পর্কে খবর রাখেন।" (সূরা নূর-৪১)

(২) হিদায়েতের দ্বিতীয় স্তর প্রথম স্তরের তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ। ইহা যেই সকল বস্তুর সহিত জড়িত উহাকে পরিভাষায় বিবেকবান, বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। উহারা হইতেছে মানব ও জ্বিন জাতি। এই হিদায়েত নবী রসূলগণ আসমানী কিতাবের মাধ্যমে মানুষের নিকট পৌঁছাইয়াছেন। কেহ এই হিদায়েত গ্রহণ করিয়া মুমিন হইয়াছে আর কেহ উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কাফির বেদ্বীনে পরিণত হইয়াছে।

(৩) হিদায়েতের তৃতীয় স্তর আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাহা কেবলমাত্র মুমিন, মুত্তাকী তথা আল্লাহ ভীরুদের জন্য। এই হিদায়েত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীতই মানুষকে প্রদান করা হয়। ইহার নামই তাওফীক অর্থাৎ হিদায়েতের মাধ্যমে এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব তৈরী করিয়া দেওয়া যে, কুরআন মজীদের হিদায়েতকে গ্রহণ করা এবং ইহার উপর আমল করা সহজ সাধ্য হইয়া যায় এবং ইহার বিরুদ্ধাচরণ কঠিন হইয়া পড়ে। এই তৃতীয় স্তরের পরিসীমা অনেক ব্যাপক। এই স্তরই মানবের উন্নতির ক্ষেত্র। নেক কাজের সাথে সাথে এই হিদায়েত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেমন কুরআন মজীদে এরশাদ হইয়াছেঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -

অর্থাৎ "যাহারা আমার পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে আমি তাহাদিগকে আমার পথে আরও অধিকতর অগ্রসর হইবার পথ অবশ্যই দেখাইয়া থাকি।" (সূরা আনকাবুত-৬৯)

হিদায়েতের এই তিনটি স্তরের প্রথম ও তৃতীয় স্তর সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সহিত সম্পৃক্ত। এই পর্যায়ের হিদায়েত একান্তভাবে একমাত্র তাঁহারই কার্য। ইহাতে নবী ও রসূলগণের কোন অধিকার নাই। নবী রসূলগণের কাজ কেবল হিদায়েতের দ্বিতীয় স্তরে সীমাবদ্ধ। কুরআন মজীদে যে সকল স্থানে নবী রসূলগণকে হিদায়েতকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হিদায়েতের দ্বিতীয় স্তরের ভিত্তিতেই বলা হইয়াছে। আর হাদীছের শেষে সংযোজিত আয়াত انك لا تهدى من احببت। অর্থাৎ "আপনি যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে হিদায়েত করিতে পারিবেন না।" এই আয়াতে হিদায়েতের তৃতীয় স্তরের কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ কাহাকেও হিদায়েতের তাওফীক দান করা আপনার কাজ নহে।

بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى التَّوْحِيْدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করিবে সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে এর দলীল।

৪৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

হাদীছ-৪৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বাক্‌র বিন আবী শায়বা ও যুহায়র বিন হরব (রহঃ)। তাহারা উভয়ই ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি---হযরত ওছমান (রাযিঃ) হইতে। হযরত ওছমান (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়া মৃত্যুবরণ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

সুদীর্ঘকাল ব্যাপী শিরক ও কুফরীতে নিমজ্জিত মক্কার মানুষেরা একক আল্লাহ তা'আলাকে ভুলিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া মূর্তিদের মহব্বত স্বভাবে পরিণত করিয়া লইয়াছে। তাহারা পবিত্র কাবা ঘরে তিনশত ষাটটি মূর্তিকে পুজা-অর্চনার জন্য নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের এই হাজার হাজার বৎসরের পুজনীয় মূর্তিদের বিসর্জন দেওয়া যে কত কঠিন ব্যাপার ছিল তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। তাহারা যদি সত্যের ডাকে সাড়া দিয়া একক আল্লাহ তা'আলাকে স্বীকার করে তবে এই স্বীকারোক্তিকে কম করিয়া দেখা যায় না। বরং ইহা তাহাদের জন্য বিরাট মুজাহিদা বলিতে হইবে। বাতিলকে ত্যাগ করিয়া দ্বীনে হককে গ্রহণ করা। তাহারা যদি নিজ হাতে নির্মিত মূর্তিদের সন্তুষ্টির জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারে তাহা হইলে চিরন্তন সত্য একক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কি করিবে? যাহা কিছু করিবার সকল কিছুই করিবে। ফলে কালিমায়ে তাওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে জান্নাতের সুসংবাদ অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ও যুক্তিসংগত। অধিকন্তু কালিমায়ে তাওহীদের মধ্যে রিসালতের স্বীকারোক্তিসহ আহকামে শরীআত অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। (বিস্তারিত হাদীছ নং ৩৪-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) সুতরাং তাওহীদ ও রিসালতের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনসহ ইন্তেকাল করিলে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

শায়খ ইবনুস সিলাহ (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছ রাবীগণের সংক্ষিপ্ততা মাত্র। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত এই মর্মে অন্যান্য হাদীছের ন্যায় সম্পূর্ণ বলিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া ইহাও হইতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূর্তিপুজক কাফির, মুশরিকদের সম্বোধন করিয়া সংক্ষিপ্তভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। কেননা তাওহীদের মধ্যে রিসালতসহ শরীআতের যাবতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেনঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব যাহাতে পূর্বাপর সকল আহলে হক রহিয়াছেন, তাহাদের অভিমত হইতেছেঃ যে ব্যক্তি একত্ববাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। যদি সে গুনাহ হইতে পবিত্র হয় যেমন- (ক) নাবালিগ শিশুরা, (খ) ঐ ব্যক্তি যে বালিগ হইবার সাথে সাথে পাগল হইয়া গিয়াছে, (গ) গুনাহ কবীরা হইতে সহীহ তাওবাকারী যদি সে তাওবা করিবার পর সেই গুনাহ বা অন্য কোন গুনাহের মধ্যে লিপ্ত না হইয়া থাকে, (ঘ) যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করে নাই এমন ব্যক্তিবর্গ প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তাহারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে না।

আর তাওহীদ রিসালতে বিশ্বাসী কবীরা গুনাহকারী যদি তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে তবে উহা আল্লাহ

তা'আলার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত। তিনি চাহিলে ক্ষমা করিয়া প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন অথবা তাহাকে গুনাহ পরিমাণ জাহান্নামের শাস্তি দিয়া জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কবীরা গুনাহের অপরাধে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে না। যেমন– অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না যদিও তাহার দ্বারা (পার্থিব জগতে ইসলামে ছাওয়াবের কাজ বলিয়া স্বীকৃত) ভাল কর্ম হইয়া থাকে। (নববী)

বলাবাহুল্য কবীরা গুনাহকারী মুমিন ব্যক্তি গুনাহ পরিমাণ জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করা কাফিরদের জাহান্নামের শাস্তির ন্যায় নহে। উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলুভী (রহঃ) বলেনঃ ليس من الحكمة ان يفعل بصاحب الكبيرة مثل ما يفعل بالكافر-

অর্থাৎ "ইহা হিকমত নহে যে, কাফিরের সহিত যেই ব্যবহার করা হইবে সেই ব্যবহার কবীরা গুনাহকারীর সহিত করা হইবে।" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা)

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ তাওহীদ ও রিসালতে বিশ্বাসী গুনাহগার অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির হুকুম সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

মুরজিয়া (একটি ভ্রষ্ট দল) সম্প্রদায় বলেনঃ ঈমানের সহিত কোন গুনাহই অনিষ্ট করিবে না।

খারেজী (একটি ভ্রষ্ট দল) সম্প্রদায় বলেনঃ গুনাহ অনিষ্ট করিবে এবং মানুষ গুনাহের দরুন কাফির হইয়া যায়। মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলেনঃ যদি উক্ত ব্যক্তি কবীরা গুনাহকারী হয় তবে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকিবে। তাহাকে মুমিনও বলা যায় না। এবং কাফিরও বলা যায় না বরং সে ব্যক্তি ফাসিক।

আশায়েরা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত হইতেছে যে, উক্ত ব্যক্তি (তাওহীদ ও রিসালতে বিশ্বাসী গুনাহগার) মুমিন থাকিবেন। যদি তাহার গুনাহ ক্ষমা না করা হয় তাহা হইলে তিনি জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবেন। তবে অবশ্যই তিনি জাহান্নামের শাস্তি হইতে একবার না একবার মুক্তি পাইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবেন।

আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা খারেজী ও মু'তাযিলা দলের অভিমত খণ্ডন হইয়া যায়। তবে মুরজিয়ারা যে আলোচ্য হাদীছের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা প্রমাণ দিয়া থাকে উহার উত্তর এই যে, তোমাদের অভিমত এই হাদীছ দ্বারা কিরূপে প্রমাণিত হয়। কারণ হাদীছে বলা হইয়াছে তাওহীদের বিশ্বাসী জান্নাতে যাইবে। ইহা সম্ভবতঃ তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া অথবা শাফায়াত দ্বারা জাহান্নামের শাস্তি হইতে মুক্তি পাইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অথবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বাণী دخل الجنة "জান্নাতে প্রবেশ করিবে" ইহার মর্মার্থ হইবে دخلها بعد مجازاته بالعذاب "গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করিবার পর জান্নাতে প্রবেশ করিবে।"

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীছের এইরূপ তা'বীল করিয়া মর্মার্থ গ্রহণ করা অপরিহার্য। কারণ পবিত্র কুরআন মজীদের বহু আয়াত ও হাদীছ শরীফসমূহে স্পষ্টভাবে গুনাহগারদের আযাব হইবার বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য হাদীছের অর্থ গ্রহণে তা'বীল না করিলে আয়াত ও অন্যান্য হাদীছের সহিত অসামঞ্জস্য হয়। অথচ শরীআতের বিধি-বিধানে পরস্পর সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা অত্যাবশ্যক।

আলোচ্য হাদীছ শরীফের শব্দ وهو يعلم "আর সে দৃঢ় বিশ্বাস করে তাওহীদকে" দ্বারা কাট্টা মুরজিয়াদের অভিমত খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। মুরজিয়ারা বলে, তাওহীদ ও রিসালতের স্বীকার কেবলমাত্র মুখ দিয়া বলিলেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। যদিও অন্তরে উহার দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যমান না থাকে। মুরজিয়াদের অভিমত সঠিক নহে। কারণ আলোচ্য হাদীছ ছাড়াও পরবর্তী ৪৬নং হাদীছে সন্দেহাতীত দৃঢ় বিশ্বাসের শর্ত করা হইয়াছে। উক্ত হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ غير شاك فيهما "তাওহীদ ও রিসালতে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় না করে।" ইহা দ্বারা আমাদের মাযহাবের তায়ীদ হইয়াছে।

কাযী আয়্যায (রহঃ) আরও বলিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ঐ ব্যক্তি দলীল গ্রহণ করে, যে বলে কেবলমাত্র অন্তরে তাওহীদ ও রিসালতের জ্ঞান থাকাই উপকারের জন্য যথেষ্ট, মুখে স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদের এই অভিমত সঠিক নহে। কারণ এই অধ্যায়ের অন্যান্য হাদীছসমূহে উহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন–(ক) যে ব্যক্তি لا اله الا الله বলিবে। (খ) যে ব্যক্তি لا اله الا الله وانى رسول الله "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহ তা'আলার রসূল"–এর সাক্ষ্য দিবে। অনুরূপ বিভিন্ন শব্দে ও অর্থে অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল হাদীছ দ্বারা মুখে স্বীকার করিবার বিষয়টিও প্রমাণিতহয়।

এই সকল হাদীছের ভিত্তিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব হইতেছে যে, অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং মুখে স্বীকার করা উভয়টি ঈমানের জন্য অপরিহার্য। আর জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এতদুভয়ের একটি যথেষ্ট নহে। তবে কাহারও মুখে কোন সঙ্কট থাকিলে যেমন–মুক অথবা মুখে বলিবার অবকাশ না পাওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে অবশ্য অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস যথেষ্ট হইবে।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছ মুজমাল তথা সংক্ষিপ্ত। তাই ব্যাখ্যার প্রয়োজন রহিয়াছে। উহার মর্মার্থ হইবে, তাওহীদ ও রিসালতে দৃঢ় বিশ্বাস করা এবং উহার হক ও ফরযসমূহ যথাযথ আদায় করা। তবেই জান্নাতেপ্রবেশকরিবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেনঃ উহা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে কুফর ও শিরক হইতে লজ্জিত হইয়া কালিমায়ে তাওহীদের স্বীকারোক্তি করিয়া মৃত্যুবরণ করে।

বলাবাহুল্য আলোচ্য হাদীছের এই সকল তা'বীল ঐ সময় প্রয়োজন যখন উহার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যখন স্বীয় স্থান ও ধাপ হিসাবে হাদীছের মর্মার্থ গ্রহণ করা হইবে তখন উহার ব্যাখ্যা জটিল নহে। যেমন– মুহাক্কিকীন ওলামাগণ অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সালাফে সালেহীন, মুহাদ্দিছীন, ফকীহ এবং মুতাকাল্লেমীনের অভিমত হইতেছে– গুনাহগার মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যদিও গুনাহের মলিনতা মাখানো হয়, শরীআতের ওয়াজিবকে বর্জনকারী হয় অথবা হারাম কর্মকারী হয় তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার সম্পর্কে যেই রায় দিবেন তাহাই হইবে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইতে পারে না যে, সে জাহান্নামে প্রবেশ না করিয়া সর্বপ্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। কিন্তু তাহার দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে যে, সে কোন এক সময়ে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীনে রহিয়াছে যে, তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন অথবা গুনাহ পরিমাণ শাস্তি দেওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন।

অধিকন্তু এই মর্মের সকল হাদীছকে স্বীয় অর্থে বহাল রাখিবার সম্ভাবনাও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং পরস্পর সামঞ্জস্যতাও বজায় থাকিবে। উহা এইরূপে হইবে যে, যদি জান্নাতে প্রবেশের দ্বারা মর্ম নেওয়া হয় যে, জান্নাতের যোগ্যতা লাভ হইবে। হয়ত বর্তমানে ক্ষমার মাধ্যমে অথবা ভবিষ্যতে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (নববী, ফতহুল মুলহিম)

৪৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ نَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنِ الْوَلِيْدِ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مِثْلَهُ سَوَاءً

হাদীছ–৪৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন আবী বাক্‌র আল মুকাদ্দামী (রহঃ)। তিনি---হযরত ওছমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ওছমান (রাযিঃ) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ হাদীছ বলিতে শুনিয়াছি---অবশিষ্ট হাদীছের অংশ উপরোল্লেখিত হাদীছ শরীফের অনুরূপ।

৪৬ حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ قَالَ فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ قَالَ حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ قَالَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ قُلْتُ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَاةِ قَالَ كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا قَالَ حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ -

হাদীছ—৪৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বাক্‌র বিন নযর বিন আবী নযর (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেনঃ আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর সহিত (তাবুকের জিহাদের) সফরে ছিলাম। দলের সকল লোকদের পাথেয় (খাদ্য সম্ভার প্রায়) নিঃশেষ হইয়া গেল। এমন কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দুইটি ক্ষতির মধ্যে কম ক্ষতির বিবেচনায়) আমাদের কিছুসংখ্যক (সাওয়ারী বা বাহক হিসাবে ব্যবহৃত) উট[১] যবেহ করিবার মনস্থ করিলেন। রাবী বলেনঃ তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সম্ভবতঃ আপনি যদি লোকদের (নিকট যৎসামান্য অবশিষ্ট) খাদ্য সামগ্রী (যাহা আছে উহা) একত্রিত করিয়া মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার দরবারে (বরকতের) দু'আ করিতেন তবে উত্তম হইত[২] (অর্থাৎ বরকতময় খাদ্যদ্রব্য দলের সকল লোকের জন্য যথেষ্ট হইবে)। রাবী বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাই করিলেন। অতঃপর যাহার নিকট গম ছিল তিনি গম নিয়া এবং যাহার নিকট খেজুর ছিল তিনি খেজুর নিয়া উপস্থিত হইলেন। তালহা বিন মুসাররিফ বলেনঃ হযরত মুজাহিদ আরও বর্ণনা করেন যে, যাহার নিকট খেজুরের আঁটি ছিল তিনি উহা নিয়াই উপস্থিত হইলেন। আমি (তালহা) জিজ্ঞাসা করিলামঃ তাহারা খেজুর আঁটি দ্বারা কি করিতেন? তিনি (হযরত মুজাহিদ জবাবে) বলিলেনঃ তাহারা উহা চুষিতেন[৩] এবং উহার উপর পানি পান করিতেন। রাবী বলেনঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্যের উপর (বরকতের জন্য) দু'আ করিলেন। রাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেনঃ (আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় বরকতের এমন অবস্থা হইল যে, সংগৃহীত খাদ্য ভাণ্ডার হইতে) সকল লোক নিজ নিজ খাদ্য পাত্রসমূহ খাদ্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়ানিলেন।[৪]

টীকা-১· حمائلهم শব্দটি " حاء " এবং " جيم " এর সহিত বর্ণিত আছে। দুইভাবেই ব্যাখ্যাকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনুস সিলাহ বলেনঃ উভয় বর্ণনাই সহীহ। حمائل শব্দটি حمولة এর বহুবচন। উহার অর্থ কাষ্ঠ বা বোঝা বহনকারী উষ্ট্র। আর جمائل শব্দটি جمالة এর বহুবচন এবং جمالة শব্দটি جمل এর বহুবচন। যেমন- حجر এর বহুবচন حجارة আসে। جمل বলা হয় পুরুষ উটকে। উহার স্ত্রীলিঙ্গ ناقة অর্থাৎ উষ্ট্রী। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-২· لو جمعت ما بقي 'আপনি যদি লোকদের অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী সংগৃহীত করিয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট বরকতের দু'আ করিতেন তবে কতইনা ভাল হইত' আলোচ্য বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিচক্ষণ কর্মচারী স্বীয় যুক্তি সঙ্গত কোন পরামর্শ তাহার কর্মকর্তাকে প্রদান করা জায়েয। যাহাতে কর্মকর্তা উক্ত পরামর্শে বিবেচনা করিতে পারেন। কর্মকর্তা যদি উক্ত পরামর্শে কল্যাণ অবলোকন করেন তবে উহা নিঃসংকোচভাবে গ্রহণ করা উচিত। (ফতহুল মুলহিম)

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেনঃ এই (মু'জেযা প্রকাশের) সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বূদ নাই এবং নিশ্চয় আমি আল্লাহ তা'আলার (মনোনীত সত্য) রসূল। যে বান্দা এই দুইটি বিষয় (তাওহীদ ও রিসালত তথা পূর্ণ দ্বীন)-এর প্রতি সন্দেহাতীত দৃঢ়বিশ্বাস সহ (আমল করিয়া) আল্লাহ তা'আলার সহিত সাক্ষাৎ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ'

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এই রঙ বেরঙের পৃথিবীতে আগমন করিয়া মানবজাতিকে এমন এক অচিন্তিত অজানা সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যাহা সাধারণ দৃষ্টির অনুভূতির বহির্ভূত বরং অনেকটা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই জগতের পশ্চাতে অপর একটি জগৎ রহিয়াছে যাহা এই বিরাট পৃথিবী হইতে অনেকগুণে বিস্তৃত। এই অদ্ভুতপূর্ণ জগত হইতে বহুগুণে অদ্ভুতপূর্ণ, আশ্চর্যজনক, হৃদয়গ্রাহী ও চিরস্থায়ী। আর এই যাবতীয় বস্তুজগৎ এমন একক সত্তা সৃষ্টি করিয়াছেন যিনি সকল বস্তুজগতের অন্তরালে। তিনি মহাশক্তিধর নিরাকার। এক একটি অণু পরমাণুর অস্তিত্ব ও ধ্বংস তাঁহারই কুদরতের মুষ্টিতে সংরক্ষিত। এই বিস্ময়কর দাবীর সহিত অপর বিস্ময়কর দাবী তাঁহারা ইহাও করেন যে, ঐ নিরাকার একক সত্তার পক্ষ হইতে তাঁহারা তাঁহারই মনোনীত পয়গাম্বর তথা বার্তাবাহক। আর ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণ ও শান্তি কেবলমাত্র তাঁহাদের অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রসূলের অনুসরণের মধ্য দিয়াই সেই একক সত্তার অনুসরণ হয়।

এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করিবে সে তো আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করিল।" (সূরা নিসা-৮০)

অন্য আয়াতে এরশাদ করেনঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا -

অর্থাৎ "আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিবে সে মহান সফলতা লাভ করিল।" (সূরা আহযাব-৭১)

বলাবাহুল্য মানবজাতির স্বভাব হইতেছে যে, তাহারা শুধু স্বীয় পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার উপর বিশ্বাস করে এবং যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া কোন কথার উপর বিশ্বাস। অবশ্য ইহাও ঐ পর্যবেক্ষণের ফল বটে। এই কারণেই মানব জাতিকে ঐ অদৃশ্যাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং দৃঢ়তা স্থাপনে সম্মতি করাইবার জন্য কোন না কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজন। অনুরূপ কোন পদ্ধতি অনুসৃত না হইলে আম্বিয়া কেরামের দাওয়াতকে তৎক্ষণাৎ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

টীকা-৩ يَمَصُّوْنَ মীমের উপর যবর দ্বারা প্রসিদ্ধ পঠনরীতি। مَصَّ শব্দটি বাবে سمع ও نصر হইতে উহার অর্থ চুষা। খাদ্যাভাবে খেজুর আঁটি চুষিয়া পানি পান করিলে খানিকটা ক্ষুধা নিবারণ হয়। তাই তাহারা উহা চুষিয়া পানি পান করিতেন। مَصَّ শব্দটি পাঁচভাবে পড়া যায়। (১) مَصَّ الرَّمَانَةَ (২) مَصِّهَا (৩) مَصَّهَا (৪) مُصَّهَا (৫) مُصَّهَا - (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-৪ مَلَاءَ الْقَوْمِ اَزْوِدَتَهُمْ :- اَزْوِدَةً শব্দটি زاد এর বহুবচন। উহার অর্থ রসদ বা পাথেয়। পাথেয় পূর্ণ করা হয় না। তাই আসল বাক্য হইবে ملاء القوم اوعية ازودتهم দলের সকল লোক স্বীয় পাত্রসমূহ খাদ্যদ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন।' এখানে مضاف কে উহ্য করিয়া مضاف اليه কে উহার স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ ইহা বলাও সম্ভব যে, سمى الاوعية ازوادا باسم ما فيها - অর্থাৎ পাত্রকে পাত্রের মধ্যে রক্ষিত পাথেয়-এর নামে নামকরণ করা হইয়াছে। এইরূপ নামকরণের পদ্ধতি আরবী ভাষায় রহিয়াছে।

সত্যায়িতকরণে কিছুটা অপরাগতা অনুধাবন করিবে। এইজন্য অত্যাবশ্যক যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম পৃথিবীতে আগমন করিয়া মানবজাতির সামনে এমন একটি নতুন পদ্ধতির প্রমাণের সূচনা করা যাহা অদৃশ্য জগতের উপর ঈমান আনয়নের জন্য মানবিক স্বভাবকে সহজ সরলতার সহিত সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হয় এবং মানুষের স্বভাব মুতাবিক এইরূপ প্রমাণাদি ও আলামতসমূহ উপস্থিত করিবে যাহার সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের সহিত রহিয়াছে। এই অলৌকিক প্রমাণ শক্তি মহান রব্বুল আলামীন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে দান করিয়াছেন। উহাই হইতেছে মু'জিযা।

মানুষ যখন স্বীয় চক্ষুদ্বয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করে যে, বস্তুসমূহের বিশেষত্ব এবং ওজনের ঐ মূলনীতি যাহা সে নিজ মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করিয়া রাখিয়াছিল, উহা আজ মুজিযার সামনে অসার ও বাতিল প্রমাণিত হইয়াছে। এই পর্যবেক্ষণে অনুভূতি জ্ঞান দ্বারা মানুষ এমন একটি উচ্চস্তর গুণের অধিকারী হইয়া বসে, যাহার ফলে সে মহাসত্য চিরন্তন সত্তা যিনি ঐ সকল বস্তু সমূহ এবং উহার বিশেষত্বসমূহের একক স্রষ্টা মহাশক্তিধরকে স্বীকার করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিবার যোগ্যতা ও গ্রহণ ক্ষমতা অর্জন করে। অতঃপর ক্রমশঃ তাহার মধ্যে রসূল বর্ণিত যাবতীয় অদৃশ্যাবলীর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবার প্রবণতা সৃষ্টি হইতে থাকে। কমপক্ষে এতখানি তো একান্ত জরুরীভাবে লভ্য যে,তাহার মস্তিস্কের মধ্যে উক্ত বর্ণিত অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে কোন প্রকার অবিশ্বস্ততা অবশিষ্ট থাকিবে না।

অতঃপর মানুষ যখন ইহা অবলোকন করেন যে, ঐ আশ্চর্যজনক বিষয়াদির সম্পর্ক এই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সহিত নিবিড় সংযোগ রহিয়াছে তখন তাঁহাদের রিসালতের দাবীতে সত্য হইবার এবং অদৃশ্যের সঠিক ব্যাখ্যাতা হইবার মধ্যেও কাহারও সন্দেহ সংশয় থাকিবার অবকাশ থাকে না। অল্প খাদ্য অল্প লোক আহার করিতে সামর্থ হওয়াই পর্যবেক্ষণের ফল। কিন্তু অল্প খাদ্য দু'আর বকরতে কল্পনাতীতভাবে দলের সকল লোক নিজ নিজ পাত্রসমূহ খাদ্য দ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া লইতে সক্ষম হইবার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের পর্যবেক্ষণে অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি রহিয়াছে। সুতরাং বস্তুর বিশেষত্বের উপর নির্ভর করা যায় না বরং তাহাতে অন্য কোন হাত রহিয়াছে। সর্বশেষ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই অলৌকিক ঘটনা (মু'জিযা) প্রত্যক্ষ করিবার পর মানুষ স্বভাবতঃ অনুধাবন করিবে যে, এই আশ্চর্যজনক বিষয়টি পর্যবেক্ষণের বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও যখন বাস্তব সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল তখন তিনি যদি অপর কোন বিস্ময়কর সংবাদ প্রদান করেন তাহা হইলে উহা সন্দেহাতীত বাস্তব সত্য হইবে না কেন? নিশ্চয় সত্য হইবে।

শায়খুল হাদীছ ওয়াত তাফসীর আল্লামা হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ছাহেব মদ্দাযিল্লুহু বলেনঃ খাদ্য সম্ভারে বরকতের মু'জিযা প্রকাশের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টির সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইহাও বলা যায় যে, অনভিজ্ঞ মানুষেরা হয়ত মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিয়া এই আকীদা পোষণ করিয়া বসিবে যে, তিনিই খোদা। যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিয়া খ্রীষ্টানরা তাঁহাকে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার সন্তান তথা তিন খোদার এক খোদা বলিয়া শিরকী আকীদা পোষণ করিয়া বসে। তাই উম্মতে মুহাম্মদিয়ার এইরূপ সন্দেহ সংশয়ে পতিত হইবার পথ বন্ধ করিবার লক্ষ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, আমার দ্বারা যে এইরূপ আশ্চর্যজনক বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে উহা মুজিযা মাত্র। নবী ও রসূল স্বীয় রিসালতের সপ্রমাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা ইহা দান করিয়াছেন। আমিই সর্বশেষ রসূল। সুতরাং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা একক অদ্বিতীয়। তাঁহার সহিত অন্য কেহ শরীক নাই। আর আমি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রসূল।

আলোচ্য হাদীছ শরীফে খাদ্য সামগ্রীর উপর বরকত হইবার মু'জিযা প্রকাশিত হইবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য প্রদানের ঘোষণাটি উপস্থাপন অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ যথাযোগ্য সংযোগ সম্পর্কের বিষয়টি উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট হইয়া যায়। (হাদীছের ব্যাখ্যা ৪৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

ফায়দাঃ (ক) নিম্নপদস্থ ব্যক্তি কোন বিষয় কল্যাণকর বুঝিয়া উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে পরামর্শ দেয়া জায়েয। আর কর্মকর্তা উহাতে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়।

(খ) নিম্নপদস্থ ব্যক্তির পরামর্শ কল্যাণকর বিবেচিত হইলে সেই মতে কাজ করা অসম্মানজনক নহে।

(গ) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসাফিরগণ–এর নিজ নিজ খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত করা এবং এক সাথে বসিয়া আহার করা জায়েয, যদিও কেহ অধিক আহার করে আর কেহ অল্প আহার করে। আমাদের আছহাবগণ বলিয়াছেন, ইহা সুন্নাত।

(ঘ) বড় খানা যিয়াফতে তৈরী খাদ্যদ্রব্যে নিকটস্থ কোন আল্লাহ ওয়ালা আলিম বুজুর্গ দ্বারা বরকতের দু'আ করানো জায়েয। সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার দু'আ কবূল করিয়া বরকত দান করিবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

٤٧ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ شَكَّ الْأَعْمَشُ قَالَ لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُوا قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ قَالَ وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ قَالَ وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ قَالَ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَئُوهُ قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ -

হাদীছ–৪৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন সহল বিন ওছমান এবং আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আল–আলা (রহঃ)। তাহারা উভয়ই--হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) অথবা আবূ সাঈদ (খুদরী (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেন (সনদ সূত্রে উল্লেখিত রাবী) আ'মাশ (রহঃ)–এর সন্দেহ[১] (যে এই

টীকা-১. شك الاعمش রাবী হযরত আ'মাশ (রহঃ) আলোচ্য হাদীছ শরীফের মূল বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) অথবা আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ), এতদুভয়ের মধ্যে সন্দেহ ব্যক্ত করিয়াছেন। শারেহ বলেনঃ আমাশের এই সন্দেহের দরুন হাদীছ শরীফের মতন সহীহ ও সঠিকতার কোন ক্ষতি করে না। কেননা খতীব বুগদাদী স্বীয় কিফায়া গ্রন্থে এবং অন্যান্য হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ হাদীছ বর্ণনার কানূন তথা বিধান উল্লেখ করিয়াছেন যে, কোন রাবী যদি দুইজন রাবী হইতে নাম উল্লেখ পূর্বক এইরূপে বর্ণনা করেন যে, আমি হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি অমুক অথবা অমুক রাবী হইতে। আর উভয় রাবী যদি ছিকাহ হয় তবে বর্ণনাকারীর এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিবার কারণে হাদীছের মতনের

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

হাদীছের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) না কি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)? তবে এতদুভয়ের একজন অবশ্যই বর্ণনা করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) অথবা আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) (এতদুভয়ের একজন) বলেনঃ তাবুক জিহাদের সময়ে[১] যখন (মুসলিম সৈন্যদলের) লোকগণ (প্রকট খাদ্যাভাবে পতিত হইয়া) তীব্র ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িলেন তখন তাহারা আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি যদি অনুমতি প্রদান করেন তাহা হইলে আমরা আমাদের পানি বহনকারী উটগুলি যবেহ করিয়া উহার গোশত (ক্ষুধা নিবারনের জন্য) আহার করিব এবং উহার চর্বি ব্যবহার করিব। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ তোমরা তাহা করিতে পার (অর্থাৎ যবেহ করিতে পার)। রাবী বলেনঃ ইত্যবসরে হযরত ওমর (রাযিঃ) আগমন করিলেন এবং তিনি (অনুমোদিত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া) আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! (আপনি যে পানি বহনকারী উট যবেহ করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন উহা) এইরূপ করা হইলে বাহন[২] কমিয়া যাইবে (অথচ জিহাদের ময়দানে বাহনের অভাব বিপদজনক)। বরং আপনি লোকদিগকে তাহাদের যৎসামান্য উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য (যাহা আছে তাহা) নিয়া উপস্থিত হইতে বলুন। অতঃপর উহার উপর তাহাদের জন্য মহান করুণাময় আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দরবারে বরকতের জন্য দু'আ করুন। একান্ত আশা যে, (আপনার দু'আয়) আল্লাহ তা'আলা উহাতে বরকত দান করিবেন।[৩] (ফলে খাদ্যাভাব দূরীভূত হইয়া যাইবে) অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর রায়ের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া) বলিলেনঃ হ্যাঁ (ইহা উত্তম বটে)। রাবী বলেন, তারপর তিনি একটি দস্তরখান আনিতে বলিলেন এবং উহা বিছাইলেন। অতঃপর তিনি সকলের (যৎসামান্য) উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য (যাহার কাছে যাহা আছে) লইয়া উপস্থিত হইতে বলিলেন। রাবী বলেনঃ তখন কেহ এক মুষ্টি চনাবুট নিয়া আসিলেন, কেহ এক মুষ্টি খেজুর নিয়া উপস্থিত হইলেন, আর কেহ এক টুকরা রুটি লইয়া আসিলেন। এইরূপে মাত্র সামান্য কিছু রসদপত্র দস্তরখানে সংগৃহীত হইল। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দস্তরখানে জমাকৃত খাদ্যদ্রব্যের উপর আল্লাহ তা'আলার দরবারে) বরকতের দু'আ করিলেন। ইহার পর তিনি লোকদিগকে বলিলেনঃ তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাত্রসমূহ (খাদ্য-সামগ্রী) ভর্তি

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

বিশুদ্ধতায় কোন ক্ষতি করিবে না। বরং সর্বসম্মত মতে উক্ত হাদীছের মতন সহীহ ও প্রমাণযোগ্য। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) ছাড়া অন্যান্য ছিকাহ রাবীগণের ক্ষেত্রে যদি হাদীছের মতন সহীহ বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে উত্তমভাবেই গ্রহণযোগ্য হইবে। কেননা الصحابة كلهم عدول। "সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) প্রত্যেকই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।" ফলে আলোচ্য হাদীছের মূল বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা না কি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ); এতদুভয়ের একজনকে নির্দিষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম)

অত্র পৃষ্ঠার টীকা

টীকা- ১. يوم غزوة تبوك এখানে يوم দিন দ্বারা আভিধানিক অথবা শরয়ী দিন মর্ম নহে। আভিধানিক অর্থে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং শরয়ী অর্থে সুবহে সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়কে দিন বলা হয়। বরং এখানে يوم দিন দ্বারা সাধারণ সময় বা কালকে বুঝানো হইয়াছে। غزوة - 'গযূয়া' ঐ জিহাদকে বলা হয় যাহার মধ্যে খলীফা অথবা খলীফার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। تبوك - 'তবুক' শ্যাম দেশের একটি স্থানের নাম। গযূয়ায়ে তবুক হিজরী ৯ম সনের রজব মাসে সংঘটিত হইয়াছিল।

টীকা-২. قلّ الظهر - বাহন কমিয়া যাইবে। الظهر শব্দের অর্থ পিঠ। উহার বহুবচন ظهر আসে। এখানে ظهر দ্বারা মর্ম হইতেছে যানবাহন হিসাবে ব্যবহৃত জন্তু তথা উট। উটকে ظهر হিসাবে নামকরণের কারণ হইতেছে, উহার পিঠে সওয়ার হওয়ার কারণে অথবা উহার পিঠে বোঝা বহন করিবার কারণে এবং সফরে উহারই সাহায্য গ্রহণ করা হয়। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-৩. لعل الله ان يجعل فى ذلك এই বাক্যে مفعول به উহ্য রহিয়াছে বাক্যটি হইবে لعل الله ان يجعل فى ذلك بركة او خيرا। 'একান্ত আশা যে, (আপনার দু'আয়) আল্লাহ তা'আলা উহাতে বরকত অথবা কল্যাণ দানকরিবেন।'. (ফতহুল মুলহিম)

কর। রাবী বলেনঃ দলের প্রত্যেক লোকই স্বীয় পাত্র পূর্ণ করিয়া লইলেন, এমনকি এই সেনা বাহিনীর কোন পাত্রই আর অপূর্ণ রহিল না। রাবী আরো বলেন, তারপর দলের সকল লোকই পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিলেন। ইহার পরও কিছু খাদ্যদ্রব্য উদ্বৃত্ত রহিয়া গেল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেনঃ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) মা'বূদ নাই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলার (মনোনীত) রসূল। যে বান্দা এই দুইটি বিষয় (তাওহীদ ও রিসালত)–এর প্রতি সন্দেহাতীত দৃঢ় বিশ্বাসসহ আল্লাহ তা'আলার সহিত সাক্ষাৎ করিবে সে জান্নাত হইতে বঞ্চিত হইবে না।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী ৪৬নং হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যার অনুরূপ। উভয় হাদীছই একটি ঘটনা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত। উভয় রিওয়ায়াতে শাব্দিক কিছু পার্থক্য থাকিলেও মর্মার্থ এক ও অভিন্ন।

ফায়দাঃ জিহাদে সাহায্যকারী যে কোন জন্তু জানোয়ার আমীর তথা সেনাপতি অথবা ইমাম তথা রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতীত যবেহ করিতে পারিবে না। ইমাম কল্যাণকর বিবেচনা অথবা ক্ষতির আশংকা ব্যতীত অনুমতি দিবেন্না।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের মধ্যে Dictatorship 'একনায়কত্ব' এর স্থান নাই। প্রজাবর্গের অভিমত প্রকাশ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। দেখুন; হযরত ওমর (রাযিঃ) বিনা দ্বিধায় স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন।

٤٨ حدثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنِى جُنَادَةُ بْنُ اَبِى اُمَيَّةَ قَالَ نَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَابْنُ اَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَاَنَّ النَّارَ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ -

হাদীছ—৪৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন দাউদ বিন রুশায়দ (রহঃ) তিনি…ওবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) হইতে। হযরত ওবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বূদ নাই, তিনি একক অদ্বিতীয় তাঁহার (সত্তায় ও গুণাবলীতে অন্য কেহই) কোন অংশীদার নাই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা এবং তাঁহারই (মনোনীত সর্বশেষ) রসূল (সাবধান! তোমরা কিন্তু তাওহীদ ও রিসালতের মান মর্যাদা যথাস্থানে রাখিও। নিজ পক্ষ হইতে অতিরঞ্জন অথবা ঘাটতি করিবার পথ অবলম্বন করিও না। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এইরূপ অতিরঞ্জন ও ঘাটতি করিয়া খ্রীষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায় ভ্রষ্টতায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।) আর নিশ্চয় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা[১] ও তাঁহার বান্দী (হযরত মরিয়ম (আঃ))–এর পুত্র[২] (আল্লাহ তা'আলা কালিমা

টীকা–১. ان عيسى عبد الله । "নিশ্চয় হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার বান্দা"। সহীহ বুখারী শরীফে عبدالله। عبده এরপর ورسوله এবং তাঁহার মনোনীত রসূল রহিয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ)কে আল্লাহ তা'আলার বান্দা বলিয়া খ্রীষ্টানদের আকীদা ত্রিতত্ত্ববাদের খণ্ডন করা হইয়াছে এবং ইহুদীরা যে হযরত ঈসা (আঃ)কে অভিশপ্ত বলিত এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সম্মানিত মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ)কে অপবাদ দিত উহা, "رسوله" শব্দ দ্বারা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করা

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দ্বারা তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন) যাহা তিনি মরিয়মের গর্ভে ঢালিয়া দিয়াছিলেন[১] (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা كن "হও" দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন। তাই তিনি পিতার মাধ্যম ব্যতীতই পয়দা হইয়াছেন) এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে প্রেরিত একটি (মর্যাদাপূর্ণ) রূহ (অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লাশানুহু তাঁহার রূহকে বিশেষ নির্দেশে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদিও সকল রূহ আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর রূহ বড় সম্মানিত এবং মর্যাদাপূর্ণ। কারণ তাঁহার রূহ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে সরাসরি প্রেরিত।) আর নিশ্চয় জান্নাত হক ও সত্য এবং নিশ্চয় জাহান্নাম হক ও সত্য (এই মূল আকাঈদসমূহ স্বীকার করিয়া দৃঢ়ভাবে যে ব্যক্তি মানিয়া নিবে) সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের আটখানা দরজার মধ্যে যে কোন দরজা দিয়া (সে প্রবেশের) ইচ্ছা করিবেন তাহাতেপ্রবেশকরাইবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছ শরীফখানা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। আকাঈদের দিকে একত্রিতকারী ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আর সংক্ষিপ্তাকারে সকল প্রকার কুফরী শিরকী মতবাদ ইহা দ্বারা খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। চিরস্থায়ী পরিত্রাণের সকল কেন্দ্র বিন্দু ঈমান এবং আকাঈদসমূহের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল। আ'মালের দুর্বলতা ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু ঈমান ও আকাঈদের মধ্যে সামান্যতম ত্রুটিও

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

হইয়াছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার রসূল। পূত পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত রিসালতের দায়িত্ব প্রদান করা হয় না। সুতরাং তোমাদের উল্টাপাল্টা কথা অপবাদ ছাড়া উহাতে কোন বাস্তবতা নাই।

টীকা-২. ابن امته "আল্লাহ তা'আলার মনোনীতা পবিত্রা বান্দীর ছেলে" এই বাক্য দ্বারা খ্রীষ্টানদের ধারণাকে খণ্ডন করা হইয়াছে। খ্রীষ্টানরা ধারণা করিত যে, হযরত মরিয়ম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার স্ত্রী (নাউযুবিল্লাহ)। ইহা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা। কারণ অন্যান্য মহিলা জাতির ন্যায় তিনিও আল্লাহ তা'আলার বান্দী।

অত্র পৃষ্ঠার টীকা

টীকা-১. كلمته القاها الى مريم "যাহা তিনি হযরত মরিয়মের গর্ভে ঢালিয়া দিয়াছিলেন"। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সৃষ্টি চিরাচরিত নীতির বহির্ভূত করাটি মহান রব্বুল আলামীনের নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা মহান শক্তিধর হইবার বিষয়টি প্রকাশের জন্য এইরূপ করিয়াছেন যাহাতে শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী মিলনের মাধ্যমেই জন্মের সীমাবদ্ধতা না থাকে। ইহা তো আল্লাহ তা'আলার একটি অনুগ্রহ। না হয় তিনি যেইভাবে চাহিবেন সেই ভাবেই সৃষ্টি করিবেন। তাঁহার সাধারণ রীতিনীতির বিপরীত পিতাহীন সৃষ্টির নিদর্শন ছাড়াও অনেক নিদর্শন ছিল। সময়ের পূর্বে দোলনার শিশুকে কথা বলিবার সামর্থ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে মৃত জীব জীবিত হইত।

কবি বলেন-

بے پدر فرزند پیدا او کند
طفل را در مہد گویا او کند۔

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা পিতা ব্যতীত সন্তান পয়দা করিলেন। বাল্য শিশুকে দোলনায় কথা বলিতে শিক্ষা তিনিই দান করিয়াছেন।"

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে সময় পরিবারের লোকজন হযরত মরিয়ম (আঃ)কে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করে তখন হযরত ঈসা (আঃ) জননীর স্তন্য পানে রত ছিলেন। তিনি তাহাদের ভৎর্সনা শুনিয়া স্তন্যপান ছাড়িয়া বামদিকে পাশ ফিরাইয়া তাহাদের দিকে মনোযোগ দেন। তারপর তর্জনী খাড়া করিয়া এই কথা বলেন اني عبد الله "আমি আল্লাহ তা'আলার দাস।" এই প্রথম কথাই হযরত ঈসা (আঃ) সকল ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করিয়াছেন যে, যদিও আমি অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু আমি আল্লাহ নহি বরং আল্লাহ তা'আলার দাস। সুতরাং কেহ যেন (আমাকে আল্লাহ তা'আলার সহিত অংশীদার সাব্যস্ত করিয়া) আমার উপাসনায় লিপ্ত না হইয়া পড়ে।

ক্ষমাযোগ্য নহে। ইসলামী আকাঈদ তথা ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ–এর রূহ হইতেছে তাওহীদ ও রিসালত। উভয়টিকে যথাস্থানে রাখিতে হইবে। এমন যেন না হয় যে, রিসালতের বাহক তথা রসূলকে সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়া তাওহীদের কাছে পৌঁছিয়া যায়। আর এমন আকীদাও থাকিতে পারিবে না যাহাতে রসূলগণের মর্যাদার অবমাননা হইয়া বসে। এই উভয় (অর্থাৎ রসূলের সম্মানে অতিরঞ্জন অথবা অবমাননা) বিশ্বাসই শিরকী কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উত্তমকে স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা দ্বীনের কোন বিষয়েই অতিরঞ্জন করিতে যাইও না। বিশেষভাবে তাওহীদ ও রিসালতের ক্ষেত্রে নির্ভেজাল আকীদা ঈমানের জন্য অপরিহার্য। পূর্ববর্তী উম্মতেরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করিয়া শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাওহীদ উহা নহে যাহার মধ্যে ত্রিতত্ত্ববাদের বিশ্বাস বিদ্যমান রহিয়াছে। বরং তাওহীদ উহাই যাহার মধ্যে উপমা, উদাহরণের অংশীদার হইতে পবিত্র থাকিবে। খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)কে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলিত। অপরদিকে ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাহার মাতাকে অপবাদ দিত। এই উভয় সম্প্রদায়ই শিরক ও কুফরী করিয়া ভ্রষ্টতায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ইহুদী সম্প্রদায়ের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ـ

অর্থাৎ "যাহাদের আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং যাহাদের উপর তাঁহার গজব নাযিল হইয়াছে।" (সূরা মায়েদাহ–৬)

আর নাসারা তথা খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ ـ

অর্থাৎ "তাঁহারা ইতিপূর্বে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং অনেক লোককেও পথভ্রষ্ট করিয়াছে। অনন্তর তাহারা সত্য পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।" (সূরা মায়েদাহ–৭৭)

পবিত্র কুরআনের সূরাতুল ফাতিহায় উভয় দলকে যথাক্রমে مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ (যাহারা আপনার অভিসম্পাতগ্রস্ত) এবং الضَّالِّيْن (যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আল্লামা মুফতী শফী (রহঃ) স্বীয় তফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে লিখিয়াছেনঃ مغضوب عليهم বলিতে ঐ সকল লোকদিগকে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা ধর্মের হুকুম আহকামকে বুঝিয়াছে তবে স্বীয় অহমিকা বা ব্যক্তিগত পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হইয়া বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। অন্য শব্দে বলা যায় যে, যাহারা আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধান ও আদেশ মান্য করিতে গাফিলতি করিয়াছে। যেমন সাধারণভাবে ইহা ইহুদীদের নীতি ছিল। পার্থিব জগতের সামান্য স্বার্থের জন্য দ্বীনের বিধি বিধান বিসর্জন দিয়া তাহারা নবী রসূলগণকে অবমাননা ও লাঞ্ছিত করিতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করিত না। (তাহারা চরম বিশ্বাসঘাতকও বটে) আর الضالين। তাহাদের বলা হইয়া থাকে যাহারা না বুঝিয়া অজ্ঞতার দরুন ধর্মীয় ব্যাপারে ভুল পথের অনুসারী হইয়াছে এবং ধর্মের সীমা লংঘন করিয়া অতিরঞ্জনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। যেমন– নাসারা তথা খ্রীষ্টানরা। তাঁহারা নবীর শিক্ষাকে এত অগ্রাধিকার প্রদান করিয়াছে যে, নবীগণকে আল্লাহ তা'আলার স্থানে উন্নীত করিয়া দেখিয়াছে। ইহুদীদের ক্ষেত্রে ইহা অন্যায় এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ তা'আলা মনোনীত নবীগণের কথা মান্য করে নাই। এমনকি তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত ও হত্যা পর্যন্ত করিয়াছে। অপরদিকে নাসারাদের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন হইয়াছে যে, তাহারা নবীগণকে আল্লাহ তা'আলার পর্যায়ে পৌঁছাইয়া শিরক করিয়াছে।

ইসলামী শরীআতের বিধানে সিদ্ধান্ত এই যে, ইহুদী ও নাসারাদের আকীদা ভ্রান্ত। বস্তুতঃ হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রসূলের গুণে গুণান্বিত ছিলেন, ইহার অধিক কিছু নহে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল একশ্রেণীর দুনিয়াদার মন্দ আলেমের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা সর্বশেষ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার জাতি নূর দিয়া তৈরী বলিয়া আকীদা পোষণ করে এবং উহা প্রচারও করে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আল্লাহ তা'আলার জাতি নূর দিয়া তৈরী হন তাহা হইলে শিরক ছাড়া আর কি হইবে? ইহা কি অতিরঞ্জন নহে? ইহা তো খ্রীষ্টানদের আকীদার অনুরূপই। স্বার্থবাদী মন্দ আলেমদের নিকট জিজ্ঞাস্য যে, নিরাকার আল্লাহ তা'আলার নূরের কি আকার আছে? আল্লাহ তা'আলার নূর কি চিরন্তন নহে? চিরন্তনের অংশতো চিরন্তন হইবে। তাহা হইলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার জাতি নূর দিয়া তৈরী বলিলে তিনি চিরন্তন হইবেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন বস্তু চিরন্তন নাই। অতএব দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, খ্রীষ্টানরা সরল প্রাণ মুসলমানের আকীদাকে নষ্ট করিবার জন্য মন্দ আলেমদের কাজে লাগাইয়াছে। না হয়, আলোচ্য হাদীছ ও কুরআন মজীদের বহু আয়াত এবং অন্যান্য হাদীছে তাওহীদ ও রিসালতের মান নির্ণয়ে স্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকিতে বানাউট কথায় বিশ্বাস করিয়া শিরক করিবার কি যুক্তি রহিয়াছে? আল্লাহ তা'আলা সরল প্রাণ মুসলমানগণের আকীদাকে শিরক মুক্ত রাখুন। আমীন!

হযরত ঈসা (আঃ) "রূহুম মিনহু"

"রূহুল্লাহ" কেবল হযরত ঈসা (আঃ)–এর একটি উপাধি ছিল। খ্রীষ্টানরা "রূহুল্লাহ" উপাধির কারণে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার অংশ বলিয়া বুঝিয়াছিল। অথচ আরবী ভাষায় ضافت। উপযোগ (অর্থাৎ দুইটি বিশেষ্য পদের পরস্পর সংযোগ)–এর কয়েক প্রকারের এক প্রকার হইতেছে সম্মান বুঝাইবার জন্য। যেমন– بيت الله। "বায়তুল্লাহ"–এর এই মর্ম নহে যে, উক্ত মর্যাদাপূর্ণ ঘরের সহিত আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর পবিত্র সত্তার বসবাসের সম্পর্ক রহিয়াছে। তিনি স্থান, কাল, পাত্রের উর্ধে। বরং এখানে শুধু উক্ত ঘরখানির সম্মান প্রকাশই উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে 'রূহুল্লাহ' এব 'কালিমাতুল্লাহ' এর 'ইযাফত' তথা উপযোগ দ্বারাও সম্মান প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু মর্ম নহে।

শায়খ আকবর লিখিয়াছেনঃ প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিবসে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্ট সকল রূহ হইতে অঙ্গীকার নেওয়ার পর সকল রূহকেই পিতার মেরুদণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া দিয়াছেন। কেবল মাত্র হযরত ঈসা (আঃ)–এর রূহ কোন পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন না করিয়া হযরত জিব্রাঈল (আঃ)–এর নিকট আমানত হিসাবে রাখিয়াছিলেন যাহাতে হযরত ঈসা (আঃ)–এর জন্মের (নিকটবর্তী) সময়ে পিতার মাধ্যম ছাড়া শুধু মাতার মধ্যে প্রদান করা হয়। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে যথাসময়ে যথাযথভাবে আমানত হিসেবে রক্ষিত হযরত ঈসা (আঃ)–এর রূহকে হযরত ঈসা (আঃ)–এর মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ)–এর মধ্যে প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, যখন হযরত ঈসা (আঃ)–এর জন্মের সময় নিকটবর্তী হইল তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মাতা মরিয়মের উদরে একটি সুন্দর আকৃতির মানবদেহ রূপ ধারণ করেন। অতঃপর তাঁহার রূহ তাঁহার মধ্যে প্রদান করা হয়। হযরত ঈসা (আঃ)–এর রূহ "رُوحٌ مِّنْهُ" হওয়ার হাকীকত ইহাই।

(আল–বাওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির–১ম খণ্ডঃ১১৮ পৃঃ)

ইহা ছাড়াও শরীআত বিশেষজ্ঞগণ হযরত ঈসা (আঃ)কে রূহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত হইবার বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) সকল রূহকেই মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)–এর রূহের জন্মের মধ্যে সাধারণ নীতিরীতির বিপরীত অলৌকিকভাবে কেবলমাত্র মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করায় সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশার্থে 'রূহুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত হয়।

(২) মৃতজীব তাহার বাক্য قُمْ بِاذْنِ الله 'আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে দাড়াও' দ্বারা জীবিত হইত। এই সম্পর্কের কারণে তাঁহার উপাধি রূহুল্লাহ হয়।

(৩) আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও স্ত্রী মিলন ব্যতীত কেবল কালিমায়ে كُنْ 'হও' শব্দ দ্বারা স্ত্রীজাতির মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হয়।

(৪) যেহেতু তাহার জন্মের মধ্যে সাধারণ রীতি (পুরুষ স্ত্রীর মিলন) জমাট রক্তের মাধ্যমে হয় নাই, তাই তাঁহাকে সম্মানিত উপাধি দান করা হইয়াছে। মোটকথা এই যে, রূহুল্লাহ উপাধি দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)–এর স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইবার বিষয়টি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। আর منه শব্দটি বিশেষ করিয়া তাঁহারই জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। কেননা ইহুদীরা যে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করিত। বস্তুতঃ তাহা নহে বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল এবং তাঁহার মাহবুব ও প্রিয়বান্দা।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) স্বীয় ফতহুল মুলহিম গ্রন্থে 'রূহুম মিনহু' শব্দের মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। জনৈক খ্রীষ্টান পাদ্রী একজন মুসলমান কারীর رُوحٌ مِنْهُ তেলাওয়াত শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিল যে, কুরআন মজীদের এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার অংশ। আর খ্রীষ্টান ধর্মেও এই আকীদাই পোষণ করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার অংশ এবং তাঁহার ছেলে। সুতরাং তোমরা আমাদিগকে ভ্রান্ত বলিবার কোন যৌক্তিকতা নাই।

হযরত আলী বিন হুসাইন বিন ওয়াকিদ (রঃ) উক্ত পাদ্রীর প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তো ইহাও বলিয়াছেনঃ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ -

অর্থাৎ "আর আসমানসমূহে এবং ভূ–পৃষ্ঠে সেই সমস্ত বস্তু রহিয়াছে সেই সকল বস্তুকে তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে।" (সূরা জাছিয়া–১৩)

বলাবহুল্য "رُوحٌ مِّنْهُ" "শব্দ দ্বারা যদি بعضه "তাহার কিছু" অথবা جزء منه "তাঁহার অংশ" মর্ম নেওয়া হয় তবে এই আয়াতের মর্ম হইবে আকাশ ও ভূ–মণ্ডলে যাবতীয় বস্তুই আল্লাহ তা'আলার এক অংশ এবং এক খণ্ড। তোমাদিগকে জিজ্ঞাস্য যে, তোমাদের আকীদা সঠিক হইলে কেবলমাত্র হযরত ঈসা (আঃ)ই আল্লাহ তা'আলার অংশ কেন হইবেন? আকাশ ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় বস্তুকেই তাঁহার অংশ বলিতে হয়। অথচ তোমরা আকাশ ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় বস্তুকেই আল্লাহ তা'আলার অংশ তথা সন্তান হইবার বিশ্বাস কর না। সুতরাং روح منه দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)কে ছেলে হইবার বিষয়টি কিভাবে প্রমাণিত হয়? এই জবাব শ্রবণ করিয়া উক্ত খ্রীষ্টান পাদ্রী মুসলমান হইয়া গেল।

হযরত ঈসা (আঃ)–এর জন্ম যুক্তির পরিপন্থী নহে

আমাদের যুগে কোন কোন ব্যক্তি এই সন্দেহে পতিত হইয়াছে যে হযরত ঈসা (আঃ) পিতা ব্যতীত কিভাবে জন্ম হইলেন? অথচ ইহা চিরাচরিত নীতি ও কানূনের দ্বারা অসম্ভব বুঝা যায়। এই অভিমত পোষণকারীদেরকে জিজ্ঞাস্য যে, তোমরা বিশ্বজগৎকে চিরন্তন অথবা ধ্বংসশীল মনে কর? যদি ধ্বংসশীল তথা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া মান্য কর তবে প্রাথমিক জন্মের মানুষের প্রকাশ কোন একজন ব্যক্তি হইতেই হইবে। যাহার না ছিল পিতা আর না ছিল মাতা। অতএব মহান রব্বুল আলামীন যখন পিতা–মাতা ছাড়া একজনকে সৃষ্টি করিলেন তাহা হইলে পিতা ছাড়া কাহাকেও সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে কি কঠিন ব্যাপার? কখন নহে বরং ইহা আরো সহজ ও যুক্তি সংগত।

আর যদি বিশ্বজগৎকে চিরন্তন ধারণা কর তবে এই চিরন্তন দ্বারা এই মর্ম হওয়া অসম্ভব যে, বিশ্বজগৎ পূর্ব হইতেই অনুরূপ নির্মাণ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। কেননা, নির্মাণ অবস্থা ও পাহাড় পর্বতসমূহ পূর্বকাল ধরিয়া সবসময় পরিবর্তন পরিবর্ধন হইতে যাইতেছে। আর ইহার ভিত্তিতে চক্র তথা মণ্ডলসমূহের চক্র বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হইতেছে। অতঃপর উহার খণ্ডসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া দ্বিতীয় বার একটি নতুন চক্র প্রকাশ করিতে সক্ষম। এই কারণেই আবী কাওর ও দায়ূ জানিস এবং একদল দার্শনিক যাহারা বিশ্বজগৎ চিরন্তনে বিশ্বাসী ছিল তাহারা

লিখেন যে, ভূমণ্ডলের প্রথম বিন্যাসের মধ্যে ভূমণ্ডল হইতে শ্রেষ্ঠতম প্রাণী যেমন– মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদি স্বেচ্ছায় তথা নিজে নিজে সৃষ্টি হইতেছিল। পরিশেষে দীর্ঘযুগ অতিক্রম করিবার পর ভূমণ্ডলের শক্তি হ্রাস পাইতে পাইতে বর্তমানে উহার ক্ষমতা এই পরিমাণে পৌঁছিয়াছে যে, এখন উদ্ভিদ এবং নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী যেমন– ইঁদুর, ক্রিমি, বিছা, পোকা মাকড়, পিঁপড়া, কীট পতঙ্গ ইত্যাদি ব্যতীত শ্রেষ্ঠতম কোন প্রাণী ভূমণ্ডল হইতে স্বেচ্ছায় সৃষ্টি হয় না।

বলাবাহুল্য যেই মহান স্রষ্টা ভূমণ্ডলের মধ্যে এমন ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন যে, মানুষ এবং সকল প্রকার প্রাণী উহা হইতে সৃষ্টি করিয়া দিবেন সেই স্রষ্টার পক্ষে খোদ মানুষ হইতে অপর মানুষ জন্ম দেওয়া কি কঠিন? কখনও হইতে পারে না। আর ইহা যুক্তির পরিপন্থীও নহে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকরা বিশ্বজগতের সৃষ্টির ব্যাপারে গবেষণা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছে। উহা ভাল, তবে তাহারা কি তাহাদের জ্ঞানের পরিধি কতখানি এ সম্পর্কে গবেষণা করিয়াছে? সৃষ্টির জ্ঞান যে কত সীমিত ও সামান্য ইহা বুঝিতে পারিলেই তাহাদের জন্য কল্যাণকর হইত এবং হককে বুঝিতে সক্ষম হইত। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, হযরত ঈসা (আঃ)কে পিতা ব্যতীত সৃষ্টিকে অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা যুক্তি ও দর্শনের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের বর্জনযোগ্য বেহুদা কথা মান্য করিয়া লয়। আর চিরন্তনবাণী কুরআন মজীদের এবং হাদীছে রসূলের যুক্তি সঙ্গত সত্যবাণীর মধ্যে সন্দেহ করে। খোদ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মানুষের প্রাথমিক সৃষ্টি সম্পর্কে এবং বিশ্বজগতের সৃষ্টির প্রারম্ভের বিষয়ে এমন মতানৈক্য রহিয়াছে যে, একে অপরের গবেষণা ও ধারণাকে হাস্যাস্পদ, অলীক, মিথ্যা এবং বাতিল বলিয়া অভিহিত করে।

আল্লামা থানবী (রহঃ) স্বীয় 'বয়ানুল কুরআন' গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মু'জিযা। মু'জিযায় যত অসম্ভব্যতাই থাকুক না কেন উহাতে কোন দোষ নাই। বরং ইহাতে অলৌকিকতা গুণটি আরও অধিক করিয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহাতে তেমন অসম্ভব্যতাও নাই। কারণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বর্ণনা মতে নারীর বীর্যে ধারণ শক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই যদি এই কারকশক্তি আরও বাড়িয়া সন্তান জন্মের কারণ হইয়া যায় তবে তাহা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নহে।

বিপরীত হাদীছ শরীফের সহিত সমন্বয়

আলোচ্য হাদীছ শরীফের শেষাংশ "أَدْخَلَهُ اللّٰهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ" (তাওহীদ, রিসালত ও দ্বীনের মূল আকাঈদসমূহ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া যে ব্যক্তি মানিয়া নিবে) সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের আটখানা দরজার মধ্যে যে কোন দরজা দিয়া (সে প্রবেশের) ইচ্ছা করিবেন তাহাতে প্রবেশ করাইবেন।" দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রবেশকারীকে স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কে কোন্ দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে উহা সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে। উদাহরণতঃ নামাযী ব্যক্তি বাবুস সালাত দিয়া; রোযাদার বাবুর বাইয়্যান দিয়া প্রবেশ করিবে। উভয় হাদীছে বাহ্যিক পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বিরোধ নাই। কারণ যে ব্যক্তির জন্য যেই দরজা নির্ধারিত রহিয়াছে সেই দরজাই তাহার কাছে উত্তম বলিয়া মনে হইবে। ফলে সে স্বাধীনভাবেই সেই দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে।

আল্লামা ওছমানী (রহঃ) একটি কথা বলিয়াছেন যে, হাদীছ শরীফের "شَاءَ" শব্দটির কর্তা যখন আল্লাহ তা'আলা হইবে তখন হাদীছের মর্ম হইবে যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত ব্যক্তিকে এমন আ'মাল করিবার তাওফীক দিবেন যাহার কারণে সে ঐ দরজা দিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে যাহা উক্ত আমলকারীর জন্য নির্ধারিত ছিল। আল্লাহসর্বজ্ঞ।

৪৭ حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقى قال نا مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعى عن عمير بن هانئ فى هذا الاسناد بمثله غير انه قال ادخله الله الجنة على ما كان من عمل و لم يذكر من اى ابواب الجنة الثمانية شاء -

হাদীছ—৪৯. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আহমদ বিন ইব্রাহীম আদ দাওরাকী (রহঃ)১...২... উমায়ব বিন হানী (রহঃ) হইতে এই সনদে উপরোল্লেখিত অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহার বর্ণনায় একটু পার্থক্য রহিয়াছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন সে যে আমলের উপর থাকুক না কেন। আর রাবী এই বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই "জান্নাতের আটটি দরজার যে কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা সে প্রবেশ করিতে পারিবে।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছ শরীফের দুইটি মর্মার্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ "যদি ঈমান ও আকীদা সহীহ হয় তবে আ'মাল যেইরূপই হউক উহার দুর্বলতা ক্ষমাযোগ্য হইতে পারে। আশ্চর্য নহে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমতে শাস্তি ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। দ্বিতীয়তঃ এই মর্ম হইতে পারে যে, জান্নাতে প্রবেশের জন্য ভিত্তিমূলক বস্তু হইতেছে ঈমান ও আকীদার শুদ্ধতা। সুতরাং যে ব্যক্তির ঈমান ও আকীদা শুদ্ধ হইবে সে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে স্বীয় আ'মাল মুতাবিক প্রকোষ্ঠ তথা শ্রেণী প্রাপ্ত হইবে। অবশ্য গোনাহ থাকিলে ক্ষমার মাধ্যমে প্রথমে অথবা গোনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

টীকা-১· الدورقى। 'আদ-দাওরাকী' এই সম্বন্ধে মতানৈক্য রহিয়াছে। তবে প্রসিদ্ধ কথা হইতেছে যে, আহমদ এর পিতা ইব্রাহীম অত্যন্ত ইবাদত গোজারী ছিলেন। আর ঐ যুগে ইবাদত গোজার ব্যক্তিকে দাওরাকী বলিয়া ডাকা হইত।

টীকা-২· الاوزاعى। আল আওযায়ী হইতেছেন আবূ ওমর আবদুর রহমান বিন ওমর বিন ইউহমিদ শামী ও দামেশ্‌কী। তাহার নিজ যুগে সর্বসম্মত মতে তিনি আহলে শামদের ইমাম ছিলেন। তাহার সম্বন্ধ 'আওযায়ী' হইবার বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। উহার একটি অভিমত হইতেছে যে, 'আওযা' দামেশ্‌কের একটি গ্রামের নাম। উক্ত গ্রামের দিকে সম্বন্ধ করিয়াই তাহাকে 'আওযায়ী' বলা হয়।

٥٠ حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت انه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لاشهدن لك ولئن شفعت لاشفعن لك ولئن استطعت لانفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير الا حدثتكموه الا حديثا واحدا وسوف احدثكموه اليوم وقد احيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار.

হাদীছ—৫০. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন কুতায়বা বিন সাঈদ। তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীছ শোনান লায়ছ। তিনি রিওয়ায়াত করেন ইবন আজলান[১] হইতে, তিনি রিওয়ায়াত করেন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন হাব্বান হইতে, তিনি রিওয়ায়াত করেন ইবন মুহায়রীয[২] হইতে। তিনি রিওয়ায়াত করেন সুনাবিহী (রহঃ)[৩] হইতে, তিনি রিওয়ায়াত করেন হযরত উবাদা বিন ছামিত (রাযিঃ) হইতে। হযরত সুনাবিহী (রহঃ) বলেনঃ আমি হযরত উবাদা (বিন সামিত) (রাযিঃ)—এর নিকট গেলাম তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। অতঃপর (তাঁহার অবস্থা দেখিয়া) আমি কাঁদিতে লাগিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, শান্ত হও (আমাকে কথা বলিবার সুযোগ দাও) ক্রন্দন করিতেছ কেন? আল্লাহর কসম। যদি আমাকে সাক্ষী বানানো হয় তাহা হইলে তোমার (ঈমানের) পক্ষে সাক্ষ্য দিব। আর যদি আমার সুপারিশ গৃহীত হয় তাহা হইলে

টীকা—১. ابن عجلان। ইবন আজলান হইলেন ইমাম আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন আজলান আল—মাদানী। তিনি ফাতিমা বিনত ওলীদ বিন উতবা বিন রবীআর গোলাম ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট আবেদ, ফকীহ ও মুফতী ছিলেন। মসজিদে নববী (রহঃ)—এর মধ্যে তাহার একটি দরসগাহ ছিল। তিনি তাবঈ ছিলেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) ও হযরত তুফাইল (রাযিঃ)—এর যুগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি স্বীয় মাতৃগর্ভে তিন বৎসরের কিছু অধিক সময় ছিলেন। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা—২. ابن محيريز। ইবন মুহাইরীয হইলেন আবদুল্লাহ বিন মুহাইরীয জানাদা বিন ওহাব আল করশী আবূ আবদিল্লাহ। তিনি প্রবীন তাবঈ ছিলেন। ইমাম আওযায়ী (রহঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, যদি কাহারও অনুসরণ কর তবে ইবন মুহাইরীয (রহঃ)—এর ব্যক্তিত্বের অনুসরণ করিবে। কারণ যেই উম্মতের মধ্যে ইবন মুহাইরীয—এর ন্যায় ব্যক্তি বর্তমান থাকিবে আল্লাহ তা'আলা সেই উম্মতকে কখনও পথভ্রষ্ট করিবেন না। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা—৩. الصنابحي। আস—সুনাবিহী হইলেন আবূ আবদিল্লাহ আবদুর রহমান বিন উসাইলা আল—মুরাদী। মুরাদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা গোত্রের নাম সুনাবিহ। তিনি প্রবীন তাবঈ ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে মদীনার পথে সফর আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে জুহফা নামক স্থানে পৌছিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহলোক ত্যাগ করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর ওফাতের পাঁচ অথবা ছয় দিন পর তিনি মদীনায় গমন করেন। হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ও অন্যান্য সাহাবা কেরাম (রাযিঃ) হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। খলীফা আবদুল মালিক—এর যুগে তিনি পরলোক গমন করেন। উল্লেখ্য যে, অপর একজন সুনাবিহ রহিয়াছেন, তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি হইলেন সুনাবিহ বিন আ'সার (রাযিঃ)। ইলমে হাদীছে অনভিজ্ঞতা হেতু অনেকেই উভয়কে একব্যক্তি বলিয়া ধারণা করেন। প্রকাশ থাকে যে, হাদীছের সনদসমূহের মধ্যে আলোচ্য হাদীছের সনদসূত্র মর্যাদাবহ ও অত্যন্ত সৌন্দর্যপূর্ণ রীতিতে বৈশিষ্টপূর্ণ। কারণ এই সনদে চারিজন তাবঈ একত্রিত হইয়াছেন যাহারা একে অপরের নিকট হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। যেমন— ইবন আজলান, ইবন হাব্বান, ইবন মুহাইরীয ও সুনাবিহী (রাহিমাহুমুল্লাহ)। (ফতহুল মুলহিম)

অবশ্যই তোমার জন্য সুপারিশ করিব। আর যদি আমার সাধ্যে (তোমাকে কোন প্রকার উপকার করিবার পন্থা) থাকে তবে নিশ্চয় আমি তোমার উপকার করিব। তারপর হযরত উবাদা (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের জন্য কল্যাণ রহিয়াছে এমন যতগুলি হাদীছ শরীফ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি উহাদের একটি হাদীছ শরীফ ব্যতীত সকল হাদীছ শরীফই তোমাদের নিকট বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। আজ সেই অবশিষ্ট হাদীছ শরীফখানাই তোমাদের কাছে বর্ণনা করিতেছি। কেননা আজ আমার রূহ, সম্ভুত পিঞ্জর হইতে উর্ধ বিচরণে প্রস্তুত (অর্থাৎ মৃত্যু সময় উপস্থিত) হইয়াছে। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি; যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার (মনোনীত) রসূল; আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ইসলামী শরীআতে দুইটি মূল বিষয় রহিয়াছে। যে ব্যক্তি এতদুভয়ের কোন একটিও যদি ছাড়িয়া দেয় সেই ব্যক্তির না দ্বীন গ্রহণযোগ্য আর না কোন আমল। ইহার একটি হইতেছে যে, একক আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করা এবং ইবাদতে অন্য কাহাকেও অংশীদার না করা। দ্বিতীয় হইতেছে যে, ঐ পদ্ধতিতে ইবাদত করা যাহা শরীআত নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। নতুন আবিস্কার এবং নিজের কৃত্রিম পদ্ধতি না হওয়া চাই। অতএব সম্পূর্ণ দ্বীনে ইসলামের সারমর্ম যেন এই হইল যে, কেবল একক আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করা। আর ইবাদত ঐ নিয়মে করা যেই নিয়ম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রসূল করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন।

হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব (রহঃ) স্বীয় মাকতুবাতে ঈমানের অধ্যায়ে একটি বিষয় অত্যন্ত সুন্দর লিখিয়াছেন। উহা অনুধাবন করিলে হাদীছ শরীফের মধ্যে ঈমান সম্পর্কে যে সকল স্থানে সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত বর্ণনার পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইবে এবং উহার ব্যাখ্যায় যেই মুস্কিল অনুভূত হয় উহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায়। হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ)-এর বিবরণের সারাংশ এই যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সকলেরই দ্বীনের মূল বিষয়ে সর্বসম্মত আকীদা যে, একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অন্য কাহাকেও অংশীদার না করা। এই চিরসত্য হযরতে আম্বিয়া (আঃ) ব্যতীত অন্য কাহারো মুখ হইতে প্রকাশিত হয় নাই। আর যখন এই কালিমায়ে তাওহীদ যাহা একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ইবাদতের হকদার হইবার নিষেধ করে তখন এই বিষয়টি আম্বিয়া আলাইহিস সালামের পবিত্র জিহ্বা তথা ভাষায় ব্যাখ্যাতার দয়া হইতে শুরু হয়। তাই এই অর্থের লক্ষ্যে যে ব্যক্তিই উক্ত কালিমা পাঠ করিবেন তিনি প্রকৃতভাবে কেবল রসূলের অনুসরণ এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের পরই পাঠ করিবেন। এই কারণেই উক্ত ব্যক্তির কালিমা পাঠের মধ্যই রিসালতের সত্যায়নকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। সুতরাং আম্বিয়া (আঃ)-এর দাওয়াতে তাওহীদকে স্বীকার করাই বস্তুতঃ তাহাদিগকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও স্বীকার করাকেই বুঝায়। আর যেইরূপ তাওহীদ শুধু জিহ্বা দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে একক নাম নহে বরং অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসও করিতে হইবে তদ্রূপ রসূলের উপর ঈমানও কেবল তাঁহাকে বিশ্বস্ত খাঁটি মানব বলিয়া মানিয়া নেওয়ার নাম নহে বরং রসূলকে ঐ যাবতীয় মর্যাদা ও সম্মানের সহিত মান্য করা অপরিহার্য যাহা কুরআন মজীদে তাঁহার জন্য অত্যাবশ্যক গণ্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ রসূলকে মানিবার মর্ম হইতেছে যে, তাঁহার আনিত শরীআতকে নিজের পার্থিব জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে পরজীবনের কল্যাণের জন্য বিধিবদ্ধ আইন বানাইয়া লওয়া।

অতঃপর যখন রসূলের জীবন এইভাবে অবশ্য কর্তব্য হইয়া যায় তখন অন্যান্য সকল অদৃশ্যাবলীর সত্যায়নও রসূলের সত্যায়নের মধ্য দিয়া স্বেচ্ছায় আঁকড়াইয়া যায়। জাহান্নাম, ফিরিশতা, তকদীর এবং পুনরুত্থান তথা আখিরাতে যাবতীয় অবস্থাবলী উহারই অধীনে আসিয়া পড়ে। এই কারণেই হাদীছ শরীফসমূহে সাধারণভাবে শুধু শাহাদাতাইনের উল্লেখকেই যথেষ্ট গণ্য করা হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন স্থানে শাহাদাতাইনের সহিত অন্যান্য আকীদাসমূহকেও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল হাদীছ শরীফসমূহের মধ্যে মূল বিষয়ের কোন পার্থক্য নাই

শুধু সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত অথবা একটি ব্যাখ্যা পদ্ধতির বিভিন্নতা মাত্র। এই সম্মত ও যথার্থ স্বীকৃত আকীদার বিপরীত কোন সুক্ষ্ম দৃষ্টি তথা খুঁটিনাটি বিষয় অনুসন্ধান করা তাহকীক তথা বিশ্বস্ততা নহে বরং উহা দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাসেরই নামান্তর।

বক্তা শ্রোতা মণ্ডলীর জ্ঞান—বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া বক্তব্য পেশ করা বাঞ্ছনীয়

হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) শপথসহ সুনাবিহীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেনঃ যতগুলি হাদীছ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি যাহাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রহিয়াছে উহাদের একটি হাদীছ ব্যতীত সকল হাদীছকেই আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছি। আজ সেই অবশিষ্ট হাদীছখানাই তোমার নিকট বর্ণনা করিব। কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঐ সকল হাদীছ গোপন করিয়াছেন যেই সকল হাদীছকে তিনি কোন ক্ষতি বা ফিৎনার কারণ হইবে বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। কারণ, সকল মানুষের জ্ঞান—বুদ্ধি এই পরিমাণ নাই যে, প্রত্যেক হাদীছের মর্ম অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে। অধিকন্তু যেই সকল হাদীছে কোন প্রকার আমলের কথা নাই অথবা ইসলামী শরীআতের কোন আবশ্যকীয় বিষয়াবলীর কোন বিষয় না থাকিলে উহা বর্ণনা করিতে বিরত রহিয়াছেন। অনুরূপ অনেক সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) যেই সকল হাদীছে কোন আমলের বর্ণনা নাই এবং উহা জানিবার প্রতি উম্মতের আবশ্যকও নাই অথবা সাধারণ মানুষের জ্ঞান—বুদ্ধি উক্ত হাদীছের মর্ম অনুধাবনে অপারগ অথবা বক্তা ও শ্রোতাদের ক্ষতির সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে সেই সকল হাদীছ বর্ণনা করা হইতে বিরত রহিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, এই প্রকারের হাদীছসমূহ হইতেছে মুনাফিকদের বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ, কিয়ামতের আলামত, কোন সম্প্রদায়ের মন্দ গুণাবলী বা তিরস্কার এবং ভৎর্সনা ইত্যাদি বর্ণিত হাদীছ।

বলাবাহুল্য যেই সকল হাদীছসমূহের মধ্যে এই সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে, শ্রোতাদের জ্ঞান—বুদ্ধির স্বল্পতা হেতু হাদীছের সহীহ মর্ম না বুঝিবার কারণে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি হইবার প্রবল ধারণা হয় তাহা হইলে উক্ত হাদীছসমূহ গোপন করিবার মধ্যে কোন দোষ নাই বরং অনেক ক্ষেত্রে গোপন রাখাই অত্যাবশ্যক। এই সম্পর্কে হযরত আলী (রাযিঃ) বলেনঃ

حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون ان يكذب الله ورسوله -

"মানুষের জ্ঞান—বুদ্ধি ও অনুধাবন ক্ষমতা অনুসারে হাদীছ শরীফ বর্ণনা কর। তোমরা কি ইহা পছন্দ কর যে, তাহারা (হাদীছ শরীফের প্রকৃত মর্মার্থ না বুঝিয়া) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলকে মিথ্যার অপবাদ দিয়া বসুক?"

হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ) বলেনঃ

ما انت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة -

অর্থাৎ "এমন কোন সম্প্রদায়ের নিকট তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর হাদীছ বর্ণনা করিবে না, যে সম্প্রদায়ের উক্ত হাদীছের মর্মার্থ অনুধাবন করিবার মত জ্ঞান—বুদ্ধি নাই। (শ্রোতার অনুধাবন ক্ষমতার বিবেচনা না করিয়া হাদীছ বর্ণনা করিলে) অনেক লোক ফিৎনায় পতিত হইবে।" (ফতহুল মুলহিম, নববী)

এক হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ

لا تمنعوا الحكمة اهلها فتظلموهم ولا تضعوها فى غير اهلها فتظلموها -

অর্থাৎ "গুঢ় তত্ত্বের বিষয়সমূহকে এমন লোকদের নিকট গোপন করিবে না, যাহারা উহার যোগ্য। যদি তোমরা এমন কর তাহা হইলে উহা মানুষের উপর যুলুম হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা যোগ্য নয় তাহাদের সামনে হেকমত বা সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করিবে না। কারণ, ইহাই হইবে উক্ত বিষয়ের উপর যুলুম।"

ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাহাদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তব্য উপস্থাপন করা হইবে তাহাদের অবস্থার অনুপাতে কথা বলাও আলেমের জন্য একটি অন্যতম দায়িত্ব। যাহাদের পক্ষে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাদের সামনে এমন মাসআলা মাসায়েল বর্ণনা করিবে না। সেই জন্যই সম্মানিত ফেকাহবিদগণ বহু বিষয় বর্ণনা শেষে লিখিয়া থাকেন هذا مما يعرف ولا يعرّف এই বিষয়টি এমন যাহা আলিমগণ জানিয়া নিবেন। কিন্তু সাধারণের নিকট প্রচার করিবেন না অর্থাৎ তাহা উচিৎ হইবে না।

শাহাদাতাইনের সাক্ষ্য প্রদানসহ উহার হক আদায়কারীর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম

আলোচ্য হাদীছের উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, শাহাদাতাইনের মধ্যে দ্বীনে শরীআতের যাবতীয় বিষয় শামিল রহিয়াছে। কাজেই তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য প্রদান ও দৃঢ় বিশ্বাসসহ দ্বীনে শরীআতের যাবতীয় বিষয়ের উপর যথাযথ আমল করিলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করিয়া দিবেন।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) স্বীয় ফতহুল মুলহিম গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) বলিয়াছেনঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট অকাট্য প্রমাণাদির দ্বারা এই কথা প্রমাণিত যে, গুনাহগার ফাসেক মুসলমান চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে না। তবে তাহার শাস্তি অবশ্যই হইবে। অতঃপর শাফায়াতের পর তাহাকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। অতএব বুঝা যায় যে, হাদীছের মর্ম ইহা নহে যে, গুনাহগার স্বীয় গুনাহের শাস্তি ভোগ করিবে না বরং মর্ম এই হইবে, যে ব্যক্তি ঈমান ও আকীদার সহিত নেক আমলের উপর কায়েম ছিল তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হইবে। অতঃপর আল্লামা ওছমানী (রহঃ) অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন জবাবাদিও উল্লেখ করিয়াছেনঃ

(১) আলোচ্য হাদীছ শরীফের প্রয়োগ তাওবার সহিত সম্পর্কিত। যে মুমিন গুনাহগার ব্যক্তি খালেছ তাওবা করিয়া শাহাদাতাইনের উপর মৃত্যুবরণ করিবে তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হইবে।

(২) অত্র হাদীছ শরীফ শরীআতের ফরায়েযের বিধান অবতীর্ণ হইবার পূর্বের। কিন্তু এই জবাবে আপত্তি আছে। কারণ এই হাদীছের অনুরূপ হাদীছ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ইমাম মুসলিম (রহঃ) রিওয়ায়াত করিয়াছেন। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হিজরী সপ্তম সনে খাইবর বিজয়ের বৎসর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তখন শরীআতের সকল আহকামই প্রবর্তন হইয়াছিল এবং সকল ফরয যেমন– নামায, রোযা এবং যাকাত ফরয হইয়াছিল। কেবল হজ্জ সম্পর্কে দ্বিমত রহিয়াছে। অবশ্য এক বর্ণনা মতে হজ্জ ৫ম বা ৬ষ্ঠ হিজরী সনে ফরয হইয়াছিল। এই হিসাবে তখন হজ্জও ফরয হইয়াছিল। তবে অন্য একটি বর্ণনায় হজ্জ হিজরী ৯ম সনে ফরয হইবার অভিমত রহিয়াছে।

অধিকন্তু শুধু হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতেই নহে বরং হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ) হইতেও এই মর্মের হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আর তিনিও ঐ বৎসরই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে হাযির হইয়াছিলেন যেই বৎসর হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং কিরূপে মান্য করা যায় যে, এই মর্মে হাদীছসমূহ শরীআতের ফরায়েয–এর বিধান নাযিল হইবার পূর্বে ছিল।

আল্লাম আইনী (রহঃ) বলেন, এই আপত্তির উপর আপত্তি আছে। কারণ ইহাতে সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) এবং হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ), হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে এই প্রকারের রিওয়ায়াতসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন যাহা ফরায়েয অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই ছিল। অতঃপর ফরয অবতীর্ণ হইবার পর উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লামা ওছমানী (রহঃ) আল্লামা আইনী (রহঃ)–এর "আপত্তির উপর আপত্তি"কে মারাত্মক ভুল বলিয়া খণ্ডন করিয়া লিখিয়াছেন যে, হাফেয ইবন হাজার (রহঃ) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) ও হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ)–

এর যেই সকল রিওয়ায়াতের হাওয়ালা তথা বরাত দিয়াছেন উহা হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে নহে বরং হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) ও হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ)–এর মাসানিফ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকন্তু হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ যাহা ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় সহীহ মুসলিম শরীফে (৫৫ নং হাদীছ) রিওয়ায়াত করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়াতের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুবারক পাদুকাদ্বয় হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)–এর নিকট দেওয়ার এবং হযরত ওমর (রাযিঃ) উক্ত সুসংবাদকে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিবার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)–এর ইসলাম গ্রহণের পরেই হইয়াছিল। কাজেই এরূপ উজ্জলতম দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও কিরূপে আল্লামা আইনী (রহঃ)–এর ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হাদীছ বিশেষজ্ঞের দৃষ্টির আড়ালে পড়িয়া গেল ইহা বোধগম্য নহে।

(৩) আলোচ্য হাদীছে প্রায় নিশ্চিত অবস্থা প্রকাশ করিয়াছে যে, একজন তাওহীদবাদী ব্যক্তি সাধারণতঃ নেক আমল করিবে এবং গুনাহ হইতে বিরত থাকিবে।

(৪) জাহান্নামের আগুন তাহার উপর হারাম করা হইবে। ইহার মর্ম হইতেছে যে, চিরকাল জাহান্নামে থাকাকে হারাম করা হইবে। অর্থাৎ গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর জাহান্নামের আগুন তাহার উপর হারাম করা হইবে। ইহার দ্বারা আসল আগুনে প্রবেশের নিষেধ করা হয় নাই বরং চিরস্থায়ী আগুনে প্রবেশের নিষেধ করা হইয়াছে।

(৫) আগুন দ্বারা মর্ম ঐ আগুন ও জাহান্নামের স্তর যাহা কাফির ও মুশরিকদের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে। একত্ববাদী মুমিন গুনাহগারের জন্য শাস্তির আগুন মর্ম নহে।

(৬) জাহান্নামের আগুন হারাম হইবার দ্বারা মর্ম হইবে যে, মুমিন গুনাহগারের সম্পূর্ণ শরীরের উপর আগুন হারাম করা হইবে। কেননা জাহান্নামের আগুন মুসলমানের সিজদার স্থানসমূহ এবং জিহ্বা (যাহার দ্বারা তাওহীদ স্বীকার করিয়াছে) সম্পূর্ণভাবে জাহান্নামের আগুন হইতে নিরাপদ থাকিবে। এই সকল স্থানে আগুন স্পর্শও করিবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম)

ফায়দাঃ দ্বীনে শরীআতের সুক্ষ্ম বিষয় সাধারণ জনসভায় বয়ান করা উচিত নহে। কারণ অনেকে উহার মর্ম না বুঝিয়া ফিৎনা ফাসাদে পতিত হইবে।

٥١ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ قَالَ نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

হাদীছ—৫১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদিগকে হাদীছ শোনান হাদ্দাব বিন খালিদ আল-আযদী (রহঃ)।[১] তিনি...হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেনঃ একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পশ্চাতে (একটি সওয়ারীর মধ্যে) বসা ছিলাম।[২] আর (এত নিকটে উপবিষ্ট ছিলাম যে,) আমার এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে হাওদার কাষ্ঠ খণ্ড ব্যতীত আর কোন ব্যবধান ছিল না (অর্থাৎ অত্যন্ত নিকটে ছিলাম ফলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন ও স্মরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম)। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে সম্বোধন করিয়া) বলিলেনঃ হে মুআয বিন জাবাল। আমি (জবাবে) বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি হাযির আছি এবং আপনার আনুগত্যে প্রস্তুত রহিয়াছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো কিছুক্ষণ (পথ) চলিলেন। অতঃপর বলিলেনঃ হে মুআয বিন জাবাল। আমি আরয করিলাম; ইয়া রসূলাল্লাহ! বান্দা আপমার খেদমতে হাযির; আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ (পথ) চলিলেন। অতঃপর (তৃতীয়বার) বলিলেনঃ হে মুআয বিন জাবাল![৩] আমি (জবাবে) বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য।[৪] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ তুমি কি জান, বান্দাদের উপর আল্লাহ তা'আলার কি হক রহিয়াছে? হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার (মনোনীত) রসূলই উহা ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ বান্দাদের উপরে আল্লাহ তা'আলার হক হইতেছে এই যে, তাহারা তাঁহার ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত অন্য কোন বস্তুকে শরীক করিবে না।

টীকা-১: هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ হাদ্দাব (রহঃ)কে هُدْبَه হুদবাহও বলা হয়। ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় সহীহ মুসলিম শরীফের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। কোন স্থানে هَدَّاب হাদ্দাব আর কোন স্থানে هُدْبَه হুদবাহ বর্ণনা করিয়াছেন। সর্বসম্মত অভিমত হইতেছে যে, একটি নাম আর অপরটি উপনাম। অতঃপর কোন্‌টি নাম এবং কোন্‌টি উপনাম এই বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। আবূ আলী গাস্‌সানী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, হুদবাহ হইতেছে নাম আর হাদ্দাব হইতেছে উপনাম। আর আবূ আমর (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, 'হুদবাহ' উপনাম এবং 'হাদ্দাব' নাম। (নববী, ফতহুল মুলহিম)

টীকা-২: "كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم" একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহনের পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলাম। আর সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে - ومعاذ رديفه على الرحل "ردف" শব্দটি একটি সওয়ারীর উপর দুইজন আরোহণ অবস্থায় পিছনে যিনি বসেন তাহাকে رِدْف বলা হয়। رحل শব্দটি অধিকাংশ সময় উটের পিঠের হাওদাকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে উট নহে বরং গাধার পিঠের হাওদার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ পরবর্তী (৫২নং হাদীছেও একই ঘটনার বিবরণে) গাধার কথা বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছ শরীফের এই বাক্য দ্বারা তিনটি কথা বুঝা যায়। (১) শক্তিশালী সওয়ারীর উপর আগে পিছে দুই ব্যক্তি আরোহণ করা

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ (পথ) চলিবার পর পুনরায় বলিলেনঃ হে মুআয বিন জাবাল! আমি বলিলাম; ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার খেদমতে হাযির এবং আপনার আনুগত্যে প্রস্তুত আছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ তুমি কি জান, বান্দাগণ ইহা যথাযথ পালন করিলে আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দার কি হক রহিয়াছে? আমি আরয করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রসূলই উহা উত্তম জানেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ (আল্লাহ তা'আলার উপর বান্দার হক হইতেছে যে, যদি বান্দা শরীকহীন খালেছ একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে তবে) তিনি স্বীয় বান্দাগণকে শাস্তি দিবেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(ক) " حق "'হক' বলা হয় প্রত্যেক বাস্তব বস্তুকে যাহা অকাট্যভাবে পাওয়া অথবা যাহা ভবিষ্যতে পাওয়া জরুরী তথা অত্যাবশ্যক হয়। যখন বলা হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা হক অথবা মৃত্যু, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম 'হক' তখন উহার মর্ম এই হইবে যে, ইহা অকাট্যভাবে অবশ্যই পাওয়া যাইবে। এই কারণেই সত্য কথাকেও 'হক' বলা হয়। কারণ উহা অকাট্যভাবে পাওয়া গিয়াছে এবং উহার বাস্তবতা বিদ্যমান রহিয়াছে। অনুরূপভাবে 'হক' ওয়াজিব এবং লাযিম তথা অত্যাবশ্যককে বলা হয় যাহার মধ্যে কোন এখতিয়ার তথা স্বাধীনতা নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত ফরায়েয সমূহ আদায় অবশ্য কর্তব্য এবং কাহারও ধার পরিশোধ করা অত্যাবশ্যক। আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত 'হক' শব্দটির স্থান উপযোগী অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব যখন বলা হইবে যে, حق الله على العباد বান্দাদের উপর আল্লাহ তা'আলার হক রহিয়াছে তখন উহার মর্ম এই হইবে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর যাহা ফরয এবং ওয়াজিব করিয়াছেন উহা আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। করিবার না করিবার স্বাধীনতা নাই।

এই সম্পর্কে মহান রব্বুল আলামীন এরশাদ করেনঃ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

জায়েয (২) এই বাক্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিনয় ও ভদ্রতার মাহাত্ম্য প্রকাশ ঘটিয়াছে। (৩) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে হযরত মুআয (রাযিঃ)কে তিনবার সম্বোধন করিয়া অত্যন্ত গোপন কথা প্রকাশ করিবার দ্বারা হযরত মুআয (রাযিঃ)-এর জ্ঞানে পারদর্শিতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-৩ يا معاذ بن جبل হে মুআয বিন জাবাল! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিবার পথে স্বীয় সাথী হযরত মুআয (রাযিঃ)কে থামিয়া থামিয়া পরপর তিন বার সম্বোধন করিয়াছেন। বলাবাহুল্য কোন উর্ধতন কর্মকর্তা যদি নিম্নপদস্থ কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যাপারে সম্বোধন করে তবে নিম্নপদস্থ ব্যক্তির অন্তরে যাবতীয় চিন্তা দূর করিয়া সম্বোধনকারীর প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়। আর থামিয়া পুনঃ পুনঃ আহবান করিবার দ্বারা আরও অধিকভাবে একাগ্রতা সৃষ্টি হয় এবং বক্তব্য শ্রবণের প্রতি অতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আকাংক্ষা সৃষ্টি হইবার পর বক্তব্য পেশ করিলে শ্রোতার অন্তরে বক্তব্যটির অত্যধিক গুরুত্ব প্রকাশ পায় এবং মনে গাঁথিয়া হেফয হইয়া যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)কে তিনবার সম্বোধন করিবার মাধ্যমে স্বীয় উপস্থাপিত বক্তব্যের অত্যধিক গুরুত্বের প্রতি তাকীদ করাই উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ এরশাদের পূর্বে এই নীতি অবলম্বন করিতেন। সহীহ হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, انه صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلثا لهذا المعنى অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বভাব শরীফ ছিল যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিতেন তখন উহা পুনঃ পুনঃ তিনবার সম্বোধন করিতেন যাহাতে শ্রোতার অন্তরে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।" (ফতহুল মুলহিম, নববী)

টীকা- ৪ لبيك سعديك আপনার জন্য আমি হাযির, আমি আপনার আনুগত্যের জন্য নিয়োজিত আছি। দ্বিবচন লওয়া হইয়াছে তাকীদের জন্য। আসল বাক্য হইবে البّ لك البابا بعد الباب আর السعد শব্দের অর্থ বরকত বা সুভাগ্য। উহার বহুবচন اسعد এবং سعود আসে لبيك سعديك অর্থাৎ আমি আপনার খেদমতের জন্য পুনঃ পুনঃ হাযির। (বিস্তারিত ইনশাল্লাহ কিতাবুল হজ্জ দ্রষ্টব্য)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ـ

অর্থাৎ "কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর পক্ষে সম্ভব নয় যে, যখন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূল কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তখন সে কাজে সে সব মুমিনগণের কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে। (অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী করিবার বা না করিবার) অধিকার থাকে না। বরং তাহা কার্যে পরিণত করাই ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক হইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের কথা অমান্য করে, সে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পতিত হইল।" (সূরা আহযাবঃ ৩৬)

একটি বিশেষ মূল বিষয় হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অন্য কাহাকেও অংশীদার না করা। বস্তুতঃ অংশীদারহীন একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতই একান্ত কাম্য। ইহাই তাওহীদ ফিল ইবাদত। ইবাদতে তাওহীদ তথা খালেছ একক আল্লাহ তা'আলার জন্য ইবাদত না হইলে উহা গ্রহণযোগ্য নহে। এই কারণেই ইসলামী শরীআত যে সকল বস্তুতে শিরক–এর গন্ধ লেশ মাত্রও বিদ্যমান রহিয়াছে উহা হইতেও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থাৎ "(হে নবী!) আপনি বলিয়া দিন। আমি তো তোমাদেরই মত মানুষ। (তবে) আমার নিকট কেবল এই ওহী আসে যে, তোমাদের ইলাহ তথা মা'বুদ হইতেছেন একক মা'বূদ। সুতরাং যেই ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সহিত (সাফল্যময়) সাক্ষাৎ লাভের আকাংক্ষা রাখে তবে সে যেন নেক কাজ করিতে থাকে এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাহাকেও অংশীদার না করে।" (সূরা কাহফঃ ১১০)

আর যখন বলা হইবে যে, حق العباد على الله ـ "আল্লাহ তা'আলার উপর বান্দাদের হক রহিয়াছে তখন উহার মর্ম হইবে যে, উহার নিশ্চয়তা প্রদান অর্থাৎ উহা অবশ্যই পাওয়া যাইবে।"

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেনঃ বান্দা যদি অংশীদারহীন খালেছ একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে তবে তাহার জন্য ছাওয়াব ও প্রতিদানের অঙ্গীকার রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু ওয়াদা করিয়াছেন সেহেতু উহা অকাট্যভাবে সত্য হইবে। তাঁহার খবর মিথ্যা হইবার না অবকাশ আছে, আর না বিপরীত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই হিসাবেই "হক" বলা হইয়াছে, না হয় আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর উপর কোন বস্তু নির্দেশক্রমে ওয়াজিব নাই। কারণ তিনিই নির্দেশদাতা, তাঁহার উপর নির্দেশ দেওয়ার মত কাহারও অস্তিত্ব নাই। তিনি আদি, অনন্ত, চিরন্তন, সার্বভৌম ও মহাশক্তিধর। (কুরতুবী)

(খ) "হক" শব্দের অর্থ الجدير অর্থাৎ " لائق " তথা উপযুক্ত হইবে। কেননা যে ব্যক্তি খালেছ একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করিবে সে উপযুক্ত যে, হিকমতে এলাহী (নিজ) অনুগ্রহে তাহাকে আযাব দিবেন না।

(গ) যেইরূপ ওয়াজিব পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক অনুরূপ ইহারও বাস্তবতা এবং তাকীদের ক্ষেত্রে ওয়াজিবেরন্যায়।

(ঘ) আল্লাহ তা'আলার 'হক'–এর বিপরীতে বান্দাদের 'হক'–এর উল্লেখ করা হইয়াছে।

٥٢ حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة قال ثنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن ابى اسحق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير قال فقال يا معاذ تدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا -

হাদীছ–৫২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদিগকে হাদীছ শোনান আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীছ শোনান আবুল আহওয়াস সালাম বিন সুলাইম (রহঃ)। তিনি---হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেন, আমি এক সফরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সহিত গাধার পিঠে তাহার পশ্চাতে বসা ছিলাম।[১] উক্ত গাধাটির নাম উফায়র ছিল।[২] হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে সম্বোধন করিয়া) বলিলেনঃ হে মুআয! তুমি কি অবগত আছ যে, বান্দাদের উপর আল্লাহ তা'আলার কি হক এবং আল্লাহ তা'আলার উপর বান্দাদের কি হক রহিয়াছে? হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলামঃ আল্লাহ তা'আলা ও (ওহীর মাধ্যমে) তাঁহার (মনোনীত) রসূলই তাহা উত্তম জানেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ নিশ্চয় বান্দাদের উপর আল্লাহ তা'আলার হক হইল তাহারা একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত অন্য কিছু শরীক করিবে না। আর আল্লাহ তা'আলার উপর বান্দাদের হক হইতেছে, যে আল্লাহ তা'আলার সহিত কোন কিছু শরীক করিবে না তাহাকে তিনি আযাব দিবেন না।

হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেনঃ আমি আরয করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কি লোকজনের নিকট এই সুসংবাদটি প্রচার করিব না? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ না, (সার্বজনিনভাবে) লোকজনের নিকট এই সংবাদ প্রচার করিও না। হয়ত বা (সাধারণ লোকেরা ইহার মর্মার্থ বুঝিবে না। তাই গুনাহ হইতে বাঁচিয়া অধিক নেক কাজে ত্যাগ স্বীকার না করিয়া) কেবল ইহার উপরই তাহারা ভরসা করিয়া থাকিবে। (ফলে প্রাথমিক নাযাতসহ জান্নাতের উচ্চস্তর লাভে বঞ্চিত হইবে।)

টীকা–১· পূর্ববর্তী রিওয়ায়াতে হাওদা বর্ণিত হইয়াছে। হাওদা উটের পিঠে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠে সাওয়ার ছিলেন। আর আলোচ্য রিওয়ায়াতে গাধার পিঠে সাওয়ারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, উভয়টি পৃথক ঘটনা। শারেহ বলেনঃ উভয় রিওয়ায়াতের ঘটনা একটি হইবার সম্ভাবনা আছে। হয়ত বা রাবী হযরত মুআয (রাযিঃ) পূর্বের রিওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার মধ্যকার দূরত্বের বিষয়টি বুঝাইবার উদ্দেশ্যে কেবল হাওদার পশ্চাতে রক্ষিত কাষ্টখণ্ডের উদাহরণ দিয়াছেন অর্থাৎ একটি সাওয়ারীতে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলাম। আমাদের মধ্যে হাওদার পশ্চাতের কাষ্ঠখণ্ডের ব্যবধান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি অত্যন্ত নিকটে বসা ছিলাম। ফলে তাঁহার এরশাদসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন ও হেফয করিতে পূর্ণভাবে সক্ষম হইয়াছি।

টীকা–২· عُفَيْرٌ উফায়র শব্দটি عفر হইতে অনুসৃত। عفر শব্দের অর্থ মাটির রং। এই রংয়ের নামেই গাধাটির নামকরণ 'উফায়র' হইয়াছে। দামইয়াতী (রাযিঃ) বলেনঃ এই গাধাটি শাহ মাকোকাস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। বিদায় হজ্জের সময় উহা মরিয়া গিয়াছিল। অন্য একটি গাধা ফারূহ বিন আমর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দিয়াছিলেন। উহার নাম يعفور ইয়াফূর। ইয়াফূর বলা হয় হরিণের বাচ্চাকে। সম্ভবতঃ গাধাটি অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন ছিল বলিয়া উহার নামকরণ ইয়াফূর হইয়াছিল। আর কেহ কেহ উহার বিপরীত বলিয়াছেন অর্থাৎ উফায়র নামক গাধাটি ফারূহ বিন আমর এবং ইয়াফূর নামক গাধাটি শাহ মাকোকাস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়ারূপে প্রদান করিয়াছিলেন। (ফতহুল মুলহিম)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি গুরুত্ব সহকারে হযরত মুআয (রাযিঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিলেনঃ বান্দাগণ যদি খালেছ একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে তবে করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাহাকে আযাব দিবেন না। এই সুসংবাদ শ্রবণের পর হযরত মুআয (রাযিঃ) আরয করিলেনঃ আমি কি এই সুসংবাদ জনগণের নিকট প্রচার করিব? তদুত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, সার্বজনিনভাবে মানুষের নিকট এই সুসংবাদ প্রচার করিও না। কারণ, সকল মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বোধগম্যতা সমান নহে। ফলে অনেকেই হয়ত এই সুসংবাদের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন না করিবার কারণে শুধু ইহার উপরই ভরসা করিয়া থাকিবে। গুনাহ হইতে পরহেজ করিয়া অধিক নেক কাজে সাধনার মাধ্যমে প্রাথমিক নাযাতসহ জান্নাতের উচ্চ হইতে উচ্চস্তর লাভ করিতে পারিবে না।

অন্য রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)কে সুসংবাদ জনগণের নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাযিঃ) আপত্তি করায় উহা প্রচার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যেমন- বায্যার হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে সহীহ সূত্রে এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেনঃ

ان النبى صلى الله عليه وسلم اذن لمعاذ فى التبشير فلقيه عمر فقال لا تجعل ثم دخل فقال يا نبى الله انت افضل رأيا ان الناس اذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها قال فرده۔

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সুসংবাদকে জনসমক্ষে প্রচারের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত মুআয (রাযিঃ)-এর সহিত হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর সাক্ষাত হইলে তিনি বলিলেন, এই সুসংবাদ প্রচারে তাড়াহুড়া করিও না। তারপর হযরত ওমর (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে গমন করিয়া আরয করিলেনঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ! আপনি যেই সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহে যথার্থ। কিন্তু মানুষ যখন ইহা শ্রবণ করিবে তখন (এই সুসংবাদের সার-রহস্য উদঘাটন করিয়া সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করিতে পারিবে না, তাই হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের উপর) তাহারা ভরসা করিয়া থাকিবে। রাবী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর অভিমত গ্রহণ করিয়া) তাহাকে সুসংবাদ প্রচার করিতে নিষেধ করিলেন।

বলাবাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক চলিবার নামই ইবাদত। আর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যও ইবাদতই। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাইলে প্রত্যক্ষ করা যায় যে অধিকাংশ মানুষ এই ইবাদতেই অংশীদার সাব্যস্ত করিয়াছে। না হয়, আল্লাহ তা'আলার সত্তার একত্বের উপর মক্কার কাফির ও মুশরিকদেরও বিশ্বাস ছিল। উল্লেখ্য যে, আবরাহা বাদশা যখন পবিত্র কাবা ঘর ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল তখন মক্কার সর্দার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব স্বীয় গোত্রের লোকজনকে নিয়া কাবার চৌকাঠ ধরিয়া পবিত্র ঘর রক্ষার দায়িত্ব একক আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। ঘরে রক্ষিত মূর্তিদের পবিত্র ঘর রক্ষার্থে আল্লাহ তা'আলার সহিত শরীক করেন নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, توحيد فى الذات আল্লাহ তা'আলার সত্তায় একত্ববাদ-এর বিশ্বাস অমুসলমানদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অমুসলমানদের নিকট توحيد فى العبادة ইবাদতে একত্ববাদ-এর বিশ্বাসের অভাব ছিল। তাহারা ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুকে শরীক করিত। অথচ ইবাদত পাইবার নিরঙ্কুশ অধিকার একক আল্লাহ তা'আলারই। আর এই توحيد فى العبادة এর মধ্যে توحيد فى الذات শামিল রহিয়াছে। কারণ একক সত্তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে খালেছ একক সত্তা আল্লাহ তা'আলার জন্য ইবাদত করিবে কেন? এই কারণেই ইবাদতে অংশীদার সাব্যস্ত করিলে তাওহীদে বিশ্বাস থাকে না। তাই মুশরিকরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে।

ইবাদতের মধ্যে ঈমান, আ'মাল, যাবতীয় দ্বীনে শরীআতের করণীয়ও বর্জনীয় আহকামাদি শামিল রহিয়াছে। ঈমান কলব তথা অন্তরের ইবাদত। নামায, রোযা শারীরিক ইবাদত। যাকাত মালী ইবাদত। হজ্জ শারীরিক ও মালী ইবাদত। আদেশ পালন ইবাদত, নিষেধ বর্জন করা ইবাদত। অতএব ইবাদতের মধ্যে তাওহীদ, রিসালাতসহ সম্পূর্ণ দ্বীনে শরীআত অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। খালেছ একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত তথা পূর্ণ দ্বীন মানিয়া চলা বান্দার দায়িত্ব। ইহাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের নিকট প্রাপ্য। প্রাপ্য যথাযথ আদায় করিলে প্রতিদান ও পুরস্কার দিবেন বলিয়া তিনি ঘোষণা দিয়াছেন। আর আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ব্যতিক্রম হইবার নহে। তিনি স্বীয় ঘোষণার বাস্তবায়নে বলিয়াছেনঃ বান্দারা যদি খালেছ একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে তবে তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি দিবেন না। ইহা তাহার অনুগ্রহ। না হয়, তিনি যদি কোন নেক বান্দাকেও জাহান্নামের শাস্তিতে নিপতিত করেন তবে কাহারও প্রতিবাদ করিবার নাই। এই বিষয়টিকেই "আল্লাহ তা'আলার উপর বান্দার হক" বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন হয় যে, আলোচ্য হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, বান্দাগণ একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করিলে তিনি তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি দিবেন না। অথচ পবিত্র কুরআন ও বহু হাদীছে গুনাহগার মুমিন ব্যক্তির জাহান্নামের শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রশ্নের জবাব অত্র অধ্যায়ের হাদীসসমূহে প্রদান করা হইয়াছে। এখানে ওলামাগণের আরো কয়েকটি জবাব প্রদান করা যাইতেছে।

(১) বান্দাগণ খালেছ একক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করিলে তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন না অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি দিবেন না।

(২) অত্র হাদীছে ঈমানের স্বভাব ও বিশেষত্ব বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। ঈমানদার ব্যক্তি স্বভাবতঃ তাওহীদ রিসালতের বিশ্বাসসহ নেক আমল করিবেন এবং গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবেন। ফলে তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হইবে না।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেন যে, ইহার উদাহরণ এইরূপঃ কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার বিভিন্ন ঔষধের গুণাগুণ, কার্যকারীতা ও বিশেষত্ব বলিয়া দেন যে, অমুক ঔষধ গরম অথবা শীতল ইত্যাদি। ইহার দ্বারা ডাক্তারের এক একটি ঔষধের পৃথক কার্যকারীতা বর্ণনা উদ্দেশ্য। কিন্তু শর্ত হইতেছে যে, উহার বিপরীত কোন কারণ উপস্থিত না হওয়া। বিপরীত কারণ উপস্থিত হইলে উহার কার্যকারীতা পরিবর্তন হইবে। অনুরূপ আলোচ্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের স্বভাব ও বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। ঈমানের বিশেষত্ব হইতেছে যে, মুমিন ব্যক্তিকে জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়া জান্নাতে পৌছাইয়া দিবে। তবে শর্ত হইল বিপরীত কোন বস্তু তথা গুনাহ বর্তমান না থাকা চাই। গুনাহ থাকিলে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

এ বিষয়টিকে আল্লামা মাহমূদ হাসান (রহঃ) আরো সুন্দর উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উহা এই যে, পানির স্বভাব ও বিশেষত্ব হইল শীতল থাকা। কিন্তু উহাকে যদি আগুনে তাপ দেওয়া হয় তবে উহা আগুনের ন্যায় হইয়া যায়। অতঃপর কয়েক ঘন্টা আগুন হইতে নিরাপদ স্থানে রাখিলে পুনরায় শীতল হইয়া যায়। ঈমানের স্বভাবও অনুরূপ। ঈমানের স্বভাবগত কার্যকারীতা হইতেছে মুমিনকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবে এবং জাহান্নাম হারাম করিয়া দিবে। কিন্তু কোন অবাঞ্ছিত বস্তু তথা গুনাহ প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়াইলে সাময়িক গুনাহ পরিমাণ শাস্তিতে পতিত হইবে। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

অপর একটি প্রশ্ন হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাযিঃ)কে এই সুসংবাদ প্রচার করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি কিরূপে প্রচার করিলেন?

এই প্রশ্নের জবাব ব্যাখ্যার অধীনে অনেকটা পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। তবে নিম্নে হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের জবাবাদি উল্লেখ করা হইলঃ

(১) হযরত মুআয (রাযিঃ) জানিতেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নিষেধাজ্ঞা শর্তের সহিত ছিল। উহা হইতেছে-ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ আ'মালিয়াতে কষ্ট স্বীকারে অভ্যস্থ না হওয়ার কারণে তাহারা শুধু সুসংবাদের উপর ভরসা করিয়া থাকিবার ভয় ছিল। পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিবর্তন হইয়া মুসলমানগণ স্বীয় ধর্মে দৃঢ়পদ হইয়া আ'মালিয়াতের উপর কষ্ট স্বীকার ও সাধনায় অভ্যস্থ হইয়া পড়িবার পর উক্ত ভয় অবশিষ্ট ছিল না। তাই তিনি মৃত্যুর সময় প্রচার করিয়াছেন।

(২) এই নিষেধাজ্ঞা তাবলীগ ওয়াজিব হইবার এবং ইলম গোপনের প্রতি ধমক অবতীর্ণ হইবার পূর্বে ছিল। অতঃপর দ্বীনে শরীআতের ইলম যাহার নিকট যতখানি রহিয়াছে উহা অন্যকে জানাইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেমন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ তোমরা আমার পক্ষ হইতে যদি একটি বাণীও হয় জন সমাজের নিকট পৌছাইয়া দাও।"

পবিত্র কুরআন মজীদে ইলম গোপন না রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেমন- وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ "আর গোপন করিবে না।" (আল ইমরান-১৮৭)

হাদীছ শরীফে ইলম গোপনের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। যেমন-

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইলম গোপন রাখিবে, কিয়ামত দিবসে তাহাকে আগুনের লাগাম পরানো হইবে।"

তাই হযরত মুআয (রাযিঃ) গুনাহ হইতে বাঁচিবার জন্য প্রচার করিয়াছেন।

(৩) সুসংবাদটি কেবল সার্বজনিনভাবে প্রচারের নিষেধ ছিল। বিশেষ বিশেষ জ্ঞানী লোকদের নিকট বর্ণনা নিষেধ ছিল না। এই কারণেই হযরত মুআয (রাযিঃ) মৃত্যুর সময়ে বিশিষ্ট জ্ঞানীদের সামনে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। (তায়লীক, আশিয়া, ফতহুল মুলহিম)

সম্ভবতঃ হযরত মুআয (রাযিঃ) ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রচার করিয়াছেন। ইজতিহাদ হইতেছে যে, তিনি যখন সুসংবাদ প্রচার করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচার না করিবার কারণ উল্লেখ করিয়াছেনঃ তাহারা ভরসা করিয়া থাকিবে। এখন যদি সুসংবাদ ও উহা প্রচার না করিবার কারণসহ সম্পূর্ণ হাদীছ শরীফ বর্ণনা করা হয় তবে বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোকগণ উহার মর্মার্থ অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবেন এবং সেই মুতাবিক উম্মতের নিকট ব্যাখ্যা প্রকাশ করিবেন। উহার উপর ভরসা করিয়া থাকিবেন না বরং এই সুসংবাদের ফলে মানুষের মনে আশার সঞ্চার হইবে। ঘটনাক্রমে কোন গুনাহ হইবার পর নিরাশ হইবে না। আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা করিয়া অধিক হারে আমল করিতে সচেষ্ট হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ঈমানের দাবী

বস্তুতঃ ঈমান দ্বীনে এলাহীতে প্রবেশের নাম। আর কাহারও দ্বীনে প্রবেশ হইবার মর্ম হইতেছে ইহাই যে, সে দ্বীনের আহকামকে নিয়মানুবর্তিতার সহিত পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবে। ঈমানকে যখন আ'মালের পূতকার্যে নিয়োজিত করে তখন উহা মুমিনের অন্তরে বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর ক্রমে ক্রমে এই ঈমানী নূর যতখানি তীব্র ও শক্তিসম্পন্ন হইবে ততখানি সন্দেহ তথা শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও কুপ্রবৃত্তির অভিলাষ ধ্বংস করিতে থাকিবে। পরিশেষে মুমিনের ছোট বড় এমন কোন গুনাহই অবশিষ্ট থাকিবে না যাহা সে জ্বালাইয়া

নিশ্চিহ্ন করিয়া না দেয়। অধিকন্তু উহার সামনে জাহান্নামের আগুনও চিৎকার করিতে থাকে এবং বলে; হে মুমিন! আপনি একটু দ্রুতগতিতে অতিক্রম করুন। আপনার ঈমানী নূর আমার প্রজ্জলিত অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করিয়াদিতেছে।

নিঃসন্দেহে ঈমানের স্বভাব তথা বিশেষত্ব ইহাই যে, সে গুনাহসমূহের কাছে আটকাইয়া যাইবে না। সে গুনাহ সমূহকে ধুলিস্মাৎ করিয়া জান্নাতের উপযোগী বানাইয়া দিবে। ঈমান ঐ পানির ন্যায় যাহা নিজ স্বভাবের লক্ষ্যে শীতল। যদি উহাকে গুনাহসমূহের গরমে পতিত না করে তবে শীতলই থাকিবে। ঈমান ঐ উপকারী ঔষধের ন্যায় যদি উহাকে ব্যবহারে অনিয়ম না করে তবে আরোগ্য করিবেই।

জান্নাত এবং জাহান্নামের বন্টন ঈমান ও শিরকের ভিত্তিতে, কেবল ভাল-মন্দ আ'মালের উপর নহে

মানুষ যদিও আদি নহে কিন্তু অবশ্যই অনন্ত। এই কারণেই তাহার জন্য একটি অনন্ত বাসস্থান এবং স্থায়ী ঠিকানা অত্যাবশ্যক। দুনিয়া মানুষের অস্থায়ী তথা সাময়িক ঠিকানা মাত্র যাহা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সীমিত। তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান জান্নাত অথবা জাহান্নাম। ঈমান যতই দুর্বল হউক না কেন অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তিতে থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে শিরক যতই হালকা হউক না কেন জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কাজেই জান্নাত এবং জাহান্নামের বন্টন ঈমান এবং কুফরের উপর রাখা হইয়াছে। ভাল অথবা মন্দ আ'মালের উপর নহে।

যদি ভাল অথবা মন্দ আ'মাল ভিত্তি হইত তবে জান্নাতের নেয়ামতসমূহ এবং জাহান্নামের বিপদসমূহও ঐ পরিমাণ সময়ের জন্য হইত যেই পরিমাণ সময় তাহাদের আ'মাল করিবার জন্য ছিল। কিন্তু উহার পরিধি যেহেতু নিয়ত এবং ইচ্ছা সমূহ সেহেতু উহার প্রতিদানও নিয়ত এবং ইচ্ছা মুতাবিক হইবে। অবশ্য ধাপ তথা পদমর্যাদা সমূহের বন্টন আ'মালের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হইবে। ইহা হইতেই ঈমানের গুরুত্ব এবং কুফরের দুর্ভাগ্য অনুমিত হয়।

সূর্যের সম্মুখে মেঘমালা আসিয়া উহার উজ্জলতা ও তাপকে কিছুক্ষণের জন্য বিবর্ণ অবশ্য করিতে পারে। কিন্তু উহার আলোকে বিলুপ্ত করিতে পারে না। অবাধ্যতা ও গুনাহের মেঘমালা ঈমানের দীপ্তিমান উজ্জলকে অস্পষ্ট করিতে পারিলেও উহার নূরকে সমূলে ধ্বংস করিতে পারে না।

আলোর একটি রশ্মি যেমন রাত্রের অন্ধকারের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে সক্ষম নহে তেমন কোন ভাল কর্ম কুফর শিরকের ঐ অন্ধকারকে পরিস্কার তথা উজ্জল করিতে সক্ষম নহে যাহা সম্পূর্ণ অন্তরকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

ঈমান আ'মাল ব্যতীত মূল্যহীন নহে

আ'মাল ঈমান ব্যতীত মূল্যহীন। কিন্তু ঈমান আ'মাল ব্যতীত মূল্যহীন নহে। চাবির যদি দাঁতসমূহ ক্ষয় হইয়া যায় তবে উহা বেশী কাজে আসে না কিন্তু উহার হাকীকত তথা মূলতত্ত্ব অস্তিত্বহীন হয় না। কাপড়ের চিত্রাবলী ও অলঙ্করণ যদি বিবর্ণ হইয়া পুরাতন হইয়া যায় তবে ব্যবহার যোগ্য থাকে না বটে, কিন্তু উহার অস্তিত্ব বিপন্ন হয় না। ঈমান আ'মাল ছাড়া অভদ্র বন্ধু বলা যাইতে পারে কিন্তু উহাকে শত্রু বলা যাইবে না। ঈমান ও আ'মালের পরিমাণ জ্ঞান লাভ করিয়া উভয়ের গুরুত্ব নিজ নিজ স্থানে রাখিতে হইবে। আ'মালের সীমা হইতে অধিক গুরুত্ব প্রদান পদস্খলন ও ভ্রষ্টতা এবং উহার সীমা হইতে অধিক অমনোযোগ প্রত্যাবর্তনে শামিল। সঠিক পথে কায়িম থাকিবার জন্য ঈমান ও আ'মালের সঠিক সীমা-এর পরিচিতি খুবই জরুরী। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

٥٣ حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن ابي حصين والاشعث بن سليم انهما سمعا الاسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدرى ما حق الله على العباد قال الله ورسوله اعلم قال ان يعبد الله ولا يشرك به شيئا قال اتدرى ما حقهم عليه اذا فعلوا ذلك فقال الله ورسوله اعلم قال ان لا يعذبهم ـ

হাদীছ—৫৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদিগকে হাদীছ শোনান মুহাম্মদ বিন মুছান্না এবং ইবন বাশশার (রহঃ)। ইবন মুছান্না (রহঃ) বলেন, আমাদিগকে হাদীছ শোনান মুহাম্মদ বিন জাফর (রহঃ)। তিনি—হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত মু'আয (রাযিঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা আমাকে সম্বোধন করিয়া) বলিলেনঃ হে মুআয! তুমি কি অবগত আছ যে, বান্দাদের উপর আল্লাহ তা'আলার কি হক রহিয়াছে? আমি (জবাবে) বলিলামঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার (মনোনীত) রসূলই (এই বিষয়ে) অধিক জ্ঞাত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ (বান্দাদের উপর আল্লাহ তা'আলার হক হইতেছে যে,) যেন একক আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করা হয় এবং তাঁহার সহিত অন্য কিছু অংশীদার না করা হয়।[১] (অতঃপর) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রশ্ন) করিলেন, তুমি কি অবগত আছ যে, বান্দারা যদি ইহা যথাযথ আদায় করে তবে আল্লাহ তা'আলার উপর বান্দাদের কি হক রহিয়াছে? আমি (জবাবে) বলিলামঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার (মনোনীত) রসূলই (এই বিষয়ে) অধিক জানেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ (আল্লাহ তা'আলার উপর বান্দাদের হক এই যে,) তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন না।

٥٤ حدثنا القاسم بن زكريا قال نا حسين عن زائدة عن ابي حصين عن الاسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجبته فقال هل تدرى ما حق الله عز وجل على الناس نحو حديثهم

হাদীছ—৫৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন কাসিম বিন যাকারিয়া (রহঃ)। তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হুসাইন, তিনি যায়িদাহ হইতে, তিনি আবী হাচীন হইতে, তিনি আসওয়াদ বিন হিলাল হইতে। আসওয়াদ বিন হিলাল বলেনঃ আমি হযরত মুআয (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেনঃ (একদিন) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার আহবানে সাড়া দিলাম। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তুমি কি অবগত আছ যে, মানুষের উপর আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কি হক রহিয়াছে?—হাদীছের বাকী অংশ পূর্ববর্তী (তিনটি রিওয়ায়াতে যাহা ইমাম মুসলিম (রহঃ)—এর চারি জন ওস্তাদ কর্তৃক বর্ণিত) হাদীছের অনুরূপ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণিত ৪র্থ রিওয়ায়াত যাহা ইমাম মুসলিম (রহঃ)—এর শায়েখ ও উস্তাদ কাসিম বিন যাকারিয়া (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীছের বিষয়বস্তুও উহাই যাহা উপরোক্ত তিনটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত তিনটি রিওয়ায়াত ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় চারিজন উস্তাদ হযরত হাদ্দাব (রহঃ), আবূ বকর বিন আবী শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশশার (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

حديثهم শব্দে هم সর্বনামটি উপরোক্ত তিনটি রিওয়ায়াতের চারিজন রাবীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা—১· সহীহ মুসলিম শরীফের কোন কোন নুসখায় شيئ এর স্থলে- شيئا রহিয়াছে। অর্থ হইবে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত অন্য কোন বস্তুকে শরীক করিবে না।

٥٥ حدثني زهير بن حرب قال نا عمر بن يونس الحنفي قال نا عكرمة بن عمار قال حدثني ابو كثير قال
حدثني ابو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله
صلى الله عليه وسلم معنا ابو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين اظهرنا فابطأ علينا
وخشينا ان يقتطع دوننا وفزعنا وقمنا فكنت اول من فزع فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى اتيت حائطا للانصار لبني النجار فدرت به هل اجد له بابا فلم اجد فاذا ربيع يدخل في جوف
حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال ابو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شانك قلت كنت بين اظهرنا فقمت فابطأت علينا فخشينا
ان تقتطع دوننا ففزعنا فكنت اول من فزع فاتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء
الناس ورائي فقال يا ابا هريرة واعطاني نعليه قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط
يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان اول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان
يا ابا هريرة فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد ان لا اله الا
الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لاستي فقال ارجع يا ابا
هريرة فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجهشت بكاء وركبني عمر فاذا هو على اثري فقال
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك يا ابا هريرة قلت لقيت عمر فاخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين
ثديي ضربة خررت لاستي قال ارجع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما
فعلت قال يا رسول الله بابي انت وامي ابعثت ابا هريرة بنعليك من لقي يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا
بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فاني اخشى ان يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم ـ

হাদীছ—৫৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাকে হাদীছ শোনান যুহায়র বিন হারব (রহঃ), তিনি বলেনঃ আমাদিগকে হাদীছ শোনান ওমর বিন ইউনুস আল হানাফী (রহঃ), তিনি বলেনঃ আমাদিগকে হাদীছ শোনান ইকরামা বিন আম্মার (রহঃ), তিনি বলেনঃ আমাকে হাদীছ শোনান আবূ কাছীর, তিনি বলেনঃ আমাকে হাদীছ শোনান হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেনঃ (একদা) আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট বসা ছিলাম। আমাদের সহিত দরবারে উপবিষ্ট লোকজনের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) এবং হযরত ওমর (রাযিঃ)ও ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং (বাহিরে) তশরীফ নিলেন। অতঃপর তিনি আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে বিলম্ব করিলেন। ইহাতে আমরা ভয় পাইয়া গেলাম যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে কি না

তিনি কোন বিপদে পড়িলেন। (এই ধারণায়) আমরা শংকিত অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভীত–সন্ত্রস্তদের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রথম। তাই আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম। অনুসন্ধান করিতে করিতে বনী নাজ্জার গোত্রের আনসারদের একটি বাগানের দেওয়ালের নিকট পৌছিলাম। (আমার ধারণা হইল যে, সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেওয়ালের অভ্যন্তরের বাগানে থাকিতে পারেন তাই) আমি বাগানে (প্রবেশের লক্ষ্যে) প্রাচীরের চতুষ্পার্শ্বে দরজা তালাশ করিয়া ঘুরিলাম, কিন্তু কোন দরজা পাইলাম না (হয়ত উক্ত বাগানের প্রাচীরের দরজা ছিল না অথবা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইবার কারণে দরজা দৃষ্টিতে পড়ে নাই)। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম বাগানের প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত কুয়া হইতে একটি 'রবী' তথা ছোট প্রণালী বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।[১] আর 'রবী' নালা বা ছোট প্রণালীকে বলা হয়। অতঃপর (গত্যন্তর না দেখিয়া) আমি নিজেকে (শিয়ালের ন্যায়) সংকুচিত করিয়া প্রণালী পথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট পৌছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশে) বলিলেনঃ আবূ হুরায়রা। আমি (জবাবে) বলিলাম, জ্বি হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমার অবস্থা কি? আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেনঃ আমি আরয করিলাম, আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর আপনি আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। আপনার প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হওয়ায় আমরা ভয় পাইলাম যে, আমাদের অবর্তমানে আপনি একা অবস্থায় কোন বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়িলেন কি না? (এই ধারণায়) আমরা সকলই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলাম। তবে চিন্তান্বিতদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম মজলিস হইতে উঠিয়া আপনার সন্ধানে এই বাগানের প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হই। কিন্তু (প্রাচীরের কোন দরজা না পাইয়া) আমি নিজেকে সংকুচিত করিলাম (এবং নালা পথে বাগানে প্রবেশ করিয়া আপনার সাক্ষাতে ধন্য হইয়াছি) যেমনভাবে শিয়াল স্বীয় শরীর সংকোচন করিয়া থাকে (এবং সরু পথে কোন স্থানে প্রবেশ করে)। আর সেই সকল লোকগণ আমার পশ্চাতে আগমন করিতেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) হে আবূ হুরায়রা। (সম্বোধন) করিয়া তাঁহার মুবারক পাদুকাদ্বয় (আমার নিকট) প্রদান করিয়া বলিলেনঃ তুমি আমার এই পাদুকাদ্বয় লইয়া যাও[২] এবং এই (বাগানের) প্রাচীরের বাহিরে এমন যে কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ তুমি পাইবে সে যদি আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসসহ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

টীকা–১ بئر خارجة শারেহ নববী (রহঃ) বলেনঃ উভয় শব্দের শেষ অক্ষরে তানভীন দ্বারা পঠিত। خارجة শব্দটি بئر শব্দের صفت হইবে। এই পঠন মতে অনুবাদ করা হইয়াছে যে, বাগানের প্রাচীরের বাহিরের কুয়া হইতে একটি ছোট নালা বাগানে প্রবেশ করিয়াছে। হাফিয আবূ মুসা আল আসবিহানী (রহঃ) প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই বাক্যটি তিনভাবে পড়া যায়। একঃ যাহা শারেহ বর্ণনা করিয়াছেন। দুইঃ بئرٍ - بئر خارجه শব্দটি তানভীন দ্বারা এবং خارجه শব্দের শেষে পেশযুক্ত هاء হইবে। আর هاء সর্বনামটি حائط।এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। বাক্যটি হইবেঃ البئر في موضع خارج عن الحائط। অর্থাৎ প্রাচীরের বাহির স্থানের কুয়া হইতে একটি ছোট প্রণালী বাগানে প্রবেশ করিয়াছে।তিনঃ بئر শব্দটিকে خارجة শব্দের দিকে اضافت। করিয়া পড়া। এই সময় خارجة 'খারিজা' হইবে এক ব্যক্তির নাম। বাক্যের অর্থ হইবেঃ খারিজার কুয়া হইতে একটি ছোট নালা বাগানে প্রবেশ করিয়াছে।

(ফতহুল মুলহিম)

টীকা–২ اذهب بنعلي। "তুমি আমার এই পাদুকাদ্বয় লইয়া যাও"। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পাদুকাদ্বয় এই জন্য প্রদান করিয়াছিলেন যাহাতে উহা পশ্চাতের লোকগণের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শন হিসাবে গণ্য হয় যে, আবূ হুরায়রার সহিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাক্ষাত হইয়াছে এবং আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) যে পয়গাম বর্ণনা করিবেন উহা দৃঢ় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আরো তাকীদ হয়। অধিকন্তু পয়গামের গুরুত্বও প্রকাশিত হইবে। সুতরাং পাদুকাদ্বয় প্রদান কেবল তাকীদ প্রকাশই উদ্দেশ্য। কারণ পাদুকাদ্বয় প্রদান না করিলেও হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)–এর সংবাদ গ্রহণযোগ্য ছিল। মুল্লা আলী কারী স্বীয় মিরকাত কিতাবে লিখিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর অবস্থান স্থানে সিনাই পবর্তের ঔজ্জ্বল্যতা লাভ হইয়াছিল। তাই তিনি নিজ পাদুকাদ্বয় স্বীয় সাহাবীর নিকট প্রদান করিয়াছিলেন।

(ফতহুল মুলহিম)

"একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই" এর সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাহাকে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদদিবে। ১

(হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে সুসংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে মুবারক পাদুকাদ্বয় লইয়া রওয়ানা হইলে) তখন সর্বপ্রথমই যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল তিনি হইলেন হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)। হযরত ওমর (রাযিঃ) (আমাকে জিজ্ঞাসা) করিলেনঃ হে আবূ হুরায়রা। এই পাদুকাদ্বয় কাহার? আমি (উত্তরে) বলিলামঃ ইহা তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মুবারক পাদুকাদ্বয়। তিনি আমাকে নিজ পাদুকাদ্বয় দিয়া পাঠাইয়াছেন (এবং এরশাদ করিয়াছেন) যে, যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় সে যদি আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসসহ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর সাক্ষ্য দেয় তবে যেন আমি তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাইয়া দেই। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেনঃ (এই কথা শ্রবণ করিবার পর) হযরত ওমর (রাযিঃ) স্বীয় হাত দ্বারা আমার বুকে এমন আঘাত করিলেন যে, আমি পশ্চাতের দিকে পড়িয়া গেলাম। ২অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) (আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেনঃ হে আবূ হুরায়রা। ফিরিয়া যাও। অতঃপর আমি কান্না কান্না অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খেদমতে ফিরিয়া আসিলাম। এইদিকে হযরত ওমর (রাযিঃ)ও (বিলম্ব না করিয়া) আমার পিছনে পিছনে আসিতেছিলেন। আশ্চর্য যে, (আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া দেখি যে,) তিনি আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার অবস্থা দেখিয়া) বলিলেনঃ হে আবূ হুরায়রা। তোমার কি হইয়াছে? আমি আরয করিলাম, হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আর আপনি যেই পয়গাম দিয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন উহা আমি হযরত ওমর (রাযিঃ)কে জানাই। (পয়গাম শোনামাত্র) তিনি আমার বক্ষদেশে এমন আঘাত করিলেন যাহার কারণে আমি পশ্চাতের দিকে (নিতম্বের উপর কুঞ্চন হইয়া) পড়িয়া যাই। অতঃপর তিনি আমাকে (পয়গাম জনগণের নিকট প্রচার না করিয়া) ফিরিয়া আসিতে নির্দেশ দিয়াছেন। (আমার অভিযোগ শ্রবণ করিয়া) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত ওমরকে সম্বোধন করিয়া) বলিলেনঃ হে ওমর। তোমাকে কোন্ বিষয়ে

টীকা–১· রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বাণী فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ـ

"এই প্রাচীরের বাহিরে এমন যে কোন ব্যক্তির সাক্ষাত তুমি পাইবে সে যদি আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসসহ لا اله الا الله এর সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাহাকে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দিবে।" হাদীছে এই অংশের মর্মার্থ হইতেছে যে, তাহাদিগকে জানাইয়া দাও, যে ব্যক্তি তাওহীদের প্রতি আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসসহ মুখে স্বীকারোক্তিকারীর গুণে গুণান্বিত সে জান্নাতী। কারণ আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) তাহাদের আন্তরিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নহেন। ইহা আহলে হকগণের মাযহাবের সপক্ষে প্রকাশ্য দলীল যে, তাওহীদে স্বীকারোক্তি ব্যতীত কেবল আন্তরিক বিশ্বাস পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট নহে। আর না আন্তরিক বিশ্বাস ব্যতীত কেবল সাক্ষ্য তথা স্বীকারোক্তি মুক্তির জন্য যথেষ্ট। বরং উভয়টি অত্যাবশ্যক অর্থাৎ তাওহীদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসসহ মুখে সাক্ষ্য তথা স্বীকার করিবার নাম ঈমান। এই খালিছ ঈমানই মুমিনকে জান্নাত লাভের যোগ্য বানাইয়া দেয়। বলাবাহুল্য তাওহীদের মধ্যে রিসালতসহ শরীআতের যাবতীয় বস্তু শামিল রহিয়াছে। (বিস্তারিত ৪৪ নং হাদীছ ও এই অধ্যায়ের অন্যান্য হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

(নববী)

টীকা–২· فضرب عمر হযরত ওমর (রাযিঃ) সুসংবাদ শ্রবণ মাত্রই আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)–এর বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। এই আঘাত দ্বারা আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে কষ্ট দেওয়া বা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সুসংবাদের প্রতিবাদ করা উদ্দেশ্য নহে। বরং আঘাতের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, সুসংবাদ জনসাধারণের সমক্ষে প্রচার না করিবার জন্য আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে সতর্ক করা। কেননা জনসাধারণ এই সুসংবাদের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন করিতে পারিবে না। তাই তাহারা গুনাহ হইতে পরহেজ করিয়া অধিক নেক আ'মালে কষ্ট স্বীকারে অলসতা করিবে এবং সুসংবাদের উপরই ভরসা করিয়া থাকিবে। ফলে আযাব হইতে নিরাপদ থাকিয়া প্রাথমিক জান্নাত লাভসহ জান্নাতের উচ্চ হইতে উচ্চস্থান লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে।

(নববী)

এই কাজ করিতে উত্তেজিত করিয়াছে? হযরত ওমর (রাযিঃ) (জবাবে) আরয করিলেন; ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান হউক। আপনি কি আপনার মুবারক পাদুকাদ্বয়সহ আবূ হুরায়রাকে প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাহার সহিত যদি এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয় যে আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ "একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নাই" তবে তাহাকে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ প্রদান করুক?১ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ হ্যাঁ।.

হযরত ওমর (রাযিঃ) আরয করিলেন, (হুযুর আপনার সুসংবাদ যথার্থ কিন্তু) এইরূপ (জনগণের নিকট) প্রচার করিবেন না। কারণ আমি আশংকা করি যে, মানুষেরা (আমল না করিয়া কেবল) ইহার (সুসংবাদের) উপর ভরসা করিয়া থাকিবে। (ফলে প্রাথমিক জান্নাত লাভ বা জান্নাতের উচ্চ হইতে উচ্চ স্থান লাভে বঞ্চিত হইবে বরং) আপনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিন। তাহারা আ'মাল করুক। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার অভিমতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া) বলিলেনঃ আচ্ছা, তাহাদিগকে (আ'মাল করিবার জন্য) ছাড়িয়া দাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করিলে অনুমিত হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সাহাবায়ে কেরামের প্রণয়াসক্তি কিরূপ ছিল। ইসলামী ইতিহাস ব্যতীত অনুরূপ প্রেম ও বশ্যতার উদাহরণ সম্ভবতঃ অন্য কোথায়ও মিলিবে না। নবুওয়াতের চন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে নক্ষত্ররাজির ঘন সমাবেশ। হঠাৎ চন্দ্র দৃষ্টির অন্তরাল হইতেই সাহাবায়ে কেরামের অশান্ত ও চিন্তান্বিত দৃষ্টিসমূহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীদারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। অন্তরে নানাহ ধারণার উদ্ভব হইতে থাকে। অনুসন্ধান করিতে করিতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) একটি প্রাচীরের নিকট পৌছিলেন। কোথায়ও না দেখিয়া তিনি ধারণা করিলেন হয়ত বা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাচীরের অভ্যন্তরের বাগানেই থাকিতে পারেন। বাগানের চারিপার্শ্ব উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তড়িৎ গতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীদার লাভের আকাংক্ষার দরুন দরজার সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা নালা পথেই নিজকে সংকুচিত করিয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন। শ্বাস স্ফীত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই বাগানে দেখিয়া মুখাবয়বের চিন্তান্বিত হালাত অকস্মাৎ উল্লাসে রূপান্তরিত হইয়া গেল। বলিয়া উঠিলেন, হুযুর! আপনি এইস্থানে তশরীফ গ্রহণ করিয়াছেন। আর আমরা সকলই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। দেখুন, আমিই সর্বপ্রথম আপনার সান্নিধ্যে হাযির হইয়াছি। অন্যান্য লোকগণও আমার পশ্চাতে আপনার অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সাহাবায়ে কেরামের অত্যধিক মহব্বত প্রত্যক্ষ করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর রব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার করুণা সাগর প্লাবিত হয় এবং মাহাত্ম্যের সৌন্দর্য প্রভাবশালী হইয়া তাঁহার পবিত্র জবান হতে অতীব গোপন রহস্য মহা সুসংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ে। যাহার পরিণামে সাহাবাগণের অশান্ত হৃদয় সান্ত্বনার বাণীতে হইবে পরিতৃপ্ত। এরশাদ করিলেনঃ যে ব্যক্তি আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসসহ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর সাক্ষ্য প্রদান করিবার গুণে গুণান্বিত হইবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। হে আবূ হুরায়রা! চিহ্নস্বরূপ আমার পাদুকাদ্বয় লইয়া যাও। তাহাতে লোকগণ প্রশান্তি লাভ করিবে আর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাকীদও হইবে যে, তুমি যাহা বলিতেছ উহা পয়গাম্বরত্বের বার্তা তথা স্বর্গীয় বাণী। فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ এর সিনাই পর্বতের ঔজ্জ্বল্যতা আজ করুণার মাহাত্ম্যের মধ্যে দীপ্তিমান। মহা সুসংবাদ লইয়া হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) অত্যন্ত আনন্দচিত্তে চলিলেন। আর সর্বপ্রথমই মহান ব্যক্তিত্ব হযরত ওমর (রাযিঃ)-এরই সাক্ষাৎ ঘটিল যাহার উদ্যম ও আড়ম্বর হইতে শয়তান পর্যন্ত ছুটিয়া পালায়। তিনি তাহাকেই সেই মহা সুসংবাদ জানাইলেন।

টীকা-১ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এই জিজ্ঞাসা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর মাধ্যমে প্রদত্ত মহা সুসংবাদের খবরে সন্দেহ করিয়া নহে বরং হযরত ওমর (রাযিঃ) স্বীয় অভিমত উপস্থাপনে ভূমিকা হিসাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর মহা সুসংবাদের খবরটি চিত্তের সন্তোষে পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র।

হযরত ওমর (রাযিঃ) ঘটনা বুঝিতে পারিলেন যে, বস্তুতঃ করুণার চাহিদা তো অবশ্যই ইহাই, কিন্তু উপযোগিতার চাহিদা তো ইহা নহে। তাই তিনি স্বীয় হাত দ্বারা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর বুকে আঘাত করিয়া ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ফিরিয়া আসিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার পিছনে পিছনে দরবারে হাযির। বর্ণনা করিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে ফিরত পাঠাইবার বিচক্ষণতা। হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর অভিমত শ্রবণের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্য হইতে করুণা গুণের আধিক্যতার হালাত পরিবর্তন হইয়া পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া গেল। সম্মত হইলেন হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর অভিমতে। নিষেধ করিলেন ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে। জান্নাতের সুসংবাদ ছিল রহমত তথা করুণার দাবী আর উহা প্রচার না করা উপযোগিতার দাবী।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) স্বীয় ফতহুল মুলহিম গ্রন্থে এই বিষয়টির অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উহার সারমর্ম এই যে, মহান রব্বুল আলামীনের জাঁকজমক ও মাহাত্ম্য প্রতিটি মুহূর্তে সীমাহীনভাবে এক একটি। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. অর্থাৎ সর্বদা ও সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার এক একটি শান ও অবস্থা থাকে। অনুরূপ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাহাত্ম্য, সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন হইত। কোন সময় আল্লাহ তা'আলার সহিত তাঁহার এমন অবস্থা বিরাজ করিত যাহা কোন নৈকট্যশীল ফিরিশতা অথবা নবী রসূলের পক্ষে সম্ভব নহে। আবার কোন সময় স্বীয় পরিবার পরিজনের সহিতও সহৃদয় অবস্থা সম্পৃক্ত হইত। আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন পরম করুণা ও অসীম দয়ার গুণ ক্রোধের উপর প্রাধান্য হইয়া সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণুকে পরিবেষ্টিত করিবার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রব্বুল আলামীনের মুশাহিদায় নিমজ্জিত হইতেন তখন তাহার মাংস, হাড় প্রভৃতিতে করুণা বাদশাহ বিস্তার লাভ করিতেন। সেই করুণা সাগরে নিমজ্জিত অবস্থায় তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা দেন।

من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنة وحرمه الله على النار وان زنى وان سرق على رغم انف ابى ذر -

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসসহ বলে একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করিয়া দেন, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে-আবূ যর-এর নাক কাটা গেলেও। (অর্থাৎ আবূ যর না পছন্দ করিলেও)

আর আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ এবং প্রতিশোধের তীব্রতা গুণ যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে প্রাধান্য পাইত তখন আল্লাহ তা'আলার ভয়ে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিত। ফলে তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা দেন যে, لا يدخل الجنة قتات ولا نمام "পরোক্ষ নিন্দাকারী ও পরসমালোচনাকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না" এবং لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. "যাহার অত্যাচার হইতে প্রতিবেশী নিরাপদ নহে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

এই প্রকার বর্ণিত হাদীছ শরীফসমূহের মর্ম হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলার রহমত তথা করুণার দাবী হইতেছে তাওহীদে বিশ্বাসী ও স্বীকারোক্তিকারী বান্দা যদিও যিনা ও চুরির ন্যায় কবীরা গুনাহে মাখানো হয় চিরস্থায়ী জাহান্নামের অগ্নিতে নিপতিত হইবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওহীদ রিসালতে সাক্ষ্য প্রদান করে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলকে সহীহ পরিচয়ের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বৃহত্তম রহমত ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ ফযল ও করমের ভিত্তিতে বাঞ্ছিত বিশ্বাস যে, তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস ও সাক্ষ্যের বদৌলতে করুণার মাধ্যমে আযাবহীনভাবে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবে।

আর আল্লাহ তা'আলার শানে গযব তথা ক্রোধ ও প্রতিশোধের প্রচণ্ডতা গুণের দাবী হইতেছে যে, নগণ্য বিষয়ের নির্দেশের অমান্য এবং প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচরণ যেমন পেশাব হইতে অপবিত্রতা ও পরসমালোচনা ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। তাই গুপ্তচর, পরোক্ষ নিন্দা ও প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদান ইত্যাদি কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের স্বীয় কর্মেই তাহাদের ধ্বংস তথা শাস্তিতে পতিত হইবার জন্য এবং জান্নাতে প্রবেশের হকদার না হইবার জন্য যথেষ্ট।

এই বিষয়টি আল্লামা সাআদী সিরাজী ফারসী ভাষায় অত্যন্ত সুন্দর লিখিয়াছেন–

بتہدید اگر برکشد تیغ حکم ÷ بمانند کروبیان صم وبکم

وگر در دہد یک صلائے کرم ÷ عزازیل گوید نصیبے برم

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ তা'আলা ধমক ও ভয় প্রদর্শনমূলক হুকুমের তলোয়ার টানেন তথা কঠোর নির্দেশ দেন তখন নৈকট্যশীল ফিরিশতাগণ শ্রবণহীন ও বোবা তথা হতভম্ব হইয়া যায়। আর যদি তিনি সাধারণ করুণা ও ক্ষমার ঘোষণা দেন তাহা হইলে আযাযীল তথা অভিশপ্ত ইবলিস বলে যে, আমিও এক অংশ লইয়া যাইব।"

মোটকথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বাণীঃ "যে ব্যক্তি لا اله الا الله বলিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করিয়া দেন।" ইহা মহান আল্লাহ তা'আলার রহমতের দাবী এবং কলেমা শাহাদাতের প্রভাবের শক্তি। আর গুপ্তচর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। আর না পরোক্ষ নিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ইহা গযবে ইলাহী এবং শাস্তির তীব্রতার দাবী।

অতএব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)–এর নিকট স্বীয় পাদুকাদ্বয় প্রদান করিয়া মহা সুসংবাদ প্রচারের নির্দেশটি ছিল ঐ অবস্থায় যে অবস্থায় তাঁহার অন্তরে মহান আল্লাহ তা'আলার রহমত, করুণা, মেহেরবাণী ও নূরে জামাল বিচরণ করিতেছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) এই সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া প্রচার করিতে চলিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সান্নিধ্যের বদৌলতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর 'শানে আরোহন ও শানে অবতরন প্রভৃতি অবস্থাবলী' সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে অধিক অবহিত ছিলেন। এই জন্যই হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে সুসংবাদ প্রচার না করিয়া ফেরত আসিতে নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও রসূলুল্লাহ–এর দরবারে হাযির হইয়া ফেরত পাঠানোর উপযোগিতা বর্ণনা করেন। হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর বক্তব্য শ্রবণের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সেই প্রথম অবস্থা পরিবর্তন হইয়া পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিল। ফলে হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর পরামর্শে সম্মত হইলেন এবং তাহার অভিমত গ্রহণ করিয়া বলিলেন, ঠিক আছে, তাহাদিগকে আমল করিবার জন্য ছাড়িয়া দাও। (ফতহুল মুলহিম)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার করুণার মুশাহিদায় নিমগ্ন অবস্থায় এরশাদ করিলেনঃ من قال لا اله الا الله دخل الجنة "যে ব্যক্তি একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই বলিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" অপর দিকে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধে ও প্রতিশোধের প্রচণ্ডতার মুশাহিদায় আন্তরিক কম্পিত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর এরশাদ لا يدخل الجنة قتات ولا نمام "গুপ্তচর ও পরোক্ষ নিন্দাকারী বা পরসমালোচক জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।" এই পবিত্র হাদীছদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যিক বিরোধ মনে হইলেও বস্তুতঃ একটি অপরটির ব্যাখ্যায় অত্যন্ত সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে। উভয় মর্মের বর্ণিত হাদীছের সমন্বয়ে যথার্থ ও প্রকৃত মর্মার্থ নির্ণয় করা সহজ সাধ্য হইয়াছে।

বলাবাহুল্য পূর্বেই প্রমাণসহ আলোচনা করা হইয়াছে যে, তাওহীদের মধ্যে রিসালতের স্বীকারোক্তিসহ দ্বীনে শরীআতের যাবতীয় বস্তু অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। (হাদীছ নং ২৩ ও ৩৪ এর ব্যাখ্যা দেখুন) এখন এই দ্বিতীয়

রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, শরীআতের বর্জনীয় তথা গুনাহ হইতে পবিত্র থাকিয়া তাওহীদ রিসালতে দৃঢ় বিশ্বাসসহ শরীআতের নির্দেশিত ইবাদত যথাযথ পালন করিলে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। হ্যাঁ, ইহার দ্বারা কেবল মুক্তি পাইয়া জান্নাত লাভ হইল কিন্তু জান্নাতের যে শত স্তর বা শ্রেণী রহিয়াছে উহার উচ্চ হইতে উচ্চ স্তর লাভের জন্য সুন্নাত ও নফলের সাধনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পরোক্ষ নিন্দা ও পর সমালোচনা প্রভৃতি কবীরা গুনাহকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। এই হাদীছের মর্মার্থ প্রথম রিওয়ায়াতে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে যে, তাওহীদ রিসালতে দৃঢ় বিশ্বাসসহ দ্বীনে শরীআতের ফরযসমূহ আদায়কারী কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকিলে প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। অবশ্য খালিছ তাওবা বা শাফাআতের দ্বারা ক্ষমা পাইলে ভিন্ন কথা। না হয় গুনাহ পরিমাণ জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবার পর তাওহীদ রিসালতে দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে একবার না একবার মুক্তি পাইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

প্রথম রিওয়ায়াতে আশার সঞ্চার করিয়াছে আর দ্বিতীয় রিওয়ায়াতে নিরাশ তথা ভয়ের সঞ্চার করিয়াছে। আশাহীন নৈরাশ্য কুফুরীতে পৌছায় আর ভয়হীন আশা বঞ্চিত করে। ভয় ও আশার মধ্যেই প্রকৃত ঈমান। সুতরাং তাওহীদ রিসালতের দৃঢ় বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তিসহ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনিত রসূলের আদেশ নিষেধ অত্যধিক সতর্ক ও আন্তরিক ভীতির সহিত যথাযথভাবে মানিয়া চলিতে হইবে এবং অকস্মাৎ কোন অবাঞ্ছিত অপরাধ তথা গুনাহ হইয়া পড়িলে তৎক্ষনাৎ খালিছ তাওবা করিয়া পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার রহমত কামনা করিতে হইবে। ইহাই দ্বীন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ফায়দাঃ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, (১) প্রজাবর্গ রাষ্ট্রপতির হুকুমের উপর যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতির জন্য প্রয়োজন যে, তিনি প্রজাদের প্রশ্নে ন্যায়সঙ্গত উত্তর দিবেন অথবা স্বীয় হুকুম স্থগিত করিবেন।

(২) আলিম ব্যক্তি মজলিসে উপস্থিত জনগণকে দ্বীনের বিষয়ে বুঝাইবেন এবং তাহাদের বিভিন্ন বিষয়ের সমাধানদিবেন।

(৩) অনুমতি ব্যতীত অন্যের মালিকানা দেশ বা জমিনে প্রবেশ জায়েয, যদি ঐ কথার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, মালিক অসন্তুষ্ট হইবে না। কেননা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বাগানে প্রবেশ করিয়াছেন কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিষেধ করেন নাই। তাহা ছাড়া কাহারও সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করা, অন্যের খানা আহার করা, জানোয়ারে আরোহণ করা, খাদ্যদ্রব্য নিয়া আসা ইত্যাদি জায়েয, যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, উক্ত বস্তুসমূহের মালিক অসন্তুষ্ট হইবেন না। আর যদি মালিক অসন্তুষ্ট হইবার আশংকা থাকে তবে অনুমতি ব্যতীত কাহারও বস্তু আহার বা ব্যবহার করা জায়েয নাই।

(৪) ইমাম স্বীয় দূতকে কোন চিহ্ন সহকারে প্রেরণ করা জায়েয। ইহার দ্বারা খবরের তাকীদ হয়।

(৫) ফিৎনা ফাসাদের ভয় থাকিলে অথবা উপযোগিতা মনে করিয়া দ্বীনের কোন ইলম যাহা অবগত হওয়া অত্যাবশ্যক নহে উহা গোপন রাখা জায়েয।

(৬) "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউক" বলা জায়েয। তবে কতকের মতে এইরূপ বলা মাকরূহ। কিন্তু এই অভিমত সহীহ নহে। (নববী)

٥٦ حدثنا إسحق بن منصور قال أنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما ـ

হাদীছ—৫৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদিগকে হাদীছ শোনান ইসহাক বিন মানছুর, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীছ জানান[১] মু'আয বিন হিশাম, তিনি বলেন আমাকে হাদীছ শোনান আমার পিতা, তিনি রিওয়ায়াত করিয়াছেন কাতাদাহ হইতে, তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীছ শোনান হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মু'আয বিন জাবাল (রাযিঃ) একই বাহনের পৃষ্ঠে (নবীজীর পশ্চাতে) বসা ছিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত মু'আয (রাযিঃ)কে সম্বোধন করিয়া) বলিলেনঃ হে মু'আয! হযরত মু'আয (রাযিঃ) (জবাবে) বলিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি হাযির আছি এবং আপনার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দ্বিতীয়বার সম্বোধন করিয়া) বলিলেনঃ হে মু'আয! হযরত মু'আয (রাযিঃ) (জবাবে) বলিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি উপস্থিত, আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত মু'আযকে তৃতীয়বার সম্বোধন করিয়া) বলিলেনঃ হে মু'আয! হযরত মু'আয (রাযিঃ) (জবাবে) বলিলেনঃ 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি হাযির আছি এবং আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। (অতঃপর) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যে কোন বান্দা (এই কথার) সাক্ষ্য দেয় যে, একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার (প্রিয়) বান্দা ও (মনোনীত) রসূল তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করিবেন।

হযরত মু'আয (রাযিঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কি এই সুসংবাদ মানুষকে জানাইয়া দিব না যাহাতে তাহারা এই খুশীর খবর দ্বারা প্রফুল্লতা লাভ করিতে পারে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তাহা হইলে লোকেরা ইহার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবে। অতঃপর হযরত মুআয (রাযিঃ) স্বীয় অন্তিমকালে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন[২] যাহাতে হাদীছ গোপন রাখিবার গুনাহ তাহার উপর না থাকে।

টীকা-১· حدثنا ও اخبرنا। প্রভৃতি শব্দের অর্থ ও ব্যবহার বিধি ১নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

টীকা-২· فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ এই বাক্যে موته শব্দের "ه" সর্বনামটি হযরত মু'আয (রাযিঃ)—এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে। অর্থাৎ অতঃপর হযরত মু'আয (রাযিঃ) স্বীয় অন্তিমকালে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কেননা ইমাম আহমদ (রহঃ) সহীহ সনদে রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে,

عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : اخبرني من شهد معاذا حين حضرته الوفاة ، يقول ـ

سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني ان احدثكموه الا مخافة ان لا يتكلوا فذكره

অর্থাৎ "হযরত জাবির বিন আবদিল্লাহ আল আনছারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমার নিকট ঐ ব্যক্তি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যিনি হযরত মু'আয (রাযিঃ)—এর ওফাতের সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। হযরত মু'আয (রাযিঃ) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর নিকট হইতে একটি হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি উহা অদ্যাবধি তোমাদের নিকট এই ভয়ে বর্ণনা করি নাই যে, হয়ত তোমরা (হাদীছের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন না করিয়া) কেবল ইহার বাহ্যিক অর্থের উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিবে। অতঃপর তিনি উক্ত হাদীছ শরীফখানা বর্ণনা করিলেন।

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

অতি নিকটে উপবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয (রাযিঃ)কে তিনবার সম্বোধন করিয়াছেন যাহাতে তিনি অধিক মনোযোগী হন এবং বর্ণিত কথার অত্যধিক গুরুত্ব প্রকাশ পায়। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন উহাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সাথে সাথে প্রচার না করিবার কারণও বলিয়া দিয়াছেন যে, মানুষ কেবল ইহার উপরই ভরসা করিয়া থাকিবে এবং অধিক আমল করিবার জন্য সাধনা ও পরিশ্রম স্বীকার করিবে না।

মানব জাতির স্বভাব হইতেছে যে, অত্যধিক ভয়ভীতির দরুন কর্মহীন হইয়া যায়। পক্ষান্তরে অত্যধিক প্রশান্তির ও নির্ভয়ের কারণে অলস হইয়া পড়ে। ভয় ও আশার মধ্যে দ্বীন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, জাহান্নামের আযাব হইতে পরিত্রাণ একটি বিরাট সাফল্য। কিন্তু করুণাময় কেবল উহাতে সন্তুষ্ট হইতে চান না যে, নিজ হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ তথা প্রভুভক্তগণকে স্বীয় অন্যান্য ধনাগার হইতে তাহাদিগকে ধন অর্জন করিবার সুযোগ দিবেন না। জান্নাতের মধ্যে একটির পর একটি উচ্চস্থান রহিয়াছে। করুণার চাহিদা হইতেছে যে, সকলকে উহা অর্জনের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়া দিবে যাহাতে অধিক হইতে অধিক চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে জান্নাতের উচ্চ হইতে উচ্চস্থান লাভ করিতে পারে। আর শুধু নাজাতের উপর পরিতুষ্ট থাকিয়া জান্নাতের উচ্চস্থানসমূহ অর্জনে বঞ্চিত না হয়।

এক হাদীছ অপর হাদীছের মর্মার্থ স্পষ্ট করিয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যার জন্য জামে তিরমিযী শরীফের একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহাতে বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। "হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পালন করে, নামায আদায় করে, বায়তুল্লাহর হজ্জ করে, আমার স্মরণ নাই যে, তিনি যাকাতের কথা বলিয়াছেন কি না, তবে আল্লাহ তা'আলার উপর হক যে, তাহাকে নাজাত দিবেন। চাই সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করুক অথবা স্বীয় মাতৃভূমিতে বসবাস করুক। হযরত মু'আয (রাযিঃ) আরয করিলেনঃ লোকদিগকে কি ইহা জানাইয়া দিব? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ না, আমল করিতে দাও। কেননা জান্নাতের একশত ধাপ তথা শ্রেণী রহিয়াছে। প্রত্যেক ধাপের মধ্যে এতখানি ব্যবধান রহিয়াছে যতখানি ব্যবধান নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যে রহিয়াছে। জান্নাতুল ফিরদাউস হইতেছে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ধাপ। উহার উপরই করুণাময় রহমানের আরশ। আর উহা হইতে জান্নাতের প্রশ্রবণসমূহের উৎপত্তি। যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট ঝাঞ্ছা কর তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের ঝাঞ্ছা করিবে।"

গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করিলে বুঝা যায় যে, জামে তিরমিযী শরীফের এই হাদীছের মধ্যে নামায রোযার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার পরও প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কাজেই এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপকভাবে এই সংবাদ প্রচার করিতে এই জন্য নিষেধ করিয়াছেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগ হওয়ায় মুমিনগণ আ'মালে অভ্যস্থ হয় নাই। তাই শুধু শাহাদাতাইনের উপর কৃতকার্যতা ও কল্যাণের ভুল অনুভূতির মধ্যে পতিত হইবে। অতঃপর যখন নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয হইবার বিষয়টি তাহাদের সামনে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল তখন ভুল বুঝিবার কোন সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল না। অথচ তিনি উহাও প্রচার করিতে কেন নিষেধ করিয়াছেন? ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিষেধ করিবার উদ্দেশ্য ফরায়েযের

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

আল্লামা কিরমানী (রহঃ) একটি সম্ভাবনা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ " موته " শব্দের " ه " সর্বনামটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। অর্থাৎ হযরত মু'আয (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তিমকালে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আল্লামা ইবন হাজার (রহঃ) আল্লামা কিরমানী (রহঃ)-এর এই সম্ভাবনাকে উপরোল্লেখিত হযরত জাবির বিন আবদিল্লাহ আল আনসারী (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। (ফতহুল মুলহিম)

বিষয়ে ছিল না বরং ঐ আ'মাল যাহা পরিত্রাণের পর জান্নাতের ধাপ লাভের বিষয়ে সম্পর্ক ছিল। এই কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ জান্নাতে শত ধাপ রহিয়াছে। পরিত্রাণ তো প্রত্যেক ধাপেই অর্জন হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকাংক্ষা ইহা ছিল যে, নিজ উম্মত নাজাতের উচ্চ হইতে উচ্চ ধাপ লাভ করুক। প্রথমতঃ ইবাদত তো কেবল লাভ ও ক্ষতির দৃষ্টিতে হয়। তাই ফরায়েয আদায়ের দ্বারা নাজাতের সুসংবাদ শুনিয়া হয়ত দিবারাত্রে পরিশ্রম করা হইতে অলসতা সৃষ্টি হইবে। কিন্তু যখন নৈকট্য ও সন্তুষ্টির উচ্চ উদ্দেশ্য সম্মুখে আসে তখন মানুষ এমন লোভী হইয়া যায় যে, নৈকট্যের উচ্চ হইতে উচ্চ মনযিল অতিক্রম করিবার পরও আশান্বিত ও পিপাসিতই থাকিয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি এখন কেবল নাজাতকে শেষ মনযিল মনে করে, হইতে পারে যে সে ফরায়েয আদায়ের উপর নাজাতের সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া বসিয়া থাকিবে। আর সুন্নত ও নফলসমূহের মধ্যে সাধনা করা ছাড়িয়া দিবে। আল্লাহ তা'আলার রসূল চাহেন যে, এই ব্যক্তিও পরিশ্রমী হউক যাহাতে রসূলের উম্মত সকলই নাজাতের উচ্চ ধাপসমূহ অর্জনে সফলকাম হয়।

জামে তিরমিযী শরীফের রিওয়ায়াত দ্বারা আরো প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতের ছাদ মহান করুণাময় আল্লাহ তা'আলার আরশ। জান্নাতের সর্বোচ্চ ধাপের নাম ফিরদাউস। আর জান্নাতের প্রশ্রবণ তথা প্রণালীসমূহের উৎপত্তি ফিরদাউস হইতে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াবলীর কিছু তথ্য আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে ঈমান গ্রহণের জন্য কিছুটা ধারণা সৃষ্টি হয়। না হয় বস্তুজগতের সহিত সম্পর্কশীল ব্যক্তির জন্য আখিরাতের বিস্তারিত জানিবার ইচ্ছা অনর্থক মস্তিষ্ককে একটি চিন্তায় পতিত করা ছাড়া আর কিছুই নহে। জান্নাতের হাকীকতের ইলম জান্নাতে প্রবেশেই হইতে পারে। আজ আ'মালের বিস্তারিত জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, কাল আ'মালের প্রতিদানের বিস্তারিত নিজে নিজেই সামনে আসিবে। সময়ের পূর্বে পরকালের বিস্তারিত জিজ্ঞাস্য ইনসাফ নহে আর তড়িগড়িও।

মুমিন জাহান্নামের জন্য হারাম

কাফির মুশরিক জাহান্নামের হালাল খাদ্য। সে তাহাদিগকে এমনভাবে আহার করিবে যেমনভাবে হালাল খাদ্য সন্দেহাতীত আহার করা হয়। কিন্তু মুমিনকে তাহার জন্য হারাম করা হইয়াছে। কাজেই মুমিন হইতে সে এইরূপ দূরে থাকিবে যেইরূপ হারাম হইতে দূরে থাকিতে হয়। অকস্মাৎ গুনাহের কারণে কোন মুমিন উহাতে পতিত হইলে সে বমি করিবার চেষ্টায় থাকিবে। জাহান্নামের পেটে মুমিন কখনও হজম হইবে না। ফলে একবার না একবার গুনাহের ময়লা পরিষ্কার হইয়া উহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

সাহাবায়ে কেরামের নিকট হাদীছ শরীফের তবলীগের গুরুত্ব হাদীছে রসুল ও কুরআনের হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-এর নিকট হাদীছ শরীফসমূহের তবলীগের গুরুত্ব কোন্ স্তরের ছিল অর্থাৎ তাঁহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন হাদীছকেই স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া মৃত্যুবরণকে ইলম গোপনের পর্যায়ভুক্ত অনুভব করিতেন। যদি হাদীছ শরীফসমূহের শরয়ী পদমর্যাদা না হইত অথবা কুরআন মজীদের পর উহার বর্ণনা অনাবশ্যক হইত তবে এইরূপ গুরুত্ব প্রদানের কারণ কি ছিল? আর ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-এর নিকট কুরআন মজীদের আয়াতঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي
الْكِتٰبِ اُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۔

অর্থাৎ "নিশ্চয় যে সকল লোক ঐ সমস্ত তথ্য গোপন করে যাহা আমি নাযিল করিয়াছি। যেইগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং পথ প্রদর্শক, যখন আমি কিতাবে সাধারণ লোকদের জন্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। ঐ সকল লোকদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীগণও তাহাদের প্রতি অভিশাপ প্রেরণ করে।"

এর হুকুমের মধ্যে যেইরূপ কুরআন মজীদের আয়াত অন্তর্ভুক্ত সেইরূপ হাদীছে রসূলও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন যে, "যদি কুরআন মজীদের আয়াত না থাকিত, তাহা হইলে আমি তোমাদের নিকট কোন হাদীছ বর্ণনা করিতাম না। এইস্থানে আয়াত বলিতে সেই সমস্ত আয়াতকে বুঝানো হইয়াছে, যাহাতে ইলম গোপন করিবার ব্যাপারে কঠিন অভিসম্পাত করা হইয়াছে। এমনিভাবে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকে হাদীছ বর্ণনা করিতে গিয়া এই ধরনের কথা বলিয়াছেন যে, ইলম গোপন করিবার ব্যাপারে যদি কুরআন মজীদের এই আয়াতখানা না থাকিত, তাহা হইলে আমি এই হাদীছ বর্ণনা করিতাম না।

সুতরাং এই সকল রিওয়ায়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-এর নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছও কুরআন মজীদের হুকুমেরই অনুরূপ। কেননা আয়াতে গোপন করিবার ব্যাপারে সেই সকল লোকদের প্রতিই অভিসম্পাত করা হইয়াছে যাহারা অবতীর্ণ প্রকৃষ্ট হিদায়েতসমূহ গোপন করিবে। হাদীছে তাহার পরিস্কার বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছসমূহকেও কুরআন মজীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এবং তাহা গোপন করাকে অভিসম্পাতযোগ্য বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যেই ইলমে দ্বীন প্রচার ও প্রসারের আবশ্যক রহিয়াছে উহার প্রচার করা ওয়াজিব এবং উহা গোপন করা হারাম। আর উম্মতের আলিমগণের উপর ফরয যে, দ্বীনে শরীআতের যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয়াদিকে এক যুগ হইতে অপর যুগ পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে-

من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من النار۔

অর্থাৎ "যে লোক দ্বীনে শরীআতের কোন বিধি-বিধানের ইলম জানা সত্ত্বেও তাহা জিজ্ঞাসা করিলে গোপন করিবে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাহার মুখে আগুনের লাগাম পরাইয়া দিবেন।" (ইবন মাজাহ)

এই আয়াত দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, জ্ঞানকে গোপন করিবার অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলার ব্যাপারেই প্রযোজ্য যাহা কুরআন মজীদ ও হাদীছে রসূলে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রহিয়াছে এবং যাহা প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা মাসায়েল সাধারণের নিকট প্রকাশ না করাই উত্তম যাহা দ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। তখন তাহা ইলম গোপন করিবার পর্যায়ভুক্ত নহে। (এই বিষয়ে বিস্তারিত ৫০ নং হাদীছের ব্যাখ্যার অধীনে "শ্রোতা মণ্ডলীর জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া বক্তব্য পেশ করা বাঞ্ছনীয়" দ্রষ্টব্য)।

বলাবাহুল্য যে সকল লোক হাদীছ শরীফসমূহ হইতে বেপরোয়া প্রকাশ করিয়া থাকে তাহারা হাদীছ শরীফসমূহ হইতে নহে বরং আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রসূল হইতে বেপরোয়া তথা মুক্ত থাকিতে চায়।

ইলমীফায়দাঃ تَأَثُّمًا = পাপে পতিত হইবার ভয়। ইলমে দ্বীন গোপন করিবার পাপে জড়িত হইবার ভয়ে হযরত মু'আয (রাযিঃ) স্বীয় অন্তিমকালে এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত মু'আয (রাযিঃ)-এর একটি কথা দ্বারাও ইহা বুঝা যায়।

ان كل حديث يبلغنى عن رسول الله صلى الله وسلم حدثتكموه الاحديثا واحدا خمأته لكم لأحد به عند الموت وقرب الرحيل ولولا مخافة الاثم بعدم التبليغ وفوات الامتثال لقوله صلى الله عليه وسلم. بلغوا عنى ولو ما حدثت به احدا ابدا

অর্থাৎ "নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যতগুলি হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি সবগুলি হাদীছই আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু একটি হাদীছ তোমাদের নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছি। আজ অন্তিমকালে এবং আখেরাতের পথে সেই পবিত্র হাদীছখানা বর্ণনা করিতেছি। আর যদি তাবলীগ না করিবার গুনাহ এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী بلغوا عنى ولو اٰية "তোমরা আমার পক্ষ হইতে যদি একটি বাণীও হয় জনসমাজের নিকট পৌছাইয়া দাও" এর উপর আমল হাত ছাড়া হইবার ভয় না থাকিত তবে কখনও কাহারও নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করিতাম না। (হযরত মু'আয (রাযিঃ) এই কথাটি ঐ সময় বলিয়াছিলেন যখন তিনি দুনিয়া হইতে চিরবিদায় নেওয়ার সর্বশেষ মুহূর্তে এবং আখিরাতের প্রথম মনযিলে পদার্পনের সময় হইয়াছিল।)

হযরত মু'আয (রাযিঃ) জ্ঞাত ছিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষেধাজ্ঞা শুধু সাধারণ জনসমক্ষে প্রচারের বিষয়ে ছিল। কারণ তাহারা হাদীছের প্রকৃত মর্মার্থ না বুঝিয়া কেবল সুসংবাদের উপর ভরসা করিয়া থাকিবে। আর বিশেষ ক্ষেত্রে নিষেধ ছিল না। এই নিষেধ হারাম পর্যায়েরও ছিল না। উহার প্রমাণ হইতেছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ হুরায়রাকে সুসংবাদ জনসমাজে প্রচারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাযিঃ) অভিমত পেশ করিলেন যে, এই সুসংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করা উচিৎ হইবে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর অভিমতে সম্মত হইলেন।

হযরত মু'আয (রাযিঃ) প্রথমতঃ সাধারণ নিষেধাজ্ঞার উপর ভিত্তি করিয়া কাহারও নিকট বর্ণনা করেন নাই। অতঃপর মৃত্যুর সময়ে তিনি বিশেষ বিশেষ লোকগণের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য নিষেধ যদি এমন ব্যাপক হইত যে, কোন ব্যক্তিকেই বলা যাইবে না তাহা হইলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয (রাযিঃ)কেও বলিতেন না। শুধু হযরত মু'আয (রাযিঃ) কেন, অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবী যেমন হযরত ওবাদা বিন ছাবিত, হযরত আবূ হুরায়রা প্রমুখের নিকটও বলিয়াছেন। কাজেই ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত মু'আয (রাযিঃ)-এর ন্যায় জ্ঞান ও বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট ইহা প্রচার করা নিষেধ ছিল না। হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) এই জবাবের অধীনে মুসনাদে আহমদ-এর দুইটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন যাহা উপরোল্লেখিত জবাবের গুরুত্ব প্রকাশ করে।

لما حضرته الوفاة قال ادخلوا على الناس. فادخلوا عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول من مات لا يشرك بالله شيئًا، جعله الله فى الجنة. وماكنت احد   الا عند الموت
وشاهدى على ذلك ابو الدرداء. فقال صدق اخى وما كان يحدثكم الا عند موته.

"যখন (হযরত মু'আয (রাযিঃ)-এর) ওফাত নিকটবর্তী হইয়াছিল তখন তিনি বলিলেন; আমার নিকট লোকদিগকে আসিতে দাও। লোকগণ আগমন করিবার পর বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিঃ যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে "কোন বস্তুকে মহান আল্লাহ তা'আলার সহিত শরীক করে নাই, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।" আর আমি তোমাদের নিকট এই রিওয়ায়াত মৃত্যুকালে বর্ণনা করিতেছি। আমার এই কথার উপর হযরত আবূদ দারদা (রাযিঃ) সাক্ষী রহিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিবার পর হযরত আবূদ দারদা (রাযিঃ) বলিলেন; আমার ভাই (মু'আয) সত্য বলিয়াছেন এবং তিনি অন্তিমকালেই তোমাদের নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। (মুসনাদে আহমদ)

মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ আইয়ূব (রাযিঃ)-এর ঘটনাও অনেকটা অনুরূপই। হযরত আবূ যবইয়ান-এর মাধ্যমে বর্ণিত আছে যে,

ان ابا ايوب غزى الروم فمرض فلما حضر قال احدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حالى هذه ما حدثتكموه سمعته يقول: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة۔

"হযরত আবূ আইয়ূব (রাযিঃ)কে জিহাদ করিবার জন্য রোম দেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি সেই স্থানে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অতঃপর যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল তখন বলিলেনঃ আমি তোমাদিগকে একখানা হাদীছ শুনাইতেছি যাহা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি। যদি আমার অবস্থা এইরূপ না হইত তবে তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতাম না। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিঃ "যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, একক আল্লাহ তা'আলার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করে নাই, সে জান্নাতে প্রবেশ করিল।"

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) স্বীয় ফতহুল মুলহিম গ্রন্থে এই স্থানে একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, হযরত মু'আয (রাযিঃ) ও অন্যান্য সাহাবীগণ এই হাদীছকে জীবনের শেষ মুহূর্তে এই কারণে বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে হাদীছের অর্থ স্বয়ং নিজেদের অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবন আবী হাতিম (রহঃ) হযরত আবূ যুরআ (রাযিঃ)-এর জীবনীতে লিখিয়াছেন যে, যখন তাহার ওফাত নিকটবর্তী হয় তখন তিনি হযরত মু'আয (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ সনদসহ বর্ণনা আরম্ভ করেন, আর যখন তিনি এই পর্যন্ত পৌছিলেন من كان آخر كلامه لا إله إلا الله۔ তখন তার রূহ উর্ধ বিচরণ করিয়া গেল (যেন ফিরিশতাগণ উত্তরে বলিলেনঃ بقوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة

হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-এর আলোচ্য বর্ণনা পদ্ধতি ও অন্তর্দৃষ্টির দরুণ হাদীছের মর্মার্থ অস্পষ্ট থাকিবার কথা নহে। দ্বিতীয়তঃ এই আবেগ এবং তবলীগে দ্বীনের দাবীও ছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন হাদীছ প্রচার ব্যতীত অবশিষ্ট না থাকে। এই কারণেই সাহাবীগণ এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই আযীমুশ্শান সুসংবাদ মানুষের নিকট পৌছিয়া যায় এবং হাদীছের বাহ্যতঃ এবং প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা কোন ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনাও মস্তিষ্কে সৃষ্টি না হয়।

হাদীছের মর্মার্থের গভীরতার দিকে মনোযোগী করিবার জন্য ইহার চাইতে উত্তম ও কার্যকর রীতি সম্ভবতঃ হইতেই পারে না যাহা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) অবলম্বন করিয়াছেন।

৫৭ حدثنا شيبان بن فروخ قال نا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك قال اصابني في بصري بعض الشيء فبعثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احب ان تاتيني فتصلي في منزلي فاتخذه مصلى قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من اصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي واصحابه يتحدثون بينهم ثم اسندوا اعظم ذلك وكبره الى مالك بن دخشم قالوا ودوا انه دعا عليه فهلك وودوا انه اصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال اليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قالوا انه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد احد ان لا اله الا الله واني رسول الله فيدخل النار او تطعمه قال انس فاعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه

হাদীছ—৫৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদিগকে হাদীছ শোনান হযরত শায়বান বিন ফাররূখ (রহঃ)।[১] তিনি বলেনঃ আমাদিগকে হাদীছ শোনান সুলায়মান তথা ইবনুল মুগীরা (রহঃ)। তিনি বলেনঃ আমাদিগকে হাদীছ শোনান ছাবিত (রহঃ), তিনি রিওয়ায়াত করেন হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে; তিনি বলেনঃ আমাকে হাদীছ শোনান মাহমুদ বিন রবী' (রাযিঃ), তিনি রিওয়ায়াত করেন হযরত ইতবান বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে।

হযরত মাহমুদ বিন রবী' (রাযিঃ) বলেনঃ আমি মদীনায় গমন করিলাম।[২] অতঃপর হযরত ইতবান (রাযিঃ)—এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তারপর আমি (হযরত ইতবান (রাযিঃ)কে) বলিলামঃ আপনার নিকট হইতে আমার নিকট একটি হাদীছ শরীফ পৌছিয়াছে—। হযরত ইতবান (রাযিঃ) বলেন (জ্বী হ্যাঁ, ইহা শুনেন) আমার চোখে কোন এক রোগের দরুন দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।[৩] তাই আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

টীকা—১. فروخ ফাররূখ নামটি علمية এবং عجمة দুই সববের দরুন غير منصرف তাই যের এবং তানভীন হইবে না। কতক বলেন যে, ফাররূখ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)—এর এক পুত্রের নামও ছিল।

টীকা—২. محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة এই বাক্যটি এইরূপ হইবে,

اى حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بحديث قال فيه محمود قدمت المدينة-

অর্থাৎ হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেনঃ আমাকে হযরত মাহমুদ বিন রবী (রাযিঃ) হযরত ইতবান (রাযিঃ)—এর সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে হযরত মাহমুদ (রাযিঃ) বলেন, যখন আমি মদীনায় গমন করিলাম—। আলোচ্য হাদীছের সনদসূত্রে দুইটি বিশেষত্ব রহিয়াছে। প্রথমতঃ তিনজন সাহাবী, যেমন হযরত আনাস (রাযিঃ), হযরত মাহমুদ (রাযিঃ) এবং হযরত ইতবান (রাযিঃ) একত্রিত হইয়াছেন, যাহাতে একজন হইতে অপর জন রিওয়ায়াত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ বড় সাহাবী ছোট সাহাবী হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। কেননা হযরত আনাস (রাযিঃ) হযরত মাহমুদ (রাযিঃ) হইতে বয়স, ইলম এবং মর্যাদার দিক দিয়া বড় ছিলেন। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা—৩. اصابني في بصري। রোগের দরুন দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অন্য রিওয়ায়াতে لما ساء بصري আর কোন রিওয়ায়াতে قد انكرت بصري বর্ণিত হইয়াছেঃ এই সকল রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে তাঁহার দৃষ্টি শক্তি দুর্বল ছিল কিন্তু অন্ধ ছিলেন না। তবে সহীহ বুখারী শরীফের باب الرخصة في المطر শিরোনামার অধীনে হাদীছ রহিয়াছে যে, হযরত ইতবান (রাযিঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের ইমাম ছিলেন এবং তিনি অন্ধ ছিলেন—

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে এই বলিয়া খবর পাঠাইলাম যে, আমার একান্ত আকাংক্ষা আপনি আমার ঘরে তশরীফ আনিয়া কোন এক স্থানে সালাত আদায় করিবেন, যাহাতে আপনার (সালাত আদায়ের) স্থানটিকে (বরকতের লক্ষ্যে) আমি নিজের জন্য নামাযের স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়া লইতে পারি।[১] হযরত ইতবান (রাযিঃ) বলেনঃ অতঃপর (একদা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন এবং তাঁহার সাহাবাগণের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিয়াছেন তাহারাও সঙ্গে আসিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া নামায আদায় করিতে থাকিলেন। (এইদিকে) তাঁহার (সঙ্গে আগত) সাহাবীগণ পরস্পর (মুনাফিকদের বিবিধ আচরণ ও স্বভাব চরিত্রের বিষয়ে) কথা বলিতেছিলেন। অতঃপর তাহারা স্বীয় আলোচনায় মালিক বিন দুখশামকে[২] লক্ষ্য বস্তু করিলেন এবং তাহাকে বড় মুনাফিক বলিয়া মন্তব্য করিলেন। আর তাহারা ইচ্ছা পোষণ করিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিক বিন দুখশামের জন্য বদদু'আ করেন যাহাতে সে ধ্বংস হইয়া যায় বা তাহারা চাহিতেন যেন সে শক্ত বালা মুসীবতে পতিত হয়। (আলোচনা চলাকালীন সময়ের মধ্যে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সম্পন্ন করিলেন এবং তিনি (স্বীয় সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেনঃ সে কি সাক্ষ্য দেয় না যে, একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহ তা'আলার (মনোনীত) রসূল? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) (জবাবে) আরয করিলেনঃ সে (তাওহীদ রিসালতে মৌখিক) সাক্ষ্য দেয় বটে কিন্তু তাহার অন্তরে (সম্ভবত) ইহা (ঈমান) নাই (কেননা সে মুনাফিকদের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখে)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ ইহা কখনও হইতে পারে না যে, কোন ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহ তা'আলার রসূল অথচ সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে? অথবা (তিনি ইহা বলিয়াছেন) যে, তাহাকে জাহান্নামের অগ্নি দগ্ধ করিবে? হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেনঃ এই হাদীছ শরীফখানা আমার খুব পছন্দ হইল। তাই আমি আমার (স্নেহের) পুত্রকে বলিলাম, এই হাদীছখানা লিপিবদ্ধ কর।[৪] অতঃপর সে উহা লিখিয়া রাখিল।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها تكون الظلمة والسيل وانا رجل ضرير البصر ۔ الحديث

হযরত ইতবান (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট আরয করিলেন যে, অন্ধকার এবং বৃষ্টি হয় আর আমি দৃষ্টিহীন মাযুর ব্যক্তি····। এই বর্ণনা অন্যান্য বর্ণনার বিপরীত হয়। হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) বলেন, আমার মতে এইরূপ নহে বরং হযরত মাহমূদ (রাযিঃ)–এর কথা যে, ইতবান (রাযিঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের ইমাম ছিলেন এবং তিনি অন্ধ অর্থাৎ হযরত মাহমূদ (রাযিঃ) হযরত ইতবানের সহিত মদীনায় সাক্ষাতের সময়ে অন্ধ ছিলেন। কিন্তু হযরত ইতবান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরয করিবার সময় অন্ধ ছিলেন না। হ্যাঁ وانا رجل ضرير البصر ইহার মর্মার্থ اصابنى منه ضر। অর্থাৎ তাহার চোখে কোন বস্তু আবরণ সৃষ্টি করিয়াছিল। সুতরাং ইহাতে বুঝা যায় যে, পূর্ণ অন্ধ ছিলেন না। কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহঃ)–এর অন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যাহা হাম্মাদ বিন সালমা (রহঃ) হযরত ছাবিত–এর সূত্রে এই শব্দ রহিয়াছে যে, তিনি অন্ধ ছিলেন ইহার মর্ম হইতেছে যে, দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হইয়া দৃষ্টিহীনতার নিকটে পৌছিয়া গিয়াছিল। তাই তাহাকে অন্ধ বলা হইয়াছে। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা–১: فاتخذه مصلى অতঃপর আপনার (নামায আদায়ের) স্থানটিকে আমি মুছাল্লা বানাইব। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নামায আদায়ের জন্য নিজ ঘরের কোন একটি স্থানকে নির্দিষ্ট করা জায়েয আছে। তবে সুনানে আবী দাউদ শরীফের একটি রিওয়ায়াতে আছে যাহাতে বাহ্যতঃ এইরূপ স্থান নির্দিষ্ট করা হইতে নিষেধ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার জবাব এই যে, এই নিষেধাজ্ঞা মসজিদ সম্পর্কে অর্থাৎ মসজিদের কোন স্থানকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়েয নাই। আর এই হুকুমও ঐ সময় যখন রিয়া তথা বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয়। তাহা না হইলে কাহারও যদি মসজিদের কোন স্থানের সহিত দৈহিক সম্বন্ধ সৃষ্টি হইয়া যায় তবে আজীবন উক্ত স্থানে নামায আদায় করিলেও কোন দোষ নাই। অধিকন্তু ঘর ও মসজিদের হুকুম এক নহে।

টীকা–২: مالك بن دخشم মালিক বিন দুখশাম। 'দুখশাম' নামটি কোন কোন নুছখায় "দুখাইশাম" রহিয়াছে।

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের গোপন তথা আন্তরিক নিয়্যাতসমূহ এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা আমাদের কোন হক অধিকার নাই। কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করে তবে তাহার অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আলোচনাধীন আনা ইসলামী সহিষ্ণুতা বিরোধী। তবে আ'মালের সাক্ষ্য যদি বিপরীত প্রকাশিত হয় তাহা হইলে তাহার ব্যাপার অবশ্য জটিল। কেননা সহিষ্ণুতারও একটি সীমা রহিয়াছে। ইসলাম এইরূপ সহিষ্ণুতা অনুমোদন করে না যাহা মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে আইন অমান্যের Spirit 'সৃষ্টি করিয়া দিবে। ইসলাম প্রকাশ্য ইবাদত আদায়ের মাধ্যমে আনুগত্য ও আন্তরিক বশ্যতার রূহ সৃষ্টি করিতে চায় আর আন্তরিক আনুগত্যের রূহ সৃষ্টি করিয়া প্রকাশ্য অংগসমূহকে ইসলামের আনুগত্য ও বাধ্য বানাইয়া দিতে চাহে। যদি বহির্ভাগ এবং অন্তর উভয়ের মধ্যে এই সমন্বয়তা সৃষ্টি না হয় তবে উহার নাম নিফাক অথবা পাপাচার। (এই বিষয়ে ৩৪, ৩৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

"নিফাক" এর মূলতত্ত্ব

আরবী অভিধানে نفاق অর্থাৎ কপটতা হইতেছে এক প্রকার প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার নাম। মুনাফিক অন্তরে কুফর গোপন করে এবং মুখে ঈমান প্রকাশ করিয়া প্রতারণা করিতে নিয়োজিত থাকে। মুনাফিকের সম্পূর্ণ জীবনই যেহেতু এই অপগুণে আচ্ছন্ন থাকে সেহেতু তাহাকে মুনাফিক বলে।

পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাইলে, প্রত্যক্ষ করা যায় যে, যখনই কোন স্থানে কোন এসলাহী (তথা সংশোধনের) আন্দোলনের আওয়াজ বুলন্দ করা হইয়াছে তখনই উক্ত ময়দানে তিনটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। (১) পূর্ণভাবে সমর্থক দল। (২) সম্পূর্ণ প্রতিপক্ষ তথা শত্রু দল। (৩) এবং তৃতীয় দলটি হইতেছে যে, ভিতরে প্রতিপক্ষতা বহন করিয়া কেবল বাহ্যিক সমর্থন দানে একাত্মতা প্রকাশ করা।

বলাবাহুল্য এই তৃতীয় দলটি চিরকালব্যাপী দ্বিতীয় দল অপেক্ষা অধিক বিপদ সঙ্কুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ দ্বিতীয় দলটি প্রকাশ্য শত্রু। প্রকাশ্য শত্রুর অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব কিন্তু বন্ধুরূপী শত্রুর অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নহে। এই কারণেই সলফে সালেহীনের যুগে যখনই কোন ব্যক্তি সম্পর্কে গোপন ষড়যন্ত্র বা নিফাকের সন্দেহ হইত তখনই তাহার অপরাধকে ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া ধারণা করা হইত। উল্লেখ্য

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

আর সহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য হাদীছের কিতাবে 'মীম' এর স্থলে 'নূন' দ্বারা রহিয়াছে অর্থাৎ দুখশান এবং দুখাইশান। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-৩ فقضى رسول الله صلعم - الصلوة অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সম্পন্ন করিলেন। "অন্য রিওয়ায়াতে فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة مع الجماعة অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআতের সহিত নামায সম্পন্ন করিলেন।" আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে—

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبّر نقمنا فصففنا فصلّى ركعتين ثمّ سلّم -

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায়ের জন্য দাঁড়াইলেন এবং তাকবীর বলিলেন। আমরাও তাঁহার পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইলাম। তিনি দুই রাকআত নামায আদায় করিয়া সালাম ফিরাইলেন।" ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল নামায জামাআতের সহিত আদায় করা জায়েয।

টীকা-৪ فقلت لا بنى اكتبه "অতঃপর আমি আমার পুত্রকে বলিলাম এই হাদীছখানা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখ।" হযরত আনাস (রাযিঃ) স্বীয় পুত্রকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করিবার নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদীছ শরীফসমূহ এবং অন্যান্য যাবতীয় দ্বীনে শরীআতের ইলম লিপিবদ্ধ করা জায়েয বরং উত্তম। আর কোন কোন সময় উহা লিপিবদ্ধ করা ওয়াজিব ও অত্যাবশ্যক। (এই সম্পর্কে বিস্তারিত "ভূমিকা" দ্রষ্টব্য।)

যে, হযরত হাতিব বিন আবী বুলতাআ (রাযিঃ) বদরী সাহাবী ছিলেন অথচ মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে তাহার একটি আমলে সামান্য ক্রটিকে নেফাক তথা কপটতা সন্দেহ করিয়া হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার সম্পর্কে دعنى اضرب عنق هذا المنافق "আমাকে অনুমতি দিন যে, আমি এই মুনাফিকের গ্রীবা ছিন্ন করিয়া দেই।" এইরূপ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা অনুমিত হয় যে, হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর দৃষ্টিতে নিফাকের অপরাধ কোন্ স্তরের বিবেচিত হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর আবেগসমূহকে সেই দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। কিন্তু নিফাক যেহেতু মানুষের অন্তরের অবস্থার নাম আর অন্তরের অবস্থার জ্ঞান একমাত্র আলিমুল গায়েব আল্লাহ তা'আলারই রহিয়াছে তাই তিনি ইচ্ছা করিলে স্বীয় রসূলকে কোন ব্যক্তির অন্তরের বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। কাজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে ঈমানদার হইবার বিষয় সত্যায়িত করিলে উহা সেই ব্যক্তির ঈমানের উপর দলীল হইবে।

হযরত মালিক বিন দুখশাম (রাযিঃ)ঃ

হযরত মালিক বিন দুখশাম (রাযিঃ) আনসারী সাহাবী ছিলেন। আবূ ওমর বিন আবদিল বার (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, বাইআতে আকাবায় তিনি উপস্থিত ছিলেন কিনা এই বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও তিনি যে বদর জিহাদে এবং উহার পর অন্যান্য গযূয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন উহাতে কাহারও কোন মতবিরোধ নাই। তিনি সুহাইল বিন আমরকে বন্দী করিয়াছিলেন। হযরত মালিক বিন দুখশাম (রাযিঃ) ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন, যাহাদিগকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের মসজিদ "মসজিদে যিরার"কে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) ও ইবন ইসহাক (রহঃ) স্বীয় মাগাযী গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث مالكا هذا ومعن بن عدى فحرقا مسجد الضرار۔

অর্থাৎ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মালিক (মালিক বিন দুখশাম) এবং মাআন বিন আদী (রাযিঃ)কে (মুনাফিকদের মসজিদ ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহারা উভয়ে মসজিদে যিরারকে দগ্ধ করিয়া দিলেন।" এই সকল নিদর্শনাদী এবং বিশেষ করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার আন্তরিক ঈমান ও নিফাক হইতে পবিত্র হইবার বিষয়টি সত্যায়িত করিবার দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সত্য মুমিন মুসলিম ছিলেন। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) রিওয়ায়াত করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ الا تراه قال لا اله الا الله يبتغى بها وجه الله تعالى۔
"তোমরা কি প্রত্যক্ষ করিতেছ না যে, সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে لا اله الا الله বলে।"

হ্যাঁ, সাহাবীগণ (রাযিঃ) যে তাহাকে মুনাফিক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এই মুনাফিক দ্বারা তাহাকে বিশ্বাসগত মুনাফিক (نفاق الكفر) তথা কাফির বলা উদ্দেশ্য নহে বরং কোন কোন মুনাফিকের সহিত সম্বন্ধ তথা বন্ধুত্ব রাখিবার কারণে তাহাকে আমলগত মুনাফিক (نفاق العمل) বলিয়াছেন। আর ইহা সম্ভবতঃ তাঁহার উযর তথা অপারগতা ছিল যেমন হযরত হাতিব বিন আবী বুলতাআ (রাযিঃ)–এর উযর ছিল।

বলাবাহুল্য নবূওয়াতের যুগের পর আর কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাসগত মুনাফিক (نفاق الكفر) বলিবার হক অধিকার কাহারও নাই। তবে আমলগত মুনাফিক (نفاق العمل) চিরকাল থাকিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম)

শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি একটি অঙ্গীকারনামা মাত্র

আলোচ্য হাদীছ শরীফে কোন প্রকার শর্ত ব্যতীত কেবল শাহাদাতাইন তথা তাওহীদ রিসালতের স্বীকারোক্তির উপর জাহান্নামের অগ্নি হইতে পরিত্রাণের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। অথচ শাফাআত অধ্যায়ের হাদীছসমূহে রহিয়াছে যে, শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও যদি অন্যান্য ইসলামী আহকাম তথা ফরয

ওয়াজিব আদায় না করে তবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। জবাব এই যে, এই সকল রিওয়ায়াতে বাহ্যতঃ বিরোধ মনে হইলেও বস্তুতঃ কোন বিরোধ বা বৈপরীত্য নাই। শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি একটি সংক্ষিপ্ত শিরোনাম। যাহার মধ্যে আহকামে শরীআতের আদেশ নিষেধ ও ফরয ওয়াজিব অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অথবা এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের "অঙ্গীকারপত্রে" স্বাক্ষর করা। যাহার মর্ম এই যে, ইসলামের সকল আহকাম নিয়মানুবর্তীতার সহিত পালনের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ফরয ওয়াজিবসমূহ আদায়ে ত্রুটি করে তাহা হইবে অপরাধ তথা গুনাহ। তাই গুনাহ পরিমাণ শাস্তি হইবে। এরশাদ হইয়াছে- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ - "আর যে অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করিবে সে তাহা প্রত্যক্ষ করিবে।"

ফায়দাঃ ১। বুযুর্গগণের আছার তথা চিহ্ন দ্বারা বরকত লাভ জায়েয।

২। ওলামা, ফুযালা এবং মাশায়েখ স্বীয় মুরীদ এবং শিষ্যদের বাস গৃহে যাওয়া এবং তাহার সহিত মিলিত হওয়া উত্তম।

৩। অধীনস্থরা তাহাদের কর্তার নিকট যুক্তিসংগত কোনকিছু আবেদন করা জায়েয।

৪। নামায আদায়কারীর পার্শ্বে বসিয়া কথা বলা জায়েয আছে যদি নামাযের অসুবিধা না হয়।

৫। বাড়ী তথা গৃহের মালিক সম্মত থাকিলে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগত মেহমান-এর ইমামাত করা জায়েয।

৬। হাকিম বা ইমামের নিকট কোন ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করিয়া দেওয়া জায়েয যদি উক্ত ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৭। ইমাম অথবা আলিম ব্যক্তি স্বীয় সাথীদের সঙ্গে লইয়া কাহারও সহিত সাক্ষাৎ অথবা দাওয়াত খাওয়ার জন্য যাইতে পারেন। ইহা জায়েয। (নববী)

৫৮ حدثني ابو بكر بن نافع العبدى قال نا بهز قال نا حماد قال نا ثابت عن انس قال حدثني عتبان بن مالك انه عمى فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لى مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة -

হাদীছ–৫৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাকে হাদীছ শোনান আবূ বকর বিন নাফি' আবাদী (রহঃ) তিনি বলেনঃ আমাদিগকে হাদীছ শোনান বাহয (রহঃ), তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীছ শোনান হাম্মাদ, তিনি বলেনঃ আমাদিগকে হাদীছ শোনান ছাবিত, তিনি রিওয়ায়াত করিয়াছেন হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেনঃ আমার নিকট হযরত ইতবান বিন মালিক (রাযিঃ) এই কথা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে এই বলিয়া খবর পাঠাইলেন, (আমার একান্ত ইচ্ছা যে) আপনি আমার বাড়ীতে তশরীফ আনুন এবং আমার জন্য (আপনার নামায আদায়ের স্থানটিকে) একটি মসজিদ (সালাত আদায়ের স্থান হিসাবে) চিহ্নিত করিয়া দিন।[১] অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন এবং তাঁহার সাহাবীগণও (যাহারা আসিতে ইচ্ছা করিলেন তাহারা) সঙ্গে আসিলেন। কিন্তু এক ব্যক্তি অনুপস্থিত রহিলেন যাহার নাম মালিক বিন দুখশাম (রাযিঃ)। অতঃপর তিনি (বর্ণনাকারী হাদীছের পববর্তী অংশ) হযরত সুলায়মান বিন মুগীরার (উপরোল্লেখিত হাদীছের) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

এই হাদীছ শরীফের বিষয়বস্তু উপরোল্লেখিত ৫৭নং হাদীছের অনুরূপ। সহীহ বুখারী শরীফের আরবী শরাহ ফতহুল বারী গ্রন্থে পূর্ণ ঘটনাকে বিস্তারিত উল্লেখ করা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড ৪৩৭ পৃঃ)। ঘটনা এই যে, একজন বদরী সাহাবী হযরত ইতবান বিন মালিক (রাযিঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের ইমামতির দায়িত্ব পালন করিতেন। রোগের কারণে তাহার দৃষ্টি শক্তি খুবই দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। একদা তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খেদমতে আরয করিলেন যে, অন্ধকার সময়ে যখন বৃষ্টি হইয়া রাস্তাঘাটে পানির স্রোত বহিতে থাকে তখন আমার পক্ষে মসজিদে যাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে আমার নিজ ঘরেই নামায আদায় করিতে হয়। আমার একান্ত বাসনা, আপনি যদি আমার ঘরে যাইয়া কোন একস্থানে নামায পড়িতেন তবে সেই স্থানটি বরকতময় হইত। আর আমি ঐ স্থানটিকে সর্বদার জন্য নামাযের স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়া লইব। সম্ভবতঃ এই দরখাস্ত শুক্রবারে করা হইয়াছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার আবেদন মঞ্জুর করিলেন। হযরত ইতবান (রাযিঃ) আরয করিলেন, আচ্ছা হুযুর! আগামীকালই তশরীফ আনুন।

পরদিন সকালে একটু বেলা হইবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর (রাযিঃ), হযরত ওমর (রাযিঃ) এবং অন্যান্য সাহাবাগণকে সঙ্গে লইয়া হযরত ইতবানের বাস গৃহে তশরীফ আনিয়া প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করিয়া বসিবার পূর্বেই জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কোন্ স্থানে নামায পড়িব? হযরত ইতবান (রাযিঃ) ঘরের এক কোণের দিকে ইঙ্গিত করিলেন।

টীকা–১: فخط لى مسجدا অর্থাৎ اعلم لى على موضع لاتخذه مسجدا اى موضعا اجعل صلوتى فيه متبركا باثارك)

অর্থাৎ আপনি আমার জন্য একটি স্থান চিহ্নিত করিয়া দিন যাহাতে আমি উক্ত স্থানটিকে বানাইয়া লই মসজিদুল বাইত অর্থাৎ আপনার (নামায আদায়ের) চিহ্নটিতে বরকত লাভের জন্য সর্বদা নামায আদায় করিব। (ফতহুল মুলহিম)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য দাঁড়াইলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) পিছনে কাতার বাঁধিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত নামায আদায় করিয়া সালাম ফিরাইলেন। আরব দেশে গোশত দিয়া এক প্রকার খাদ্য তৈরী করা হয়। উহাকে খযীরা (خزيرة) বলে। হযরত ইতবান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর জন্য যে খযীরা তৈরী করিয়াছিলেন উহা তাঁহার সামনে পেশ করিলেন। মহল্লাবাসীর যেই সকল লোক মজলিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদিগকে সঙ্গে নিয়া সকলই পেশ কৃত খাদ্য আহারকরিলেন।

আগন্তুক লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিলঃ মালিক বিন দুখশাম কোথায়? সে কি এই স্থানে উপস্থিত হয় নাই? অন্য একজন বলিয়া উঠিলেনঃ সে তো মুনাফিকদের সহিত সম্বন্ধ রাখে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? কোন একজন বলিলেন, এইরূপ বলিও না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তোমরা কি প্রত্যক্ষ কর না যে, সে কালেমা পাঠকারী, আর এই কলেমা পাঠে লোক দেখানো উদ্দেশ্য নয় বরং সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কলেমা পাঠ করিয়াছে। তবে তাহাকে যে মুনাফিকদের প্রতি হিতাকাঙ্খী প্রত্যক্ষ করিতেছ এই ব্যাপারে তাহাকে নসীহত কর। প্রশ্নকারী চুপ হইয়া গেলেন এবং আদবের সহিত আরয করিলেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূল উত্তম জানেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পর কোন ব্যক্তির অন্তরে নিফাক আছে অথবা নিফাক নাই এই হুকুম দেওয়ার হক অধিকার কাহারও নাই। এই কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উসূল বলিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা বাহ্যিক অবস্থার সীমা পর্যন্ত শৃঙ্খলিত। আর অন্তরের অবস্থার হুকুম তোমাদের কাজ নহে যে, বক্ষ ছিরিয়া ছিরিয়া কি দেখিয়া লইবে?

ইবাদতের জন্য স্থান নির্ধারণ ও বুযুর্গগণের আছার তথা চিহ্ন দ্বারা বরকত লাভ জায়েয

আলোচ্য হাদীছে হযরত ইবতান (রাযিঃ) স্বীয় ঘরের যে কোন জায়গায় নামায আদায় করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নামাযের স্থান নির্দিষ্ট করিবার মধ্যে উপযোগিতা ইহা ছিল যে, স্থান নির্ধারণের দ্বারা ইবাদতে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য মা'মূলাত আদায়ের জন্যও স্থান নির্দিষ্ট করা জায়েয। তবে শর্ত হইতেছে যে, উহাকে মূল উদ্দেশ্য (مقصود بالذات) অনুভব করা যাইবে না। কেবলমাত্র ইবাদতে একপ্রকার একাগ্রতা সৃষ্টির অছিলা তথা উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহিলে করা যাইবে। দ্বিতীয়তঃ এই নির্ধারণের দ্বারা অন্য কাহারও হক নষ্ট করা যাইবে না।

অতঃপর দেখা যায় যে, এই সাহাবী নিজেই স্থান নির্দিষ্ট করিতে পারিতেন কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তকলীফ দিয়া বাড়ীতে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নামায আদায়কৃত স্থানটি বরকতময় হইবে। ফলে উক্ত স্থানের ইবাদতে অধিক বরকত লাভ হইবে। তবে শর্ত হইতেছে যে, বিশ্বাস ও আমলের মধ্যে অতিরঞ্জন এবং সীমা অতিক্রম না হইতে হইবে। তাহা না হইলে আ'মাল শিরক ও বিদাআতের সীমায় প্রবেশ করিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

باب الدليل على ان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وان ارتكب المعاصى الكبير.

অনুচ্ছেদঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে রব্ব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল হিসাবে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে সে মুমিন যদিও সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকে" উহার দলীল

৫৯ حدثنا محمد بن يحيى بن ابى عمر المكى وبشر بن الحكم قالا حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردى عن يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.

হাদীছ—৫৯. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদিগকে হাদীছ শোনান মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন আবী ওমর আল মক্কী (রহঃ) এবং বিশর বিন হাকাম (রহঃ)। তাহারা উভয়ই[১] রিওয়ায়াত করেন হযরত আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিব (রাযিঃ)[২] হইতে। হযরত আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিব (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন; সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাইয়াছে যে আল্লাহ তা'আলাকে রব্ব, ইসলামকে দ্বীন এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল হিসাবে সন্তুষ্ট চিত্তে মানিয়া নিয়াছে।

টীকা-১ وهو ابن محمد الدراوردى আর তিনি হইলেন ইবন মুহাম্মদ আদ দাওয়ারদী (রহঃ)। বর্ণনাকারী হযরত আবদুল আযীয (রহঃ)-এর পিতার নাম উল্লেখ করেন নাই। ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁহার পিতার নাম প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে অন্যদের সহিত সংমিশ্রন না হয়। আর و هو শব্দটি অতিরিক্ত লইয়া ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আবদুল আযীযের পিতার নাম তিনি স্বীয় পক্ষ হইতে সংযোজন করিয়াছেন।

টীকা-২ عباس بن عبد المطلب হযরত আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিব (রাযিঃ)-এর কুনিয়াত আবুল ফযল। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা আবদুল্লাহর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তাঁহার মাতার নাম নুতায়লা বিনৃত জানাব। তিনি ছিলেন খুবই মর্যাদা সম্পন্ন, প্রভাবশালী, বুদ্ধিমান সুপুরুষ। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যধিক সম্মান করিতেন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে দুই বা তিন বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা কোন এক ব্যক্তি হযরত আব্বাস (রাযিঃ)কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আপনি বড় না রসূলুল্লাহ! হযরত আব্বাস (রাযিঃ) অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত উত্তর দিয়াছিলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়। তবে বয়স আমার বেশী। হযরত আব্বাস (রাযিঃ) বাল্যকালে একবার হারাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আম্মাজান মান্নত করিয়া ছিলেন যে, যদি পাওয়া যায় তবে কা'বা ঘরে গীলাফ পরাইবেন। হযরত আব্বাস (রাযিঃ)-এর আম্মাই প্রথম মহিলা যিনি আল্লাহ তা'আলার ঘরকে রেশমী বস্ত্র পরাইয়াছিলেন। হযরত আব্বাস (রাযিঃ) জাহিলিয়াত যুগে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) স্বীয় সম্প্রদায়ের সরদার ছিলেন। বনু হাশিমের নিঃস্ব ও অসহায় দুঃস্থ মানুষের অন্ন বস্ত্র ও অপরাপর প্রয়োজন নিবারণের দায়িত্ব তিনি বহন করিতেন। হাজীগণকে পানি পান করাইবার কাজ তাহার হাতে ন্যস্ত ছিল। তিনি সর্বদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহযোগিতা করিতেন। মসজিদে হারামে কুরাইশরা যে সকল গালাগালি ও অশালীন কথা বলিত তিনি তাহাদিগকে উহা হইতে বারণ করিতেন। মুজাহিদ লিখিয়াছেনঃ হযরত আব্বাস (রাযিঃ) মৃত্যুর সময় সত্তর জন গোলাম আযাদ করিয়াছিলেন। গোপনে তিনি অনেক পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ উপযোগিতায় উহা প্রকাশ করেন নাই। অপারগ হইয়া বদর যুদ্ধে তিনি কুরাইশদের সহিত অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবূ ইয়াসর কা'ব বিন

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ইমাম নববী (রহঃ) সাহেবে তাহরীর হইতে বর্ণনা করেনঃ রাযী শব্দের অর্থ সন্তুষ্ট হওয়া, যথেষ্ট জানা, পরিতুষ্ট করা এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট কোন কিছু না চাওয়া। সুতরাং হাদীছের মর্ম হইবে যে, একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহাকেও অনুসন্ধান না করা এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন কুফরী রাস্তায় না চলা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত শরীআতের অনুকূলে থাকা। অতএব যাহার মধ্যে এই সকল গুণাবলী বিদ্যমান থাকিবে নিঃসন্দেহে ঈমানের স্বাদ তাঁহার হৃদয়ে অনুভব হইবে এবং উহার মিষ্টত্ব আস্বাদন করিবে।

আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেনঃ রিযা (رضا) দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে যে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আনুগত্য স্বীকার করা। বালা মুসীবতে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকা এবং নেয়ামত লাভে শুকরিয়া করা। আর আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত তকদীর ও ফায়সালার উপর যথাযথ সন্তুষ্ট থাকা। ইসলামী শরীআতের আদেশ পালন করা এবং নিষেধ হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত, আদাব, আখলাক ও সামাজিক আদান প্রদান প্রভৃতি যথাযথ অনুসরণ করা। দুনিয়ার আসক্তি ত্যাগ করা এবং পূর্ণভাবে আখেরাতের দিকে মনোযোগী হওয়া।

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ মিষ্টত্ব আস্বাদন করিবার মর্ম হইতেছে যে, তাহার ঈমান সহীহ হইবে। আর তাহার অন্তর স্থিরতা ও প্রশান্তি লাভ করিবে। এইজন্য যে, যখন উক্ত বস্তুসমূহে রাযী তথা সন্তুষ্ট হয় তখন ইহা প্রমাণ করিবে যে তাহার পূর্ণ মা'রেফাত এবং অন্তর্দৃষ্টি লাভ হইয়াছে। ফলে তাহার অন্তরও আনন্দ পাইবে। কেননা কোন ব্যক্তি যদি কোন বস্তুতে সন্তুষ্ট হয় তবে উহা তাহার উপর সহজ হইয়া যায়। অনুরূপ যখন মুমিনের অন্তরে ঈমান দৃঢ়পদ হয় তখন যাবতীয় ইবাদত ও নেক আ'মাল তাহার জন্য সহজ হইয়া যায় এবং উহা তাহাকে আস্বাদন দেয়।

তুহফাতুল আহইয়ার গ্রন্থে রহিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্বের উপর সন্তুষ্ট হওয়ার আলামত এই যে, তাঁহার নির্ধারিত ভাগ্যলিপি ও নিয়তির উপর সন্তোষ থাকিবে। চিন্তা, কষ্ট ও বালা মুসীবতের মধ্যেও তাঁহার প্রতি অপবাদ ও তিরস্কার করিবে না।

আর দ্বীনে ইসলামের উপর সন্তুষ্ট হইবার আলামত এই যে, ইসলামের যাবতীয় আহকামের উপর অটল থাকিবে এবং কুফরী ও শিরকীর রীতিনীতির পার্শ্বেও যাইবে না। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত ও পয়গাম্বরত্বের উপর সন্তোষ হইবার আলামত এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের উপর চলিবে এবং বিদআতের সহিত শত্রুতা রাখিবে। সুতরাং যাহার মধ্যে এই সকল বিষয়াবলী উপস্থিত না থাকিবে সে ঈমানের আস্বাদনের গন্ধও পাইবে না।

রিযা (رضا) নৈকট্যতার উচ্চ স্থান

"রব্ব" (ربًا) এর অর্থ সরদার, মালিক ও সর্বময় পরিচালক। বান্দার এই ইলম ও দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করিবার পর অর্জন করিবে যে, আল্লাহ তা'আলা যেইভাবে চাহেন সেইভাবেই পরিচালনা করিয়া থাকেন। দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-আনন্দ ইত্যাদি যাহা কিছুই হউক না কেন তাঁহারই পক্ষ হইতে এবং বান্দা উহারই উপর রাযী ও

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

ওমর (রাযিঃ)-এর হাতে তিনি বন্দী হন এবং ফিদিয়া প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করেন। হিজরী ৭ম সনে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায় হিজরত করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। হুনায়নের জিহাদে তিনি খুবই বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং স্বীয় উচ্চ নিনাদে জিহাদের গতি পাল্টাইয়া দিয়াছিলেন। অন্যান্য জিহাদেও তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হিজরী ৩২ সনে ৮৬ বা ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর পরবর্তী বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত আব্বাসী খিলাফত তাঁহারই নামের সহিত সম্পর্কিত।

খুশী থাকিবে। আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্বের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈমানের এই অবস্থা বান্দার মধ্যে অন্য একটি উচ্চ হালাত সৃষ্টি করিবে। এই কারণেই মাশায়েখগণ - رضا (সন্তুষ্ট)কে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের উচ্চস্থান বলিয়াছেন। হ্যাঁ, প্রথমতঃ রিযা তথা সন্তুষ্ট অবস্থায় বান্দার খানিকটা কষ্ট অনুভব হইতে পারে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে তাহার জীবনের গতিধারায় এইরূপ আশ্রয় গ্রহণ করিবে যে, সম্পূর্ণ জীবনই দ্বীনে শরীআতের ছাঁচে গড়িয়া স্বভাবে পরিণত হইয়া যাইবে।

বলাবাহুল্য বাহ্যতঃ কোন বস্তু বান্দার স্বভাবের বিপরীত সামনে আসিলে উহাতে তাহার চিন্তা করিবার দুইটি বাহু তথা রীতি রহিয়াছে। প্রথম এই যে, আল্লাহ তা'আলা মহা প্রজ্ঞাবান, দার্শনিক ও মহান দাতা। ফলে যেই বস্তুকে আমরা আমাদের স্বভাবের বিপরীত প্রত্যক্ষ করিয়া মুসীবত মনে করিতেছি হয়তঃ উহাতে রহিয়াছে আমাদের কল্যাণ ও নিশ্চিত আরাম। ঔষধের তিক্ততা ও অপারেশনের নির্মমতা রোগী সন্তুষ্ট চিত্তে বহন করিয়া থাকে। কারণ উক্ত তিক্ততা ও নির্মমতার মধ্যে তাহার জন্য কল্যাণ গোপন রহিয়াছে। দ্বিতীয় বাহু এই যে, স্বভাবের বিপরীত কি হিসাবে? শত্রুর পক্ষ হইতে অথবা বন্ধুর পক্ষ হইতে? আল্লাহ তা'আলা মুমিনের বন্ধু, শত্রু নহেন। আর বন্ধুর প্রত্যেক কাজই মাহবুব হয়। কাজেই ঈমানের চাহিদা হইতেছে যে, করুণাময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে যাহা কিছু আসিবে উহাকে মুমিন বান্দা মহব্বতের সহিত স্বাগতম জানাইবে এবং ইহা বুঝিবে যে হাকীমের প্রত্যেক নির্দেশে হেকমত রহিয়াছে।

শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তির অর্থ অন্তর ও দৃষ্টির মধ্য হইতে অন্য কিছুর স্থান সঙ্কুলান না হওয়া। আর ইহাই হইতেছে মকামে রিযা।

দ্বীন অনুসন্ধান মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। আর দ্বীনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলের ধ্যান ধারণা অপরিহার্য। শাহাদাতাইনের মর্ম হইতেছে যে, দ্বীনে ইসলাম গ্রহণ করিবার পর প্রকৃতিগত স্বভাবের মধ্যে অন্য কোন দ্বীনের চাহিদা থাকিবে না। মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব দ্বীনে ইসলাম দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিবে। আর দ্বীনে ইসলাম প্রভুত্বে এমন সঠিক তথ্য বলিয়া দেয় যাহার পর প্রভুত্বের অনুসন্ধানও সমাপ্ত হইয়া যায়। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারা নবুওয়াত ও রিসালতের স্থানটি এমনভাবে পরিসমাপ্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহার পর নবী ও রসূলের অনুসন্ধান চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের পর যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনের কোন বিষয়সমূহে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ও অনুসন্ধানের সূত্র অবশিষ্ট আছে বলিয়া মনে করে তবে সেই ব্যক্তির শাহাদাতাইন কেবল মৌখিক হইবে। আর যেই ব্যক্তি দ্বীনী বিষয়সমূহের শান্তির উপর শান্তি পায় এবং তাহার দৃষ্টিকে অন্য দিকে ফিরানো অনাবশ্যক করিয়া দেয় তবে বুঝিতে হইবে যে, শাহাদাতাইন তাহার অন্তরের মধ্যে পতিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সন্তোষ ও আনুগত্যের এই মনযিলের নাম ঈমান। বান্দা যখন এই মনযিল লাভ করিবে তখন দ্বীনের কোন বিষয়ের উপর দোষ অন্বেষণ ও প্রশ্নাদি থাকিবে না। আর তাহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এই কথা বাহির হইবেঃ

زندہ کنی عطائے تو ور بکشی فدائے تو

دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو۔

"জীবিত আছি তোমার দানে, মৃত্যু দিলে তোমার প্রেমে

হৃদয় মত্ত তোমার প্রতি, যাহা কর তোমার খুশী।"

এই সন্তোষ ও আনুগত্যের আলোচনা কুরআন মজীদের বিভিন্ন শব্দে আসিয়াছে।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ - ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ -

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট। ইহা তাহার জন্যে যে তাহার রব্বকে ভয় করে।" (সূরাবাইয়্যানা-৮)

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর মধ্যে এই রিযা তথা সন্তোষ কামিল স্তরের শক্তিমান ছিল। যাহার কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উম্মতগণের নিকট তাহাদের জন্য رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُمْ (আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন)কে পাথর্ক্য করণীয় "মনোগ্রাম" রূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

প্রাকৃতিক প্রভাবসমূহ সন্তোষ ও আনুগত্যের পরিপন্থী নহে

মানুষ একটি যন্ত্র নহে বরং জীবিত, অনুভূতিপরায়ন, জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন এক অস্তিত্ব। আনন্দ ও চিন্তা তাহার প্রকৃতিগত প্রভাব। সে কেমন মানুষ যে বেদনার দুঃখ হইতে পরিচয় রাখে না? আনন্দের অবস্থা ও বেদনার যন্ত্রণা হইতে অপরিচিত ব্যক্তি অনুভূতিহীন অথবা দুর্ভাগা (شقاوت) হইতে পারে বটে কিন্তু সন্তোষ ও আনুগত্য হইতে পারে না। সন্তোষ ও আনুগত্যের স্থান ইহা যে, অন্তরের উপর বিষন্নতার পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িবে কিন্তু অভিযোগের কোন শব্দ মুখ হইতে নিসৃত হইবে না। নিজের অসহায়তা, বিনয় প্রকাশ ও বশ্যতা স্বীকারোক্তিপূর্বক এই কথা বলিয়া চুপ হইয়া যাইবে যে, হে ইব্রাহীম! তোমার বিয়োগে আমাদের দুর্বল অন্তর নিঃসন্দেহে ব্যথিত।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সহিত আবু সাইফ লুহারের বাড়ী গিয়াছিলাম। আবু সাইফ লুহার হযরত ইব্রাহীমের দুধ মাতার স্বামী ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইব্রাহীমকে কোলে লইলেন এবং উত্তম পিয়ার করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় বার আমরা তাহার বাড়ীতে গেলাম। তখন দেখিলাম যে, হযরত ইব্রাহীম পরলোকগমন করিয়াছেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মুবারক চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) বলিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনিও কাঁদিতেছেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেনঃ হে ইবনে আওফ! ইহা আল্লাহ তা'আলার রহমতের চিহ্ন। ইহা বলিবার পর পুনরায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর চক্ষুদ্বয় অশ্রু পরিপূর্ণ হইবার অবস্থায় এরশাদ করিলেনঃ চক্ষুদ্বয় নিঃসন্দেহে ক্রন্দন করে আর অন্তরও চিন্তান্বিত ও ব্যথিত। কিন্তু এই অবস্থায়ও মুখ হইতে ঐ শব্দ বাহির হইবে যাহা আল্লাহ তা'আলার সন্তোষের কারণ হইবে। হে ইব্রাহীম! উহাতে সন্দেহ নাই যে, তোমার ওফাতে আমরা সকলই ব্যথিত। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দাঃ (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করেন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবেন। মুসনাদে আহমদ ও জামে তিরমিযী শরীফে এই বিষয়বস্তুর উপর একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি মুসলিম বান্দা সকাল এবং বিকাল তিনবার নিম্নোক্ত বাক্যগুলি পাঠ করে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা নিজের উপর অত্যাবশ্যক করেন যে, কিয়ামত দিবসে স্বীয় বান্দাকে সন্তুষ্ট করিবেন। কলেমা (বাক্য) গুলি এইঃ

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا-

অর্থাৎ "আমি আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিপালক, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল হিসাবে সন্তুষ্ট রহিয়াছি।"

(২) হযরত দায়ালামী (রহঃ) স্বীয় মুসনাদুল ফিরদাউস গ্রন্থে হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)–এর হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেনঃ

انطقوا السنتكم قول لا اله الا الله ومحمد رسول الله وان الله ربنا والاسلام ديننا و محمد نبينا فانكم تسئلون عنها فى قبوركم-

"তোমরা স্বীয় জিহ্বা দ্বারা অধিক হারে এই কথার চর্চা (মশ্‌ক) করঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ رَبُّنَا وَالْاِسْلَامُ دِيْنُنَا وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ তা'আলার রসূল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদের পালনকর্তা, ইসলাম

আমাদের দ্বীন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নবী) নিশ্চয় তোমরা তোমাদের কবরে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবে।" (ফতহুল মুলহিম)

باب بيان عدد شعب الايمان وافضلها وادناها - وفضيلة الحياء وكونه من الايمان -

অনুচ্ছেদঃ ঈমানের শাখা প্রশাখার সংখ্যা, উহার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার বিবরণ, লজ্জার ফযীলত এবং উহা ঈমানের শাখা হওয়ার বর্ণনা.

৬০ حدثنا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ -

হাদীছ—৬০. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদিগকে হাদীছ শোনান ওবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ), তাঁহারা উভয়ই ১—২ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঈমানের শাখা প্রশাখা সত্তরটিরও অধিক।৩ লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছে ঈমানের দাবী ও প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ বর্ণনা উদ্দেশ্য। কারণ হাকীকতে ঈমান হইতেছে তাওহীদ ও রিসালতে দৃঢ় বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম।

بضع শব্দটি তিন হইতে দশের মধ্যবর্তী কোন একটি সংখ্যা বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিখ্যাত অভিধান কামূসে রহিয়াছে যে, তিন হইতে নয় পর্যন্ত। অথবা পাঁচ পর্যন্ত অথবা এক হইতে চার পর্যন্ত অথবা চার হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝাইবার জন্য উহা ব্যবহৃত হয়। আরবী ব্যাকরণবিদ খলীল বলেন, بضع সাত সংখ্যাকে বুঝায়। সর্বশেষ অভিমত অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা, কোন কোন রিওয়ায়াতে سبع وسبعون বর্ণিত হইয়াছে। এই হিসাবে بضع وسبعون এবং سبع وسبعون একই মর্মার্থ হইবে। কুরআন মজীদের একটি পবিত্র আয়াতের তফসীরে মুফাসসীরগণ بضع শব্দের মর্ম সাত গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ - "অতএব তাহাকে আরও কয়েক বৎসর কারাগারে থাকিতে হইল।" (সূরা ইউসুফ—৪২) কারণ হযরত ইউসূফ (আঃ) কারাগারে সাত বৎসর ছিলেন।

টীকা—১. ابو عامر العقدي = العقدي "আল—আকাদী" আকদ সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আবূ আমের—এর নাম আবদুল মালিক বিন আমর বিন কায়স আল বসরী।

টীকা—২. "ابو صالح" আবূ সালেহ হইতেছেন যাকওয়ানুছ ছাম্মান আয যিয়্যাত আল মাদানী। তাহাকে ছাম্মান ও যিয়্যাত বলিবার কারণ হইল তিনি কূফা হইতে ঘি ও তৈলের ব্যবসা করিতেন।

টীকা—৩. بضع শব্দটি "ب" বর্ণে যের, আর কেহ কেহ বলেন "ب" বর্ণে যবর হইবে। রাত্রের এক অংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সংখ্যার সহিত ব্যবহারের সময় তিন হইতে নয় পর্যন্ত যে কোন একটি সংখ্যা বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় بضع سنين - بضع عشر من النساء ، بضع শব্দটি পূর্বে লওয়া ওয়াজিব। তাই - عشرون وبضع বলা সহীহ নহে।

شعبة - শব্দের অর্থ গাছের শাখা বা কোন মূল বস্তুর অংশ। কাজেই হাদীছের মর্ম হইবে যে ঈমানের সত্তরের উপর কয়েকটি প্রকৃতি বা শাখাসমূহ রহিয়াছে অর্থাৎ ঈমান সত্তরের উপর কয়েকটি প্রকৃতিসমূহের নাম।

বলাবাহুল্য হাদীছ শরীফসমূহে কোন কোন আ'মালকে ঈমানের রুকন এবং কোন কোন আ'মালকে ঈমানের শো'বা তথা শাখা বলা হইয়াছে। এই ব্যবহার রীতির পার্থক্যের দরুন বাহ্যতঃ এই ধারণা হয় যে, ইহা দ্বারা আ'মালের মর্যাদার পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যে সকল আ'মালকে রুকন বলা হইয়াছে উহার অবস্থান সম্ভবতঃ খানিকটা উচ্চ এবং যে আ'মালকে শো'বা বলা হইয়াছে উহার অবস্থান নিম্ন তথা শুধু শাখার অনুরূপ। শাখাকে কর্তন করিলে মূল গাছের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কেবল উহার প্রকাশ্য সজ্জায় কিছু পার্থক্য দৃষ্টি পড়ে।

কিন্তু যখন ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করা হয় যে, উক্ত শাখাসমূহের মধ্যে এমন এমন গুরুত্বপূর্ণ শাখাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যাহার সহিত ইসলামের আরকানের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান এবং উহার সম্বন্ধ শুধু প্রকাশ্য পর্যন্ত সীমিত নহে বরং উহার মূল পর্যন্ত পৌছে তখন উপরোল্লেখিত সুক্ষ্মতা বর্ণনার ধারন ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে না। উদাহরণতঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত পরবর্তী হাদীছে তাওহীদে এলাহীর স্বীকারোক্তিকেও ঈমানের শো'বা তথা শাখা বলা হইয়াছে। সুতরাং কিরূপে বলা যায় যে, শো'বা দ্বারা মর্ম শাখা, যাহাকে কর্তন করিলে মূল গাছের কোন ক্ষতি হইবে না।

রইছুল মুহাদ্দেছীন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহঃ)-এর অভিমত এই যে, এই স্থানে শো'বা (شعبة) শব্দটির দ্বারা একটি উচ্চ মূলতত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর উহা এই যে, বস্তুতঃ ঈমান শুধু শুষ্ক শীর্ণ বিশ্বাসের নাম নহে যাহার মধ্যে নেক আ'মালের কোন শাখা বিদীর্ণ করিবে না বরং ঈমান ঐ সজীব বিশ্বাসের নাম যাহার মধ্যে নেক আ'মালের শাখা প্রশাখা সর্বদা বিদীর্ণ হইতে থাকিবে এবং উহার উপর ইবাদতের বিবিধ রঙের এবং চমৎকার ফল-ফুল প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এই ঈমানই সজীব, জীবিত ও দীপ্তমান। কিন্তু যে ঈমানের মধ্যে নেক আ'মালের কোন শাখা বিদীর্ণ না হইবে উহা জীবিত ঈমান নহে বরং মৃত ও দুর্বল ঈমান। আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি নিঃসন্দেহে ঈমানের সর্ববৃহৎ রুকন বটে কিন্তু ইহা ঐ সময় হাকীকত তথা মূলতত্ত্ব দ্বারা পূর্ণতা ধারণা করা যাইবে যখন নেক আ'মালের সাক্ষ্য ঈমানের সহিত বিদ্যমান থাকিবে। আর ইসলামের পবিত্র অঙ্গীকারও ঐ সময় পূর্ণাঙ্গ বলা যাইবে যখন মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেক আ'মালের জন্য উদ্বিগ্ন দৃষ্টি হইবে। যদি এইরূপ না হয় তাহা হইলে ইহা এই বিষয়ের দলীল হইবে যে, আন্তরিক বিশ্বাস লাভ হইয়াছে কিন্তু উহা ফাঁপা তথা খোসা মাত্র। উহার মধ্যে হাকীকতের কোন রূহ নাই। আর মৌখিক স্বীকারোক্তি যদিও বিদ্যমান কিন্তু ইহাও প্রথাগত উহার মধ্যে বিশ্বাসের কোন গন্ধ নাই।

সারকথা এই যে, ইসলামের শাখাসমূহ ঐ বিষয়ের দলীল হইবে যে, একজন মুমিনের ঈমান সজীব, জীবিত অথবা উহার রূহ বাহির হইয়া গিয়াছে। এই হাকীকতের দিকে ইঙ্গিত করিবার লক্ষ্যে এই স্থানে শাখা শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই বিষয়বস্তুকে কুরআন মজীদ এক বাগ্মি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছে। এরশাদ হইয়াছেঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ - تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا -

অর্থাৎ "আপনার কি জানা নাই যে, আল্লাহ তা'আলা কালিমা তাইয়্যেবার কেমন উপমা বর্ণনা করিয়াছেন। উহা একটি পবিত্র (খর্জুর) বৃক্ষের ন্যায়, যাহার মূল শিকড় অত্যন্ত সুদৃঢ় সংবদ্ধ এবং শাখাসমূহ উচ্চাকাশের দিকে যাইতেছে, উহা মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে প্রত্যেক মৌসুমে নিজ ফল দান করে।"

(সূরা ইব্রাহীমঃ ২৪-২৫)

এই আয়াতে কালিমা তাইয়্যেবাকে একটি মৌসুমের প্রভাব মুক্ত খুব ফলবান বৃক্ষের সহিত উপমা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু উহা গাছ নহে যাহাতে শাখা প্রশাখা ও ফল-ফুল ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত নহে; অথবা কেবল বৎসরে এক মৌসুমে ফল দেয়, ইহা আবার কোন মৌসুমে নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রকৃত ও উত্তম গাছ উহাই যাহা কোন মৌসুমেই অবনতি ঘটে না এবং বৎসরে কেবল একবার ফল প্রদান করাও নহে বরং মৌসুমের প্রভাব মুক্ত থাকিয়া শাখা প্রশাখায় সুসজ্জিতভাবে সকল মৌসুমে সমভাবে ফল ও ফুলসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। কালিমা তাওহীদ ঠিক অনুরূপই। ইহার মূল অর্থাৎ বিশ্বাস মুমিনের অন্তরে বদ্ধমূল রহিয়াছে। নেক আ'মালসমূহ উহার শাখাপ্রশাখা।

সুতরাং এখন মুহাদ্দিছগণের এখতিয়ার রহিয়াছে যে, চাই তাহারা সম্পূর্ণ গাছকে ঈমান বলিবেন অথবা ঈমানের মূল 'বিশ্বাস' (تصديق) কে গণ্য করিবেন এবং নেক আ'মালকে উহার শাখা প্রশাখা ও ফল-ফুল বলিবেন।

প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপরিহার্য যে, দিবা-রাত্রে স্বীয় ঈমানের হিসাব পরীক্ষা করা এবং অনুমান করিবে যে, নিজ ঈমান নেক আ'মালের প্রতি কতখানি আকাংক্ষা রাখে। উহাতে নেক আ'মালের কতগুলি শাখা বিদীর্ণ তথা রোপন হইয়াছে এবং কোন কোন শাখা এমন রহিয়াছে যাহা এখনও বিদীর্ণ হইতে অবশিষ্ট রহিয়াছে। অবশিষ্ট শাখাগুলি যথাশীঘ্র রোপনের জন্য চেষ্টা করিবে।

মুহাদ্দিছগণ ইসলামী শাখাসমূহ বর্ণিত হাদীছগুলিকে এইরূপ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন যে, উহাকে একত্রিত করিবার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ কিতাবসমূহ পর্যন্ত তৈরী করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে ইমাম বায়হাকী, আবূ হাতিম বিন হিব্বান, আবূ আবদুল্লাহ হালীমী, শায়খ আবদুল জলীল এবং ইসহাক বিন আল কুরতুবী (রহঃ) প্রমুখের ন্যায় প্রসিদ্ধ বড় বড় মুহাদ্দিছগণ শামিল রহিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকেই কুরআন ও হাদীছে গবেষণা করিয়া ঈমানের শাখাগুলি একত্রিত করিয়াছেন। তবে তাহাদের বর্ণিত শাখাগুলির উপর নির্ভর করিয়া দৃঢ়ভাবে ইহা বলা যাইবে না যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য কেবল এই শাখাগুলিই ছিল বরং উহার অধিকও হইতে পারে। কেননা অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যার উল্লেখ কেবল অধিক বুঝাইবার জন্য হইয়া থাকে, শুধু নির্দিষ্ট করিবার জন্য নহে। যেমন কুরআন মজীদে এরশাদ হইয়াছেঃ

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ـ

অর্থাৎ "যদি আপনি তাহাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না; ইহার কারণ এই যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার মনোনীত রসূলের সহিত কুফরী করিয়াছে।" (সূরা তওবা-৮০)

আয়াতে সত্তর দ্বারা অধিক সংখ্যক বুঝানো উদ্দেশ্য অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের জন্য অধিক হারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও ক্ষমা করা হইবে না। কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফে যে সকল আ'মালকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে হাদীছ ব্যাখ্যাকারগণ উহার সংখ্যা নির্ণয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাইয়াছেন। হাফেয আবূ হাতিম ইবন হিব্বান (রহঃ) বলেন, আমি এই হাদীছের উপর দীর্ঘকাল গভীর চিন্তা করিয়াছি। আর ইবাদত এবং নেক আ'মালের গণনা করিয়াছি। তখন পাইয়াছি যে, উহা সত্তরের উপর কয়েকটি বেশী। অতঃপর আমি হাদীছ শরীফসমূহের দিকে মনোযোগ প্রদান করি এবং যে সকল ইবাদতকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন উহা একত্রিত করিয়া গণনা করিয়াছি। তাহাতে সত্তর হইতে কয়েকটি কম পাইয়াছি। শেষে আমি আল্লাহ তা'আলার কিতাবের প্রতি মনোযোগ দেই এবং উহা গভীরভাবে পাঠ করি এবং যে সকল ইবাদতকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের মধ্যে শামিল করিয়াছেন উহাদের সবগুলি একত্রে যোগ করিয়া দেখিয়াছি যে, সত্তর হইতে কয়েকটি কম হয়। অতঃপর কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফকে একত্রিত করি এবং যে সকল ইবাদত পুনঃ পুনঃ পাইয়াছি উহাকে বাদ দিয়া দেখিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনিত রসূল

বর্ণিত ঈমানের সহিত সম্পর্কিত ইবাদতের সংখ্যা উনআশি হইয়াছে। উহার বেশীও নহে আর না কম। তখন আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের শাখা বলিয়া এই ইবাদতসমূহের কথাই বলাউদ্দেশ্য।

ইবন হিব্বান (রহঃ) আরো বলেন যে, কোন কোন রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, ঈমানের শাখা ষাটের উপর কয়েকটি। এই বর্ণনাও সহীহ। কারণ আরবীগণ গণনা বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং উহার দ্বারা তাহাদের এই উদ্দেশ্য নহে যে, ইহার উপর আর হইতে পারিবে না। বরং অধিক বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করেন অর্থাৎ ঈমানের শাখাঅনেক।

তবে অধিকাংশ হাদীছ ব্যাখ্যাকারগণ ঈমানের শাখার সংখ্যা সাতাত্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার অধিকও হইতে পারে। এই স্থানে ঈমানের শাখা প্রশাখাগুলিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে। যাহাতে প্রত্যেকেই স্বীয় ঈমানকে ক্রমশঃ বাড়াইতে এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর করিতে পারেন।

বলাবাহুল্য বস্তুতঃ ঈমান তিনটি বিষয়ের সমষ্টির নাম। (ক) তাওহীদে ও রিসালতে আন্তরিক বিশ্বাস, (খ) মৌখিক স্বীকারোক্তি, এবং (গ) শরীআতের আহকামসমূহ অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল। সুতরাং ঈমানের শাখাসমূহ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সম্পর্কিত শাখা ৩০টিঃ (১) আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান। অর্থাৎ তিনি সত্তায় ও গুণাবলীতে একক অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরীক নাই। (২) একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য সবকে তাঁহারই সৃষ্ট দাস বলিয়া বিশ্বাস করা। (৩) ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাস করা। (৪) আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা। (৫) আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত ও মনোনীত সকল নবী রসূলগণকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা। (৬) তকদীর বিশ্বাস করা অর্থাৎ ভাল মন্দ যাহা কিছু হয় সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে হয়। (৭) কিয়ামত অর্থাৎ বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস করা। (৮) জান্নাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করা (৯) জাহান্নাম বিশ্বাস করা (১০) আল্লাহ তা'আলার সহিত মহব্বত ও ভক্তি রাখা। (১১) অন্য যাহার সহিত মহব্বত বা শক্রতা রাখিতে হয় তাহা কেবল আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে রাখা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দোস্তের সহিত আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে দুস্তি রাখা এবং আল্লাহ তা'আলার শক্রর সহিত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে শক্রতা রাখা। তাহা ছাড়া স্বীয় নফসানী উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মহব্বত বা শক্রতা না করা। (১২) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সহিত মহব্বত রাখা এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা, দরূদ পাঠ করা এবং তাঁহার প্রদর্শিত নীতি অনুসরণ করাও মহব্বত ও শ্রদ্ধারই অন্তর্ভুক্ত। (১৩) এখলাছ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ যে কোন আমল বা ইবাদত করা হয়, খালেছ নিয়্যতে আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে করা। (১৪) রিয়া ও মুনাফেকী ত্যাগ করা। (১৫) আল্লাহ তা'আলার ভয় অন্তরে রাখা। (১৬) আল্লাহ তা'আলার রহমতের আশা রাখা। (১৭) আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে নিরাশ না হওয়া। (১৮) যখন যে কোন গুনাহ হইয়া পড়ে তৎক্ষনাৎ তাওবা করা। (১৯) আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। (২০) অঙ্গীকার রক্ষা করা। (২১) শাহাওয়াত বর্জন করা অর্থাৎ কাম রিপুকে দমন করা। (২২) বালা–মুসীবতে ধৈর্য্য ধারণ করা। (২৩) বিনয়ী হওয়া অর্থাৎ নিজেকে ছোট মনে করা। (২৪) তকদীর অনুযায়ী (পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয়) যাহা কিছু ঘটিবে উহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তাওয়াক্কুল করা। (২৫) বড়কে ভক্তি এবং ছোটকে স্নেহ করা। (২৬) গর্ব ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করা। (২৭) হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা। (২৮) রাগ দমন করা। (২৯) অন্যায় কাজ করিতে লজ্জাবোধ করা। (৩০) অন্যকে প্রতারনা না করা এবং দুনিয়ার আসক্তি ত্যাগ করা।

মৌখিক বিশ্বাসের সহিত সম্পর্কিত শাখা ৭টিঃ (৩১) আল্লাহ তা'আলার একত্ব স্বীকার করা অর্থাৎ لا اله الا الله কলেমা পড়া। (৩২) কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করিতে থাকা। কমপক্ষে দৈনিক ১০ আয়াত, মধ্যম ১০০ আয়াত। ইহা অপেক্ষা অধিক বড় মর্তবার মধ্যে গণ্য। (৩৩) দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা এবং (৩৪)

অন্যকে শিক্ষা দেওয়া। (৩৫) দু'আ করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করা। (৩৬) যিকির আযকার ও এস্তেগফার পড়া। (৩৭) বাহুল্য কথাবার্তা হইতে দূরে থাকা।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আ'মালের সহিত সম্পর্কিত শাখা ৪০টিঃ (৩৮) পাক-ছাফ (পবিত্র ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন) থাকা। দেহ, পরিধেয় বস্ত্র, স্থান পবিত্র রাখা। অযূ, গোসল, হায়েয-নিফাস এবং জানাবাত হইতে পবিত্রতা অর্জন করা (৩৯) ছতর ঢাকিয়া রাখা অর্থাৎ পুরুষের নাভি হইতে হাঁটুর নিম্ন পর্যন্ত এবং মহিলাদের আপাদমস্তক ঢাকিয়া রাখা। (৪০) সালাত কায়েম করা। সালাত বলিতে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল সবই অন্তর্ভুক্ত। (৪১) সদকা করা অর্থাৎ যাকাত, ফিৎরা আদায় করা, মানুষকে আহার করানো, মেহমানদের সম্মান করা এবং গোলাম, বান্দী আযাদ করা। (৪২) ফরয ও নফল রোযা রাখা। (৪৩) রমযানের শেষ দশদিন ইতেকাফ করা, কদরের রাত্রি অনুসন্ধান করা। (৪৪) হজ্জ করা। কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা। (৪৫) দ্বীন রক্ষার্থে হিজরত করা অর্থাৎ যে দেশে বা যে সমাজে বাস করিলে ঈমান রক্ষা করা যায় না এমন স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাওয়া। (৪৬) আল্লাহ তা'আলার নামে কোন মান্নত করিলে উহা পূরণ করা। (৪৭) আল্লাহ তা'আলার নামে (জায়েয কাজ করিবার) কসম তথা শপথ করিলে সেই মতে কাজ করা। (৪৮) অন্যায় কাজে কসম খাইলে উক্ত কসম ভঙ্গ করিয়া কাফফারা আদায় করা। (৪৯) কুরবানী করা। (৫০) জানাযায় অংশ গ্রহণ করা। (৫১) করয তথা ঋণ পরিশোধ করা। (৫২) সূদমুক্ত লেনদেন করা এবং সততা অবলম্বন করা। (৫৩) সত্যকে গোপন না করা। সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া। (৫৪) বিবাহ করিয়া স্বীয় চরিত্র রক্ষা করা। (৫৫) স্ত্রী-পুত্রে তথা পরিবার পরিজনের হক আদায় করা। (৫৬) পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা, তাহাদের খেদমত করা। (৫৭) ছেলে-মেয়েদের লালন পালন করা এবং তাহাদিগকে আদব কায়দা, মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা দেওয়া। (৫৮) আত্মীয়-স্বজনের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাহাদের হক আদায় করা। (৫৯) গোলাম, বান্দী ও কর্মচারী প্রমুখ অধীনস্থদের কর্তার বশীভূত থাকা এবং তাহার হিতাকাঙ্খী হওয়া। (৬০) কর্মকর্তা অধীনস্থদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা। (৬১) ন্যায় পরায়নতার সহিত বিচার করা এবং রাজ্য শাসন করা। (৬২) মুসলমানদের হক জামাআতের সহিত থাকা। অর্থাৎ সালাফে সালেহীন এবং দ্বীনদার মুহাক্কিক আলেমগণের বিরুদ্ধে কাজ না করা। (৬৩) শরীআতের পরিপন্থী না হইলে মুসলমান বাদশাহের হুকুম পালন করা। (৬৪) যথাসম্ভব পরোপকারে এবং লোকহিত ব্রতে লিপ্ত থাকা। যাহারা রাজদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায় তাহাদিগকে দমন করা। (৬৫) সৎ কাজে সহায়তা এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা। (৬৬) শরয়ী শাস্তির বিধান কায়েম করা। (৬৭) আমানত যথাযথ অবিকল ফেরৎ দেওয়া। (৬৮) প্রতিবেশীদের হক আদায় করা। তাহাদের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করা। (৬৯) হালাল রুজি উপার্জন করা। (৭০) হালালভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ভাল কাজে ব্যয় করা, অপব্যয় না করা। (৭১) সালাম দেওয়া এবং সালামের জওয়াব দেওয়া। (৭২) ইসলাম প্রচার করা। ইসলামী রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করা। (৭৩) দ্বীনে এলাহী প্রতিষ্ঠায় জিহাদ করা। (৭৪) নিজের জন্য যাহা পছন্দনীয় অপরের জন্য তাহা পছন্দ করা। (৭৫) কেহ হাঁচি দিয়া "আলহামদুলিল্লাহ" বলিলে তাহাকে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ারহামুকাল্লাহ) বলিয়া দু'আ দেওয়া। (৭৬) অপরের ক্ষতি না করা। (৭৭) হাসি-তামাসা ও খেলাধূলা হইতে বাঁচিয়া থাকা। (৭৮) রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু যেমন ঢিলা, পাথর বা কাঁটা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিলে উহা সরাইয়া রাস্তাকে সুগম করিয়া দেওয়া। (মুছান্নেফকৃত "ফরুউল ঈমান" (ঈমানের শাখা সমূহ) কিতাবে কুরআন ও হাদীছের প্রমাণসহ বর্ণিত হইয়াছে)।

লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা

" حياء " লজ্জাশীলতার দুইটি উৎসঃ (১) خلقى সৃষ্টিগত। (২) كسبى উপার্জনগত। প্রথমটি জন্মগত চরিত্রের মধ্যে গণ্য। উহাতে মানুষের চেষ্টা, সাধনা ও উপার্জনের কোন অধিকার থাকে না। কিন্তু লজ্জা শরম যেহেতু এমন গুণ যাহা উন্নত আচার ব্যবহারের আন্দোলনকারী হইয়া থাকে এবং মন্দ ও নিকৃষ্ট আচার ব্যবহার হইতে বিরত রাখে সেহেতু সৃষ্টিগত গুণকেও ঈমানের একটি অংশ গণ্য করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়টি যাহা অক্লান্ত আধ্যাত্মিক সাধনা ও মুজাহিদায় তথা পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্টি হয়। উহা আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাত, তাঁহার আড়ম্বর ও মহিমা। তাঁহার বান্দাদের নৈকট্য এবং তাঁহার অবস্থার পূর্ণ ইলমের উপস্থিতির ফলাফল হয়। ইহা ঈমান বরং ইহসানেরও উচ্চস্তর।

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলুভী (রহঃ) লিখিয়াছেনঃ "حياء" লজ্জাশীলতাকে ঈমানের রুকন না বলিয়া শাখা বলিবার কারণ হইতেছে যে, রুকন তো কেবল ঐ আ'মালকে গণ্য করা যাইতে পারে যাহার সম্বরণ ও সঠিক আন্দাজ করা সম্ভব। লজ্জা এবং অনুরূপ অন্যান্য আচার ব্যবহার যেহেতু পূর্ণভাবে সম্বরণ সম্ভব নহে সেহেতু উহাকে রুকন গণ্য করা হয় নাই, যদিও উহার গুরুত্ব সুপ্রকাশিত। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগ)

ইমাম রাগিব (রহঃ) বলেনঃ حياء হইতেছে মন্দ কথা ও কাজ হইতে নফসের সঙ্কোচন। উহা মানুষের বৈশিষ্ট্য। উহা মানুষকে কুপ্রবৃত্তির তাবেদার হইতে বিরত রাখে। উহা পবিত্রতা ও ক্ষমার মিলিত রূপ। তাই লজ্জাশীল ব্যক্তি ফাসেক হয় না, আবার বীর পুরুষও লজ্জাশীল হয়। আর কখনও ইহা সাধারণভাবে নফসের সঙ্কোচন হয়। যেমন কোন কোন শিশুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। বলাবাহুল্য এই সৃষ্টিগত লজ্জাশীলতা মানুষকে সাধনার মাধ্যমে শরয়ী লজ্জাশীলতা লাভে সহায়তা করে।

ওয়াহেদী (রহঃ) বলেনঃ "حياء" এবং استحياء। উভয়ই "حيات" জীবনসত্ব হইতে নিসৃত। আর লজ্জা মানুষের জীবন শক্তি। অতএব যে ব্যক্তির অনুভূতি নমনীয় এবং জীবন শক্তিশালী হয় তাহার লজ্জা হয়। জুনায়েদ বুগদাদী (রহঃ) বলেনঃ লজ্জা হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের প্রতি দৃষ্টি করা এবং বান্দা নিজ ত্রুটিসমূহের প্রতি নযর করা অর্থাৎ বান্দা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহসমূহের প্রতি এবং নিজের দোষত্রুটির প্রতি গভীর চিন্তা করা। উহার দ্বারা বান্দার মধ্যে এমন একটি হালাত তথা অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহাকে حياء লজ্জা বলে। উল্লেখ্য যে, মানুষের আচার ব্যবহারের মধ্যে আত্মার প্রকৃষ্টতাসমূহ তিন প্রকারে হইয়া থাকেঃ (১) সততা বা সাধুতা (২) সাহসিকতা এবং (৩) ন্যায়পরায়নতা। বস্তুতঃ "حياء" লজ্জা হইতেছে সাধুতার একটি শাখা।

আবূ আলী মসকুইয়া (রহঃ) স্বীয় কিতাবুত তাহারাতে লিখিয়াছেনঃ লজ্জা নফস তথা আত্মাকে গর্ব ও অহংকার হইতে বিরত রাখে এবং মন্দ কার্যাবলী হইতে বাঁচাইয়া রাখে।

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ লজ্জা একটি সৃষ্টিগত গুণ। তাহা সত্ত্বেও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করিবার কারণ হইতেছে যে, উহা কখনও সাধনা ও মুজাহিদার দ্বারা সৃষ্টি হয়। যেমন উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী সাধনার মাধ্যমে অর্জিত হয়। আর কখনও সৃষ্টিগতভাবে লাভ হয়। কিন্তু "حياء" (লজ্জা)-এর ব্যবহার শরীআতের বিধান মতে নির্ভর হয় উপার্জন, নিয়্যাত এবং ইলমের উপর। আর ইহাই হইতেছে ঈমানের অঙ্গ। দ্বিতীয় এই যে, লজ্জা নেক্ আ'মালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং গুনাহ হইতে ফিরাইয়া রাখে।

কিন্তু অন্য হাদীছে যে বর্ণিত হইয়াছেঃ লজ্জাশীলতা উত্তমই উত্তম এবং উহার দ্বারা ভাল ব্যতীত মন্দ হয় না। এই হিসাবে প্রশ্ন হয় যে, অনেক সময় লজ্জাশীলতার (حياء) কারণে মানুষ হক কথা বলা হইতে বিরত থাকে। আর সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা ছাড়িয়া দেয়। আর অনেক সময় লজ্জা প্রাপ্য হক হইতে বঞ্চিত করে। কাজেই লজ্জা সম্পূর্ণই উত্তম, কিরূপে বলা যায়। ইহার উত্তর এই যে, ইহা প্রকৃত حياء লজ্জা নহে। ইহাকে দুর্বলমনা ও শক্তিহীনতা বলে। কেহ কেহ উহাকে রূপক مجازا অর্থে "حياء" বলিয়াছেন। কারণ উহা আকৃতিগতভাবে "حياء" এর সাদৃশ্য হয়। কিন্তু মূলতত্ত্বে "حياء" (লজ্জা) ঐ সৃষ্টিবস্তুর নাম যাহা অশ্লীল ও মন্দ কথা এবং কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে এবং উত্তম কথা ও কাজের দিকে আহবান করে এবং হকদারের হক আদায়ে ত্রুটি করিতে নিষেধ করে। (নববী)

লজ্জাশীলতার সীমা

ইসলাম সৃষ্টিগত এবং স্বভাবগত গুণাবলীর মধ্যে সংশোধন করে নাই বরং শুধু উহার সীমা নির্ধারণ করিয়া

দিয়াছে। এই পরিমাণ লজ্জা শরম যাহা মনুষত্বের মধ্যে চরমোৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত উহা প্রশংসা যোগ্য। আর ঐ দুর্বলমনা লজ্জা শরম যাহা দুনিয়াদারের প্রথার মধ্যে প্রবিষ্ট এবং শরীআতের লেনদেনে এক প্রকার বাঁধা হইয়া দাঁড়ায় উহা ঘৃণাযোগ্য। ইসলাম অভদ্রতা ও ঔদ্ধত্যতা–এর শিক্ষা দেয় না। আবার আদব ও সম্মানের মধ্যে এত বাড়াবাড়ি হইতে বিরত রাখে যাহা মানুষের ইবাদতের নিকট করিয়া দেয়। বস্তুতঃ প্রাচুর্য ও ঘাটতির রাস্তা হইতে বাঁচাইয়া তাহাদের জন্য মধ্যম সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে যাহার দ্বারা আচার ব্যবহার ও চরিত্রাবলী পুরাপুরি সম্পূর্ণতা লাভ করে।

٦١ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ اَوْ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ -

হাদীছ–৬১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যুহাইর বিন হারব (রহঃ)। তিনি বলেনঃ আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন জরীর (রহঃ), তিনি সুহাইল হইতে, তিনি আবদুল্লাহ বিন দীনার হইতে। তিনি আবূ সালেহ হইতে। তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ ঈমানের শাখা সত্তরটির কিছু বেশী অথবা (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন) ষাটটি ও কিছু বেশী (রাবীর সঠিক সংখ্যা স্মরণ নাই)। ইহার সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ শাখা হইতেছে মুখে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বলা অর্থাৎ তাওহীদে এলাহীর স্বীকার করা। আর ইহার সর্বনিম্ন শাখা হইতেছে রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু (যেমন পাথর, কাঁটা প্রভৃতি) অপসারণ করা। আর লজ্জা শরম ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ ঈমানের আভিধানিক অর্থ হইতেছে বিশ্বাস। আর শরীআতের পরিভাষায় ঈমান হইতেছে তাওহীদে এলাহীতে (ও রিসালতে) দৃঢ় বিশ্বাস এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি করা। আর শরীআতের প্রমাণাদির দ্বারা বুঝা যায় যে, নেক আ'মালও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। ঈমানের সর্বোত্তম প্রকৃতি কালিমায়ে তাওহীদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করা এবং সর্বনিম্ন প্রকৃতি তথা শাখা কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা হইতে অপসারণ করা। উল্লেখ্য যে, ঈমানের সম্পূর্ণতা নেক আ'মালের দ্বারা এবং উহার পূর্ণাঙ্গতা ইবাদতের দ্বারা হইয়া থাকে। আর ইবাদত করা ও ঈমানের সকল শাখার পাবন্দ হইতেছে বিশ্বাস তথা ঈমানের পরিশিষ্ট। আর শাখাসমূহের দ্বারাই আন্তরিক বিশ্বাসের দলীল হয়। আর এই সকল প্রকৃতি তথা শাখাসমূহ ঐ ব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান থাকিবে যাহার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। কাজেই শাখাসমূহ ঈমানের বহির্ভূত নহে। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বিষয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, শাখাসমূহের সর্বোত্তম শাখা হইতেছে তাওহীদে এলাহী যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য ওয়াজিব। কারণ কোন শাখাই ইহা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ফলে ইহা হইতেছে ঈমানের মূল। আর সর্বনিম্ন শাখা হইতেছে কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা হইতে অপসারণ করা। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অনেক শাখা রহিয়াছে। মুজতাহিদগণ অত্যধিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে গবেষণা করিলে উহার 'জোর ধারণা' জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু যথার্থ জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। আর অনেক হাদীছ বিশেষজ্ঞই ইহার উপর যথেষ্ট চেষ্টা সাধন করিয়াছেন এবং সঠিক সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও ইহা দৃঢ়ভাবে বলা যায় না যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর অন্তরে হুবহু এই শাখাসমূহের বিষয়ই রহিয়াছে। তাই এই সকল শাখাসমূহের যথার্থ সংখ্যা জ্ঞাত হওয়া ঈমানের জন্য ওয়াজিব নহে এবং উহার অজ্ঞতা

ঈমানের কোন ক্ষতি করিবে না। কেননা ঈমানের মূল এবং অত্যাবশ্যক শাখা প্রশাখা প্রকাশিত ও প্রমাণিত। হ্যাঁ, হাদীছে বর্ণিত শাখা প্রশাখাসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান থাকা ঈমানের জন্য ওয়াজিব। (নববী)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) স্বীয় তাফসীরুল আবরার-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আলোচ্য হাদীছে প্রথম শো'বা তথা শাখা হইতেছে কথামূলক ইবাদত (عبادات القولية) হইতে এবং দ্বিতীয় শো'বা হইতেছে কর্মমূলক নেককাজ طاعات الفعلية অথবা প্রথমটি কর্মমূলক (কেননা উহা অন্তরের কর্ম) এবং দ্বিতীয়টি পরিত্যাগমূলক। অথবা প্রথমটি হক তথা আল্লাহ তা'আলার সহিত মুআ'মলা তথা লেনদেন এবং দ্বিতীয়টি সৃষ্টির সহিত লেনদেন। অথবা আল্লাহ তা'আলার হক অধিকার কায়েম এবং দ্বিতীয়টি বান্দার অধিকার কায়েম করা। সুতরাং যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে উভয়ের হক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে সে অবশ্যই প্রকৃত সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আলোচ্য হাদীছে ঈমানের সর্বোত্তম ও সর্বনিম্ন দুইটি শাখা বর্ণনা করিবার পর বিশেষ গুরুত্ব সহকারে মধ্যবর্তী একটি শাখার উল্লেখ করা হইয়াছে যে, লজ্জাশরম ঈমানের একটি অন্যতম শাখা।

এই স্থানে প্রশ্ন হয় যে, ঈমানের মধ্যম শাখাসমূহের মধ্যে "حياء" লজ্জাশীলতাকে গুরুত্ব সহকারে এককভাবে উল্লেখ করিবার তাৎপর্য কি?

উত্তর এই যে, লজ্জাশরম সকল উত্তম বিষয়ের আহবায়ক। ঈমান যেমন মানুষকে সকল প্রকার কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত রাখে, তদ্রূপ লজ্জাশরমও মানুষকে অনেক কুকর্ম হইতে বিরত রাখে। অর্থাৎ লজ্জাশরম পার্থিব জগতে যাবতীয় অশ্লীলতা ও অপরাধ হইতে দূরে রাখে এবং পরজগতে মহান রব্বুল আলামীনের সামনে যেন লজ্জা না পাইতে হয় সেই জন্য নেক আ'মালের দিকে উদ্বুদ্ধ করে। এই কারণে বলা হইয়াছে اذا لم تستحي فاصنع ماشئت "যখন তোমার লজ্জাশরম নাই তখন যাহা ইচ্ছা করিতে পার।" নেক আ'মালের প্রতি আগ্রহ অনেক ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতার উপর নির্ভর করে। যাহার লজ্জাশরম আছে সে পার্থিব জগতে মানুষের নিকট নিন্দিত হইবার আশঙ্কায় মন্দ কাজ ও কথা হইতে বিরত থাকে। এবং পরজগতে আল্লাহ তা'আলার নিকট উহার পরিণাম কি হইবে? আর আল্লাহ তা'আলা ও রসূলের আদেশ নিষেধ অমান্য করিলে আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার সহিত কি রূপে সাক্ষাৎ করিবে? এই ভাবিয়া নেক আ'মাল করিতে থাকে।

একজন বিশিষ্ট মনীষী লজ্জাশীলতার মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলিয়াছেনঃ ان مولاك لا يراك حيث نهاك "নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যাহা বলিতে, করিতে এবং যেখানে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, তোমাকে যেন তিনি সেই কথায়, কাজে এবং স্থানে প্রত্যক্ষ না করেন—ইহা প্রকৃত লজ্জা।" আর ইহাই ইহসান ও মুশাহদার স্থান যাহা অক্লান্ত আধ্যাত্মিক সাধনা ও মুজাহদার মাধ্যমে বান্দা লাভ করে। কাজেই এই সুবিখ্যাত হাদীছ শরীফখানা যেন হাদীছে জিব্রাঈল (আঃ)—এর সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ فافضلها قول لا اله الا الله বাক্য দ্বারা ঈমানের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং وادناها اماطة الاذى عن الطريق বাক্য দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে ইসলামের দিকে। আর الحياء দ্বারা ইহসান তথা মা'রেফাতের দিকে ইঙ্গিত করাহইয়াছে।

অন্য হাদীছে এরশাদ হইয়াছেঃ

قال عليه الصلوة والسلام استحيوا من الله حق الحياء قالوا انا لنستحي من الله تعالى حق الحياء يارسول الله والحمد لله قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان يحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى ويذكر الموت والبلى ومن اراد الاخرة ترك زينة الدنيا واثر الاخرة على الاولى فمن يعمل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء ـ (رواه الترمذى فى جامعه)

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেনঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলা হইতে যথাযথ লজ্জা কর। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার শোকর, আমরা তো আল্লাহ তা'আলা হইতে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা করিয়া থাকি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা সাধারণতঃ যতখানি লজ্জা করিয়া থাক কেবল ততখানিই আমার উদ্দেশ্য নহে। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা হইতে যথাযথ লজ্জা করার দাবী রাখে তাহার কর্তব্য যে, স্বীয় মস্তিষ্কে যে শক্তি রহিয়াছে যেমন স্মরণশক্তি, বিবেচনা শক্তি, বোধ শক্তি ও চিন্তাশক্তি ইত্যাদি এবং মস্তিষ্ক সংলগ্ন যেমন চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে যাবতীয় মন্দ কর্ম ও মন্দ পথ হইতে হিফাযত তথা সংরক্ষণ করা। আর পেট ও পেট সংলগ্ন রিপু যেমন নফস ও গুপ্তাঙ্গকে অনুরূপ হিফাযত করা অর্থাৎ হারাম খাদ্য আহার ও ব্যভিচার হইতে বিরত থাকা। তাহার আরও কর্তব্য হইতেছে যে, মৃত্যু ও বালা-মুসীবতের কথা স্মরণ করা। যে ব্যক্তি আখিরাতের কল্যাণের ইচ্ছা রাখে সে দুনিয়ায় মোহ ও ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করে এবং পার্থিব জগতের উপর পরজগতকে প্রাধান্য দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি পুরাপুরি এইরূপ বিশ্বাস ও আমল করিবে সে ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলা হইতে যথাযথ লজ্জা করে বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।" (জামে তিরমিযী)

এই সকল বিবরণ দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত 'হায়া' তথা লজ্জাশরম কাহারো লাভ হইলে সে পূর্ণভাবে শরীআতের অনুসারী হইতে পারে। এই কারণেই ঈমানের মধ্যবর্তী একটি শাখাকে গুরুত্ব সহকারে এককভাবে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে 'হায়া' তথা লজ্জাশরম ঈমানের একটি অন্যতম শাখা। (ফতহুল মুলহিম)

মুমিনের মাথা হইতে পা পর্যন্ত শান্তিই শান্তি

'ঈমান' এর প্রাণ বা জীবনের আলামত এই যে, মানুষের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতির এমন চিত্র তৈরী হইবে যে, অন্য কাহারও পায়ে যদি কাঁটাও ফুটে, তবে উহার যন্ত্রণা স্বীয় অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবে। যেই অন্তরে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির ব্যথার কোন অনুভূতি বিদ্যমান না থাকিবে এবং পরস্পর বন্ধুত্ব, প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসার কোন তরঙ্গ আক্রমণ না করিবে, উহা জীবিত ঈমান নহে বরং মৃত ঈমান। কেবলমাত্র ইসলামের রুকন আদায় করিলে এবং কতগুলি নির্দিষ্ট আকাঈদ-এর উপর বিশ্বাস করিলেই কোন ব্যক্তিকে প্রকৃত মুমিন ও মুসলিমের মহান উপাধিতে ভূষিত হইবার যোগ্য বলা যাইতে পারে না। তাহাকে ইহাও প্রমাণিত করিতে হইবে যে, ইসলাম তাহাকে মাথা হইতে পা পর্যন্ত শান্তি ও কল্যাণের এবং মাথা হইতে পা পর্যন্ত অনুগ্রহ ও সহানুভূতির এমন সুমহান চিত্র তৈরী করিয়া দিয়াছে যে, রাস্তায় চলিবার সময় সৃষ্টির কষ্ট হইবে এমন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিলে উহাকে রাস্তা হইতে অপসারণ করিতে হইবে। কাজটি খুবই সহজ সরল ও সাধারণ কিন্তু ইহার তাৎপর্য অনেক। ইহার মাধ্যমে বান্দা স্রষ্টার নৈকট্যশীল হয়।

বলাবাহুল্য পরোক্ষভাবে কোন সৃষ্টির কষ্ট হইতে পারে এমন সম্ভাবনাকে সামনে রাখিয়া রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু যেমন কাঁটা, পাথর, নাপাকী ইত্যাদি অপসারণ করা 'ঈমানের শাখা' গণ্য করা হইয়াছে। তাহা হইলে মুমিন ব্যক্তি কিরূপে প্রত্যক্ষভাবে মুখ, হাত ইত্যাদি দ্বারা অন্য সৃষ্টিকে কষ্ট দিতে পারিবে। ইহা তো কোন মুমিনই করিতে পারেন না। সেবাই হইবে মুমিনের আদর্শ। শান্তিই হইবে তাহার কাম্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

٦٢ حدثنا ابوبكر بن ابى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن ابيه سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ اخاه فى الحياء فقال الحياء من الايمان

হাদীছ—৬২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বকর বিন আবী শায়রা, আমর আন নাকিদ এবং যুহায়র বিন হারব (রহঃ)। তাহারা---হযরত সালিম স্বীয় পিতা (আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি (হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, একজন (আনসারী) ব্যক্তি স্বীয় ভাইকে (অতিরিক্ত) লজ্জাশীলতার ব্যাপারে নসীহত করিতেছিলেন (যে, অতিরিক্ত লজ্জা করা চাই না) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার কথা শ্রবণের পর) বলিলেনঃ (তুমি তাহাকে ভুল নসীহত করিতেছ কেন? অথচ) লজ্জা ঈমানেরঅঙ্গ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

يعظ اخاه -তাহার ভাইকে নসীহত করিতেছিলেন। সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে يعاتب اخاه فى الحياء এই বাক্যে " فى " বর্ণটি কারণ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত। আনসারীর ভ্রাতা অত্যধিক লজ্জার কারণে প্রাপ্য হক হইতে বঞ্চিত হয়। তাই স্বীয় ভাইকে এই অতিরিক্ত লজ্জার জন্য ভৎর্সনা করিতেছিলেন যে, এইরূপ লজ্জা করিবে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার কথা শুনিয়া) বলিলেনঃ লজ্জা (حياء) ঈমানের অঙ্গ। সহীহ বুখারী শরীফের এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ "তাহাকে তাহার সৃষ্টিগত স্বভাবের উপর ছাড়িয়া দাও। কেননা লজ্জা শরম ঈমানের অঙ্গ।" হ্যাঁ, লজ্জাশীল ব্যক্তি যদি স্বীয় লজ্জা শরমের জন্য প্রাপ্য হক হইতে বঞ্চিতও হয় তবে উহা কোন প্রকার অকল্যাণজনক নহে বরং উক্ত বঞ্চিত প্রাপ্য হকের প্রতিদান সে আল্লাহ তা'আলার নিকট লাভ করিবে। অধিকন্তু এই লজ্জা তাহাকে প্রকৃত লজ্জাশীলতা লাভে সহায়তা করিবে।

ইবন কুতায়বা (রহঃ) বলেন যে, লজ্জাশরম লজ্জাশীল ব্যক্তিকে গুনাহের কর্ম হইতে বিরত রাখে যেমন ঈমান গুনাহের কর্ম হইতে বিরত রাখে। তাই উহাকে ঈমান বলা হইয়াছে। যেমন কোন বস্তুকে ঐ নামে নামকরণ করা হয় যাহার স্থানে উহাকে রাখা হয়।

আবুল আব্বাস আল কুরতুবী (রহঃ) বলেনঃ حياء লজ্জাশরম সাধনার মাধ্যমে উপার্জিত হয়। আর উহাকেই শরীআতের বিধানে ঈমানের অঙ্গ বলা হইয়াছে এবং বান্দা উহারই নির্দেশিত জন্মগত লজ্জাশীলতা নহে। তবে এই জন্মগত লজ্জাশীলতার দ্বারা বান্দা সাধনা ও মুজাহিদার মাধ্যমে উপার্জিত প্রকৃত লজ্জাশীলতা অর্জনে সহায়ক হয়। তাই জন্মগত লজ্জাকেও ঈমানের শাখা বলা হইয়াছে। উত্তম বস্তু লাভে সহায়ক বস্তু উত্তমই হইয়া থাকে। কাজেই হায়া তথা লজ্জাশীলতার দ্বারা উত্তমই লাভ হয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে জন্মগত ও উপার্জনগত উভয় প্রকারের (حياء) লজ্জাশীলতা সম্পূর্ণতার সহিত বিদ্যমান ছিল।

فكان فى الغريزى اشد حياءً من العذراء فى خدرها وكان فى الحياء المكتسب فى الذروة العليا صلى الله عليه وسلم -

অর্থাৎ "তিনি জন্মগত স্বভাবের দিকে বাসর ঘরের কুমারী হইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন এবং সাধনার মাধ্যমে উপার্জিত লজ্জাশীলতার দিকে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন।"

আল্লামা তাবরানী (রহঃ) হযরত কুররা বিন আয়াস (রহঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে,

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الدين فقال بل هو الدين كله

অর্থাৎ "কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেনঃ লজ্জাশীলতা কি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উত্তরে) বলিলেন, বরং উহা সম্পূর্ণই দ্বীন।"

অন্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে-

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ

অর্থাৎ "লজ্জা শরম ঈমান হইতে সৃষ্টি হয়। আর ঈমানের ফলশ্রুতি জান্নাত।"

বাহ্যতঃ এই 'লজ্জার' বিষয়টি খুব সাধারণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরিণাম ফলের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্ববহ। এই লজ্জা মানুষের মধ্য হইতে বিয়োগ হইলে উহার পরিণাম ফল মারাত্মক ধ্বংস হইতে পারে। এই জন্যই বলা হয় بے حیا باش ہرچہ خواہی کن - 'লজ্জাহীন হইলে যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।'

٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ يَعِظُ اَخَاهُ -

হাদীছ-৬৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ)...তিনি হযরত যুহরী (রহঃ) হইতে উপরোক্ত সনদে এই হাদীছ শরীফখানা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহার বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আনসারী ব্যক্তির পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন সে আনসারী ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতাকে (লজ্জার ব্যাপারে) নসীহত করিতেছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

হযরত যুহরী (রহঃ)-এর বর্ণিত এই হাদীছ দ্বারা জানা যায় যে, পূর্ববর্তী (৬২ নং) হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির পাশ দিয়া যাইতেছিলেন এবং সেই ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে লজ্জার ব্যাপারে নসীহত করিতেছিলেন। উক্ত জনৈক লোকটি আনসারী ছিলেন।

٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ الْحَيَاءُ لَا يَاْتِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ مَكْتُوْبٌ فِى الْحِكْمَةِ اَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِيْنَةً فَقَالَ عِمْرَانُ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِىْ عَنْ صُحُفِكَ -

হাদীছ-৬৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না এবং মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহঃ) আর শব্দটি হইতেছে ইবন মুছান্না। তাহারা উভয়ই...হযরত কাতাদাহ (রহঃ) হইতে। তিনি বলেন, আমি আবূ সাওয়ারকে হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, তিনি হযরত ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) হইতে হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ লজ্জাশীলতা শুধু কল্যাণই আনয়ন করে।

এই রিওয়ায়াত শ্রবণ করিবার, পর হযরত বুশায়র বিন কা'ব বলিলেনঃ হিকমতের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, " حياء " লজ্জাশীলতা হইতে মাহাত্ম্য-গাম্ভীর্য লাভ হয় এবং উহা হইতেই দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। হযরত ইমরান (রাযিঃ) বলিলেনঃ আমি তোমার কাছে (চিরন্তন সত্য) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ বর্ণনা করিতেছি আর তুমি আমার কাছে তোমার (ভুল শুদ্ধ সংমিশ্রিত) পুথির কথা উদ্ধৃত করিতেছ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

" وقار " বলা হয় চিন্তাভাবনা ও বোধগম্য করিয়া কোন কাজ করাকে। আর ইহার বিপরীত ছেলেমি তথা অতি দ্রুততার সহিত যাহা ধারণায় আসে উহা করা। ইহা জন্তু জানোয়ারের স্বভাব। আর سكينه ও ঐ وقار কে বলা হয় অর্থাৎ নফসের শান্তি এবং গতি দৃঢ়তা দ্বারা লাভ হয়। উহার বিপরীত চাঞ্চল্যতা ও দ্রুততা। হযরত বুশায়র বিন কা'ব (রাযিঃ) হাদীছে বর্ণিত বিষয়ের পক্ষপাতিত্বেই বলিয়াছিলেন যে, দর্শনের পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, 'হায়া' হইতে গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা অর্জিত হয়।

কিন্তু হযরত ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) বুশাইর বিন কা'বকে বলিলেন, আমি তোমার নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ বর্ণনা করিতেছি আর তুমি তোমার হিকমতের পুস্তকের কথা বলিতেছ। ইহা আদবের বিপরীত করিতেছ। কারণ কুরআন ও হাদীছের তায়ীদ তথা পক্ষপাতিত্ব দার্শনিকদের কথার দ্বারা করা স্থানোপযোগী নহে। যদিও দার্শনিকগণ বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের হইতে হাজারো রকম ভুলভ্রান্তি হইয়া থাকে। হাকীমের মর্যাদা পয়গাম্বর হইতে অনেক কম। অনুরূপ হিকমতের মর্যাদা নবূওয়াত হইতে অনেক নীচে বরং তুলনা যোগ্যই নহে। কাজেই পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ লাভ করিবার পর দার্শনিকদের কথা অনুসন্ধান করা মূল্যহীন।

বলাবাহুল্য হযরত ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ)-এর অসন্তোষের কারণ ইহা ছিল যে, বুশাইর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছের পক্ষপাতিত্ব (تائيد) দার্শনিকদের কথা দ্বারা করিয়াছেন যাহা আদব ও সম্মানের বিপরীত ছিল। বুশাইর বিন কা'ব (রাযিঃ)-এর নিয়্যাত চাই ইহা না হউক। আর হইতেও পারে না। কিন্তু আদবের দাবী ইহা ছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রাখিবে। হাদীছে রসূলের তায়ীদ অন্য কোন ব্যক্তির কথা দ্বারা করা নিষ্প্রয়োজন। বুশাইর বিন কা'ব (রাযিঃ) এই সূক্ষ্ম বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেন নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

٦٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحٰقَ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ حَدَّثَنَا قَالَ كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ فِي رَهْطٍ مِنَّا وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَئِذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارًا لِلّٰهِ وَمِنْهُ ضَعْفٌ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلَا أَرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُعَارِضُ فِيهِ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ فَأَعَادَ بُشَيْرٌ فَغَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ فَمَا زِلْنَا نَقُوْلُ فِيهِ إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ -

হাদীছ-৬৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল-হারিছী (রহঃ)। তিনি--আবূ কাতাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ কাতাদাহ বলেন, আমাদের কিছু লোকের একটি দল ইমরান বিন হুসায়নের নিকট উপস্থিত ছিলাম। আর আমাদের মধ্যে বুশায়র বিন কা'বও ছিলেন। অতঃপর সেদিন হযরত ইমরান (রাযিঃ) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ "লজ্জাশীলতা কল্যাণজনক সম্পূর্ণই।" রাবী বলেন, অথবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ اَلْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ "লজ্জাশীলতা সম্পূর্ণই কল্যাণজনক।" (অর্থাৎ রাবীর সন্দেহ হইয়াছে যে, كُلُّهُ শব্দটি خَيْرٌ-এর পূর্বে না পরে বর্ণনা করিয়াছেন উহা তাহার স্মরণ নাই। তাই উভয়টি বর্ণনা করিয়াছেন)। তখন বুশায়র বিন কা'ব (রাযিঃ) (হাদীছ শ্রবণের পর) বলিলেন, কোন কোন কিতাবে অথবা হিকমতের গ্রন্থে আমরা পাইয়াছি যে, 'হায়া' লজ্জাশীলতা হইতেই আল্লাহ তা'আলার জন্য দৃঢ়তা, ভদ্রতা ও গাম্ভীর্যের উৎপত্তি এবং তাহা হইতেই দুর্বলতারও উৎপত্তি। রাবী বলেন, (বুশায়র (রাযিঃ)-এর এই কথা শুনিয়া) হযরত ইমরান (রাযিঃ) এমন রাগান্বিত হইলেন যে, তাহার চক্ষুদ্বয় লাল বর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি (ইমরান (রাযিঃ)) বলিলেন, সাবধান! প্রত্যক্ষ করিতেছ না যে, আমি তোমার নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ বর্ণনা করিতেছি। আর তুমি ইহার বিপরীত পুথির কথা পেশ করিতেছ। রাবী আবূ কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, হযরত ইমরান (রাযিঃ) (দ্বিতীয়বার) হাদীছখানা বর্ণনা করিলেন। আর বুশায়র (রাযিঃ)ও তাহার কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। ইহাতে হযরত ইমরান (রাযিঃ) অত্যধিক রাগান্বিত হইলেন। রাবী আবূ কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, অতঃপর আমরা বলিতে থাকিলাম যে, হে আবূ নুজায়দ! (হযরত ইমরান (রাযিঃ)-এর উপনাম) সে আমাদেরই একজন (মুমিন) লোক। তাহার মধ্যে কোন ত্রুটি (মুনাফেকী বা বেদ্বীনী) নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

" حياء " "লজ্জাশীলতা একটি উত্তম বস্তু।" আর নফসের দুর্বলতা (ضعف نفسى) অর্থাৎ হীনমন্যতা বা আত্মাভিমান প্রথাগত মনের দুর্বলতা ও নীচতা যাহাকে আরবী ভাষায় عجز ও مهانة বলে এবং ইংরেজীতে Inferiority Complex (হীনতাবোধ) পৃথক বস্তু। যাহার অন্তরে শক্তি কম এবং শরীরে রক্ত অল্প তাহারই এই স্বভাব অধিকাংশ হইয়া থাকে। এই স্বভাব মানুষের মধ্যে দুর্বলতা ও হীনতাবোধ সৃষ্টি করে। সে নিজ প্রাপ্য হক পুরাপুরি লাভ করিতে পারে না, ভয় করে। পরিশেষে যাহা প্রাপ্ত হয় উহার উপর পরিতুষ্ট থাকে। প্রাপ্য হক হইতে বঞ্চিত হইবার কারণে আফসুসের নিঃশ্বাস নিসৃত করে না বরং স্বীয় হক লাভের জন্য কোন চেষ্টাও করে না। তাহা ছাড়া প্রয়োজনীয় কোন কথা আলেমের নিকট এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করে না যে, এই সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে লোকে কি বলিবে। কোন অসামর্থ লোকের বোঝা উঠাইয়া দিবার আরয করিলে এই ভাবিয়া উঠাইয়া দেয় না যে, এই নীচ কাজ করিয়া দিলে লোকে কি বলিবে, ইত্যাদি। ইহা জন্তু জানোয়ারের গুণাবলী যাহা হইতে হাকীম তথা দার্শনিকগণ সর্বদা নিষেধ করেন। বস্তুতঃ ইহা حياء এর সংজ্ঞাভুক্ত নহে। কেহ কেহ উহার উপর حياء এর ব্যবহার ভ্রমে অথবা রূপকভাবে করিয়াছেন। ইউনান দেশের হাকীম দায়ানুস বলেন 'হায়া' নফসের দুর্বলতা হইতে সৃষ্টি হয়। আর উহাকে বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে حياء (লজ্জা) দ্বারা দুর্বলতা ও হীনতাবোধ বুঝানো। ঐ حياء লজ্জাশীলতা নহে যাহা প্রশংসিত এবং মানুষকে মন্দ কর্ম হইতে বিরত রাখে এবং সৎকর্মের দিকে আহবান করে। উহা সর্বসম্মতিক্রমে উত্তম গুণ।

ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) বুশায়র বিন কা'ব (রাযিঃ)কে বলিলেনঃ আমি তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ বর্ণনা করিতেছি, আর তুমি উহার বিপরীত পুথির কথা বর্ণনা করিতেছ। বস্তুতঃ হাদীছ শরীফে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উহার মর্ম সম্পূর্ণ সহীহ। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য হইতেছে حياء দ্বারা ঐ উত্তম চরিত্রাবলীর বর্ণনা করা যাহা মানুষকে মন্দ ও গুনাহ হইতে ফিরাইয়া রাখে। ইহা সম্পূর্ণই সত্য। উহা উত্তমই উত্তম। আর হিকমতের দৃষ্টিতে যাহা প্রমাণিত ইহাও ঠিক। কারণ দার্শনিকগণ উক্ত লজ্জা শরমকে মন্দ বলেন নাই বরং নফসের দুর্বলতা (ضعف نفس) কে বর্জনযোগ্য বলিয়াছেন। যাহা বস্তুতঃ حياء এর অন্তর্ভুক্ত নহে। কাজেই হাদীছ এবং দার্শনিকদের কথায় কোন বিরোধ নাই। কিন্তু বুশায়র (রাযিঃ) যেহেতু حياء এর যে ব্যবহার উক্ত মন্দগুণের উপরও করিয়াছে এবং حياء লজ্জাশীলতাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে (১) حياء লজ্জাই দৃঢ়তা, ভদ্রতা ও গাম্ভীর্যের উৎস (২) منه الضعف অর্থাৎ حياء হইতেই দুর্বলতার উৎপত্তি। অথচ হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, الحياء كله خير। লজ্জাশীলতা

সম্পূর্ণই উত্তম। তাই বুশায়র (রাযিঃ) বাহ্যতঃ হাদীছের বিপরীত একটি কথা বলিয়াছেন। আর হিকমতের কথা হাদীছ শরীফের বিপরীত উদ্ধৃত করিবার কারণে হযরত ইমরান (রাযিঃ) রাগান্বিত হইয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, হযরত ইমরান (রাযিঃ) রাগান্বিত হইবার কারণ হইতেছে যে, হাদীছ শরীফের সহিত হিকমতের কথা বর্ণনা করিবার দ্বারা হাদীছ শরীফ ও হিকমতের মধ্যে সংমিশ্রণের আশংকা থাকে। তাই তিনি রাগান্বিত হইয়াছেন যাহাতে এইরূপ করা না হয়।

বলাবাহুল্য পূর্ববর্তী হাদীছ এবং আলোচ্য হাদীছের ঘটনা বাহ্যতঃ একই। তবে পূর্ববর্তী হাদীছে হযরত বুশায়র (রাযিঃ) কেবল হাদীছের তায়ীদে হেকমতের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। আর আলোচ্য হাদীছে সেই পর্যন্ত সীমিত থাকেন নাই বরং তিনি "حياء" এর প্রকারভেদ বর্ণনা আরম্ভ করেন যে, এক প্রকার "حياء" উত্তম আর দ্বিতীয় প্রকার "حياء" দুর্বলতার পরিণাম ফল। ইহা প্রকাশ্যভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর বিরোধ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতার আকৃতি ছিল। হযরত ইমরান (রাযিঃ)-এর নিকট এই খুটিনাটি দৃষ্টিটি ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল। তাই তিনি রাগান্বিত হইলেন। কিন্তু অন্যান্য সাহাবাগণ এই বলিয়া অবকাশ প্রদান করিলেন যে, হযরত বুশায়র (রাযিঃ)-এর নিয়্যাত ইহা নহে। তিনি মুনাফিক নহেন। আর না তিনি বেদ্বীন অথবা বেদাআতী। বরং তিনি আমাদের মধ্যেই একজন খাঁটি মুমিন মুসলমান। তাহার উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর প্রতিদ্বন্দ্বীতা নহে।

সিরাজুল ওহহাজ কিতাবের মধ্যে রহিয়াছে যে, অধিকাংশ পূর্বাপর সালেহীন তথা নেক্কারগণ অনুরূপ কথায় ঐ ব্যক্তিদের উপর রাগান্বিত হইয়াছেন যাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছের তায়ীদ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অন্য কোন ব্যক্তির কথা উদ্ধৃত করে যদিও উক্ত ব্যক্তি যেইরূপই উচ্চ মর্যাদার হউক না কেন। কারণ কোন সাহাবী, ওলী অথবা মুজতাহিদের স্থান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদার সমকক্ষ হইতে পারে না। ফলে তাহাদের কথাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদসমূহের বিপরীত কেবল ওজনহীন ও সমাদরহীনই হইবে।

সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ ব্যতীত অন্য সকল মুনীষী ও দার্শনিকদের যাবতীয় কথা হইতে কিছু গ্রহণযোগ্য হয় আর কিছু পরিত্যাগযোগ্য। যেমন বলা হয় ' خذ ما صفا ودع ما كدر গ্রহণ কর যাহা পবিত্র ও পরিষ্কার এবং পরিত্যাগ কর যাহা অপবিত্র ও অপরিষ্কার।

বিস্ময়কর বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূল ও কিয়ামাতের উপর ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ শরীফ লাভ করিবার পর কিরূপে অন্য কোন ব্যক্তির কথা গ্রহণ করিবে এবং মানিয়া নিবে? আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর উপর পণ্ডিত ও দার্শনিকদের কথা সম্মুখে রাখিবে। যে রসূলের শানে আল্লাহ তা'আলা আয়াত শরীফ নাযিল করিয়াছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى -

অর্থাৎ "আর তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এসবই ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" (সূরা নজম-৩, ৪)

٦٦ حدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنَا النَّضْرُ قَالَ ثَنَا أَبُوْ نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيْعِ الْعَدَوِيَّ يَقُوْلُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ -

হাদীছ-৬৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ), তিনি...আবূ নাআমা আল আদাভী (রহঃ) হইতে। তিনি বলেন, আমি হুজায়র বিন রবী' আল আদাভীকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি হযরত ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে (পূর্বে উল্লেখিত) হাম্মাদ বিন যায়দের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

باب جامع اوصاف الاسلام

অনুচ্ছেদঃ ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহের সমবেতকারী

٦٧ **حدثنا** ابوبكر بن ابى شيبة وابوكريب قالا حدثنا ابن نمير ح وحدثنا قتيبة بن سعيد و اسحق بن ابراهيم جميعا عن جرير ح وحدثنا ابوكريب حدثنا ابو اسامة كلهم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابى سفيان بن عبد الله الثقفى قال قلت يا رسول الله قل لى فى الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك وفى حديث ابى اسامة غيرك قال قل امنت بالله فاستقم -

হাদীছ—৬৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহঃ)---(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমাদিগকে হাদীছ শোনান কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)---সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ আছ ছাকাফী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেন যে, আমি আরয করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলিয়া দিন, যাহাতে আপনার পরে আর কাহারও নিকট আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে না হয়। আর আবূ উসামার বর্ণিত হাদীছে (بعدك এর স্থলে) غيرك রহিয়াছে (অর্থাৎ আপনি ব্যতীত আর কাহারও নিকট আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে না হয়) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তুমি বল, আমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। অতঃপর ইহার উপরই তুমি অবিচল থাক।১

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর এই পবিত্র হাদীছখানা মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার এরশাদঃ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا এর অনুরূপ। অর্থাৎ "নিশ্চয় যেই সকল লোক খাঁটিভাবে বলে যে, আমাদের প্রতিপালক একক আল্লাহ তা'আলা, অতঃপর উহার উপর অটল থাকে।" অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর তাওহীদে স্বীকারোক্তিপূর্বক ঈমান গ্রহণ করে এবং উহার উপর অবিচল থাকে অর্থাৎ তাহারা ঈমান ও তাওহীদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। আর কখনও তাহারা তাওহীদকে ত্যাগ করে না এবং কোন প্রকার শিরকের মধ্যে জড়িত হয় না। আর তাহারা আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর আনুগত্য তথা শরীআতের আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনপূর্বক ইবাদত ও সৎ কর্ম করাকে নিজের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং উহার উপর মৃত্যুবরণ করে। এই শ্রেণীর খাঁটি মুমিনদের ব্যাপারে মহান করুণাময় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়াছেনঃ

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ -

অর্থাৎ "তাহাদের প্রতি (শুভ সংবাদ লইয়া) ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হইবে, (এবং বলিবে যে,) তোমরা (আখিরাতের বিপদসমূহের) ভয় করিও না এবং (দুনিয়া ত্যাগ করিবার কারণে) দুঃখও করিও না, আর তোমরা প্রতিশ্রুত জান্নাত পাওয়ার কারণে আনন্দিত হও।" (সূরা হামীম সিজদা—৩০)

টীকা—১· আলোচ্য হাদীছ খানা ইমাম তিরমিযী (রহঃ) রিওয়ায়াত করিয়াছেন। কিন্তু উহার কিছু অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, আমি বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কোন বস্তু হইতে অধিক ভয় করা বাঞ্ছনীয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জিহ্বা মুবারক ধরিয়া বলিলেন ইহা হইতে। (কেননা অধিকাংশ গুনাহ জিহ্বা হইতে নির্গত হয় এবং মানুষের উপর অধিকাংশ বালা মুসীবত জিহ্বা হইতেই উৎপত্তি। সুতরাং জিহ্বাকে যত সংযত রাখিবে ততই নিরাপদ থাকিবে।)

হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে–

انه قال قلت يارسول الله اوصني فقال قل ربي الله ثم استقم قال قلت ربي الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و اليه أنيب. فقال ليهنك العلم ابا الحسن -

অর্থাৎ "হযরত আলী (রাযিঃ) বলেনঃ একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া আরয করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করুন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ বল, আমার প্রতিপালক একক আল্লাহ তা'আলা অতঃপর উহার উপর অবিচল থাক। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি বলিলামঃ আমার প্রতিপালক একক আল্লাহ তা'আলা আর আমার যাহা কিছু তাওফীক হয় তাহা কেবল আল্লাহ তা'আলারই সাহায্যে হইয়া থাকে, তাঁহারই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আবুল হাসান! (আল্লাহ তা'আলা) তোমার ইলমকে শক্তিশালী করুক।"

আলোচ্য হাদীছখানা মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ বাণী (جوامع الكلم) এর অন্তর্ভুক্ত। ইহার মধ্যে ইসলামের মূলনীতিসমূহ অর্থাৎ তাওহীদ ও নেক কর্মসমূহ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তাওহীদের মর্ম امنت بالله এর দ্বারা এবং যাবতীয় নেক আ'মাল ثم استقم এর অধীনে বিষয়ীভূত হইয়াছে। কেননা অটল استقامت হইতেছে সকল নির্দেশিত হুকুম আহকাম পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ হুকুম হইতে বাঁচিয়া থাকা। সুতরাং উহার মধ্যে ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কিত আন্তরিক ও শারীরিক যাবতীয় নেক আ'মাল অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই সকল বিষয়ের কোন একটিতেও ত্রুটি করিয়া দৃঢ়তা استقامت লাভ করা যাইবে না। এই কারণেই সুফিয়ায়ে কেরাম বলেনঃ হাজার কিরামত হইতেও এই অবিচল (استقامت) উত্তম।

অথবা এই মর্ম হইবে যে امنت بالله এর মধ্যে সকল প্রকার নেক কর্ম করা এবং যাবতীয় নিষেধ হইতে বিরত থাকিবার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আর "ثم استقم" (অতঃপর দৃঢ় থাক) দ্বারা শরীআতের আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন উভয়ের উপর অটল অবিচল থাকিবার বিষয়টি বুঝানো হইয়াছে। (ফতহুল মুলহিম)

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) বলেনঃ

الاستقامة ان تستقيم على الامر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب -

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অটল থাকা এবং তাহা হইতে শৃগালের ন্যায় এইদিক সেইদিক পলায়নের পথ বাহির না করিবার নাম استقامة।" (মযহারী)

হযরত হাসান বসরী বলেন, استقامت এই যে, যাবতীয় কথায় ও কাজে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা এবং গুনাহ হইতে পবিত্র থাকা।

তফসীরে কাশশাফে আছে 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা' এই কথাটি তখনই বলা শুদ্ধ হইতে পারে যখন মানুষের অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পদক্ষেপেই আল্লাহ তা'আলার প্রশিক্ষণাধীন, তাঁহার রহমত ব্যতিরেকে আমি একটি নিঃশ্বাসও ছাড়িতে সক্ষম নহি। ইহার দাবী এই যে, মানুষ ইবাদতে অটল ও দৃঢ় থাকিবে এবং তাহার আত্মা ও দেহ চুল পরিমাণও আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব হইতে বিচ্যুতি হইবেনা।

হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উপর কুরআন মজীদের সকল আয়াতের মধ্যে কোন আয়াত এই আয়াত فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (অতএব আপনি যেইভাবে আদিষ্ট হইয়াছেন, দৃঢ় থাকুন।) (সূরা হুদ–১১২) হইতে অধিক শক্ত ও ক্লেশজনক নাযিল হয় নাই। এই জন্যই যখন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছিলেন; আপনি দ্রুত বৃদ্ধ হইয়া

গেলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ

شَيَّبَتْنِي هود واخواتها لانه نزل فيها فاستقم كما امرت -

অর্থাৎ "আমাকে সূরায়ে হূদ এবং উহার ন্যায় অন্যান্য সূরাসমূহ বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কেননা উহাতে অবতীর্ণ হইয়াছে অতএব আপনি যেইভাবে আদিষ্ট হইয়াছেন, দৃঢ় থাকুন।"

আবুল কাসিম কুশাইরী (রহঃ) স্বীয় রেসালায় লিখিয়াছেনঃ استقامت এর সোপান হইল যাহার দ্বারা সকল কর্ম পূর্ণ ও সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং এই গুণ হইতেই সকল সৌভাগ্য লাভ ও উহার বন্দোবস্ত হয়। আর যেই ব্যক্তির মধ্যে অবিচল ও স্থৈর্য বর্তমান না থাকিবে, সে ব্যক্তির সকল উদ্যম নিষ্ফল এবং চেষ্টা ফলহীন হইবে।

সারকথা استقامت একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ হইলেও উহাতে শরীআতের যাবতীয় বিধি–বিধান পালন এবং হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি হইতে সার্বক্ষণিক বাঁচিয়া থাকা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। হাদীছ শরীফসমূহে যে সকল স্থানে কালিমা তাইয়্যেবার উপর জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে সে সকল স্থানে কালিমা তাইয়্যেবার সহিত কোথাও - خلوص - (আন্তরিকতা) শব্দ আর কোথাও 'ইহা কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য', আর কোথাও استقامت (অবিচল) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। সকল বর্ণনার মর্মার্থ এক। উহা হইতেছে ইসলামের যাবতীয় শিক্ষার উপর আমল করা অর্থাৎ দ্বীনে শরীআতের হালাল বিষয়ের উপর আমল করা এবং হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকা। এই সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী বিভিন্ন হাদীছের মধ্যে আবশ্যক ও স্থানোপযোগী বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

باب تفاضل الاسلام واى اموره افضل

অনুচ্ছেদঃ ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহের ফযীলত এবং ঐ বিষয়ের বর্ণনা যে, ইসলামের কোন্ কার্যটি উত্তম.

٦٨ حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال انا الليث عن يزيد بن ابى حبيب عن ابى الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ـ

হাদীছ—৬৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হযরত কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ)। তিনি—হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর নিকট আরয করিলেন যে, কোন্ ইসলাম উত্তম? (অর্থাৎ ইসলামী শরীআতের সর্বোত্তম কাজ কোন্টি?) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উত্তরে) বলিলেনঃ তুমি (ক্ষুধার্ত) লোকদিগকে পানাহার করাইবে এবং (পরস্পর) সালাম দিবে, তোমার পরিচিত কিংবা অপরিচিত যেই (কোন মুসলমান) হউক না কেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছের মধ্যে ইসলামের বিস্তৃত দুইটি দিক বর্ণনা করা হইয়াছে অর্থাৎ ক্ষুধার্তকে পানাহার করানো (اطعام الطعام) এবং পরস্পর সালাম দেওয়া افشاء السلام। পানাহার করাইবার মধ্যে এমন প্রশস্ততা রহিয়াছে যে, উহাতে না সময়ের শর্ত করা হইয়াছে আর না মুসলমান এবং কাফিরের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। এমনকি মানুষ এবং প্রাণীরও কোন নির্দিষ্ট করা হয় নাই। অনুরূপ পরস্পর সালাম দেওয়ার মধ্যেও পরিচিত আর অপরিচিতের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই।

ইসলামের মধ্যে এই দুইটি প্রকৃতি ছাড়াও অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি তথা শাখাসমূহ রহিয়াছে। কিন্তু আরবের পারিপার্শিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুইটির অধিক গুরুত্ব অনুভব করা হইয়াছে। কেননা দিবা রাত্রে হত্যা, সন্ত্রাস ও লুটপাট ইত্যাদি লোকদিগকে এইরূপ আতঙ্কগ্রস্ত করিয়াছিল যে, যখন কোন বিদেশী অপরিচিত ব্যক্তি কাহারও সাক্ষাৎ হইত তখন তাহাকে রূহ কবজকারী ফিরিশতা বলিয়া মনে করিত। আর যতক্ষণ না তাহার পক্ষ হইতে পুরাপুরি প্রসন্নতা লাভ করিত ততক্ষণ সে বিপদ সঙ্কুলই থাকিত। ইসলাম আগমন করিয়া প্রথমেই এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছে যে, ভয়—ভীতির যুগ সমাপ্ত হইয়া নিরাপদ ও শান্তির যুগ আগত হইয়াছে। আর এই বিষয়টি ঘোষণার জন্য সর্বপ্রথম سلام (শান্তি) শব্দ নির্ধারণ করিয়াছে। যাহাতে প্রথম সাক্ষাতেই এই বিষয়টি পরিস্কার হইয়া যায় যে, এখন আমি তোমার জন্য মৃত্যুর ধ্বনি নহি বরং শান্তি বার্তা হইয়া গিয়াছি। আর এই শব্দকে চলিতে ফিরিতে এমন অধিকহারে ব্যবহার করিবার হুকুম করা হইয়াছে যে, ভয়—ভীতি যেন পৃথিবী হইতে উচ্ছেদ হইয়া যায় এবং শান্তির প্রাচুর্য চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে।

সাক্ষাতের সময় প্রত্যেক জাতির এক একটি প্রতীক চিহ্ন হইয়া থাকে। ইসলাম শান্তি বার্তাকে নিজের রীতিনীতি বা চিহ্ন নির্ধারণ করিয়াছে।

হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) সালামের নির্দেশ পালনে এমন গুরুত্ব দিয়াছেন যে, কেবল পরস্পর সালাম (افشاء السلام) —এর জন্য বাজারে বাজারে অলিতে গলিতে ঘুরিতেন এবং সালাম প্রদান শেষে ঘরে প্রত্যাবর্তনকরিতেন।

পরস্পর সালাম افشاء السلام –এর গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)–এর সূত্রে অন্য একখানা হাদীছ শরীফও রিওয়ায়াত করিয়াছেন। যাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বাহ্যতঃ সালাম সাধারণ বস্তু বলিয়া ধারণা হইলেও বস্তুত উহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে–

عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شئ اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السَّلام بَيْنَكُم –

অর্থাৎ "হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর না পরস্পর মহব্বত করা ব্যতীত তোমরা পূর্ণ মুমিন হিসাবে গণ্য হইবে। আমি কি তোমাদিগকে এমন বিষয় বলিয়া দিব না যাহাকে আমল করিলে তোমরা পরস্পর মহব্বত করিতে থাকিবে? উহা এই যে, তোমরা প্রত্যেকই একে অপরকে সালাম দাও।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)–এর বর্ণিত এই হাদীছের মধ্যে জান্নাতকে ঈমানের উপর ঈমানকে মহব্বতের উপর এবং মহব্বতকে সালামের উপর নির্ভরশীল করিবার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কতক আমল বাহ্যতঃ দৃষ্টিতে সাধারণ হয় বটে কিন্তু উহার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের লক্ষ্যে বড়ই গুরুত্বের অধিকারী। সালাম বাহ্যিকঃ একটি সাধারণ স্তরের আখলাক কিন্তু উহার ফলশ্রুতি পরস্পর বন্ধুত্ব ও মহব্বত স্থাপন। ফলে মহব্বত যাহা শুধু এক আকর্ষণ এবং প্রভাবেরই নাম কিনতু তাহা সত্ত্বেও ইহা ঈমানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কারণ বলিয়া গণ্য হয়।

বস্তুতঃ ঈমান আল্লাহ তা'আলার সত্তার মহব্বতেরই অপর নাম। আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের সৃষ্টি রসূলের মহব্বতের মাধ্যমে, আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মহব্বত সৃষ্টি সাহাবায়ে কেরামের মহব্বতের মাধ্যমে এবং এইরূপ পর্যায়ক্রমে আলেম ওলামা ও মুমিনের মহব্বতের মাধ্যমে চলিতে থাকে। কাজেই আল্লাহ তা'আলার মহব্বত পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্য উল্লেখিত সকল স্তরের মহব্বতসমূহকে অতিক্রম করা অপরিহার্য। সুতরাং মুসলমানগণকে মহব্বত করিবার ফলশ্রুতি আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমানের ফলশ্রুতি মুমিনগণের সহিত মহব্বত স্থাপন হইতে থাকা। এই কারণেই মুমিনগণের সহিত শত্রুতা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ প্রভৃতি মানুষকে সঠিক ইসলামের উপর পূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে আঘাত ও ক্ষতি সাধন করে। এই গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই কুরআন মজীদে এই দু'আর শিক্ষা দেওয়া হইয়াছেঃ

وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا –

অর্থাৎ "এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে কোন হিংসা বিদ্বেষ রাখিও না"। (সূরা হাশর ১০)

এই ঈর্ষাকে দূর করিবার জন্য সবচাইতে সহজ এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসা এই সালামই।

এই আলোচনার দাবী তো ইহা ছিল যে, ইসলামের মধ্যে পরস্পর সালামের বিষয়টি রুকনের পর্যায়ভুক্ত হওয়া, কিন্তু যে সকল জিনিষ পূর্ণভাবে সম্বরণ (ضبط) এর মধ্যে আনা সম্ভব নহে। সেই সকল জিনিষের গুরুত্ব অত্যধিক হওয়া সত্ত্বেও শরীআত উহাকে রুকনের মর্যাদা দেয় নাই। তাই মহব্বতকে ইসলামের একটি প্রকৃতি তথা শাখা গণ্য করা হইয়াছে। যেমন লজ্জাশীলতা (حياء)কে ঈমানের একটি শাখা গণ্য করা হইয়াছে। কেননা উহাকে পূর্ণভাবে সম্বরণ খুবই জটিল। কাজেই এই হাকীকতকে সম্মুখে রাখিয়া অনুধাবন করা উচিৎ যে, যেই সকল আ'মালকে শরীআত শো'বা অর্থাৎ শাখা গণ্য করিয়াছে উহাকে সকল ক্ষেত্রেই সাধারণ এবং গুরুত্বহীন বলা যায় না বরং কোন কোন স্থলে রুকন পর্যায়ের জিনিষকেও সম্বরণ না হইবার দরুণ অথবা সহজ হইবার চাহিদায় শো'বা তথা শাখা গণ্য করা হইয়াছে। কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, মহব্বত দ্বীনের ফরযসমূহের একটি এবং শরীআতের রুকনসমূহের একটি রুকন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বাণী اطعام طعام (পানাহার করানো)–এর গুরুত্ব সাহাবায়ে কেরামের নির্দেশ পালনের দিকে তাকাইলেই অনুধাবন করা যায়। তাঁহারা এই এরশাদ পালনে এমন উদ্যমশীল ছিলেন যে, নিজ শিশুর জন্য রক্ষিত এক ওয়াক্ত খাবারও ক্ষুধার্তদের খাওয়ানো পছন্দ করিতেন।

জামে' তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক আনসারী সাহাবীর গৃহে রাত্রিতে একজন মেহমান আগমন করিলেন। তাঁহার নিকট এই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ছিল, যাহা তিনি নিজে এবং তাঁহার সন্তানগণ আহার করিতে পারেন। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে বলিলেনঃ শিশুদিগকে কোনরূপে শুয়াইয়া দাও। অতঃপর আলো নিভাইয়া মেহমানের সম্মুখে আহার্য্য রাখিয়া কাছাকাছি বসিয়া যাও। যাহাতে মেহমান মনে করে যে, আমরাও খাইতেছি, কিন্তু আসলে আমরা খাইব না। এইভাবে মেহমান পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) হইতে এই প্রকার বিবিধ ঘটনা বর্ণিত আছে যাহা মানুষকে উৎকৃষ্ট মানবতা শিক্ষা দেয় এবং জীবনে এক মহান বিপ্লব আনয়ন করে। এই প্রকারের আত্মত্যাগী জামাআতের উল্লেখ কুরআন মজীদে রহিয়াছেঃ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ -

অর্থাৎ "এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হইলেও তাহাদিগকে অগ্রাধিকার দান করে।" (সূরা হাশর–৯)

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযিঃ) যখন ইসলামের অনুসন্ধানে মদীনায় পৌছিলেন তখন সর্বপ্রথম যেই সকল নসীহত তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মুখ মুবারক হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন উহা এই افشاء السلام (পরস্পর সালাম দেওয়া) এবং اطعام طعام (পানাহার করানো) বাক্য ছিল।

এক হাদীছে যে সকল আ'মালকে উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে, উহার মধ্যে সবচাইতে দীপ্তিমান আমল এই افشاء السلام এবং اطعام طعام কে গণ্য করা হইয়াছে।

সহানুভূতি এবং অপরকে শ্রেষ্ঠতর ভাবনার অনুভূতি, শক্তি ও বিদ্বেষ দ্বারা সৃষ্টি হয় না।

স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও পরস্পর সাম্যের অনুভূতি কেবল শক্তি, বিদ্বেষ ও অত্যাচারের পথে সৃষ্টি হইতে পারে না। ইহার জন্য মস্তিষ্ক বিন্যাস এবং আমলী চিকিৎসা (Treatment)–এর প্রয়োজন। এই কারণেই ইসলাম মানুষের স্বীয় শক্তি দ্বারা উপার্জিত সম্পদকে শক্তি প্রয়োগ ও অত্যাচারের মাধ্যমে ছিনাইয়া অন্যকে প্রদানের নির্দেশ দেয় নাই বরং ইহা করিয়াছে যে, একদিকে তো কিছু হুকূক তথা দাবীসমূহ ফরয এবং ওয়াজিবের শিরোনামায় অত্যাবশ্যক করিয়াছে, আর কিছু হুকূক এমন রহিয়াছে যাহা আদায় করা ফরয ওয়াজিব না করিয়া কেবল মানুষকে উহার প্রেরণা যোগাইয়া তাহাদের খুশীর উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

উহার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষকে পরীক্ষা করা যে, ফরয ও ওয়াজিবের ঐ আমলী চিকিৎসার পর বর্তমানে তাহার স্বভাবের মধ্যে দান খয়রাত ও পরোপকারের কতখানি চেতনা (Spirit) সৃষ্টি হইয়াছে এবং কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগ ছাড়া তাহার মধ্যে অপরের প্রতি সহানুভূতির কিরূপ অভ্যস্থতা লাভ হইয়াছে।

সারকথা, ইসলামের এই সংক্ষিপ্ত দুইটি প্রকৃতি "পানাহার করানো" এবং "পরস্পর সালাম দেওয়া" সামাজিক জীবনের দুইটি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যদি উহাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে আমাদের সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবন বাগানে প্রেমপ্রীতি, মহব্বত ও শান্তির ফুল ফুটিয়া কল্যাণের স্রোত বহিবে। (তরজমানুস সুন্নাহ)

ফায়দাঃ (১) পানাহার করানো, দান খয়রাত করা এবং মুসলমানগণের উপকার করা খুবই জরুরী কাজ।

(২) এই হাদীছে মুসলমান পরস্পর মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখিবার প্রেরণা এবং একহৃদয় ও একতা থাকিবার হিদায়াত করা হইয়াছে।

(৩) ইসলামের নির্দেশ হইতেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান পরিচিত বা অপরিচিতকে সালাম দিবে। এখানে

প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা মর্ম প্রত্যেক মুসলমান। কাফিরদেরকে সালাম দেওয়া জরুরী নহে।

(৪) সালাম দেওয়া সুন্নাত এবং জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু যে আগে সালাম দিবে সেই ছওয়াব অধিক পাইবে। জওয়াব দেওয়ার অর্থ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলা।

(৫) দলের মধ্য হইতে একজনে সালাম দিলে বা জওয়াব দিলেই হুকুম আদায় হইয়া যাইবে।

(৬) ভদ্রতা ও বিনয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে. ইসলামের রীতিনীতি।

(৭) আন্তরিকতার সহিত আমল করিবার হিদায়াত করা হইয়াছে। (নববী)

৬৯ وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال أنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده -

হাদীছ—৬৯. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন সারহ আল মিসরী (রহঃ)। তিনি--আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ সর্বোত্তম মুসলমান কে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উত্তরে) বলিলেনঃ সেই ব্যক্তি যাহার জিহ্বা তথা মুখ (অর্থাৎ গালাগালি, অভিশাপ, গীবত, অপবাদ, চোগলখুরী এবং মানুষকে অন্যায়ভাবে বিচারকের সামনে নেওয়া ইত্যাদি) এবং হাত (অর্থাৎ আঘাত, হত্যা, পরাস্ত এবং বাতিল তথা মিথ্যার সহিত কোন কিছু লিখা ইত্যাদি) দ্বারা কষ্ট দেওয়া হইতে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

যুগ যুগ ধরিয়া আরব জাতির মধ্যে হত্যা, লুণ্ঠন, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। তাহারা এখন নুতন নুতন পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইসলামের পয়গাম্বর তাহাদের প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া দিতে চাহিয়াছেন যে, কেবল ইসলামের রুকন আদায় করিলে এবং কতগুলি নির্দিষ্ট আকাঈদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেই কোন ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন, মুসলিম উপাধি লাভের যোগ্য হইতে পারে না। তাহাকে ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে, আজ পূর্বের ন্যায় তাহার জীবন মৃত্যু বার্তা নহে বরং মাথা হইতে পা পর্যন্ত শান্তিবাহক হইয়া গিয়াছে। আমানত এবং নিরাপত্তার সেই রূহ তাহার মধ্যে সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অন্তরের মধ্যে তাহার পক্ষ হইতে ভয়ের যুগ বিতাড়িত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সহিত মুআমেলায় কি জান, আর কি মাল, সকল কিছুই পুরাপুরি বিশ্বস্ততা লাভ হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিকেই ইসলাম মুমিন, মুসলিম পদবী দান করিয়াছে। এই কানূন বর্ণনার দ্বারা ঐ দিকেও ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, কবিতা বলিবার নৈপূণ্য ব্যতীত যেমন কোন ব্যক্তিকে কবি এবং ইলম শিক্ষা ছাড়া আলেম বলা যায় না অনুরূপ শান্তি ও নিরাপত্তার বাহক ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে মুসলিম ও মুমিন বলা যাইতে পারে না।

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত জিহ্বা এবং হাতের বিশেষত্ব কেবল এই কারণে যে, সাধারণভাবে উৎপীড়নকারীর সাজ সরঞ্জাম এই দুইটিই। না হয় মূল উদ্দেশ্য হইতেছে উৎপীড়ন পরিত্যাগ করা। চাই উহা যে কোন উপায়ে হউক না কেন।

জিহ্বাকে হাতের পূর্বে উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে যে, জিহ্বা তথা মুখ দ্বারা অপরকে কষ্ট দেওয়া খুবই সহজ। আর ইহার কার্যকারিতাও বড়ই মারাত্মক। কবি বলেনঃ

جَراحات السِّنان لها التئام - ولا يلتام ما جرح اللسان

অর্থাৎ "তলোয়ার দ্বারা কৃত জখমসমূহ চিকিৎসা যোগ্য। কিন্তু যবান তথা মুখ দ্বারা সৃষ্ট জখমের কোন চিকিৎসা নাই।"

দ্বিতীয়তঃ হাতের উৎপীড়নের সম্পর্ক কেবল উপস্থিতের সহিত। আর যবান তথা মুখের উৎপীড়ন উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের সহিত বরং ইহার মধ্যে জীবিত ও মৃতের কোন বন্দীত্ব নাই।

(তরজমানুস সুন্নাহ, ফতহুল মুলহিম)

হাদীছ শরীফসমূহের সমন্বয়

উপরোল্লেখিত (৬৮ নং) হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, সর্বোত্তম মুসলমান ঐ ব্যক্তি যে ক্ষুধার্তকে পানাহার করায় এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেয়। অতঃপর আলোচ্য হাদীছের মধ্যে সর্বোত্তম মুসলমান ঐ ব্যক্তিকে বলা হইয়াছে যাহার যবান ও হাত (অর্থাৎ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) হইতে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে। তাহা ছাড়া অন্যান্য হাদীছে অনুরূপ একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছঃ

عن ابى هريرة رض قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اىّ الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله قيل - ثم ماذا؟ قال الجهاد فى سبيل الله - قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور -

অর্থাৎ "হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিলঃ কোন্ আ'মাল উত্তম? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলিলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান লওয়া। অতঃপর আরয করা হইয়াছে; তারপর কোন্‌টি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (অর্থাৎ দ্বীনে শরীআতের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে) জিহাদ করা। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে; ইহার পর কোন্ আমলটি উত্তম? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলিলেনঃ মকবূল হজ্জ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে একখানা হাদীছ বর্ণিত হইয়াছেঃ

عن عبد الله بن مسعودؓ قال سئلت رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل؟ وفى رواية اىّ الاعمال احبُّ الى الله قال الصلوةُ لوقتها - قلت - ثم أىٌّ قال برالوالدين قلت - ثم اىٌّ؟ قال الجهاد فى سبيل الله -

অর্থাৎ "হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খিদমতে আরয করিয়াছিলামঃ কোন্ আ'মাল উত্তম? অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন্ আ'মাল আল্লাহ তা'আলার অধিক প্রিয়? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেনঃ নামায স্বীয় ওয়াক্তে আদায় করা। তারপর আরয করিলামঃ অতঃপর কোন্‌টি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলিলেনঃ পিতা–মাতার সহিত সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। অতঃপর আরয করিলামঃ ইহার পর কোন্‌টি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করা।

উত্তর এই যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। আর প্রত্যেক অবস্থার জন্যে পৃথক পৃথক বিধানও হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থান, কাল, পাত্র এবং প্রশ্নকারী ও উপস্থিত

ব্যক্তিবর্গের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়াছেন। যাহার মধ্যে যেই বিষয়টির ত্রুটি দেখিয়াছেন বা অধিক প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন সেই হিসাবেই উত্তর দিয়াছেন। উদাহরণতঃ যে স্থানে পানাহার করানো এবং সালামের অধিক প্রয়োজন মনে করিয়াছেন তিনি তাহাকে ইহাই বলিয়া দিয়াছেন। আর যে স্থানে উৎপীড়ন হইতে বিরত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে সে স্থানে উহাই বলিয়া দিয়াছেন। আর ইহা সম্পূর্ণ হিকমত তথা দর্শন উপযোগীও বটে।

বলাবাহুল্য মক্কী জীবনে যে বস্তু অধিক প্রয়োজন ছিল উহা এই যে, মুসলমান সেই স্থানের নিরাপত্তাহীনতার বিপরীত নিরাপত্তা ও শান্তি বার্তা হওয়া। আর মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানগণ পরস্পর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও অপরকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া ভাবনার সৃষ্টি হওয়া অধিক প্রয়োজন ছিল। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার জন্য প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু ক্ষুধার্তদের পানাহার করানো হাতের নিরাপত্তা এবং সালাম দেওয়া যবানের নিরাপত্তার দিকে ইঙ্গিত বহন করে।

ফায়দাঃ কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া বৈধ নহে। চাই যবান দ্বারা হউক বা কোন কর্ম দ্বারা হউক এবং কাহাকেও অপমান বা ঘৃণা করা যাইবে না। (নববী)

٧٠ حدثنا حسن الحلوانى وعبد بن حميد جميعا عن ابى عاصم قال عبد انبانا ابو عاصم عن ابن جريج انه سمع ابا الزبير يقول سمعت جابرا يقول سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده -

হাদীছ–৭০. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হাসান আল-হুলওয়ানী এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ)। তিনি····হযরত জাবির (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেনঃ হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যাহার যবান তথা মুখ ও হাত হইতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

المسلم من سلم المسلمون এখানে মুসলিম দ্বারা মর্ম কামিল মুসলিম। যেমন বলা হয় زيد الرجل (যায়দ পুরুষত্বে পূর্ণাঙ্গ)। ইহা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান উদ্দেশ্য, পরিবেষ্টন (حصر) নহে। হাদীছের মর্মার্থ হইবে–

ان المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده مع مراعاة باقى الاركان والاداب -

অর্থাৎ "কামিল মুসলিম সেই ব্যক্তি যাহার মুখ এবং হাত হইতে অন্যান্য সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং ইসলামের বাকী আরকান ও আদাবসমূহ আ'মালের উপর যথাযথ মনোযোগ দিবে।"

আর হাদীছে مسلمون শব্দকে প্রায় নিশ্চিত প্রকাশার্থে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহাতে মুসলিমকে স্বীয় মুসলিম ভাইয়ের কষ্ট হইতে রক্ষণে অত্যধিক তাকীদ হয়। না হয় অমুসলিম কাফিরদেরকেও কষ্ট দেওয়া হইতে বিরত থাকা ওয়াজিব। হ্যাঁ, কাফিররা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করে তবে ভিন্ন কথা। (ফতহুল মুলহিম)

٧١ حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي قال حدثني ابي حدثني ابو بردة بن عبد الله بن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي بردة عن ابي موسى قال قلت يا رسول الله اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده

হাদীছ—৭১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হযরত সাঈদ বিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ উমূবী (রহঃ)। তিনি···আবূ মূসা (আশয়ারী) (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি আরয করিলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন্ মুসলমান উত্তম? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যাহার যবান তথা মুখ এবং হাত হইতে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(৬৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

٧٢ وحدثنيه ابراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا ابو اسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الاسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المسلمين افضل وذكر مثله -

হাদীছ—৭২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন)······ ইব্রাহীম বিন সাঈদ আল জাওহারী (রহঃ) তিনি ···হযরত বুরাইদা বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে উপরোক্ত সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীছের বাকী অংশ উপরোল্লেখিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত জওয়াব দিয়াছেন)।

باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان

অনুচ্ছেদঃ ঐ প্রকৃতিসমূহের বিবরণ, যে ব্যক্তি ঐ সকল গুণে গুণান্বিত হইবে সেই ব্যক্তি ঈমানের আস্বাদন পাইবে।

٧٣ - **حدثنا** إسحق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.

হাদীছ—৭৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইসহাক বিন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন আবী ওমর এবং মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহঃ)। তাহারা—হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তিনটি বস্তু যাহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে সেই ঈমানের প্রকৃত আস্বাদন অনুভব করিয়াছে।[১] **একঃ** যাহার নিকট আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য যাবতীয় বস্তু হইতে অধিক প্রিয়। **দুইঃ** যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তাঁহার বান্দাকে মহব্বত করে এবং **তিনঃ** যাহাকে আল্লাহ তা'আলা কুফর হইতে মুক্তি দিয়াছেন। অতঃপর সে কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তনকে এমন অপছন্দ করে যেমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।

টীকা حلاوة الايمان (ঈমানের আস্বাদন)। ওলামাগণ বলেন, حلاوة الايمان এর মর্ম হইতেছে ইবাদতে এলাহীর মধ্যে স্বাদ লাভ করা এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনে কঠোর পরিশ্রমে ধৈর্যধারন সক্ষম এবং তাঁহার সন্তুষ্টি আসবাবে দুনিয়া হইতে অধিক প্রিয় হওয়া।

আল আরীফ ইবন আবী জমরাহ (রহঃ) বলেনঃ এই حلاوة (আস্বাদন)–এর মর্মার্থ নির্ণয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে যে, এই আস্বাদন কি অনুভূত محسوسة অথবা মৌলিক (معنوية)? ফকীহ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, আস্বাদন একটি মৌলিক বস্তু অর্থাৎ ঈমানের দৃঢ়তা এবং আহকামে শরীআতের উপর অটলতা লাভ মর্ম। আর হযরত সুফিয়ায়ে কেরাম (রহঃ) আস্বাদনকে অনুভূত (محسوسة) বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং حلاوة শব্দকে কোনরূপ তাবীল ব্যতীত স্বীয় প্রকাশ্য অর্থের উপর রাখিয়াছেন। শারেহ বলেনঃ সুফিয়ায়ে কেরামের অভিমতই অধিক সহীহ। তবে আল্লাহ সর্বজ্ঞ। কেননা তাহারা হাদীছের শব্দকে তাবীল ব্যতীত প্রকাশ্য অর্থের উপর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়টি ঐ ব্যক্তি যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যিনি উক্ত স্থান লাভে সক্ষম হইয়াছেন। কাজেই যাহার উক্ত স্থান লাভ হয় নাই তাহার জন্য এই কথা বলা উচিৎ নহে যে, আস্বাদনের মর্ম অনুভূত নহে। কবি বলেনঃ

وإذا لم تر الهلال فسلم - لأناس رأوه بالأبصار.

অর্থাৎ "আর যখন তুমি নূতন চাঁদ দেখিতে পার নাই তখন স্বীকার করিয়া নাও। কেননা বহুলোক উহাকে স্বীয় চক্ষু দ্বারাদেখিয়াছে।"

সাহাবায়ে কেরাম, সলফে সালেহীন ও আল্লাহ ওয়ালাগণের বিভিন্ন ঘটনার দিকে প্রত্যক্ষ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহারা ঈমানের অনুভূত আস্বাদন حلاوة محسوسة ই লাভ করিয়াছিলেন। শাস্তির বিষন্নতার বিপরীত এই ঈমানী অনুভূত আস্বাদনই তো ছিল যাহা হযরত বিলাল (রাযিঃ)–এর যবান হইতে আহাদ, আহাদ ধ্বনি ব্যতীত অন্য কিছু নিসৃত না হওয়া।

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ শরীফখানা খুবই উচ্চাঙ্গের এবং ইসলামের মূলতত্ত্বসমূহের একটি মূলতত্ত্ব। আলেমগণ বলেন, ঈমানের স্বাদ পাইবার মর্মার্থ হইতেছে যে, ইবাদতের মধ্যে কষ্ট স্বীকার করিলে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য স্বাদ ও মিষ্টত্ব সৃষ্টি হইবে এবং দুনিয়ার উপকার ও লাভের উপর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের সন্তুষ্টি প্রাধান্য পাইবে। আর আল্লাহ তা'আলার মহব্বত হইতেছে তাঁহার নির্দেশ পালন করা এবং তাঁহার বিরোধীতা বর্জন করা। অনুরূপ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত হইতেছে তাহার অনুসরণ করা।

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ পূর্বে উল্লেখিত ঐ হাদীছের অনুরূপ যে, ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ লাভ করিয়াছে যে আল্লাহ তা'আলাকে আল্লাহ হিসাবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পয়গাম্বর হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে সন্তুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলকে মহব্বত করা। অনুরূপ খালেছ আল্লাহ তা'আলার জন্য অন্যান্য মুসলমানকে মহব্বত করা। আর কুফরীকে পুনরায় গ্রহণ করাকে ঘৃণা কেবল ঐ ব্যক্তিই করিবে যাহার ঈমান ও বিশ্বাস শক্তিশালী হইয়াছে এবং যাহার অন্তর প্রশান্তি লাভ করিয়াছে, বক্ষদেশ প্রশস্ত হইয়াছে এবং তাহার রক্ত মাংসে ঈমান বিস্তার লাভ করিয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিই ঈমানের আস্বাদন লাভ করিয়াছে। আর আল্লাহ তা'আলার জন্য কাহাকেও মহব্বত করা ইহার ফলশ্রুতি আল্লাহ তা'আলার মহব্বত। কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ তা'আলার মহব্বত এই যে, স্বীয় অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা মুতাবিক করা। ফলে আল্লাহ তা'আলা যাহা পছন্দ করেন উহাকে পছন্দ করা এবং তিনি যাহা অপছন্দ করেন উহাকে অপছন্দ করা।

শরীআতের কার্যাবলী স্বাভাবিক কার্যাবলীতে পরিণত হইবে

ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা এই যে, শরীআতের অনুসরণের মধ্যে ঐ স্বাদ অনুভব হইতে থাকিবে যাহা উক্ত বস্তুসমূহে রহিয়াছে, আর ইহা স্বভাবকে অধীনস্থ করিবে। নামাযের সময় নামাযের ঐরূপ বাসনা হইবে যেইরূপ শীতকালে গরম কাপড়ের জন্য হইয়া থাকে। রমযান শরীফের রোযার দিকে এইরূপ কামনা হইবে যেইরূপ গরমের মধ্যে শীতলের কামনা হইয়া থাকে। যখন নফসের মধ্যে এইরূপ ক্ষমতা সৃষ্টি হইবে তখন ক্লেশহীনভাবে শরীআতের উপর আমল করা সহজ হইবে। আর নফস স্বীয় স্বভাব ত্যাগ করিয়া শরীআতের অধীন হইয়া যাইবে। ইহার নামই সন্তুষ্ট আত্মা 'نفس مطمئنه'।

আল্লাহ তা'আলার মহব্বত কিরূপে সৃষ্টি হইতে পারে

আলোচ্য হাদীছে কামেল ঈমানের নিরিখ ইহাকে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রসূলের মহব্বত অন্যান্য সকল মহব্বতের উপর প্রভাবশালী হইবে। জামে' তিরমিযী শরীফে উল্লেখিত এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, "হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলার সহিত মহব্বত রাখ এই কারণে যে, তিনি তোমাদিগকে অসংখ্য নেয়ামত দান করিয়াছেন এবং আমার সহিত মহব্বত রাখ, আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের কারণে এবং আমার পরিবারবর্গের সহিতও মহব্বত রাখ আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের কারণে।"

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

এক সাহাবী (রাযিঃ) রাত্রিতে নামাযরত অবস্থায় স্বীয় ঘোড়া চুরি হইতে দেখিলেও নামায ভঙ্গ করেন নাই। জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিলেনঃ ঘোড়া রক্ষণ হইতে নামাযই আমাকে অধিক আস্বাদন দিতেছিল।

শত্রুর তীরের আঘাতের পর আঘাতও সাহাবী (রাযিঃ)-এর নামায ভঙ্গ করিতে পারে নাই। সুতরাং এই সকল ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহারা ঈমানী অনুভূত আস্বাদনই লাভ করিয়াছিলেন। (ফতহুল মুলহিম সংক্ষিপ্ত)

এই হাদীছের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের অত্যন্ত সহজ রাস্তা ইহাকে বলা হইয়াছে যে, প্রথমে তোমরা আল্লাহ তা'আলার ঐ নেয়ামতসমূহে ধ্যান কর যাহা দিবারাত্রে চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যতীত এবং কোন প্রকার দাবী ব্যতিরেকে তোমাদের লাভ হইয়াছে। এইভাবে যখন আল্লাহ তা'আলার মহব্বত তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হইয়া যাইবে তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত সৃষ্টি হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া যাইবে। কেননা তাঁহার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সহিত ইহাই যে, তিনি আমাদের এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে সম্পর্ককারী বার্তাবাহক। যদি বাদশাহের পত্র বাহকের সম্মান ও মর্যাদা হইয়া থাকে তবে বাদশার বাদশাহ মহান প্রতিপালকের পয়গাম্বরের সম্মান ও মহব্বত হইবে না কেন? যখন দুনিয়ায় রাজদূতদের মধ্যে সুসভ্য চরিত্রাবলী ও আদর্শ গুণাবলী হওয়া অত্যাবশ্যক তাহা হইলে মহান রব্বুল আলামীনের রসূলগণের পূর্ণাঙ্গ সুসভ্য চরিত্রাবলী ও আদর্শ গুণাবলী কেন অপরিহার্য হইবে না? নিশ্চয় তাঁহারা মহান চরিত্রের অধিকারী। ফলে তাঁহাদের সহিত মহব্বত সৃষ্টি হইবেই।

শায়খ বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, মহব্বত সৃষ্টির তিনটি কারণ হইয়া থাকে, যথা- কামাল, সৌন্দর্য ও দানশীলতা। এই তিনটি গুণাবলীই আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তায় সম্পূর্ণতার সহিত ছিল, তাঁহার জাহেরী বাতেনী কামালিয়াত পবিত্র শরীআত হইতেই প্রকাশিত হয়। তাঁহার উত্তম চরিত্রাবলী ও সৌন্দর্য হাদীছ শরীফসমূহে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক ও শারীরিক দানশীলতা ও অনুগ্রহের বিষয়টিকে কে অনুমান করিতে পারিবে।

বলাবাহুল্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুগ্রহ এমন ব্যাপক ছিল যে, তিনি জগতবাসীদের জন্য রহমত হিসাবেই প্রেরিত হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ সকল মুসলমানের গ্রীবার উপরই রহিয়াছে। তাহাদিগকে চিরস্থায়ী আরাম প্রদান করিয়াছেন। জাহান্নামের আযাব হইতে বাঁচাইয়াছেন। আর মহান রব্বুল আলামীনের অনুগ্রহও সর্বাধিক। কেননা তিনিই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর পয়গাম্বর রূপে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কাজেই মূলতত্ত্বসমূহের মূল اصل الاصول। মহব্বত আল্লাহ জাল্লা জালালুহুরই। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বায়ত, সালেহীন, আওলিয়া আল্লাহ, আয়িম্মায়ে দীন এবং মুমেনীনের মহব্বত প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের দিকে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মহব্বত আসল (بالذات) আর বাকী অন্যান্য যাবতীয় মহব্বত অপ্রাকৃত (بالعرض)। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের অধীনে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত আসল মহব্বত স্থাপন করে আল্লাহ ওয়ালাদের মতে সে ব্যক্তি মুশরিক। যেমন- আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ "তাহাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে যেমন আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালবাসা হইয়া থাকে।" ইহা হইতেছে মুশরিকদের অবস্থা। আর মুমিনগণের গুণ হইতেছে যে, وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ "আর যাহারা ঈমানদার (একমাত্র) আল্লাহ তা'আলার সহিত রহিয়াছে তাহাদের গভীর ভালবাসা (এবং সেই ভালবাসা উহাদের ভালবাসার তুলনায় বহুগুণে বেশী।)"

(সূরা বাকারাহঃ ১৬৫)

আলোচ্য হাদীছে মহব্বত দ্বারা বিবেক বুদ্ধিসুলভ (عقلى) মহব্বত মর্ম। অর্থাৎ সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধির চাহিদা হইতেছে নফসের অভিলাষের বিপরীত আল্লাহ তা'আলার এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত তথা ভালবাসাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে। উহার উদাহরণ এইরূপ যে, একজন রোগীর স্বভাবের বাসনা না হওয়া সত্ত্বেও ঔষধ ব্যবহারের প্রবল ইচ্ছা করিয়া থাকে। কেননা জ্ঞানবুদ্ধির চাহিদা যে, ঔষধ সেবনে তাহাকে আরোগ্যের দিকে নিয়া যাইবে। অনুরূপ মানুষ যখন চিন্তা করে যে, শরীআতের আদেশ ও নিষেধ তাহারই কল্যাণের জন্য তখন জ্ঞানবুদ্ধি তাহাকে উক্ত আদেশ ও নিষেধ পালনে কষ্ট স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে উহা তাহাকে আস্বাদন দিবে এবং এই জ্ঞানবুদ্ধি নফসের অভিলাষকে অধীনস্থ করিয়া লইবে। ইহাকেই ঈমানের আস্বাদন (حلاوة الايمان) শব্দ দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। অতঃপর মহব্বতও দুই প্রকারের, ফরয ও মুস্তাহাব।

ফরয ইহা যে শরীআতের যাবতীয় আদেশ পালন করা, সকল গুনাহ হইতে বিরত থাকা এবং তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা। আর যদি কোন ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হয়, হারাম কার্য করে এবং কোন ফরয ছাড়িয়া দেয়, তবে উহার নিদর্শন এই যে, আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের মধ্যে তাহার ক্রটি ও অভাব রহিয়াছে। আর মুস্তাহাব উহা যে, নফল ইবাদতসমূহ পর্যন্ত নিয়মানুবর্তিতার সহিত পালন করা এবং সন্দেহযুক্ত বস্তুসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকা।

মাতা-পিতা ও সন্তানাদির মহব্বত স্বভাবগত (طبعى) আর আল্লাহ তা'আলা ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত জ্ঞানবুদ্ধিগত عقلى। কামেল ঈমান ইহাই যে, জ্ঞানবুদ্ধির দাবী স্বভাবিক দাবীর উপর প্রাধান্য লাভ করিবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মহব্বতের কয়েকটি ঘটনা

উহুদের জিহাদের মধ্যে এক আনসারী মহিলার পিতা, ভাই ও স্বামী সকলই শাহাদত বরণ করেন। এই সংবাদ যখন তাহার নিকট পৌছিল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ভাল আছেন? লোকেরা বলিল, হ্যাঁ, তিনি নিরাপদ ও ভাল আছেন। মহিলা বলিলেন চল, আমাকে দেখাইয়া দাও যাহাতে আমি নিজে তাঁহার পবিত্র নূরানী চেহারা দেখিয়া নিতে পারি। যখন তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যক্ষ করিলেন তখন বলিয়া উঠিলেন যে, আপনি যখন জীবিত ও নিরাপদ আছেন তখন উহার পর প্রত্যেক মসীবতই আমার জন্য সহজ অর্থাৎ আমার কোন মসীবতই মসীবত নহে।

মক্কাবাসীরা যখন হযরত যায়দ বিন দছিনা (রাযিঃ)কে হত্যা করিবার জন্য হেরেম শরীফের বাহিরে নিয়া চলিল তখন আবূ সুফিয়ান বিন হারব বলিল, যায়দ! কসম করিয়া বল, ইহা কি তোমার নিকট পছন্দনীয় যে, এই সময় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার স্থানে হইত আর তুমি তোমার ঘরে হইতে? যায়দ কসম করিয়া বলিলেন, আমার নিকট কখনও ইহা গ্রহণযোগ্য নহে যে, আমি স্বীয় ঘরে হইব আর এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পায়ে একটি কাঁটাও ফুটিবে। আবূ সুফিয়ান বলিতে লাগিল আমি কাহাকেও এমন মহব্বত করিতে দেখি নাই যতখানি মহব্বত মুহাম্মদের সাথীগণ তাঁহাকে করিয়া থাকে।

আবদুল্লাহ বিন যায়দ বিন আবদ রাব্বিহি (রাযিঃ) যাহাকে 'সাহেবুল আযান' বলা হইত তিনি স্বীয় বাগানে কর্মরত ছিলেন। এমন সময় তাহার এক সন্তান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সংবাদ পৌছাইলেন। তিনি সেই সময়ই দু'আর জন্য হাত উঠাইলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ তা'আলা! আমাকে অন্ধ করিয়া দিন যাহাতে এই চোখে এখন আর কাহাকেও দেখিতে না পারি।

বলাবাহুল্য হাদীছের ব্যাখ্যায় ঘটনাবলী বর্ণনা জরুরী নহে। তবে এই ঘটনা মানুষকে উৎকৃষ্ট মানবতা শিক্ষা দেয় এবং সুক্ষ্ম বিষয় অনুধাবনে সহায়তা করে এবং আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

মহব্বত এবং ঘৃণা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য

এই হাদীছ শরীফে কামেল ঈমানের দ্বিতীয় আলামত ইহা বলা হইয়াছে যে, যখন কাহাকেও মহব্বত করিবে তখন আল্লাহ তা'আলার জন্য করিবে। ইসলামের মধ্যে মহব্বত ও ঘৃণার নিরিখ (معيار) কোন সত্তা বা ব্যক্তিবর্গ নহে বরং আল্লাহ এবং রসূল হিসাবে। আল্লাহ তা'আলার এবং তাঁহার রসূলের মহব্বত ঐ স্তরের প্রাধান্য লাভ করিবে যে, ইহার পর সকল প্রকার শত্রুতা এবং ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ তা'আলাই হইবে। যদি কাহারও সহিত মহব্বত হয় তবে তাঁহারই নামের উপর এবং যদি শত্রুতা হয় তবে তাঁহারই নামের উপর। ইসলামী তাওহীদের পরিচয় ইহা যে, মানুষের অন্তঃকরণ কেবলমাত্র ঐ একক সত্তার নামের উপর বিভক্ত হয়।

সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা হযরত হামযা (রাযিঃ)-এর হত্যাকারী ইসলাম গ্রহণ করিবার কারণে মুসলমানগণের ভাই-এ পরিণত হইয়া গেলেন। আর একজন কাতেবী ওহী মুরতাদ হইয়া আকাশ ও ভূমন্ডলের ঘৃণার্হ হইল।

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের মহব্বতের মর্ম

ইসলামের মধ্যে মহব্বত এবং ঘৃণার নিরিখ তথা তুলাদণ্ড আল্লাহ তা'আলার সত্তা। আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের সহীহ নিরিখ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ। এই জন্যই কুরআন মজীদে এরশাদ হইয়াছেঃ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ ـ

অর্থাৎ "(হে নবী) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত কর তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর।" (সূরা আলে ইমরান-৩১)

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের দাবীদার হয় কিন্তু রসূলের সুন্নাতের যথাযথ মর্যাদা তাহার মধ্যে বর্তমান না থাকে ইয়া রসূলুল্লাহ! বলিয়া মহব্বতের নিঃশ্বাস পরিপূর্ণ করে কিন্তু আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহব্বত হইতে তাহার অন্তর শূন্য হয়, সে ধোকার মধ্যে রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত ও আড়ম্বর, তাঁহার সম্মান ও আদব প্রধানতম ফরয। আর এই সকল কিছু এই জন্য যে, তিনি ঐ মহান সত্তার মনোনিত রসূল যিনি সকল জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহীহ সম্মান ইহাই। তাহা ছাড়া নিজের খেয়াল খুশী মতে রসূলের মহব্বতের দাবীদার হওয়া সহীহ মহব্বত নহে। খ্রীষ্টানরাও হযরত ঈসা (আঃ)কে মহব্বত করিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার রসূল অনুভব করিয়া নহে বরং তাঁহার সন্তান ধারণা করিয়া। কাজেই উহাকে কি সহীহ মহব্বত বলা যাইবে? আর ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সহিত শত্রুতা পোষণ করিত তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলার শত্রু ধারণা করিয়া অথচ তিনি শত্রু নহেন বরং তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রসূল। তাই উহাকে কি সহীহ শত্রুতা বলা যাইবে? সহীহ বন্ধুত্ব এবং সহীহ শত্রুতাও কেবল ঐ একক সত্তার নামের উপরই হইবে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার মহব্বত এবং শত্রুতা ইসলামী বিধি-বিধানের বহির্ভূত।

কুফরের প্রতি ঘৃণা কামেল ঈমানের আলামত

আলোচ্য হাদীছে কামেল ঈমানের তৃতীয় আলামত ইহা বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাহাকে কুফর হইতে মুক্তি দিয়াছেন, তারপর সে কুফরের দিকে ফিরিয়া যাওয়াকে এমন অপছন্দ করে যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে। ইহা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে ইঙ্গিত হইয়াছেঃ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ـ

অর্থাৎ "ইহা আল্লাহ তা'আলার উপঢৌকন যে, তিনি তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন এবং উহাকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।" (সূরা হুজরাত-৭)

কুফরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া ইসলামী শিক্ষার একটি অংশ। যেখানে ঈমানের সহিত মহব্বত হইবে সে স্থানে কুফরের প্রতি ঘৃণাই অপরিহার্য। ইসলামের সহিত যাহার মহব্বত হইবে কুফরের প্রতি তাহার ঘৃণা হইবে। পক্ষান্তরে কুফরের প্রতি যাহার প্রবণতা হইবে ইসলামের প্রতি তাহার বিমুখিতা অত্যাবশ্যক। ইসলাম এবং কুফরের মহব্বত এক সাথে একত্রিত হওয়া অসম্ভব। আর ইহা কিরূপে হওয়া সম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলার জমীনে একটি ভ্রান্ত ও অনাচারের বিধানকে রক্ষণও ঐরূপে করা হইবে যেইরূপে সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতাকে অপরিহার্য আইন নির্ধারণ করা হইয়াছে? সুবিচার ও ন্যায় যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত অন্যায় অবিচার ও ভ্রান্ত সে স্থান হইতে বিতাড়িত হইতে বাধ্য। এই কারণেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে কোন প্রকার সন্ধি ও সংমিশ্রণ হইতে পারে না। কিন্তু ইহার মর্ম এই নহে যে, মুসলমানগণ সর্বদা কাফিরদের গ্রীবার উপর তলোয়ার রাখিয়া দিবে এবং সংঘাত লাগিয়া থাকিবে। বরং মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে সন্ধি চুক্তি হইতে পারিবে। মুসলিম দেশে

কাফিররা নিরাপদে বসবাসও করিতে পারিবে। কারণ ইসলাম ব্যক্তিবর্গের জন্য শান্তি বার্তা। সুতরাং মুসলমানের পক্ষ হইতে যে কোন মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা পাইবে। অমুসলিমের পক্ষ হইতে মুসলিম আক্রান্ত না হইলে শান্তিই থাকিবে। কাজেই ইসলাম ব্যক্তি সংঘাত বৈধ রাখে না বটে কিন্তু ন্যায়ের সহিত অন্যায়কে, শান্তির সহিত অশান্তিকে, সুবিচারের সহিত অবিচারকে সমর্থন করে না। এই কারণেই ইসলাম কুফরের সহিত কোন সম্পর্ক বৈধ রাখে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

৭৪ حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال نا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الايمان من كان يحب المرء لا يحبه الا لله من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان ان يلقى فى النار احب اليه من ان يرجع فى الكفر بعد ان انقذه الله منه ـ

হাদীছ—৭৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহঃ)। তাহারা উভয়ই....হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তিনটি গুণ যাহার মধ্যে বিদ্যমান সে ঈমানের প্রকৃত আস্বাদন পাইয়াছে। (১) যে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাহাকেও মহব্বত করে। (২) যাহার নিকট আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূল অন্য সকল বস্তু হইতে অধিক প্রিয়; এবং (৩) আল্লাহ তা'আলা যাহাকে কুফর হইতে মুক্তি দিয়াছেন; তাহার পর সে পুনরায় কুফরের দিকে ফিরিয়া যাওয়া হইতে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিক পছন্দ করে।[১]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(হাদীছ নং ৭৩–এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

৭৫ حدثنا اسحق بن منصور قال انا النضر بن شميل قال انا حماد عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير انه قال من ان يرجع يهوديا او نصرانيا ـ

হাদীছ—৭৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইসহাক বিন মনছুর (রহঃ)। তিনি....হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন....পরবর্তী অংশ উপরোল্লেখিত হাদীছের বর্ণনাকারীদের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে পার্থক্য এই যে, (এই হাদীছে রহিয়াছে) তিনি বলিয়াছেনঃ ইয়াহুদী অথবা নাসারা ধর্মের দিকে ফিরিয়া যাওয়া হইতে....(অর্থাৎ من ان يرجع فى الكفر ـ "কুফরের দিকে ফিরিয়া যাওয়া হইতে" এর স্থলে উল্লেখিত বাক্য রিওয়ায়াত করিয়াছেন)।

টীকা–১· উহার দ্বারা ঐ সকল লোক মর্ম যাহারা প্রথমে কাফির অথবা মুশরিক ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন এই প্রকার ব্যক্তির ইসলাম ঐ সময় তাহাকে আস্বাদন দিবে যখন সে কুফরী ধর্মের উপর এমন অসন্তুষ্ট হইবে যে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে গ্রহণ করিবে কিন্তু কুফরী ধর্ম গ্রহণ করিবে না।

باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهله اكثر من الاهل والولد والوالد والناس اجمعين واطلاق عدم الايمان على من لم يحبه هذه المحبة -

অনুচ্ছেদঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, মাতা-পিতা বরং সকল হইতে অধিক মহব্বত করা ওয়াজিব। আর যাহার এইরূপ মহব্বত লাভ না হইবে তাহাকে মুমিন বলা যায় না।

৭৬ حدثني زهير بن حرب قال نا اسماعيل بن علية ح وحدثنا شيبان بن ابي شيبة قال نا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين -

হাদীছ-৭৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ)⋯(সূত্র পরিবর্তন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন শায়বান বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তাহারা উভয়ই⋯হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কোন বান্দা এবং রাবী আবদুল ওয়ারিছের বর্ণিত রিওয়ায়াত (عبد এর স্থলে الرجل অর্থাৎ) কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত (কামিল) মুমিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাহার কাছে তাহার পরিবার পরিজন, ধনসম্পদ ও অন্যান্য সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছে মহব্বত দ্বারা স্বভাবগত طبعى মহব্বত মর্ম যাহা ক্ষমতার বহির্ভূত উহা মর্ম নহে বরং এখানে ইচ্ছাধীন মহব্বতকে বুঝানো উদ্দেশ্য যাহাকে عقلى বলে। হাদীছের মর্মার্থ হইবে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ এবং তাঁহার এরশাদসমূহের পালন সকল বস্তুর উপর প্রাধান্য দেওয়া। পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তানাদি, বন্ধু ও পরিচিত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যদি অসন্তুষ্টও হয় তাহা হইলেও আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলের নাফরমানী তথা অবাধ্য কখনও হইবে না। ইহাই সত্যিকারের মহব্বত যাহার উপর ঈমান নির্ভরশীল।

ইবন বাত্তাল (রহঃ) ও কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ মহব্বত তিন প্রকারে সৃষ্টি হয়, এক প্রকার মহব্বত বুজুর্গীর কারণে হয় যেমন পুত্রের মহব্বত পিতার সহিত, ছাত্রের মহব্বত শিক্ষকের সহিত। দ্বিতীয় প্রকার মহব্বত দয়ার্দ্রতা ও স্নেহ পরায়নতার যেমন পিতা মাতার সহিত সন্তান সন্ততির হইয়া থাকে। তৃতীয় প্রকারঃ মহব্বত এক আকৃতি ও এক মতাবলম্বী হইবার কারণে সৃষ্টি হয় যেমন বন্ধু-বান্ধব ও সমসাময়িক ব্যক্তিদের সহিত হয়। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে উল্লেখিত সকল প্রকার মহব্বত একত্রিত হইয়াছে।

ইবন বাত্তাল (রহঃ) বলেন, হাদীছের মর্মার্থ এই হইবে যে, যাহার ঈমান কামিল হয় সে উক্ত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করিবে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক তাহার উপর পিতা এবং পুত্রের হক হইতে অধিক। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যস্থতায় আমরা জাহান্নাম হইতে নাজাত পাইয়াছি এবং পথভ্রষ্টতা হইতে বাহির হইয়া হিদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছি।

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতের মধ্য হইতে ইহাও যে, তাঁহার সুন্নাতের সাহায্য করা এবং তাঁহার আনীত শরীআতের উপর প্রশ্নকারীর উত্তর দেওয়া এবং তাঁহার সহিত

মিলিত হইবার আকাংক্ষা করা যদিও জান এবং মাল ব্যয় হইয়া যায়। কাজেই এই বিষয়টি জানিবার পর ইহা প্রমাণিত হয় যে, এইরূপ মহব্বত ব্যতিরেকে ঈমানের মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে না। আর ঈমান সহীহ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান ও মর্যাদা পিতা-মাতা, বুযুর্গ ও অনুগ্রহকারী প্রমুখ হইতে অধিক হয়। এইরূপ বিশ্বাস যাহার মধ্যে বিদ্যমান নাই সে মুমিন নহে। (নববী)

٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهٖ وَوَالِدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ -

হাদীছ-৭৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহঃ)। তাহারা উভয়ই---হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেনঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমাদের কেহই ততক্ষণ পর্যন্ত (কামিল) মুমিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাহার নিকট তাহার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং অন্যান্য সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

এই অনুচ্ছেদের হাদীছদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসলামী যিন্দীগী গ্রহণ করিবার পর যদি এই অবস্থা সম্মুখে আগত হয় যে, পিতা পুত্র হইতে এবং পুত্র পিতা হইতে, ভাই স্বীয় ভাই হইতে এবং স্বামী স্বীয় স্ত্রী হইতে পৃথক হইয়া যায়, পরিবার পরিজন, গোত্র অসন্তুষ্ট হয়, স্বীয় সঞ্চয়কৃত সম্পদ হাত ছাড়া হয়, চলিত লাভজনক ব্যবসায় লোকসান হইয়া পড়ে, নিজ উত্তম বাসস্থান ত্যাগ করিতে হয়, তবে এইরূপ অবস্থায় কাহার সহিত থাকিবে? যদি বলা হয় পার্থিব বস্তু ও প্রিয়জনের সহিত, তাহা হইলে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, উৎসর্গের যে অঙ্গীকার তোমরা মহান রব্বুল আলামীনের সহিত করিয়াছিলে উহা ত্রুটিপূর্ণ ও অশুদ্ধ ছিল।

নিঃসন্দেহে প্রিয়জনের বড় হুকূক তথা দাবীসমূহ রহিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার প্রেরিত রসূলের হক সকল হইতে উর্ধে। আর এই জন্যই যখন কাহারও হক আদায়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের হক নষ্ট হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের হককে প্রাধান্য দিতে হইবে। কামিল ঈমানের নিরিখ (معیار) ইহাই যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের মহব্বত সকল মহব্বতের উপর জয়ী হইবে। আর মহব্বত জয়ী হওয়ার মর্ম এই যে, যদি এইরূপ অবস্থা আসে যে, ইসলামের কারণে পিতা স্বীয় পুত্রকে ত্যাগ করা প্রয়োজন হয় অথবা সন্তানাদি স্বীয় পিতা-মাতাকে ত্যাগ করা আবশ্যক হয় তবে ঈমান ইহাই যে, ত্যাগ করিতে হইবে। অতএব এই প্রকারের মহব্বতকে চাই জ্ঞান বুদ্ধির মহব্বত حب عقلی অথবা শরয়ী মহব্বত حب شرعی দ্বারা ব্যাখ্যা করিবে।

বর্তমানে আমরা যে পরিবেশে অবস্থান করিতেছি ইহা ইসলামী পরিবেশ। এখানে সন্তানও মুসলমান এবং পিতাও মুসলমান। তাই ঐ দিকে আমাদের বুদ্ধিমত্তা যায় না যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের মহব্বতের সহিত পিতামাতা অথবা সন্তানাদির মহব্বতের কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে বরং এখানে তো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের মহব্বত উহার দিকে আহবান করে যে, পিতামাতার মহব্বত আরও অধিক হউক। কিন্তু যখন এই পরিবেশ ছিল না এবং ইসলাম দুনিয়াবাসীকে কুফরীর অন্ধকার হইতে মুক্ত করিয়া নূরে হিদায়েতের দিকে দাওয়াত দিতেছিল তখন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের মহব্বত এবং পিতা ও সন্তান-সন্ততির শত্রুতা সমার্থক হইয়াছিল। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করিত সে ব্যক্তিকে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ত্যাগ করিতে হইত। আর যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিত তাহাকে আল্লাহ

তা'আলা ও তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করিতে হইত। তবে মধ্যবর্তী একটি স্থান এইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের মহব্বতের সহিত দুশমনের মহব্বতকেও সঙ্গে রাখা। কিন্তু এই হাদীছ শরীফে উক্ত দুর্বলতাকেও দূরীভূত করিয়াছে এবং তা'লীম দিয়াছে যে, প্রকৃত ইসলাম ইহাই যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ও তাঁহার রসূলের মহব্বতের উপর সবকিছু উৎসর্গ কর।

ইসলাম এবং কুফরের উক্ত দ্বন্দ্ব এবং আকর্ষণ–বিকর্ষণ বর্তমানে আর অবশিষ্ট নাই বটে কিন্তু ইসলামী আহকামের উপর যথাযথ আমল করিবার মধ্যে আজও এই প্রাচীরসমূহ বাধা সৃষ্টিকারী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোন কোন স্থানে নিজ কৃত্রিম অশুদ্ধ রীতিনীতি এবং আধুনিকতায় আবদ্ধ আর কোন কোন স্থানে মহব্বতের শিকলে আবদ্ধ। উৎসর্গ ব্যতীত যদি আমরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের আশায় বসিয়া থাকি তবে বসিয়া থাকা যাইবে কিন্তু ইসলামের দাবীর সহিত অপর কোন দাবীর সংমিশ্রন সম্ভব নহে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

باب الدليل على ان من خصال الايمان ان يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير

অনুচ্ছেদঃ নিজের জন্য যাহা পছন্দনীয় অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্যও তাহা পছন্দ করা ঈমানের বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য হইবার প্রমাণ।

৭৮ **حدثنا** مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

হাদীছ–৭৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না এবং ইবন বাশশার (রহঃ)।[১] তিনি·····হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেহ (কামিল) মুমিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ না সে তাহার (মুসলিম) ভাইয়ের জন্য অথবা[২] তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ তাহার প্রতিবেশীর জন্য উহা পছন্দ করিবে যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

টীকা–১· ابن بشار। ইবন বাশ্‌শার হইলেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার বিন ওছমান বিন দাউদ বিন কীসান আবদী বসরী। মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শারের উপনাম আবূ বকর এবং উপাধি ছিল 'বুনদার'। 'বুনদার' শব্দটি হাফিয–এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিনি ভাল হাফিয ছিলেন বলিয়া এই উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি নিজ শহরের সকল শায়খ হইতে হাদীছসমূহ সংগ্রহ করিয়া একত্রিত করিয়াছিলেন। আহমদ (রহঃ) বলেন, আমি তাহার নিকট হইতে প্রায় পাঁচ হাজার হাদীছ শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

টীকা–২· لاخيه اولجاره (স্বীয় ভাইয়ের জন্য অথবা স্বীয় প্রতিবেশীর জন্য) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম لاخيه বলিয়াছেন না কি لجاره বলিয়াছেন এতদুভয়ের মধ্যে বর্ণনাকারীর সন্দেহ হইয়াছে। তবে উভয়ের একটি বলিয়াছেন ইহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই। সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রাবীর সন্দেহসহ বর্ণনা করা হইয়াছে। অনুরূপ মুসনাদে আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ) ও রাবীর শকসহ বর্ণনা করিয়াছেন। আর সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে রাবীর সন্দেহ ছাড়া لاخيه (স্বীয় ভাইয়ের জন্য) বর্ণিত হইয়াছে। আর لاخيه দ্বারা মর্ম হইল اخوالمسلم।(নিজ মুসলিম ভাই)।

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

হযরাতে ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীছে 'মুমিন হইতে পারিবে না' দ্বারা মর্ম 'কামিল মুমিন হইতে পারিবে না।' কেননা মূল ঈমান এই গুণ ব্যতীতও লাভ হইতে পারে। হাদীছ শরীফের মর্মার্থ এই হইবে যে, স্বীয় মুসলিম ভাইয়ের জন্যও ইবাদত নেক কর্ম এবং পার্থিব যাবতীয় ঐ বস্তুসমূহ যাহা নিজের জন্য পছন্দনীয় উহা তাহার জন্য পছন্দ করা। সুনানে নাসায়ী শরীফে এই রিওয়ায়াত এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, حتى يحب لاخيه من الخير ما يحب لنفسه (যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বীয় ভাইয়ের জন্য ভালকে পছন্দ করিবে যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।)

শায়খ আবূ আমর বিন সালাহ (রহঃ) বলেনঃ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই গুণ অর্জন করা খুবই কঠিন ও অসম্ভব। কিন্তু তাহাদের এই অভিমত সঠিক নহে। কেননা হাদীছের মর্ম এই যে, তোমাদের মধ্যে কাহারও ঈমান পূর্ণাঙ্গ হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজ মুসলমান ভাইয়ের জন্য উহা পছন্দ করিবে যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। অর্থাৎ অপরের জন্যও নেয়ামতসমূহ লাভ হওয়াকে ভাল মনে করে যদি নিজের কোন ক্ষতি না হয়। আর ইহা খুবই সহজ, সুস্থ অন্তর (قلب سليم) এর উপর অর্থাৎ যাহার অন্তর পরিস্কার হয়। তবে যাহার অন্তরে ঈর্ষা ও হিংসা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে তাহার উপর অবশ্য খুবই কঠিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে এবং আমাদের সকল ভাইদিগকে এইরূপ খারাপ অন্তর হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। (শরহেনববী)

বলাবাহুল্য এই সংক্ষিপ্ত হাদীছখানা মানবিক পূর্ণাঙ্গতার সোপান। যাহার এই গুণ অর্জিত হইবে যে, স্বীয় ভাইয়ের জন্য উহা পছন্দ করে যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে এবং উহা অপরের জন্য মন্দ অনুভব করে যাহা সে নিজের জন্য মন্দ বুঝে, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার নফস সভ্যতা ও ভদ্রতায় পুরোপুরি উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং তাহার নফস হইতে নিজস্ব অভিসন্ধির অপগুণটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। যাহাকে দূরীভূত করিবার

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

আল্লামা কুসতালানী (রহঃ) বলেন, ইহাও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, لاخيه এর মধ্যে ذمى (ইসলামী রাষ্ট্রের বিধর্মী নাগরিক) ও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই হিসাবে যে, সে তাহাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে পছন্দ করিবে। আল্লামা ওছমানী (রহঃ) বলেন, আল্লামা কুসতালানী (রহঃ)-এর অভিমত মুসনাদে আহমদ-এর একটি রিওয়ায়াত দ্বারাও তায়ীদ হয়। যেমন-

روى عن معاذ بن جبل انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الايمان قال ان تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك فى ذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال وان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك - رواه احمد

অর্থাৎ "হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি (একদা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন্ ঈমান উত্তম? (অর্থাৎ ঈমানের কোন গুণটি উত্তম?) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ "কাহাকেও মহব্বত করিলে আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তেই মহব্বত করিবে। কাহারও সহিত শত্রুতা রাখিলে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তেই শত্রুতা রাখিবে এবং স্বীয় যবানকে আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মশ্‌গুল রাখিবে।" হযরত মু'আয (রাযিঃ) পুনরায় আরয করিলেন; অতঃপর কি, ইয়া রসূলাল্লাহ! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ "আর অপর মানুষের জন্য উহা পছন্দ করিবে যাহা নিজের জন্য পছন্দ কর। এইভাবে অপরের জন্য তাহা অপছন্দ করিবে যাহা নিজের জন্য অপছন্দ কর।" (অর্থাৎ সকলের কল্যাণই কামনা করিবে।)

হযরত মু'আয (রাযিঃ) বর্ণিত এই হাদীছের ব্যাখ্যা আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন, এই স্থানে للناس - (মানুষের জন্য) শব্দ দ্বারা ব্যাপক অর্থ অর্থাৎ সকল মানুষ অথবা বিশেষ অর্থ অর্থাৎ কেবল সকল মুমিনগণ এই উভয় অর্থই গ্রহণের সম্ভাবনা রহিয়াছে। (ফতহুল মুলহিম)

জন্যই সকল প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনা ও মুজাহিদা করা হয়। কাজেই এই হাদীছখানা সংক্ষিপ্তাকারের হইলেও শরীআতের আদেশ ও নিষেধসমূহ তা'মীলের জন্য উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই মহান গুণটি নিজের নফস এবং সাধারণ মুসলমানকে এক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা ঐ সময় সৃষ্টি হইতে পারে যখন অন্তর ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ এবং সকল প্রকার অপবিত্র হইতে পবিত্র হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ফায়দাঃ যখন কোন মুসলিম ভাইয়ের মঙ্গল হইতে দেখিবে এবং উহাতে নিজের কোন ক্ষতি না হয় তবে উহার উপর আনন্দ হওয়া চাই। আর সর্বদা জনসাধারণের মঙ্গল কামনায় এবং সহানুভূতিশীলতায় অংশীদার থাকা উচিত।

৭৯ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -

হাদীছ—৭৯. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ)। তিনি[১]--হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ সেই মহান সত্তার কসম যাহার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (কামিল) মুমিন হইতে পারিবে না, যতক্ষণ না সে স্বীয় প্রতিবেশীর জন্য অথবা তিনি এরশাদ করিয়াছেনঃ স্বীয় ভাইয়ের জন্য এমন বিষয় পছন্দ করিবে যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(হাদীছ নং ৭৮ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

টীকা-১. يَحْيَى بْنُ سَعِيد ইয়াহইয়া বিন সাঈদ হইলেন- ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কাত্তান। তাঁহার ইবাদতের অবস্থা সম্পর্কে লিখিত আছে যে, তিনি একদিন ও এক রাত্রে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ খতম করিতেন। আর তিনি বিশ বৎসরকাল পরম্পরা এই আমল করিয়াছেন। ইলমী শান তাহার এইরূপ ছিল যে, তিনি আসর নামাযের পর মসজিদের মিনারার নিম্নে ঠেক লাগাইয়া দাঁড়াইতেন এবং মাগরিব পর্যন্ত হাদীছ বর্ণনা করিতে থাকিতেন। আলী বিন মাদানী, শায়খ কুফী, আমর বিন আলী, আহমদ বিন হাম্বল এবং ইয়াহইয়া বিন মুঈন প্রমুখ তাহার সম্মুখে আদবের সহিত দাঁড়াইয়া হাদীছ শ্রবণ করিতেন। (ফতহুল মুলহিম সংক্ষিপ্ত)

باب تحريم ايذاء الجار
অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হারাম

৮০ حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرنى العلاء عن ابيه عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يامن جاره بوائقه -

হাদীছ—৮০. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতায়বা বিন সাঈদ এবং আলী বিন হুজর (রহঃ)। তাহারা....হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যাহার অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদ নহে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।[১]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ চলিতে পারে না। কাজেই সে সমাজে তাহার বন্ধু—বান্ধব, মহল্লা ও পাড়ার লোকদের সহিত সমাজবদ্ধ হইয়া মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করে। ইসলামী পরিভাষায় তাহারা সকলই একে অপরের প্রতিবেশী। ইসলাম শান্তি প্রবর্তক। আর সুশৃংখল পরিবেশ ও প্রতিবেশী ব্যতীত সমাজে শান্তি আসিতে পারে না। সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের উৎখাত অত্যাবশ্যক। কাজেই উত্তম সামষ্টিক জীবনও প্রতিবেশীদের কষ্ট ও পীড়ণ হইতে বাঁচানো, যে সকল যুলুম মানুষকে গ্রাস করে তাহা হইতে রক্ষা করা। সমাজের আর্ত—পীড়িত দুঃস্থগণ যখন ক্ষুধা, চিকিৎসা ও বস্ত্রহীনতার কঠোর ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়, ভীত সন্ত্রস্ত হয় তখন তাহার প্রতি দয়ার্দ্রতা, সহানুভূতিশীলতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা। সেই সাথে উত্তম চরিত্র মহানুভবতা, শুভ সুন্দর কর্মশীলতা কাম্য। এই পরিবেশের কারণে আল্লাহ তা'আলা শুফআর হক আদায় করা জরুরী করিয়া দিয়াছেন। আর তাহা হইল কাহারও প্রতিবেশীর ঘর বা জমি বিক্রয় হইলে তাহা ক্রয় করিবার অধিকার প্রতিবেশীরই সর্বাধিক।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিবার পর আল্লাহ তা'আলা মদীনা নগরে প্রতিবেশ গড়িয়া সমাজবদ্ধ জীবন বানাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে সে স্থানে যাহারা বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করিত তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ

টীকা-১. بَوَائِقَهُ - আহমদ (রহঃ) এবং ইসমাইল (রহঃ) এখানে কিছু অতিরিক্ত শব্দসহ রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, قالوا وما بوائقه قال شره - (লোকেরা আরয করিলেন بوائق দ্বারা কি মর্ম? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেন, তাহার মন্দ হইতে") মনযিরী (রহঃ) বলেন, এই অতিরিক্ত বুখারী (রহঃ)-এর। بوائق শব্দটি بائقه এর বহুবচন ইহার অর্থ ধ্বংসকারী বস্তু এবং কঠোর বিষয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا (অথবা) প্রবল বায়ু বহাইয়া) ঐ গুলিকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন তাহাদের কৃতকর্মের দরুন (সূরা শোরা-৩৪)। হযরত আবূ উবায়দা এই আয়াতের يوبقهن শব্দের তফসীর يهلكهن শব্দ দ্বারা করিয়াছেন। আর হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)ও আল্লাহ তা'আলার এরশাদ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا - (আর আমি তাহাদের মধ্যে এক অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া দিব। সূরা কাহফ-৫২) আয়াতের موبقا শব্দের তফসীর مهلكا শব্দ দ্বারা করিয়াছেন। (ফতহুল মুলহিম)

لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيْلًا ـ

অর্থাৎ "মুনাফিকরা এবং যাহাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয় তবে অবশ্যই আমি আপনাকে তাহাদের উপর চড়াও করিয়া দিব (অর্থাৎ তাহাদেরকে মদীনা হইতে বহিস্কারের নির্দেশ দিয়া দিব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকিবে।" (সূরাআহযাব-৬০)

প্রতিবেশী কাহারা? এই সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেনঃ

اربعين دارا امامه واربعين خلفه واربعين عن يمينه واربعين عن يساره ـ

অর্থাৎ "সম্মুখে ও পশ্চাতে ডানে ও বামে চতুর্দিকে চল্লিশ বাড়ী পর্যন্ত সকলই প্রতিবেশী।"

কা'ব বিন মালিক স্বীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তি আগমন করিয়া আরয করিলেন, আমি অমুক গোত্রের মহল্লায় অবস্থান নিয়াছি। সে স্থানে আমার জন্য কঠোর ও ভীত সন্ত্রস্তের কারণ হইতেছে আমার প্রতিবেশীর মধ্যে অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর, ওমর ও আলী (রাযিঃ)কে পাঠাইলেন, ''তাহারা যেন সেই মহল্লার মসজিদের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া ঘোষণা করেন যে, তোমরা জানিয়া রাখ, চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশ বিস্তীর্ণ। আর لايدخل الجنة من خاف جاره بوائقه "যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতায় তাহার প্রতিবেশী ভীত সন্ত্রস্ত সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

আলোচ্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ "যাহার অনিষ্ট ও অত্যাচার হইতে প্রতিবেশী নিরাপদ নহে (এবং সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে যে, না জানি কখন সে আমাকে কষ্টে নিপতিত করে,) এইরূপ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

সহীহ বুখারী শরীফে এই বিষয়বস্তুর উপর হযরত আবূ শুরায়হ খযায়ী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال والله لايؤمن والله لايؤمن والله لايؤمن قيل من يارسول الله قال الذى لايامن جاره بوائقه ـ

অর্থাৎ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! সে ব্যক্তি মুমিন হইতে পারে না, আল্লাহ তা'আলার কসম! সে ব্যক্তি মুমিন হইতে পারে না, আল্লাহ তা'আলার কসম! সে ব্যক্তি মুমিন হইতে পারে না, কোন এক ব্যক্তি আরয করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে ব্যক্তি কে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ সে ঐ ব্যক্তি যাহার অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদ নহে।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই গুরুত্ব সহকারে এই কথা বলিয়াছেন। কোন কথাকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রকাশের জন্য ইহা হইতে উত্তম পদ্ধতি আর কি হইতে পারে?

এই সকল হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ। আর আহলে হকদের মাযহাব হইতেছে যে, যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করিয়াছে কিন্তু তাহার কবীরা গুনাহ রহিয়াছে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে গুনাহ ক্ষমা করিয়া জান্নাতে প্রবেশের হুকুম দিবেন, আর তিনি ইচ্ছা করিলে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি প্রদান করিয়া জান্নাতে প্রবেশেরঅনুমতিদিবেন।

এই কারণেই শারেহ (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত لايدخل الجنة (জান্নাতে প্রবেশ করিবে না) বাক্যের মর্ম দুইভাবে হইতে পারে। এক মর্ম এই যে, কোন ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া জায়েয

তথা বৈধ বলিয়া আকীদা পোষণ করে অথচ সে জানে যে ইহা হারাম। জানিয়া শুনিয়া শরীআতের হারাম বস্তুকে হালাল বলিয়া আকীদা পোষণকারী কাফির। কাজেই সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। আর দ্বিতীয় মর্ম হইতেছে যে, যদি সে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হারাম বলিয়া আকীদা রাখে বটে। কিন্তু আমল উহার বিপরীত করে অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় তবে সে প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণ দলে দলে জান্নাতে প্রবেশ করিতে থাকিবেন তখন প্রতিবেশীর সহিত মন্দ আচরণকারীর স্বীয় গুনাহ জান্নাতের দরজায় বাঁধা হইয়া দাঁড়াইবে। আর যতক্ষণ না সে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করিবে অথবা আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিবেন ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। কাজেই সে সন্দেহহীন জান্নাতে প্রবেশ করা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। অবশ্য ঈমানের বদৌলতে একবার না একবার জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

ইহাতো আখেরাতের মুআমেলা। কিন্তু পার্থিব জগতের বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কোন না কোন প্রতিবেশী রহিয়াছে। আর যদি তাহারা উত্তম আচরনের এই হিদায়েতের উপর আমল না করে তবে কিভাবে সমাজের সকল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর মহব্বত এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক মজবুত হইতে পারে। উদাহরণতঃ শহরে অসংখ্য বিজলী বাতি তার দৃষ্টিতে পড়ে যাহা হাজারো শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও একটি কেন্দ্রবিন্দুই উহার মূল। আর সেই মূল কেন্দ্রবিন্দু হইতেই বিদ্যুৎ বন্টন হয়। ঠিক অনুরূপ সমাজের সকল গোত্র, পরিবার ও ব্যক্তি বিবিধ বর্ণযুক্ত শাখা প্রশাখা হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে যদি সকলের কেন্দ্রীয় সম্পর্ক ঐ মহব্বত ও বন্ধুত্বের অনুভূতির সহিত কায়িম হইয়া যায় যাহা মানুষকে এক অপরের সহানুভূতি, মঙ্গল কামনা এবং দুঃখ কষ্টে অংশীদারীর উপঢৌকন প্রদান করে। তাহা হইলে সামাজিক জীবন হইবে অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃংখল। আর উহার বিপরীত হইলে সামাজিক জীবনে একটি বিষাক্তকর পরিস্থিতি বিরাজ করিবে। (নববী ও অন্যান্য)

باب الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت الا عن الخير وكون ذلك كله من الايمان

অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশী ও মেহমানকে সম্মান প্রদর্শনের উৎসাহ এবং উত্তম কথা ব্যতীত নীরবতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক। আর এই সকল বিষয় ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হইবার বর্ণনা

৮১ **حدثنی** حرملة بن يحيى قال انا ابن وهب قال اخبرنى يونس عن ابن شهاب عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ـ

হাদীছ–৮১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহঃ)। তিনি....হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে (সে যদি কিছু বলিতে চায় তবে) তাহার ভাল কথা বলা বাঞ্ছনীয় অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং কিয়ামতের দিবসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহার উচিত স্বীয় প্রতিবেশীকে সম্মান করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহার উচিত স্বীয় মেহমানের কদর করা।[১]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ঈমান গ্রহণের পর ভাল কর্মের ইচ্ছা ও বাসনা ঈমানী জিন্দিগীর আলামত হইয়া থাকে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছের মধ্যে একজন খাঁটি মুমিনের তিনটি আমল শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমঃ যখন কথা বলিবে তখন মুখ হইতে ভাল কথা নিসৃত করিবে। অনর্থক, হাস্যস্পদ ও অনুপযোগী

টীকা–১. فليكرم ضيفه সে যেন স্বীয় মেহমানের কদর করে। সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছেঃ جائزته يوم وليلة والضيافة ثلثة ايام فما بعد ذلك فهو صدقة ـ ولا يحل له ان يثوى عنده حتى يحرجه ـ

অর্থাৎ "মেহমানের উপহার একদিন একরাত্র এবং মেহমানদারী তিন দিনের জন্য হয়। অতঃপর উহার অধিক আল্লাহ তা'আলার নামে দান। আর মেহমানের জন্য জায়েয নহে যে স্বীয় মীযবানের নিকট এতদিন অতিবাহিত করা যাহা তাহাকে বিপদগ্রস্তেফেলিবে।"

আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন যে, মেহমানের কদর করিবার যেই হুকুম দেওয়া হইয়াছে উহা অবস্থাসমূহ এবং স্থানসমূহ হিসাবে বিভিন্ন হইবে। ফরযে আইনও হইতে পারে, ফরযে কিফায়াও হইতে পারে। যাহাই হউক মেহমানদারী করা উত্তম চরিত্র ও ভদ্রতার চিহ্ন এবং পয়গাম্বরগণের সুন্নাত।

আল্লামা লায়ছ (রহঃ) বলেন যে, একরাত্র মেহমানদারী করা ওয়াজিব, আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহঃ)–এর মতে মেহমানদারী ওয়াজিব নহে। তিনি ইমাম বুখারী (রহঃ)–এর বর্ণিত রিওয়ায়াতের শব্দ جائزة দ্বারা দলীল পেশ করেন। তিনি আরো বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহমানদারীকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম দিন খুব কদর ও সম্মান করিবে এবং উপঢৌকন ইত্যাদি প্রদান করিবে। দ্বিতীয় দিন কষ্ট হইলেও কদর করিবে। আর তৃতীয় দিন নিজের ঘরে সাধারণতঃ যাহা তৈরী করা হয় সেই সকল খাদ্যদ্রব্যই আহার করাইবে। (ফতহুল মুলহিম)

কথা মুখ হইতে বাহির করা মুমিনের শানের বিপরীত। একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এই কথাটি ঈমানের সহিত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। আর হাদীছ শরীফের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এইরূপ বর্ণনা পদ্ধতি যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করে।" ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঈমানের সহিত এই উপদেশ পরস্পর সম্পর্কশীল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থাৎ "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাহাই সংরক্ষণ করিবার জন্যে তাহার কাঁধে সদা প্রস্তুত প্রহরী রহিয়াছে।" (সূরা কাফ-১৮)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, সম্মানিত দুইজন ফিরিশতা মানুষের প্রতিটি কথা রেকর্ড করেন তাহাতে কোন ছাওয়াব অথবা গুনাহ থাকুক বা না থাকুক।

হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, কেবল সেই সকল বাক্য লিখিত হয় যাহার পরিণাম ভোগ করিতে হইবে ছাওয়াব অথবা আযাব। উভয় রিওয়ায়াতের সমন্বয় হইতেছে যে, প্রথমে প্রত্যেক কথা লিপিবদ্ধ করা হয়, চাই উহাতে ছাওয়াব অথবা গুনাহ থাকুক আর না থাকুক। অতঃপর সপ্তাহে বৃহস্পতিবার সম্মানিত ফিরিশতাদ্বয় লিখিত বিষয়গুলির পুনঃবিবেচনা করিয়া যেই সকল কথা ছাওয়াব বা শাস্তিযোগ্য এবং ভাল অথবা মন্দ সেইগুলি রাখিয়া অন্যান্য কথাগুলি মুছিয়া দেন। অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছেঃ

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা যাহা ইচ্ছা রহিত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা বহাল রাখেন; এবং মূল কিতাব তাঁহারই নিকট রহিয়াছে।" (সূরারাআদ-৩৯)

ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত বিলাল বিন হারেস মুযনী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মানুষ কোন কোন সময় এমন কথা বলে যে, উহাতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, কিন্তু সে সাধারণ মনে করিয়াই কথাটি বলে এবং অনুভব করিতে পারে না যে, ইহার ছাওয়াব এতই সুদূরপ্রসারী যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সন্তুষ্টি লিখিয়া দেন। অনুরূপভাবে মানুষ আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কোন বাক্য সাধারণ মনে করিয়া উচ্চারণ করে, কিন্তু সে ধারণাও করিতে পারে না যে, ইহার গুনাহ ও শাস্তি কতদূর পরিব্যাপ্ত হইবে। এই বাক্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী অসন্তুষ্টি লিখিয়া দেন। (ইবন কাছীর)

এক হাদীছে আছেঃ

হযরত মু'আয (রাযিঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যেই সকল কথা আমরা বলিয়া থাকি সেই সকল কথার জন্য কি আমরা পাকড়াও হইব? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেন না, নিশ্চয়ই অধিকাংশ লোক এখানে ওখানে যবান বাজির কারণেই মাথাকে নিচের দিকে করিয়া উল্টোভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্তহইবে।

জামে' তিরমিযী শরীফে এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আদম সন্তানদের মুখ হইতে যেই সকল কথা নিসৃত হয় উহাতে তাহাদের ক্ষতি আর ক্ষতিই হয় কোন কল্যাণ হয় না, মাত্র নিম্নের কয়েকটি অবস্থা ছাড়া (১) সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া (২) মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান এবং (৩) আল্লাহ তা'আলার যিকির করা।

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে হাযির হইয়া আরয করিলেন; ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি স্বীয় গোত্রের সরদার। আমি যাহা বলি তাহা তাহারা শোনে। আমি তাহাদিগকে কি বলিব? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিবর্গকে সালাম দিবে এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বর্জন করিবে। (ইবন আবী দুনিয়া)

বলাবাহুল্য যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে যে, আমার মুখ হইতে নিসৃত এক একটি শব্দ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত রক্ষক রেকর্ড করিতেছেন এবং এই রেকর্ড বিচার দিবসে পুংখানুপুংখ পরিমাপ পেশ করা হইবে তাহা হইলে সে ইহা বুঝিয়া কিরূপে বিবেচনাহীন কথা মুখ হইতে নিসৃত করিতে পারে? জিহ্বার প্রতিটি গতির উপর সে খেয়াল রাখিবে যে, আমার রেকর্ডের মধ্যে যাহাতে ভুল কথা না আসে। আমার রেকর্ড যেন খারাপ না হইয়া যায়।

এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি স্বীয় আমল এবং কথাবার্তার যাচাই করিতে থাকিবে সে নিজে নিজেই প্রয়োজন পরিমাণ কথা বলিবার অভ্যস্ত হইয়া যাইবে।

শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, যখন কেহ কথা বলিবার ইচ্ছা করিবে তখন চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, সে যেই কথা বলিতে চাহিতেছে উহা ভাল এবং ছাওয়াবের কথা তাহা হইলে ওয়াজিব হউক বা মুস্তাহাব হউক বলিবে। আর যদি জানা থাকে যে, উক্ত কথায় কোন ছাওয়াব নাই তবে নীরব থাকিবে। চাই উক্ত কথা হারাম হউক বা মাকরূহ হউক বা মুবাহ। আর যে সকল কথার মধ্যে কোন ছাওয়াবও নাই শাস্তিও নাই তবে প্রত্যেক অবস্থায় চুপ থাকা ভাল, আর মুবাহ কথাও না বলা উত্তম। কেননা মুবাহ কথাসমূহও অনেক ক্ষেত্রে হারাম এবং মাকরূহের দিকে নিয়া যায়। আর এইরূপ অনেক ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। এই কারণেই শরীআত ঐ বিষয়টি সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, মুবাহ কথা বেশী বলা ভাল নহে। কেননা মানুষ অধিক কথা বলিবার দ্বারা যদিও মুবাহ হউক হারাম এবং মাকরূহ কথায় জড়িত হইয়া যায়।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) আলোচ্য হাদীছের মর্ম বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, মানুষ কথা বলিবার পূর্বে চিন্তা করা উচিত। অতঃপর যদি তাহার নিকট এই বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, উক্ত কথায় কোন ক্ষতি নাই তবে উহা বলিবে। আর যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, উহাতে ক্ষতি হইবার অথবা ক্ষতি হইবার এবং ক্ষতি না হইবার মধ্যে সন্দেহ হয় তাহা হইলে নীরব থাকিবে।

ইমাম ইবন আবী যায়দ মালেকী (রহঃ) বলেন, সকল আদবসমূহ এবং উত্তম চরিত্রাবলী চারিখানা হাদীছ শরীফ হইতে নিসৃত হয়। একটি হইতেছে আলোচ্য হাদীছ। দ্বিতীয় হাদীছ হইতেছে মানুষের উত্তম ইসলাম এই যে, ঐ কথা বর্জন করিবে যাহা কোন কাজে আসে না (অর্থাৎ বেকার ও অনর্থক কথা হইতে বাঁচিয়া থাকা।) তৃতীয় হাদীছখানা হইতেছে لا تغضب অর্থাৎ রাগ করিও না এবং চতুর্থ ঐ হাদীছ যাহা পূর্বে গিয়াছে অর্থাৎ মানুষের জন্য উচিত স্বীয় ভাইয়ের জন্য উহা পছন্দ করা যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

উস্তাদ আবুল কাসিম কুশাইরী (রহঃ) বলেনঃ স্থান বিশেষ নীরব থাকা পুরুষের গুণ যেমন স্থান বিশেষ কথা বলা অত্যন্ত ভাল স্বভাব। আর আমি আবূ আলী দিকাক (রহঃ) হইতে শুনিয়াছি তিনি বলিতেন; যে ব্যক্তি হক কথা বলিতে নীরব থাকে (অর্থাৎ যে সময় হক কথা বলিবার প্রয়োজন হয় সে সময় হক না বলিলে) সে বোবা শয়তান। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনা ও মুজাহিদাকারীগণ যে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন উহা এই জন্য যে, কথা বলিবার মধ্যে নানাহ প্রকার বালা মুসীবত আসে এবং নফস আনন্দ পায়। সে নিজ প্রশংসা করে এবং কখনও নিজ বাকপটুত্ব এবং শ্রুতিমধুর বয়ান লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করিতে চায়। কাজেই নীরবতা ও চুপ থাকা ভদ্রতা ও উত্তম চরিত্রের একটি বড় রুকন।

ফুযায়ল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কথাকে স্বীয় আ'মালের মধ্য হইতে একটি আমল অনুভব করে সে অপ্রয়োজনীয় (ও অনুপকারী) কথা কম বলিবে।

হযরত যন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন যে, সকল হইতে স্বীয় নফসকে অধিক হেফাযতকারী ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় জিহ্বাকে অধিক সংযত রাখে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত যে, কোন ব্যক্তি হইতে আল্লাহ তা'আলার পরাম্মুখতা হইবার একটি নিদর্শন ইহাও যে, তিনি তাহাকে অনর্থক কথাসমূহে লিপ্ত করিয়া দেন।

সহল তসতরী (রহঃ) বলিতেন, যে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সে হক বলা হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে।

মা'রুফ করখী (রহঃ) বলিতেন, মানুষ অপ্রয়োজনীয় কথাসমূহে লিপ্ত থাকা মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে তাহাকে অপমানিত করার একটি আলামত।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলিতেন যে, লুকমান হাকীমকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার এই উচ্চ মর্যাদা কিসের দ্বারা লাভ হইয়াছে? তিনি বলিলেন, তিনটি কথা হইতে (১) সত্যবাদীতা (২) আমানতের যথাযথ আদায় এবং (৩) অপ্রয়োজনীয় কথাসমূহ হইতে দূরে থাকিবার স্বভাব হইতে। (মুয়াত্তা)

এই সকল কারণে সাহেবে শরীআত অপ্রয়োজনীয় কথা বলিতে নিষেধ করেন। আর ইহা এইজন্য যে, যখন অপ্রয়োজনীয় কথা মুখ হইতে নিসৃত করিতে থাকিবে তখন পর্যায়ক্রমে শরীআতের বহির্ভূত কথা মুখ হইতে বাহির হওয়া দূরে থাকে না।

বলাবাহুল্য অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা আখেরাতের কল্যাণের জন্যও অপরিহার্য. খোদ স্বীয় পার্থিব জীবন সজ্জিত করিবার জন্যও এই নসীহত মাথা হইতে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণই উত্তম! আজ উন্নতশীল পৃথিবীর কোথাও বেকারের অস্তিত্ব মিলিবে না। তবে যাহারা দুনিয়ায় মত্ত হইয়া আখেরাতের সম্পর্ক কর্তন করিয়াছে তাহারা এই ভ্রমে পতিত যে, ইসলামের মধ্যে দুনিয়ার শিক্ষা নাই। তাহাদের প্রত্যক্ষ করা উচিত যে, ইসলামী মতবাদের ইহা কি শিক্ষা নহে যে, মানুষ এক মুহূর্তও যেন বেকার ও অপ্রয়োজনীয় কথায় ও কাজে অতিক্রম না করে। তবে পার্থক্য এই যে, ইসলাম দুনিয়ার প্রতিটি দিক আখেরাতের অভিমুখি করিয়া দেয়। কাফিরদের দুনিয়া আর মুমিনদের দুনিয়ার মধ্যে এই একটিই পার্থক্য। অন্যথায় দ্বীন না দুনিয়াকে নষ্ট করে আর না দুনিয়া হইতে বাধা সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পবিত্র এরশাদ হইতেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং কিয়ামত দিবসের হিসাব–নিকাশের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে যে, সে স্থানে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বস্তুর হিসাব হইবে, প্রত্যেক আমল ন্যায়ের পাল্লায় ওজন করা হইবে এবং সেই মুতাবিক প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হইবে, সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। পূর্ববর্তী (৮০নং) হাদীছের মধ্যে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম উল্লেখপূর্বক উহা হইতে বিরত থাকিবার বিষয় বলা হইয়াছে। আর আলোচ্য হাদীছ দ্বারা জানা গেল যে, কেবলমাত্র এতখানি যথেষ্ট নহে যে, তাহাদেরকে কষ্ট না দেওয়া বরং তাহাদের সহিত উত্তম আচরণও করিতেহইবে।

উত্তম আচরণ হইতেছে যে, নিজ প্রতিবেশীকে কোন কষ্ট না পৌছানো, তাহার সহিত উত্তম হইতে উত্তম ব্যবহার করা, তাহার পক্ষ হইতে যদি কোন কথা স্বভাবের বিপরীত হয় তাহা হইলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা, মন্দের প্রতিশোধ ভাল দ্বারা প্রদান। আর নিজের ভাল আচরণ, উত্তম ব্যবহার, দয়া, উদারতা ও ক্ষমাশীলতার চরিত্রাবলী দ্বারা প্রতিবেশীর অন্তর জয় করা। ঘরে থাকিবার অবস্থায় মহল্লাবাসী প্রতিবেশীদের সহিত এবং সফর অবস্থায় সফর সাথীদের সহিত এইরূপ আচরণ করা যাহাতে তাহাদের জন্য কষ্টের কারণ না হইয়া শান্তির কারণ হয়। সে তাহাকে যেন নিজের জন্য বোঝা মনে না করে এবং চিন্তিতও না থাকে বরং সে তাহার জন্য দুঃখ বেদনার বস্তু না হইয়া দেহধারী রহমত হয়।

প্রতিবেশীদের সহিত উত্তম আচরনের উপর অন্য একটি বিস্তৃত হাদীছ শরীফ রহিয়াছে যে, লোকেরা আরয

করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! প্রতিবেশীদের প্রতি প্রতিবেশীদের কি হক অধিকার রহিয়াছে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ প্রতিবেশীদের উপর প্রতিবেশীদের হক অধিকার এই যে, যদি তাহারা ঋণ চায় তাহা হইলে ঋণ দিবে, সাহায্য সহযোগিতার আবেদন করিলে সাহায্য সহযোগিতা করিবে, অসুস্থ হইলে তাহাকে দেখিতে যাইবে এবং সেবাযত্ন করিবে, অভাবী হইলে অভাব দূর করিবার জন্য যথা-সম্ভব চেষ্টা করিবে, ফকীর মিসকীন হইলে তাহার প্রতি নেক দৃষ্টি রাখিবে, আনন্দের সময় তাহাকে মোবারকবাদ দিবে, কোন বালা মুসীবতে পতিত হইলে সমবেদনা প্রকাশ করিবে, মৃত্যু হইলে জানাযায় অংশ গ্রহণ করিবে, নিজের অট্টালিকা এমন উচ্চ করিবে না যাহাতে প্রতিবেশীর আলো-বাতাস বন্ধ হইয়া যায়, এইরূপও করিবে না যে, তোমাদের পক্ষ হইতে দুর্গন্ধ বাতাস তাহাদের কষ্ট পৌছায়, ফল ক্রয় করিলে প্রতিবেশীকেও হাদিয়া দিবে, যদি উহার সুযোগ না হয় তবে গোপনে খাইবে এবং সতর্ক থাকিবে যাহাতে তোমাদের শিশুরা উহা বাহিরে না নিয়া যায়। কেননা উহাতে তাহাদের শিশুরা একগুয়েমী সৃষ্টি করিবে এবং তাহাদের ক্রয় ক্ষমতা না থাকিবার কারণে স্বীয় শিশুদের উপর রাগান্বিত হইবে।

প্রতিবেশীদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করিয়াছেনঃ

وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

অর্থাৎ "এবং (সৌজন্য মূলক ব্যবহার কর) নিকটস্থ প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী এবং সঙ্গী-সাথীদের সহিত" (সূরা নিসা-৩৬)

আল্লাহ তা'আলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিবেশীদের হক অধিকার সম্পর্কে এতই তাকীদ করিয়াছেন যে, তিনি সর্বদা এই ব্যাপারে জাগ্রত ও সচেষ্ট থাকিতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه.

অথাৎ "হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে নসীহত করেন, যাহার ফলে আমার মনে এই ধারণা উদয় হইল যে, তিনি সম্ভবতঃ তাহাকে উত্তরাধিকারী করিয়া দিবেন।"

প্রতিবেশীদের সহিত উত্তম আচরণের হুকুম বিশেষ করিয়া এই জন্য যে, মানুষের অধিক আদান-প্রদান এই প্রতিবেশীদের সহিতই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তাহাদের সহিত উত্তম ব্যবহারে অভ্যস্থ হইবে দৃঢ় বিশ্বাস যে, দূরবর্তী লোকদের সহিতও উত্তম ব্যবহার করিবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নসীহতের মধ্যে বিরাট হেকমত নিহিত রহিয়াছে, যাহার ফলে মানুষের সামাজিক জীবন সুখময় করিয়া তুলিবে। উদাহরণতঃ বলা যায় যে, প্রাসাদ হইতেছে প্রাচীর, ছাদ এবং স্তম্ভসমূহের সংমিশ্রিত নাম। আর ইহার সকল অংশ যেই উপাদন ও ইটের দ্বারা তৈরী উহার উপরই সম্পূর্ণ প্রাসাদের স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা নির্ভর করিয়া থাকে। সমাজকে একটি প্রাসাদের সহিত তুলনা করা যায় যে, ইহা বিভিন্ন পরিবার, গোত্রের সমষ্টির নাম এবং ইহা পরিবার ও গোত্রের ব্যক্তিবর্গ দ্বারাই সৃষ্টি। কাজেই ব্যক্তিবর্গ যেই প্রকারের হইবে সম্পূর্ণ সমাজই উহার রঙ্গে রঙ্গীন হইবে। যদি ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক না হয় তাহা হইলে সকল সমাজের মধ্যে পাষাণ হৃদয় এবং নিজ অভিসন্ধির ঝড় বহিবে। শান্তি চিরতরে পৃথিবী হইতে বিদায় নিবে।

মানব জগতে যদি প্রতিবেশীর সহিত উত্তম আচরণের উপরই আমল করা হয় তবে কেবল এই হিদায়েত এক বিরাট কল্যাণের বিপ্লব এবং সার্বজনীন সংশোধনের নিশ্চয়তা দান করিতে পারে। কিন্তু আফসোস যে, বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেই উপযুক্ততা এবং চিন্তা ও ভাবনাসমূহ দুনিয়াকে উপহার দিয়াছে উহা অন্য কিছু। উহার মূল প্রকৃতি এবং স্বভাবের মধ্যে নিজ অভিসন্ধি, অদয়ার্দ্রতা, লোভ ও উচ্চাকাংক্ষার বিষাক্ত স্থান হিসাবে চিহ্নিত

হইয়াছে। প্রতিবেশীদের সম্পর্ক তো কোথায়? খোদ পারিবারিক সম্বন্ধেও আত্ম কলহে লিপ্ত। আর কেবল দূরবর্তী আত্মীয়দের মধ্যে নহে বরং নিকটাত্মীয়দের মধ্যে এমন কি পিতা–মাতা এবং সন্তান–সন্ততির মধ্যে নিজস্ব অভিসন্ধি এবং দ্বন্দ্ব বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। যে সকল দেশ আজ আধুনিক সভ্যতার উচ্চারোহণের পথে সেই সকল দেশের সামাজিক অবস্থা পাঠ করিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, নিজস্ব পিতা–মাতা এবং নিজস্ব সন্তানদের মধ্যে এমন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হইয়াছে যে, সম্ভবতঃ চতুষ্পদ জন্তুরাও উহার কাছে হার মানিবে।

তৃতীয়ঃ মূল্যবান নসীহত সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা বলিয়াছেন যে, শক্তি সামর্থ অনুযায়ী স্বীয় মেহমানের হৃদয় জয়, সম্মান এবং ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করিবে। মেহমানদারী ইসলামের রীতিনীতি, পয়গাম্বরগণের সুন্নাত এবং সালেহীনের স্বভাব। এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, একরাত মেহমানদারী করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফের এক হাদীছে মেহমানদারীকে جائزة অর্থাৎ দান বলা হইয়াছে। এই হাদীছের দৃষ্টিতে মেহমানদারী ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। অবশ্য উভয় হাদীছে সামঞ্জস্য রহিয়াছে যে, কোন কোন অবস্থায় মেহমানদারী ওয়াজিব হইবে। যেমন মেহমান অন্য কোথাও থাকা বা খাওয়ার ব্যবস্থা করিবার সুযোগ না থাকিলে সেই স্থলে ওয়াজিব। আর যদি মেহমানের অন্য কোথাও থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিবার সুযোগ থাকে তবে ওয়াজিব নহে। কিন্তু ইহা সকল ক্ষেত্রেই আখলাকী ফরীযা তো অবশ্যই।

ইহা তো মীযবানের জন্য আবশ্যক আর খোদ মেহমানের জন্য আবশ্যক এই যে, সে নিজ মীযবানকে কষ্টে পতিত না করা, তাহার সামর্থের অধিক তাহার কাছ হইতে আশান্বিত ও যাঞ্চাকারী না হওয়া। কেননা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফের অন্য হাদীছে রহিয়াছে যে, মেহমানের জন্য ইহা জায়েয নহে যে, মীযবানের নিকট এতখানি দীর্ঘকাল অবস্থান করা যাহার কারণে সে সঙ্কীর্ণতা অনুভব করে।

শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ ফকীহগণ ঐক্যমত যে, মেহমানদারী মহৎ চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত তবে ওয়াজিব নহে। তাহাদের দলীল ঐ হাদীছ অর্থাৎ যিয়াফতের جائزة একরাত্র। جائزة বলা হয় দান, প্রতিদান এবং অনুগ্রহকে। আর ইহা ইচ্ছাধীন বস্তু, ওয়াজিব নহে। অধিকন্তু তিনি ফরমাইয়াছেন, মেহমানের প্রতি অনুগ্রহ করা উচিৎ এবং উত্তম ব্যবহার করা চাই। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, মেহমানদারী ওয়াজিব নহে। কারণ ওয়াজিবের জন্য এইরূপ শব্দ ব্যবহার করা হয় না।

বলাবাহুল্য আলোচ্য হাদীছ শরীফে বর্ণিত তিনটি অমূল্য নসীহত এই সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অপরিহার্য যাহাতে প্রীতি ও ভালবাসার দোলনা হয়। এই সমাজই যাহার প্রত্যেক স্তর হইতে মুহব্বত, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির মাধুর্য ফুটিবে এবং বন্ধুত্বের বসন্তকাল প্রস্ফুটিত হইবে। একজন খাঁটি মুমিন হইতে শরীআত দাবী করে যে, সে এইরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করুক, যাহার মধ্যে গোলাপ যে কোন কাঁটা হইতে বিপদমুক্ত থাকে। আল্লাহসর্বজ্ঞ।

٨٢ حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة قال ثنا ابو الاحوص عن ابى حصين عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا اوليسكت ـ

হাদীছ–৮২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি–হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন

করিয়াছে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।[১] আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে সে যেন স্বীয় মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় নীরব থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(৮০ ও ৮১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)

৮৩ وحدثنا إسحق بن إبراهيم قال أنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال فليحسن إلى جاره -

হাদীছ—৮৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ---(হাদীছের পরবর্তী অংশ উপরোল্লেখিত) রাবী আবূ হাসীন (রহঃ)—এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে ইহাতে রহিয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ فليحسن الى جاره সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীর সহিত উত্তম আচরণ করে।

৮৪ حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت -

হাদীছ—৮৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ বিন নুমায়র (রহঃ)। তাহারা উভয়ে--- হযরত আবূ শুরায়হ আল খুযাযী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীর সহিত উত্তম আচরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে সে যেন স্বীয় মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় নীরব থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(৮০ ও ৮১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)

টীকা-১. فلا يؤذ جاره এই বাক্যে ى لا يوذى এর সহিত অথবা ى لا يوذ ব্যতীত পঠন সহীহ। لا يوذ না বাচক এবং ى لا يوذى খবর যাহার দ্বারা نهى না বাচকই মর্ম। আর ইহাই অধিক বাগ্মি। ইবন আবূ জমরা (রহঃ) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হইতে বিরত থাকিবার পরম্পরায় একটি বিস্ময়কর বর্ণনা দিয়াছেন যে, যখন এইরূপ প্রতিবেশীর ব্যাপারে যাহার মধ্যকার এতটুকু নৈকট্য নহে কষ্ট না দেওয়ার বিষয়ে জোর তাকীদ তাহা হইলে ঐ প্রতিবেশী যে মানুষের অত্যন্ত নিকটে অর্থাৎ সম্মানিত লিখক ফিরিশতাদ্বয় যাহারা মানুষের ডানে বামে স্থিরীকৃত তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া শরীআত বিরোধী কর্মসমূহে লিপ্ত হওয়া কিরূপে বৈধ হইবে? আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان وان الايمان يزيد وينقص وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان

অনুচ্ছেদঃ মন্দ কর্ম হইতে নিষেধ করা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়। আর ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব হইবার বর্ণনা।

٨٥ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهٰذَا حَدِيْثُ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَأٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ -

হাদীছ—৮৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)---(সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ)---তাহারা উভয়ই কায়স বিন মুসলিম (রহঃ) হইতে, তিনি তারিক বিন শিহাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। আর ইহা আবী বকরেরও বর্ণিত হাদীছ।

হযরত তারিক বিন শিহাব (রাযিঃ) বলেন যে, যিনি সর্বপ্রথম ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা প্রদান আরম্ভ করেন তিনি হইলেন মারওয়ান[১] (বিন হাকাম)। তখন এক ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেনঃ খুতবার পূর্বে হইবে নামায। মারওয়ান বলিলেনঃ এই পদ্ধতি রহিত করা হইয়াছে। (ইহা শ্রবণের পর) হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) বলিলেনঃ এই ব্যক্তি তো স্বীয় কর্তব্য পালন করিয়াছে। কেননা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ (শরীআত বিরোধী) অন্যায় কাজ প্রত্যক্ষ করে তাহা হইলে সে যেন হাত দ্বারা উহার সংশোধন করিয়া দেয়। আর যদি ইহার ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে মুখের দ্বারা (প্রতিবাদ করিবে।)[২] আর যদি ইহাও সম্ভব না হয় তাহা হইলে আন্তরিকভাবে (উক্ত কাজকে) ঘৃণা করিবে। আর ইহা হইতেছে ঈমানের নিম্নতম স্তর।

টীকা—১. কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা প্রদান সর্বপ্রথম কে আরম্ভ করিয়াছিলেন এই বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত ওছমান (রাযিঃ) ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা পাঠ করিয়াছিলেন। আর কেহ কেহ বলেন, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)। আর ইহার কারণ এই ছিল যে, লোকেরা নামায সমাপনান্তেই চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিত এবং খুতবাকে শেষ পর্যন্ত শ্রবণের অপেক্ষা করিত না। তাহা ছাড়া কেহ কেহ বলেন যে, উহার ইহাও উপযোগিতা ছিল যে, দূরদুরান্তে বসবাসকারী লোকেরাও যাহাতে নামায পায় এবং বিলম্বে আগত ব্যক্তিরাও যাহাতে জামাআতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে সেই জন্য নামাযের পূর্বে খুতবা প্রদান করিতেন। আর কেহ কেহ বলেন, এই কাজ সর্বপ্রথম হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) করিয়াছিলেন। আর কেহ কেহ বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিঃ) করিয়াছিলেন। কিন্তু উপরে বর্ণিত রিওয়ায়াত সমূহ প্রমাণিত নহে। আর যাহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওছমান (রাযিঃ) হইতে প্রমাণিত উহা এই যে, ঈদের দিন ঈদের নামায সমাপ্ত করিয়া খুতবা আরম্ভ করিতেন। এই অভিমত সকল মালেকী ফকীহগণের এবং কেহ কেহ বলেন, ইহার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর এই ইজমা মতানৈক্যের পরে হইয়াছে। তাই বনী উমাইয়াদের মতবিরোধের

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পার্থক্য করণীয় মনোগ্রাম হইতেছে امر بالمعروف। (অর্থাৎ ভাল কাজের দিকে দাওয়াত এবং আদেশ দান) এবং نهى عن المنكر। (অর্থাৎ মন্দ কাজ ও কথা হইতে বিরত রাখা ও সংশোধন করা) এই দুইটি বস্তু ايمان بالله। (আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান)–এর সহিত অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

অর্থাৎ "তোমরা হইলে সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব হইয়াছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করিবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনিবে।"

(সূরা আলে ইমরান–১১০)

আয়াতে মুসলিম উম্মত শ্রেষ্ঠতম উম্মত হওয়ার যেই কারণসমূহের সহিত সম্পর্কিত করা হইয়াছে উহার মধ্যে বিশিষ্ট কারণ তথা গুণ হইতেছে ঈমান বিল্লাহ। আর সৎ কাজের আদেশ দান এবং অন্যায় কাজ হইতে নিষেধ করিবার মাধ্যমে মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টার দায়িত্বে ও কর্তব্যে নিয়োজিত থাকা 'ঈমান বিল্লাহ'–এর উপাদান। এই কারণেই পূর্ববর্তী উম্মতগণ যদি 'ঈমান বিল্লাহ' এর মধ্যে আমাদের হইতে পশ্চাতে রাখে তবে সৎ কাজের আদেশ প্রদানের মধ্যেও তাহাদের পা আমাদের পশ্চাতেই ছিল। আর এই উম্মত যদি ঈমান বিল্লাহ–এর মধ্যে সবচাইতে অগ্রগামী রাখে তাহা হইলে "সৎ কাজের আদেশ প্রদানের মধ্যেও এই উম্মতের পা সকল উম্মত হইতে আগে হইবে। কাজেই যে কোনভাবে হউক না কেন ঈমান বিল্লাহ–এর সহিত কোন না কোন স্তরে امر بالمعروف। হওয়াও জরুরী। যাহার সকল চাইতে দুর্বল স্তর হইতেছে অন্যায়কে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করা। যদি ইহাও না থাকে তাহা হইলে চিন্তা করিতে হইবে যে, এখন তাহার মধ্যে ঈমান বিলাহ–এর কতখানি রূহ এবং উহার কি আলামত অবশিষ্ট আছে? ইসলামের মধ্যে ঈমানের চিহ্ন কেবল কপালে নামাযের চিহ্ন, ঠোঁটে রোযার শীর্ণতা এবং ওয়াক্ত মতে যাকাত আদায়ের মধ্যেই গণ্য নহে বরং ইহার সহিত ঈমানের একটি বড় আলামত সৎ কাজের আদেশ দান এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ প্রদান করাকেও গণ্য করিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ايمان بالله। এবং امر بالمعروف। এর মধ্যে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

প্রতি ভ্রূপেক্ষ করা হয় নাই। কেননা খোলাফায়ে রাশেদীন এবং প্রথম শতকের সকলই ঐক্যমত রহিয়াছেন। আর আলোচ্য হাদীছে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) যে বলিয়াছেন, এই ব্যক্তি স্বীয় কর্তব্য পালন করিয়াছে। সকল মানুষের সামনে ইহা সুন্নাত বলিয়া পূর্বেই প্রমাণিত ছিল কেবল মারওয়ান ইহার বিপরীত করিয়াছে। তাহা ছাড়া আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে কেহ শরীআত বিরোধী কাজ দেখিবে সে যেন তাহাকে সংশোধন করিয়া দেয়। আর শরীআত বিরোধী কাজ উহাই যাহা সুন্নাতের বিপরীত হয় এবং ইহার পূর্বে সালেহীনদের কাহারও আমল না হয়। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মারওয়ান ছাড়া অন্য কেহ বা কোন খলীফা এইরূপ করেন নাই। তবে হযরত ওছমান (রাযিঃ), হযরত ওমর (রাযিঃ) এবং হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) সম্পর্কে যাহা বর্ণিত আছে উহা সহীহ নহে। (শরহে নববী)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেনঃ সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত মুগীরা বিন শু'বা, আবূ সাঈদ ইবন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), সুফিয়ানে ছাওরী (রহঃ), আওযায়ী (রহঃ), আবী ছাওর (রহঃ), ইসহাক (রহঃ), ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ), ইমাম মালিক (রহঃ) এবং জমহুরে ওলামার আমল হইতেছে ঈদের মধ্যে প্রথম নামায এবং পরে খুতবা প্রদান। হানাফী ও মালিকী মাযহাব মতে ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা দেওয়া জায়েব বটে কিন্তু খিলাফে সুন্নাত ও মাকরূহ। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা–২· فبلسانه · (সে যেন মুখ দ্বারা নিষেধ করে) ইহা ওলামাগণের দায়িত্ব। যেমন হাত দ্বারা বিরত রাখা হাকিম ও কাযীদের দায়িত্ব। যহীবিয়া কিতাবে বলা হইয়াছে যে, হাত দ্বারা সৎ কাজের আদেশ দান আমীরদের দায়িত্ব আর মুখ দ্বারা ওলামাগণের দায়িত্ব এবং আন্তরিকভাবে ঘৃণা করা সাধারণ মুমিনদের কাজ। (ফতহুল মুলহিম)

ঈমান কেবল ঐ আমলসমূহকে আদায় করিবার দ্বারা কামেল হয় না যাহা দ্বারা একজন মানুষের নফসের শুধু নিজস্ব সম্পূর্ণতা অর্জিত হয় বরং উহার নিরিখ ঐ আ'মাল যাহার দ্বারা সকল সৃষ্টির নফসের সম্পূর্ণতা লাভ হয়। অর্থাৎ "সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ হইতে নিষেধ" এই দুইটি আমল যথাযথ পালনের কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীকে অন্যান্য সকল উম্মতের সরদার বানাইয়াছেন। উম্মতে মুহাম্মদীর উদ্দেশ্য কেবল নিজ ইলমী ও আমলীর পূর্ণাঙ্গতার সম্পূর্ণতাই নহে বরং আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টির কল্যাণের ফিকির ও সংশোধনের চেষ্টা করিবার দায়িত্বও তাহাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

এই বিষয়টি চিন্তাযোগ্য যে, যখন একজন মানুষ নিজ সত্বাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছাইবার জন্যও ঈমানী শক্তি অপরিহার্য তাহা হইলে এই উম্মতের জন্য যাহাদেরকে এই দাওয়াতও দেওয়া হইয়াছে যে, দুনিয়ার সকল শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করিয়া মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক সম্পূর্ণতার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। কাজেই কতখানি দৃঢ় সংকল্প, কতটুকু ঈমানী শক্তি এবং কি পরিমাণ রব্বুল আলামীনের উপর বিশ্বস্ততা ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকা অপরিহার্য হইবে? ঈমান বিল্লাহ ব্যতীত امر بالمعروف। (সৎ কাজের আদেশ করা) হইতেই পারে না। আর এই গুণ যতখানি কামিল হইবে মানুষ ততখানি امر بالمعروف। এর জন্য ব্যাকুল হইবে।

শারেহ নববী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ যে, মন্দ এবং শরীআত বিরোধী কাজ যে কেহ প্রত্যেক্ষ করিবে সে যেন হাত অথবা মুখ দ্বারা বাধা দেয়। এই স্থানে فليغيره (সে যেন তাহাকে পরিবর্তন করে) এই "امر" (নির্দেশ) উম্মতের সর্বসম্মত মতে ওয়াজিবের জন্য। আর "সৎ কাজের আদেশ দান এবং অন্যায় কাজ হইতে বাধা প্রদান করা" ওয়াজিব হইবার উপর কিতাব, সুন্নাত এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। অধিকন্তু ইহা নসীহতের অন্তর্ভুক্ত যাহা সম্পূর্ণই দ্বীন। এই বিষয়ে কতক রাফেযী ব্যতীত অন্য কেহই মতবিরোধ করে নাই। কাজেই রাফেযীদের বিরোধীতা মূল্যহীন এবং বিবেচনাযোগ্য নহে। ইমামুল হারামাইন (রহঃ) বলেন, এই মাসআলায় তাহাদের বিরোধীতা সমাদরযোগ্য নহে। কারণ তাহাদের সৃষ্টির পূর্বেই সকল মুসলমান এই মাসআলায় ঐক্যমত হইয়াছেন। আর ইহা শরীআতের দলীল দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হইয়াছে আকল তথা যুক্তি দ্বারা নহে। কিন্তু মুতাযিলা সম্প্রদায় আকলকে প্রাধান্য দিয়া ইহার বিরোধীতা করিয়া প্রমাণ দিতে চাহিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ -

অর্থাৎ "নিজেদের (সংশোধন করার) চিন্তা কর, যখন তোমরা (দ্বীনের) পথে চলিতেছ ইহার পর যে পথভ্রষ্ট হয় তাহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই।" (সূরা মায়েদা-১০৫)

এই আয়াত আমাদের বিপরীত নহে। কেননা মুহাক্কেকগণের সহীহ তফসীর অনুযায়ী এই আয়াতের মর্ম হইতেছে যে, যখন তোমরা সকল আহকামকে (যাহা তোমাদের উপর ওয়াজিব করা হইয়াছে উহা) আমল কর তাহা হইলে অন্যান্যদের পথভ্রষ্টতার জন্য তোমাদিগকে কোন ক্ষতি করিবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

অর্থাৎ "(কিতাবে) এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কাহারও গুনাহ নিজে বহন করিবে না।" (সূরা নজম-৩৮)

অধিকন্তু যখন কোন ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ দান এবং অন্যায় কাজ হইতে নিষেধ প্রদান করিয়া দেয় তখন তাহার উপর হইতে ওয়াজিব দায়িত্ব চলিয়া যায়। এখন গুনাহ উক্ত ব্যক্তির উপরই থাকিবে যে মন্দ কাজ করিতে থাকিবে। ইহাও জানা থাকা উচিত যে, সৎ কাজের আদেশ দান এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ প্রদান করা ফরযে কিফায়া। যদি উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক এই কাজের আঞ্জাম দেয় তাহা হইলে সকলের দায়িত্ব হইতে উহার ফরয আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি কোন ব্যক্তিই এই কাজের দায়িত্ব পালন না করে তবে সকলই গুনাহগার

হইবে। আর কোন কোন স্থানে ও অবস্থায় নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরয হয় যদি উক্ত স্থানে তাহার মত জানা শোনা অন্য কোন লোক না থাকে অথবা তাহাকে ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিষেধ দ্বারা উক্ত অন্যায় দূরীভূত করা সম্ভব না হয়। যেমন কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সন্তান অথবা গোলামকে কোন মন্দ কাজ করিতে অথবা ফরয ছাড়িয়া দিতে দেখেন তবে সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপরই বাধা দেওয়া ওয়াজিব হইবে।

ওলামাগণ বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তির ধারণা হয় যে, আমার নিষেধ দ্বারা কোন উপকার হইবে না তাহা হইলেও নিষেধ করা ওয়াজিব হইবে। কেননা নসীহত দ্বারা মুসলমানদের কোন না কোন উপকার অবশ্যই হইবে। আর আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, মুমিন ব্যক্তির দায়িত্ব হইল সৎ কাজের আদেশ দান এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ প্রদান, তখন চাই সে মানিবে অথবা না মানিবে। মানানো বা স্বীকৃত করানো নিষেধকারীর উপর ফরয নহে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلٰغُ -

অর্থাৎ "রসূলের দায়িত্ব কেবল পৌছাইয়া দেওয়া মাত্র।" (সূরা মায়েদা-৯৯)

ওলামাগণ বলেন যে, সৎকাজের আদেশ দান এবং অন্যায় কাজ হইতে নিষেধ প্রদান করিবার জন্য এই শর্ত নাই যে, আদেশকারী নিজে যাবতীয় আহকামে শরীআতের উপর যথাযথ আমলকারী এবং মন্দ কাজসমূহ বর্জনকারী হইতে হইবে। বরং যদি সে নিজে ক্রটিকারীও হয় তাহা হইলেও সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ হইতে নিষেধ করা উচিত। কেননা ইহা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ফরয। কাজেই এক ফরযের মধ্যে ক্রটি হইলে অন্য ফরযে ক্রটি করা জায়েয নহে।

ওলামাগণ আরও বলেন, ভাল কাজের আদেশ দান এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ প্রদান করা কেবল হাকিম তথা শাসনকর্তাদের জন্য নির্দিষ্ট নহে বরং প্রত্যেক মুসলমানকেই উহা করিতে হইবে। ইমামুল হারামাইন (রহঃ) বলেনঃ ইহাই দলীল যে ইহার উপর মুসলমানগণের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেননা প্রথম শতকে এবং উহার কাছাকাছি যুগে নগণ্য মুসলমান নিজেই হাকিমগণকে অন্যায় ও শরীআত বিরোধী কাজ হইতে নিষেধ করিতেন এবং ভাল কাজের হুকুম করিতেন। অথচ অন্যান্য মুসলমানগণ এই ব্যক্তির কৃত কাজ হইতে বাধা দিতেন না এবং কোনরূপ ভয়ও প্রদর্শন করিতেন না। অধিকন্তু ভাল কাজের আদেশ দান এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা যদি হাকিম তথা শাসনকর্তা হওয়া শর্ত হইত তবে অবশ্যই অন্যান্য মুসলমানগণ তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন যে, তোমাদের এই কর্তব্য নহে।

কিন্তু ইহা অত্যাবশ্যক যে, যে ব্যক্তি ভাল কাজের আদেশ দান এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিবেন সেই ব্যক্তির উক্ত মাসআলার সঠিক জ্ঞান থাকিতে হইবে। আর যদি উহা প্রকাশ্য ফরয ও ওয়াজিবসমূহের মধ্যে হয় যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি অথবা প্রসিদ্ধ হারামসমূহের মধ্যে হয় যেমন যিনা, মদ্যপান ইত্যাদি তাহা হইলে তো ইহা প্রত্যেক মুসলমানের জানা বিষয়। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানই আদেশ এবং নিষেধ করিতে পারিবে। আর যদি কোন সূক্ষ্ম মাসআলা চাই উহা কথা মূলক হউক বা কাজ মূলক হউক যাহা ইজতিহাদ সম্পর্কিত হয় তাহা হইলে সাধারণ মুসলমানের উহাতে প্রবেশানুমতির হক অধিকার নাই। আর না অস্বীকারের হক রহিয়াছে বরং ইহা কেবল ওলামাগণের কাজ ও দায়িত্ব। অতঃপর ওলামাগণের ঐ সকল বিষয়ে আদেশ এবং নিষেধ করা বাঞ্ছনীয় যাহাতে মুসলমানগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর যেই সকল মাসআলায় মতবিরোধ রহিয়াছে উহাতে এক মাযহাবের লোকগণ অন্য মাযহাবের লোকগণের সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া জায়েয নাই। কেননা প্রত্যেক মুজতাহিদ সঠিক। ইহাই অধিকাংশ মুহাক্কেকগণের নিকট উত্তম।

আর কেহ কেহ বলেন, একটি মাসআলায় কেবল একজন মুজতাহিদের অভিমত সঠিক হইবে আর অন্যান্যদের ভুল। কিন্তু আমাদের নিকট ভুলটি সুনির্দিষ্ট নহে। আর যদি নির্দিষ্ট হয় তবেও ইজতিহাদী ভুলে গুনাহ নাই। তথাপি যদি নসীহত হিসাবে তাহাকে ভদ্রতার সহিত বুঝানো হয় তাহা হইলে উহা উত্তম। কেননা

ওলামাগণ এই কথায় ঐক্যমত যে, যদি কোন সুন্নাতের মধ্যে আমল বাধা না হয় বা অন্য কোন মতানৈক্যে পতিত হইবার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে যথা সম্ভব মতবিরোধ হইতে বাঁচিয়া থাকা বাঞ্ছনীয়।

কাযীউল কুযাত আবুল হাসান সাওয়ারদী বসরী শাফেয়ী (রহঃ) স্বীয় 'আল আহকামুস সুলতানিয়া' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই মাসআলায় ওলামাগণের মতবিরোধ রহিয়াছে যে, যদি বাদশাহ কোন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন আর তিনি মুজতাহিদ হন তাহা হইলে মতবিরোধ মাসআলাসমূহে তিনি স্বীয় মাযহাবের দিকে লোকদিগকে আহবান করিতে পারিবেন। কিন্তু অন্যান্য মাযহাবকে তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কেননা দ্বীনের শাখা প্রশাখার মাসআলাসমূহে সর্বদা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ), তাবেয়ীন এবং তাহাদের পরবর্তী দ্বীন বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ককে যেন কেহ অস্বীকার না করে, আর না তত্ত্বাবধায়ক অন্যান্য মুজতাহিদকে অস্বীকার করেন। অনুরূপ ওলামাগণ বলিয়াছেন যে, মুফতী এবং কাযীর হক অধিকার নাই যে, স্বীয় মাযহাবের বিপরীত অভিমতকে প্রশ্ন করিবার যদি উহা "نص" (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সেই হুকুম যাহা পরিষ্কার ও প্রকাশিত) অথবা ইজমা অথবা স্পষ্ট কিয়াসের বিরুদ্ধে না হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

উল্লেখ্য যে, এই অনুচ্ছেদ অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দান এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ প্রদানের কার্যক্রম দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে উহাতো খুবই অল্প অথচ ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ ছিল। উহার উপরই দ্বীনের স্থায়ীত্ব। আর যখন অন্যায় কাজ ব্যাপক প্রসার লাভ করিতে থাকিবে তখন নেক্কার ও বদকার সকলের উপরই আল্লাহ তা'আলার আযাব পতিত হইবে। আর যদি মানুষ অত্যাচারীকে অত্যাচার করা হইতে বাধা না দেয় তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা সকলকেই গযবে জড়িত করিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔

অর্থাৎ "যাহারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদের এই ভয় হওয়া উচিত যে, তাহাদের উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়ে অথবা তাহাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব অবতীর্ণ হইয়া পড়ে।"

(সূরা নূর-৬৩)

সুতরাং যে ব্যক্তি আখিরাতের অনুসন্ধানকারী এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহার জন্য এই কথা অর্থাৎ ভাল কাজের আদেশ দান এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করার বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত। কেননা উহাতে বড় উপকার নিহিত রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া ঐ অবস্থায় যখন উহার কাজ প্রায় বিলুপ্ত হইবার পথে এবং স্বীয় নিয়্যাতকে খালেছ রাখিবে। আর যেই ব্যক্তিকে ভাল কাজের আদেশ করিবে এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিবে তাহাকে বড় লোক মনে করিয়া ভয় করিবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ۔

অর্থাৎ "আর অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করিবেন যে তাঁহার (দ্বীনকে) সাহায্য করিবে।"

(সূরা হজ্জ-৪০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ "আর যাহারা আল্লাহ তা'আলার কথা দৃঢ়ভাবে ধরিবে, তাহারা সরল পথের দিকে হিদায়েত প্রাপ্ত হইবে।"

(সূরা আলে ইমরান-১০১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔

অর্থাৎ "আর যাহারা আমার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করে আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার পথসমূহ দেখাইব।"
(সূরাআনকাবুত-৬৯)

আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ -

অর্থাৎ "ঐ সকল মানুষেরা কি ইহা ধারণা করিয়াছে যে, তাহারা এই কথা বলিয়াই অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি। আর তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না? আর আমি ঐ সকল লোকদিগকেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম যাহারা তাহাদের পূর্বে অতীত হইয়া গিয়াছে। অতএব আল্লাহ তা'আলা সেই লোকদিগকে জানিয়া লইবেন যাহারা সত্যবাদী ছিল, আর মিথ্যাবাদীদিগকেও জানিয়া লইবেন।"
(সূরা আনকাবুত ২-৩)

উল্লেখযোগ্য যে, সর্বদা ছাওয়াব এতখানি অধিক পাওয়া যায় যতখানি কষ্ট অধিক হইবে। কাজেই امر بالمعروف এবং نهى عن المنكر এর গুরুত্বপূর্ণ কাজকে যেমন ভয় করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে অনুরূপ বন্ধুত্ব, মহব্বত এবং অলসতার বশবর্তী হইয়াও ছাড়িয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে এবং নিজ সম্মান ও মর্যাদা বাড়াইবার জন্যও নহে। কেননা দুস্তি এবং ভালবাসার দ্বারা তাহার হক তোমার উপর রহিয়াছে। আর তাহার হক ইহাই যে, তুমি তাহাকে নসীহত করিবে এবং আখিরাতের নাজাত ও কল্যাণের বর্ণনা করিবে এবং অনিষ্টকর ও ধ্বংসাত্মক কথা হইতে বাঁচাইবে। মানুষের বন্ধুত্ব ও ভালবাসা উহাই যে, তাহাকে আখেরাতের শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া কল্যাণের পথে নেওয়ার চেষ্টা করিবে যদিও উহার দরুন দুনিয়াতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর শত্রু ঐ ব্যক্তিই যে তাহার আখিরাতকে বরবাদ করে, যদিও দুনিয়ায় সে লাভবান হয়। এই কারণেই শয়তান মানুষের চরম শত্রু বলিয়া স্বীকৃত। কেননা সে মানুষের আখিরাতকে ধ্বংস করিয়া দিতে ব্যস্ত থাকে। পক্ষান্তরে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম মানুষের পরম বন্ধু। কেননা তাঁহারা মানুষের আখিরাতকে শুদ্ধ ও নিরাপদ করিয়া দেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে এবং আমাদের বন্ধুগণকে এবং সকল মুসলমানকে আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দিন এবং আপনার ক্ষমা ও অনুগ্রহ ব্যাপক ভাবে আমাদের সকলের উপর বর্ষণ করুন।

বলাবাহুল্য সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিবার ক্ষেত্রে ভদ্রতা ও বিনয়তা অবলম্বন করা উচিত। কারণ সহজ, সরল, ভদ্র ও বিনয়ের মাধ্যমেই দাওয়াতের উদ্দেশ্য লাভে অধিক ফলপ্রসূ। এই কারণে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইকে গোপনে নসীহত করে সে তাহাকে শুদ্ধ ও সজ্জিত করিল এবং যে ব্যক্তি খোলাখুলি নসীহত করে সে স্বীয় ভাইকে অপমানিত করিল। তবে নসীহতকারীকে স্থান, কাল ও পাত্র অনুধাবনের অধিকারী হইতে হইবে।

উল্লেখ্য যে, এই অনুচ্ছেদের মধ্যে এক কাজ উহাও যে, যাহাতে অধিকাংশ লোক অলসতা করে উহা এই যে, কোন ব্যক্তিকে ত্রুটিযুক্ত জিনিষ বিক্রয় করিতে প্রত্যক্ষ করিলেও তাহাকে উহা হইতে নিষেধ করে না এবং ক্রেতাকে উহা অবহিত করে না, ইহা প্রকাশ্য ভুল। ওলামাগণ এই বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে অবগত আছে যে, এই জিনিষে ত্রুটি আছে তাহা হইলে সে ব্যক্তির উপর ওয়াজিব যে, বিক্রেতাকে নিষেধ করা এবং ক্রেতাকে উক্ত ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করা। কিন্তু নিষেধ করিবার পদ্ধতিতো উহাই যাহা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন যে, উহাকে (অর্থাৎ মন্দ কর্মকে) হাত দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবে, যদি ইহা সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা, যদি ইহাও সম্ভব না হয় তবে অন্তর দ্বারা। অন্তর-দ্বারা পরিবর্তন করিবার মর্ম এই যে, উহাকে মন্দ জানিবে। আর অন্তর দ্বারা মন্দ জানা যদিও তাহাকে মন্দ হইতে বিরত রাখা হয় না তবে কি করা যাইবে? কারণ ইচ্ছাধিকারতো এই পরিমাণই।

আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এরশাদ করিয়াছেনঃ সবচাইতে নিম্নতম ঈমান ইহাই অর্থাৎ ঈমানের একটি সামান্য ফল ইহাই যে, "আন্তরিক ভাবে মন্দ কাজকে মন্দ জানা এবং উহাকে ঘৃণা করা।"

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, অন্যায় হইতে বিরত রাখিবার লক্ষ্যে এই হাদীছখানা মূল। কাজেই বিরতকারীর উপর ওয়াজিব যে, যে পদ্ধতিতেই হউক না কেন বিরত করিবে, কথা দ্বারা হউক বা কাজের দ্বারা। অতএব যদি হারাম কাজের সরঞ্জাম হয় বা পাত্র হয় তবে উহাকে স্বীয় হাত দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিবে এবং মদ্য বা নিশা জাতীয় তরল বস্তু হইলে মাটিতে বহাইয়া দিবে অথবা অন্যকে বলিবে উহা ফেলিয়া দেওয়ার জন্য। আর ছিনতাইকৃত মালকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হস্তগত করিয়া নিজেই প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরত দিবে অথবা অন্যকে দেওয়ার জন্য হুকুম দিবে। তবে জাহেল লোকদেরকে বিরত করিবার ক্ষেত্রে নম্রতা ও সহজতা অবলম্বন করা চাই এবং ঐ অত্যাচারীর উপর যাহার পক্ষ হইতে অনিষ্টের ভয় থাকে যদি প্রবল ধারণা হয় যে, সে তোমার কথা গ্রহণ করিবে। যেমন নেক্কার ও মর্যাদাপূর্ণ জিম্মাদার ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব ঐ ব্যক্তিকে নিষেধ করা যে নিম্নস্তরের পথ ভ্রষ্টতায় নিপতিত অথবা যে অন্যান্য লোকদিগকেও তাহার অপকাজে শরীক করিতে বল প্রয়োগ করে। তাহা হইলে উক্ত মর্যাদাশীল জিম্মাদার তাহার উপর শক্তি প্রয়োগ করিবে যদি শক্তি প্রয়োগ দ্বারা ফায়দা হয় এবং নিজের কোন অনিষ্টের ভয় না থাকে। আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, হাত দ্বারা বিরত রাখিবার মধ্যে অন্য কোন অনিষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ কাহারও রক্তপাত হইতে পারে (স্বয়ং নিষেধকারীর অথবা অন্য কাহারও) তবে হাত দ্বারা নিষেধ করা হইতে বিরত থাকিবে এবং শুধু মুখ দ্বারা নসীহত করিবে এবং আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিবে। আর যদি মুখ দ্বারা নিষেধ করিবার মধ্যেও ঐরূপ অনিষ্টের প্রবল ধারণা হয় তাহা হইলে কেবল আন্তরিকভাবে উহাকে মন্দ জানিবে এবং নীরব থাকিবে। আলোচ্য হাদীছের মর্ম ইহাই। উল্লেখ্য যে, যদি আল্লাহ তা'আলা চাহেন এবং অন্য কোন সাহায্যকারী পাওয়া যায় তবে সাহায্য নিবে। কিন্তু অস্ত্র হাতে লইবে না এবং যুদ্ধও আরম্ভ করিবে না। তবে এই বিষয়টি হাকিমকে অবহিত করিবে। ইহাই ফকীহ মাসআলা এবং মুহাক্কেকীন ওলামাগণের নিকট অধিক সহীহ।

আর কেহ কেহ বলেন, প্রত্যেক অবস্থায়ই মুখ দ্বারা নিষেধ করিতে হইবে। যদি নিজে হত্যা বা অনিষ্টে পতিত হইতে হয় তাহা হইলে ধৈর্য ধারণ করিবে।

ইমামুল হারামাইন (রহঃ) বলেন, প্রজাবর্গের মধ্য হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির এই হক অধিকার অর্জিত যে, কবীরা গুনাহকারীদের বিরত করা, তবে কবীরা গুনাহকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে না এবং অস্ত্রও ধারণ করিবে না। কিন্তু ঐ সময়কালের বাদশাহকে অবহিত করিবে। অতঃপর যদি বাদশাহও অত্যাচারীর সাহায্যকারী হয় এবং শরীআতের বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত না হয় এবং মুখ দ্বারা বুঝাইবার দ্বারা না বুঝে তাহা হইলে সকল ভোটাধিকারপ্রাপ্ত মুসলমান সম্মিলিতভাবে বাদশাহকে তাহার পদ হইতে সরাইয়া দিবে যদিও উহাতে অস্ত্র ধারণ, রক্তপাত ও যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। হযরত ইমামুল হারামাইনের অভিমত অর্থাৎ বাদশাহকে স্বীয় পদ হইতে নামাইয়া দেওয়া খুবই বিস্ময়কর তবে উহা ঐ অবস্থার উপর স্থাপিত যে, যদি বাদশাহকে নামাইয়া দেওয়ার দ্বারা উহা হইতে বড় অন্য কোন ফাসাদের আশংকা না থাকে। আর সৎকাজের আদেশ দানকারীর জন্য চরবৃত্তি বা খানা তালাশি করিবার ইচ্ছাধীন নাই বরং যখন তিনি কোন মন্দ কাজ প্রত্যক্ষ করেন তখন নিষেধ করিবেন।

কাযীউল কুযাত মাওয়ারদী (রহঃ) বলেন, তত্ত্বাবধায়ক কাহারও অপ্রকাশিত গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা করিবে না। হ্যাঁ, যদি প্রবল ধারণা হয় যে, কিছু সংখ্যক লোক এইরূপ অপকর্ম গোপনে করিতেছে তবে উহা দুই প্রকারঃ প্রথম প্রকার এই যে, যে কাজ সংঘটিত হইবার পর উহার সংশোধন ও প্রতিকার খুবই কঠিন ও জটিল। যেমন– কোন ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ককে সংবাদ দেয় যে, অমুক ব্যক্তি অমুক মহিলার সহিত নির্জনতায় যিনা করিবার পরিকল্পনা করিতেছে অথবা অমুককে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে তবে তৎক্ষণাৎ তত্ত্বাবধায়ক চরবৃত্তি করা উচিত এবং লোক দ্বারা উহার সত্যাসত্য যাচাই করা বাঞ্ছনীয় এবং কালক্ষেপন না করিয়া এই ঘটনার সমাধান করিবেন। অনুরূপ যদি তত্ত্বাবধায়ক ব্যতীত অন্যান্য লোকগণও জানিতে পারে তবে তাহাদের জন্য জায়েয

যে, উক্ত ঘটনার তদন্ত করা এবং উহা হইতে বিরত রাখা। দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে উপরোল্লেখিত অপরাধের চাইতে নিম্নস্তরের অপরাধ হইলে উহাতে চরবৃত্তি ও গোপন রহস্য উদঘাটনের প্রয়োজন নাই। যেমন–কোন বাড়ী হইতে পটকাবাজির শব্দ শুনিতে পাইলে বাহির হইতে ডাকিয়া নিষেধ করিবে, ঘরে প্রবেশ করিবে না। হযরত মাওয়ারদী (রহঃ) স্বীয় আল আহকামুস সুলতানিয়ার শেষ দিকে একটি চমৎকার অনুচ্ছেদ যাহাতে امر بالمعروف এবং نہی عن المنكر এর উপর অত্যন্ত গুরুত্ববহ নীতিসমূহ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমি এই স্থানে উহার সারমর্ম লিখিয়া দিয়াছি। যদিও কথা খানিকটা লম্বা হইয়াছে বটে কিন্তু এই অনুচ্ছেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও খুবই উপকারী এবং শ্রেষ্ঠতম ইসলামী নীতিমালা। (শরহে নববী)

আল কাউলুল জামীল কিতাবে আছে যে, امر بالمعروف এবং نہی عن المنكر এর আদব এই যে, নম্রতা, ভদ্রতা ও কোমলতার সহিত হওয়া। আর নির্মমতা এবং কঠোরতা কেবল বাদশাহদের উপযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ -

অর্থাৎ "আর তাহাদের সহিত উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করুন।" (সূরা নহল-১২৫)

উদাহরণতঃ নামাযের মধ্যে امر بالمعروف এর পদ্ধতি হইতেছে এই যে, যখন কোন ব্যক্তির নামাযে ত্রুটি দেখিবে তখন ঐ হাদীছ তাহার সামনে পেশ করিবে অর্থাৎ পুণরায় নামায আদায় কর কেননা তুমি যেন নামাযই পড় নাই। অনুরূপ অন্যান্য যাবতীয় কথায় ও কাজে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যাহারা আহবান করিবে সৎ কর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করিবে অন্যায় কাজ হইতে, আর তাহারাই হইল সফলকাম।"
(সূরা আলে ইমরান–১০৪)

মন্দকে দূর করিবার জন্য আইনকে নিজ হস্তে নেওয়ার অনুমতি নাই

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি কোন মন্দ ও অন্যায়কে দেখে সে যেন উহাকে হাত দ্বারা বিরত রাখে। এই স্থানে দেখা (رای) এর মর্ম হইতেছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও অত্যাচারিত বা মসীবতে নিমজ্জিত দেখে তাহা হইলে তাহার মসীবতকে হাত দ্বারা দূর করিবার হক অধিকার রহিয়াছে। আর যদি সে ব্যক্তি উক্ত মসীবত হইতে অবকাশ পাইয়া থাকে তবে শুধু এতখানি হক অধিকার রহিয়াছে যে, ঘটনাটি বিচারকের নিকট পৌছাইয়া দিবে। অন্যায়ের শাস্তি কার্যকর করিবার হক কেবল বিচারকের রহিয়াছে। কোন অপরাধমূলক ঘটনায় অপরাধীর উপর শাস্তি জারী করা সাধারণের হক অধিকার নাই। হ্যাঁ, সৎ কাজের আদেশ প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই ফরয। উহা কাহারও জন্য নির্দিষ্ট নাই। দ্বিতীয় দেখা (رای) দ্বারা মর্ম কেবল ঐ দেখা নহে যাহা আমরা ভাষাগত বলিয়া থাকি। বরং অন্যায়ের বিষয়টি দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রমাণিত হওয়া অপরিহার্য। আর ইহাও স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, শরীআতের মধ্যে যতখানি সৎ কাজের আদেশ করিবার প্রতি প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে ততখানি চরবৃত্তির বিরোধীতাও করা হইয়াছে।

'সৎ কাজের আদেশ' ও 'মন্দ হইতে বিরত' করিবার মধ্যে স্থান ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক।

ইসলামের মধ্যে সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ হইতে নিষেধ করিবার যতখানি গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে উহা হইতে অধিক গুরুত্ব ঐ বিষয়টি যে, স্থান ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অনেক ক্ষেত্রে স্থান

অনুপযোগী কথাটিই মন্দে পরিণত হয়। হাফেয ইবন কায়্যিম (রহঃ) উক্ত স্থানোপযোগির চারিটি অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) মন্দ হইতে বিরত করিবার দ্বারা সংশোধনের আশা এবং ভাল সৃষ্টি হইবার বিশ্বাস হওয়া।

(২) মন্দকে সম্পূর্ণভাবে নির্মুল করা সম্ভব নহে তবে উহার মধ্যে কিছুটা কমানো সম্ভব।

এই উপরোল্লিখিত দুই অবস্থার মধ্যে সৎ কাজের আদেশ দান এবং মন্দ হইতে নিষেধ করা জরুরী।

(৩) যেই মন্দ হইতে বিরত রাখা হইতেছে উহা হইতে বিরত রাখিবার অবস্থায় উহার অনুরূপ অন্য কোন মন্দ সৃষ্টি হইবার আশংকা থাকে।

এই তৃতীয় অবস্থা মানুষের অনুভূতি ও সৎ বিবেচনার উপর নির্ভরশীল।

(৪) যেই মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখা হইতেছে সেই মন্দ হইতে বিরত রাখিবার কারণে যদি উহা হইতে অন্য কোন মারাত্মক মন্দ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

এই চতুর্থ অবস্থার মধ্যে মন্দ হইতে নিষেধ করা হারাম।

উদাহরণতঃ এক দল লোক সতরঞ্জ খেলিতেছে, এমতাবস্থায় আশা করা যায় যে, যদি তাহাদিগকে উহা হইতে বিরত রাখা হয় তবে ভাল কাজে নিয়োগ হইবে তখন তাহাদেরকে নিষেধ করা জরুরী। অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তিকে নভেল পুস্তক পড়িতে দেখা যায়, এমতাবস্থায় যদি তাহাকে উহা হইতে বিরত রাখা হয় তবে আশংকা আছে যে, সে ঐরূপ পুস্তক পড়িবে যাহাতে আকীদাই নষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থায় তাহাকে বিরত না রাখা জরুরী। এমন কি যদি কোন ব্যক্তিকে মদ্যপান এবং জুয়া খেলার মধ্যে মত্ত দেখা যায়। আর তাহার অসৎ স্বভাব হইতে এই আশংকা হয় যে, তাহাকে বিরত রাখিলে সে হত্যা, সন্ত্রাস ও লুণ্ঠনে নিযুক্ত হইবে, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তিকে স্বীয় কাজে থাকিতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (তফহীমুল মুসলিম)

৮৬ حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان -

হাদীছ—৮৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)—এর সূত্রে মারওয়ানের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হযরত আবূ সাঈদ (খুদরী (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ যাহা (উপরোল্লেখিত) হযরত শু'বা ও সুফিয়ানের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

٨٧ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَحَدَّثْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَىَّ فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةَ فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثْتُهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ صَالِحٌ وَقَدْ تُحُدِّثَ بِنَحْوِ ذَلِكَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ -

হাদীছ—৮৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আমর আন নাকিদ, আবূ বকর বিন নযর এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহঃ)। তাহারা--হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বে যখনই কোন জাতির কাছে নবী প্রেরণ করিয়াছেন তখনই উম্মতের মধ্যে তাঁহার এমন কিছু লোককে সাহায্যকারী[১] এবং সাহাবী করিয়া দিয়াছেন যাহারা তাঁহার তরীকা অনুযায়ী চলিতেন এবং তাঁহার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। অতঃপর তাহাদের পরে এমন কিছু লোক তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল, যাহারা মুখে যাহা বলিত সেই মতে কাজ করিত না, আর যেই কাজ সম্পাদন করিত সেই সকল কাজের জন্য তাহারা আদিষ্ট ছিল না। অতএব যে ব্যক্তি এই সকল লোকদের বিরুদ্ধে হাত দ্বারা জিহাদ করিবে সেই ব্যক্তিই (খাঁটি) মুমিন। আর যে ব্যক্তি এই সকল লোকদের বিরুদ্ধে মুখ দ্বারা জিহাদ (নসীহত) করিবে সেও (খাঁটি) মুমিন। আর যে ব্যক্তি এই সকল লোকদের (অপকর্মের) বিরুদ্ধে অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে সেও (এক স্তরের) মুমিন। ইহার পরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান (এর ফল) নাই।[২]

(হাদীছের রাবী) আবূ রাফি'(রাযিঃ)[৩] বলেন যে, আমি এই হাদীছ শরীফখানা হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর

টীকা-১. حَوَارِيُّوْنَ শব্দটি حوارى এর বহুবচন ইহার অর্থ আন্তরিক বন্ধু।

টীকা-২. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ "ইহার বাহিরে সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান নাই।" অর্থাৎ অন্তর যখন এই স্তরের নির্বোধ হইয়া যায় যে, মন্দ এবং শরীআত বিরোধী কথা বা কাজ দেখিলে ঘৃণাও অনুভব হয় না তবে বুঝিতে হইবে যে, অন্তরের মধ্যে সরিষা দানার পরিমাণও ঐ ঈমান নাই যাহার ভিত্তিতে প্রতিদান ও ছাওয়াব পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই মর্ম নহে যে, ইহার পরে সে ব্যক্তি মুমিনই থাকিবে না।

টীকা-৩ "ابورافع" আবূ রাফি' (রাযিঃ)-এর নাম সম্পর্কে সহীহ অভিমত হইতেছে যে, তাহার নাম আসলাম। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত দাস ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি ইয়ামনের অধিবাসী ছিলেন। তাহাকে আযাদ করিবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার গোত্রের লোকদের সহিত বসবাস করিতে পার অথবা আমার সহিতও বসবাস করিতে পার। আমার সহিত থাকিলে তুমি আমার আহলে বায়তদের মধ্যে গণ্য হইবে। আবূ রাফি (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বসবাস করিতে পছন্দ করিলেন এবং তিনি সর্বদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে থাকিতেন।

(রাযিঃ)–এর নিকট বর্ণনা করিলাম। তখন তিনি আমার রিওয়ায়াতকে অস্বীকার করিলেন। ঘটনাক্রমে (হযরত আবদুল্লাহ) ইবন মাসউদ (রাযিঃ) আগমন করিলেন এবং কানাত (মদীনার নিকটবর্তী একটি উপত্যকায়)–এ অবস্থান গ্রহণ করিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) অসুস্থ ইবন মাসউদ (রাযিঃ)কে দেখিবার জন্য আমাকে সাথে নিয়া গেলেন। আমি তাঁহার সহিত গেলাম। যখন আমরা বসিলাম তখন আমি (হযরত আবদুল্লাহ) ইবন মাসউদ (রাযিঃ)–এর নিকট এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি এইরূপ বর্ণনা করিলেন যেইরূপ আমি (হযরত আবদুল্লাহ) ইবন ওমর (রাযিঃ)–এর নিকট বর্ণনা করিয়াছিলাম। সালেহ বিন কায়সান (রহঃ) বলেনঃ এই হাদীছ শরীফখানা আবূ রাফি' (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ফায়দাঃ আস সিরাজুল ওহহাজ গ্রন্থে আছে যে, যদিও অত্র হাদীছে এই উম্মতের উল্লেখ নাই কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ঐরূপ কিছু লোক তাঁহার উম্মতের মধ্যেও হইবে। যেমন তিনি বলেন فَمَنْ جَاهَدَهُمْ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে" ইহাতে এই উম্মতকে অন্তর্ভুক্ত না করিবার কোন কারণ নাই। আর শব্দ (لفظ) ব্যাপক অর্থ প্রকাশের নিশ্চয়তা দেয়।

(বিস্তারিত হাদীছ নং ৮৫ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।)

٨٨ وحدثنيه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ الْفُضَيْلِ الْخَطْمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ مِثْلَ حَدِيثِ صَالِحٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاجْتِمَاعَ ابْنِ عُمَرَ مَعَهُ -

হাদীছ–৮৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাকে হাদীছ শোনান আবূ বকর বিন ইসহাক বিন মুহাম্মদ (রহঃ)। তিনি····হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ এমন কোন নবী অতিবাহিত হয় নাই যাহার সহিত তাঁহার এমন কিছু সংখ্যক হাওয়ারী (সাহায্যকারী, খালেছ অনুসারী) ছিল না, (অর্থাৎ পূর্বে আগত সকল নবীগণেরই কিছু না কিছু হাওয়ারী ছিল) তাহারা তাঁহার অর্থাৎ স্বীয় নবীর প্রদর্শিত পথে চলিতেন এবং তাঁহার সুন্নাতের উপর আমল করিতেন। অতঃপর এই রিওয়ায়াতের পরবর্তী অংশ (উপরোল্লেখিত) সালিহ বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই রিওয়ায়াতে ইবন মাসউদ (রাযিঃ)–এর আগমন এবং তাঁহার সহিত ইবন ওমর (রাযিঃ)–এর মিলিত হইবার কথা উল্লেখ নাই।

باب تفاضل الايمان فيه ورجحان اهل اليمن فيه -

অনুচ্ছেদঃ মুমিনগণের মধ্যে একে অপরের অপেক্ষা ঈমানী গুণের প্রাধান্য থাকা এবং ইয়ামনবাসীদের ঈমানের প্রাধান্য হওয়া।

٨٩ حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة قال نا ابو اسامة ح حدثنا ابن نمير قال نا ابى ح وحدثنا ابو كريب قال ثنا ابن ادريس كلهم عن اسماعيل بن ابى خالد ح وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثى واللفظ له قال نا معتمر عن اسماعيل قال سمعت قيسا يروى عن ابى مسعود قال اشار النبى صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الا ان الايمان ههنا وان القسوة وغلظ القلوب فى الفدادين عند اصول اذناب الابل حيث يطلع قرنا الشيطان فى ربيعة ومضر -

হাদীছ—৮৯. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা--(সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহঃ)---(সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহঃ)--(সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারিছী (রহঃ)। তাহারা---হযরত আবূ মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাত মুবারক দ্বারা ইয়ামনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেনঃ জানিয়া রাখ যে, ঈমান সেই স্থানেই। কঠোর ও পাষাণ অন্তর হইতেছে[১] শয়তানের দুই শিং এর স্থলে (পূর্ব দিকে) বসবাসকারী সেই সকল লোক যাহারা উটের লেজের গোড়ায় থাকিয়া[২] চিৎকার দিয়া থাকে অর্থাৎ রবীআ ও মুযার সম্প্রদায়।

টীকা-১. وان القسوة وغلظة القلو (আর কঠোর ও পাষাণ অন্তর হইতেছে।) এই বাক্য দ্বারা আখেরাতের বিষয়াদি হইতে অমনোযোগী হইবার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যাহার ফলশ্রুতিতে অন্তর পাষাণ ও কর্কশ হয়। قسوة এবং غفلت শব্দদ্বয় প্রায় একই অর্থ প্রকাশ করে। কুরতুবী (রহঃ) বলেন قسوة দ্বারা মর্ম হইল তাহাদের অন্তর নরম এবং ক্রিয়াশীল নহে এবং غفلت দ্বারা মর্ম হইল দ্বীনের বুঝ না হওয়া এবং উহার প্রতি অমনোযোগী হওয়া।

فى الفدادين কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ আল্লামা শায়বানী (রহঃ) فدادين শব্দে دال কে তাশদীদহীন রিওয়ায়াত করিয়াছেন এবং উহাকে فدّاد (দাল বর্ণে তাশদীদ যুক্ত) এর বহুবচন গণ্য করিয়াছেন। আর فداد শব্দের ব্যাখ্যা কৃষি কাজ করিবার কাজে ব্যবহৃত বলদ দ্বারা করিয়াছেন। এই অবস্থায় উহার اصحاب . مضاف উহ্য মানা হইবে। অর্থ হইবে হালজোতনে ওয়ালা। হাদীছে ব্যবহৃত বাক্যের অর্থ হইবেঃ অসভ্য ও শক্ত অন্তর হালজোতনে ওয়ালা ব্যক্তিবর্গ। কারণ তাহারা শহর হইতে দূরে বসবাস করে। কিন্তু শায়বানী (রহঃ)—এর ব্যাখ্যা আবূ ওবায়দা এই কারণে খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন যে, আরববাসীরা কৃষি কাজ জানে না। (আবূ ওবায়দা (রহঃ)—এর খণ্ডনের উপর খণ্ডন রহিয়াছে। কেননা মদীনার পূর্ব দিকে কেবল আরবীদের আবাস স্থলই নহে বরং অন্যান্য দেশও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যে সকল দেশের অধিবাসীরা কৃষি কাজ জানেন।) আল্লাহ সর্বজ্ঞ। আবূ ওবায়দা (রহঃ) বলেন যে, فدّادين শব্দটি دال বর্ণে তাশদীদযুক্ত فداد এর বহুবচন। আর ইহা فديد হইতে যাহার অর্থ অধিক অর্থাৎ অধিক উটের মালিক যাহার নিকট দুইশত হইতে এক হাজার পর্যন্ত উট রহিয়াছে তাহাকেই فدّاد বলে। আসমায়ী (রহঃ) বলেন যে, স্বর উচ্চকারীদেরকে فداد বলে যেমন বলা হয়ঃ فد الرجل فديد (লোকটি খুব চিৎকার করে) উহা দ্বারা ঐ ব্যক্তি মর্ম যে কৃষি কাজ এবং জন্তুদের চালাইবার জন্য পশ্চাতে থাকিয়া স্বর উচ্চ করে। ইবন দরীদ (রহঃ)—فدّاد এর ব্যাখ্যা هوالرجل الشديد শব্দ দ্বারা করিয়াছেন। এই সকল ব্যাখ্যাবলী স্বীয় স্থানে সহীহ এবং হাদীছের মর্মার্থও পরিস্কার করিয়া দেয়। কিন্তু সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হইতেছে যে, فداد দ্বারা মর্ম অধিক সম্পদ। চাই যে কোন সম্পদই হউক না কেন। উটের বন্দীত্ব এই কারণে যে, আরবে উটই অধিক পালন করে।

(ফতহুল মুলহিম)

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ইয়ামন পবিত্র মক্কা মুয়ায্যমার ডান দিকে অবস্থিত একটি এলাকার নাম। বর্তমানে ইহা পৃথক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। প্রথমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া উহার প্রশংসা করেন এই কারণে যে, সে স্থানের মানুষ অনেক তাড়াতাড়ি ঈমান গ্রহণ করে। অতঃপর পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করেন এবং তাহাদের তিরস্কার করেন অর্থাৎ রবীআ ও মুযার গোত্রদ্বয় যাহারা অধিক উটের মালিক ও সম্পদশালী। সম্পদের মহব্বতের দরুন তাহাদের অন্তর কঠোর ও পাষাণ হইয়া গিয়াছে এবং দুনিয়ার আসক্তিতে নিমজ্জিত রহিয়াছে। ফলে তাহারা ঈমান ওয়ালাদের সঙ্গ লাভ করিতেছে না এবং ইসলামের বিরোধীতা করে। অধিকন্তু যাহারা ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আগমন করিতেন তাহাদের প্রতি যুলুম ও অত্যাচার করিয়া থাকে।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, হাদীছের মধ্যে ঈমানকে ইয়ামনের সহিত সম্পর্ক করা হইয়াছে। এই স্থানে ওলামাগণ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়া ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়াছেন। কারণ ঈমান আরম্ভ হইয়াছে মক্কা মুআয্যমা হইতে অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারা হইতে। ইমাম আবূ ওবায়দ (রহঃ) এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন- (১) এখানে ইয়ামন দ্বারা মক্কা মর্ম, (২) মক্কা ও মদীনা উভয়ই মর্ম। এই কারণে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীছ তাবূকে অবস্থানকালে বর্ণনা করিয়াছেন। আর মক্কা ও মদীনা হইতেছে তাবুক এবং ইয়ামনের মধ্যবর্তী স্থানে। কাজেই তিনি ইয়ামনের দিকে অর্থাৎ ইয়ামনের অবস্থানের দিকে ইঙ্গিত করিয়া মক্কা মদীনাকেই বুঝানো উদ্দেশ্য। কারণ তাবূক হইতে ইয়ামনের দিকেই মক্কা মদীনা অবস্থিত, উহার উদাহরণও রহিয়াছে যে রোকনে ইয়ামনী মক্কা মুআয্যমায় অবস্থিত। আর উহাকে ইয়ামনী বলিবার কারণ হইতেছে যে, উহা ইয়ামনের দিকে অবস্থিত। (৩) ইয়ামন দ্বারা আনসার লোকগণ মর্ম, কারণ আনসারগণ ইয়ামনের অধিবাসী ছিলেন। তাহারা ঈমানের সাহায্যকারী ছিলেন। তাই ঈমানের নিসবত আনসারগণের দিকে করা হইয়াছে। এই অভিমত অনেক বিশেষজ্ঞই গ্রহণ করিয়াছেন।

শায়খ আবূ আমর ইবনুস সিলাহ (রহঃ) বলেন যে, আবূ ওবায়দা ও তাহার ন্যায় অভিমত পোষণকারীগণ যদি হাদীছের শব্দের প্রতি গভীরভাবে দেখিতেন তাহা হইলে হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়া জটিল ব্যাখ্যার দিকে যাইতেন না এবং হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ ছাড়িতেন না। কারণ এই অনুচ্ছেদের এক রিওয়ায়াতে আছে, তোমাদের নিকট ইয়ামনের লোক আসিয়াছে। আর এই সম্বোধন আনসারগণকে করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আগত লোকগণ আনসার ছাড়া অন্য লোক হইবেন এবং সেই লোকদের কথা বলাই উদ্দেশ্য। অনুরূপ হাদীছে আছে جاء اهل اليمن (ইয়ামনবাসী আসিল) ইহা দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আগত লোকগণ আনসার নহেন। অধিকন্তু উক্ত রিওয়ায়াতে ইয়ামন হইতে আগত লোকদের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাহাদের গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহাদের হৃদয় নরম, ফিকহ এবং হিকমত ইয়ামনীদের। কাজেই হাদীছকে স্বীয় শাব্দিক অর্থের উপর স্থাপন করিলেও কোন প্রশ্ন হয় না। তাহা ছাড়া যদি কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ গুণে গুণান্বিত হইলে সেই গুণের সহিত উক্ত ব্যক্তিকে সম্পর্কিত করা হয়, ইহার অর্থ এই নহে যে, অন্য কোন ব্যক্তির মধ্যে এই গুণ নাই। সেই সময় ইয়ামনবাসীদের যাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসিয়াছিলেন তাহাদের অবস্থা অনুরূপই ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় এবং পরবর্তী সময়ে ইয়ামনবাসীদের অনেকই কামেল ঈমানের অধিকারী ছিলেন। যেমন ওয়াছকরনী এবং আবূ মুসলিম খাওলানী

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

টীকা-২০ عند اصول اذناب الابل (উটের লেজের গোড়ায় থাকিয়া (চিৎকার করে)) এই বাক্য দ্বারা ঐ সকল লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যাহারা দুনিয়ার মত্ততার দরুন আল্লাহ ওয়ালাগণের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হয়। তাহাদের সময় জন্তু জানোয়ারের লেজের গোড়ায় কাটিয়া যায়। ফলে দ্বীনকে বুঝিবার এবং হককে গ্রহণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা লাভ করে না। দ্বীনকে বুঝিবার জন্য এবং হক গ্রহণের যোগ্যতার জন্য ওলামা ও নেক্কারগণের সঙ্গ অপরিহার্য।

(রহঃ) এবং তাহাদের ন্যায় আরও যাহারা কল্‌বে সলীম এবং খাঁটি মুমিন ছিলেন। কাজেই ঈমানের সম্পর্ক তাহাদের দিকেই করা হইয়াছে। কারণ তাহারা ঈমানের মধ্যে কামিল ছিলেন। কিন্তু এই কথা দ্বারা এই মর্ম হয় না যে, তাহাদের ছাড়া অন্য কোন স্থানের মানুষ কামেল ঈমানের অধিকারী নাই। আর ইহাও নহে যে, ইয়ামনের প্রত্যেকটি ব্যক্তি কামিল ঈমানের অধিকারী। বরং ইয়ামনে অধিকাংশ লোকদের স্বভাব চরিত্র ও ঈমান গ্রহণের উৎসাহ উদ্দীপনা ও যোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। এই মর্ম গ্রহণ করিলে পরবর্তী হাদীছে যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ ঈমান হিজাজের মধ্যে, উহার সহিত কোন বিরোধ হয় না। আর ইয়ামনবাসীদের জন্য বর্ণিত বিষয়াবলী সেই সময়কার ইয়ামনবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী সকল যুগের ইয়ামনবাসীগণ উহার আওতাধীন হইবে না। আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া যে তিনি আমাকে সঠিক রাস্তা বলিয়া দিয়াছেন। (নববী)

সিরাজুল ওহহাজ কিতাবে আছে যে, হাদীছের শাব্দিক অর্থ পরিবর্তন না করিবার বিষয়টি কেবল ইয়ামনের জন্য নির্দিষ্ট নহে বরং এই হুকুম প্রত্যেক হাদীছেই চলিতে পারে যেই সকল হাদীছের মধ্যে কোন দেশবাসীদের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সহীহ রিওয়ায়াতসমূহে যাহাতে ইয়ামনবাসীদের ফযীলত অথবা অন্য কোন দেশের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে ঐ সকল রিওয়ায়াত দ্বারা বর্তমানেও মানুষেরা ঐ দেশের নাগরিকদের ফযীলত বাহির করে। এইজন্য যে, মূলের প্রভাব শাখা প্রশাখার মধ্যে অবশ্যই হইয়া থাকে। অতঃপর অভিজ্ঞতার দ্বারাও এই কথা জানা যায় যে, ঈমান, ফিকহ এবং হিকমত প্রত্যেক যুগে যেইরূপ ইয়ামনবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে অনুরূপ অন্য কোন দেশে প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেমন পরবর্তী হাদীছে উহার দিকে ইঙ্গিত হইবে। হাদীছে মর্মার্থের সঠিকতা নির্ণয়ের জন্য এতখানিই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা যাহাকে চাহেন তাহার প্রতিই রহমত বর্ষণ করেন। সুতরাং হাদীছকে সেই যুগের ইয়ামনবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট করিবার কোন যুক্তি নাই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের ইয়ামনবাসীর এই গুণাবলী ছিল। আল্লাহ তা'আলার রহমত অনেক প্রশস্ত।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামনবাসীদের প্রশংসা করিবার পর উহার বিপরীত রবীআ ও মুযার গোত্রদ্বয়ের তিরস্কার করেন। তাহারা মদীনার পূর্ব দিকে বসবাস করে। তাহারা অধিক উটের মালিক এবং উঠের লেজের কাছে তাহাদের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। তাই দুনিয়ার আসবাবের প্রতি মত্ততা এবং সম্পদের দাপটে ঈমান ওয়ালাদের সঙ্গলাভে বঞ্চিত থাকে এবং জন্তু জানোয়ারের সহিত অধিক থাকার কারণে তাহাদের মধ্যে জন্তু জানোয়ারের স্বভাবের প্রভাব পড়িয়াছে এবং তাহাদের অন্তর পাষাণ হইয়া গিয়াছে। তাই ঈমান ওয়ালাদের সহিত শত্রুতা রাখে এমন কি যাহারা ঈমান গ্রহণে মদীনা আসেন তাহাদের উপর অত্যাচার করে। এই জন্যই তাহাদিগকে শয়তানের দুই শিংয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কারণ পূর্ব দিকে যখন সূর্য উদয় হইতে আরম্ভ করে তখন শয়তান স্বীয় মাথার দুই পার্শ্ব সূর্যের উপর রাখিয়া দেয় যাহাতে সূর্য পূজারী কাফেরদের সিজদা তাহাদের লাভ হইয়া যায়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, শয়তানের দুই শিং দ্বারা মর্ম তাহার মাথার দুই কোণ। আর কেহ কেহ বলেন, উহার দুই দিক যেই দুইদিকে মানুষকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য প্রেরিত হয়। আর কেহ কেহ বলেন, উহা দ্বারা কাফিরদের দুই সম্প্রদায় মুযার এবং রবীআর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই দুইটি সম্প্রদায় মদীনার পূর্ব পার্শে বসবাস করিত। তাহারা সম্পদের অধিকারী ছিল এবং অন্তর ছিল খুবই শক্ত ও অমনোযোগী। এই কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে যে, পূর্ব দিকে শয়তানের প্রভাব অধিক হয়। তাই পূর্ব দিকে ইসলামের প্রচার বিলম্ব হইবে। ফিৎনা-ফাসাদও পূর্ব দিকেই অধিক হইবে। যেমন অন্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, কুফরের মাথা পূর্ব দিকে। অবশ্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় মদীনার পূর্ব দিকে অবস্থিত সকল দেশের অবস্থা এইরূপই ছিল এবং ঈমানের দিকেও তাহারা বেশ পিছাইয়া ছিল। অবশ্যই পরবর্তী সময়ে মদীনার পূর্ব দিকে অবস্থিত দেশসমূহেও ইসলামের প্রসার লাভ করিয়াছে এবং বড় বড় মুহাদ্দিছ জন্ম লাভ করিয়াছেন। কিন্তু

ফিৎনা-ফাসাদ অন্যদিকের তুলনায় অধিক হইতে যাইতেছে। আর যখন দাজ্জাল বাহির হইবে তখন পূর্ব দিক হইতেই বাহির হইবে। আর ঐ সময় কুফরের আধিক্যও পূর্ব দিকেই হইবে এবং বড় বড় ফিৎনা-ফাসাদ সংঘটিত হইবে। হে করুণাময়! আমাকে এবং আমাদের মুসলিম ভাইদিগকে ফিৎনা-ফাসাদ ও দাজ্জালের প্রভাব হইতে হিফাযত করুন।

٩٠ حدثنا أبو الربيع الزهراني قال انا حماد قال نا أيوب قال نا محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية -

হাদীছ-৯০. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন), আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ রবী আয-যাহরানী (রহঃ)। তিনি--- হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ ইয়ামনবাসীরা আসিয়াছে। তাহাদের হৃদয় খুবই কোমল। ঈমান, দ্বীনের জ্ঞান এবং হিকমত ইয়ামনবাসীদের মধ্যেই রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

সহীহ বুখারী শরীফে এই বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বনী তামীমকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিলেনঃ হে বনু তামীম! তোমাদের সুসংবাদ আছে। হতভাগ্যরা সম্পদের সুসংবাদ বলিয়া বুঝিয়াছিল। তাই তাহারা বলিয়া উঠিল আচ্ছা দিন যাহা দিবার। তাহাদের এই নীচমনা স্বভাবটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট খুবই অপছন্দ হইল। এমন সময় ইয়ামন হইতে এক জামাআত আগমন করিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, বনু তামীম তো সুসংবাদ গ্রহণ করে নাই, লও তোমরা উহা গ্রহণ কর। তাহারা বলিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা উহা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলাম। ইহা বলিয়া তাহারা আরয করিলেন, جئنا لنتفقه في الدين। (আমরা কেবল দ্বীনে শরীআতের মাসআলা মাসায়েল বুঝিবার উদ্দেশ্যেই আপনার পবিত্র দরবারে হাযির হইয়াছি।) তাহাদের এই উক্তি দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তাহাদের হৃদয় দ্বীন ও দ্বীনের আহকাম গ্রহণের জন্য কতখানি যোগ্য ছিল। যেই সুসংবাদ তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে, উহাতে কোন প্রকার বিবেচনা, আলোচনা ও বিস্তারিত অবগত হওয়া ছাড়াই গ্রহণ করিলেন এবং নিজেদের আগমনের মূখ্য উদ্দেশ্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে পেশ করিলেন যে, শুধু শরীআতের জ্ঞান অর্জনই উদ্দেশ্য। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের এই প্রশ্নহীনভাবে নবীর সুসংবাদকে গ্রহণ করায় খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাদের গ্রহণ সামর্থ ও মানসিক শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেনঃ ঈমান, ফিকাহ এবং হিকমত তাহাদেরই ভাগে। আর এই বিষয়টিকেই আলোচ্য হাদীছে কোমল হৃদয় দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কোমল হৃদয় মুমিনের একটি বৈশিষ্ট্য। উহার বিপরীত কঠোর ও পাষাণ অন্তর। এই প্রকার হৃদয় উপদেশ গ্রহণের যোগ্যতা নাই বরং উহা শুকনা পাথরের ন্যায়, যাহা বৃষ্টিকণাকে গ্রহণ করে না। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ "অতঃপর এই ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হইয়া গিয়াছে। তাহা পাথরের ন্যায় অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে তো এমনও আছে; যাহা হইতে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যাহা বিদীর্ণ

হয়, অতঃপর তাহা হইতে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যাহা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে খসিয়া পড়িতে থাকে।" (সূরা বাকারাহ–৭৪)

এই আয়াতে অন্তরের কঠোরতা এবং উহার বিভিন্ন স্তরের একটি বাগ্মি উপমা দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, অন্তরের কঠোরতা ও পাষাণত্ব ইহা যে, উহার মধ্যে ক্রিয়াশীলতা ও প্রভাব স্বীকারের কোন ক্ষমতা থাকে না, দ্বীনকে অনুধাবনের জন্য উহাতে কোন চলচ্ছক্তি নাই এবং আল্লাহ তা'আলার ভয় হইতে সম্পূর্ণ শূন্য থাকে। ইহাই নির্বোধ পাষাণ অন্তর যাহা হইতে হিদায়েতের প্রশ্রবণ তো কি গড়াইবে? হিদায়েতের কোন কণাও উহা হইতে পড়িবে না। পাষাণ হৃদয় তো শক্ত পাথর হইতেও উর্ধে। কারণ পাথরের মধ্যেও কোন না কোন প্রভাব ও কার্যকারীতা এবং কিছু না কিছু চলচ্ছক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু পাষাণ হৃদয় এইরূপও নহে।

পক্ষান্তরে মুমিনের অন্তর, মুমিনের অন্তরের মধ্যে কোমলতা এবং গ্রহণ ক্ষমতা গুণ বিদ্যমান থাকে। আর এই গুণ কেবল তাহার অন্তর পর্যন্তই সীমিত থাকে না বরং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সে সহজ প্রকৃতি, কোমল মেজাজ, মৃদু স্বভাব, ভদ্রতা, দানশীলতা, প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা, মনুষ্যত্ব এবং প্রত্যেক পরিচিত ও অপরিচিতের প্রয়োজনীয় কথা শ্রবণ এবং গ্রহণকারী হয়। এমন কি মুসলমানদের জন্য সর্বদা রহমত এবং কুফরের বিরুদ্ধে দেহ বিশিষ্ট বজ্র কঠোর, কুরআন মজীদের আয়াত।

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

(কাফিরদের প্রতি কঠোর নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল)–এর মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল গুণাবলী ইয়ামনবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রশংসার ক্ষেত্রে বলিয়াছেন, ঈমান রহিয়াছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে।

আলোচ্য হাদীছে আরো বর্ণিত হইয়াছে যে, ফিক্হ (দ্বীনের প্রজ্ঞা) রহিয়াছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে। এখানে ফিকাহ দ্বারা দ্বীনের বোধগম্য ও বুঝ মর্ম। আর শরীআতের পরিভাষায় ফিকাহ হইতেছে ঐ মূলনীতি জানার নাম যাহা দ্বারা আহকামে শরীআতের আমলসমূহ দলীল প্রমাণসহ জানা যায়।

আর যে হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, হিকমতও রহিয়াছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে। এই বিষয়ে কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে। কিন্তু সর্বোত্তম অভিমত হইতেছে যে, হিকমত ঐ জ্ঞানকে বলে যাহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পরিচিতি লাভ হয় এবং উহা দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায় এবং নফস তথা আত্মা শুদ্ধ হয় এবং হক জানা যায়। আর আমল করিবার তাওফীক হয় এবং কুপ্রবৃত্তির বাসনা হইতে বাঁচা যায়। হাকীম ঐ ব্যক্তি যাহার মধ্যে উল্লেখিত সকল গুণবিদ্যমানথাকে।

আবূ বকর বিন দরীদ (রহঃ) বলেন, যেই বাক্য উপদেশ অথবা ভয় প্রদর্শনের জন্য হয় এবং যেই কথা কল্যাণের দিকে নিয়া যায় এবং মন্দ হইতে বাঁচাইয়া রাখে উহাই হিকমত। (নববী)

সিরাজুল ওহহাজ কিতাবে আছে যে, হিকমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর হাদীছ শরীফসমূহকে বলা হয় যাহা আল্লাহ তা'আলার কালাম কুরআন মজীদের পরই উহার স্থান। আর এক জামাআত সলফে সালেহীন (রহঃ) আয়াত ويعلمهم الكتاب والحكمة (এবং তাহাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন) এর الحكمة শব্দের তফসীর হাদীছ দ্বারা করিয়াছেন। অনুরূপ আয়াতঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

অর্থাৎ "আপনি আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে আহবান করুন জ্ঞানগর্ভ কথা ও উত্তম উপদেশসমূহের দ্বারা।" (সূরা নহল–১২৫)

এই আয়াতে উল্লেখিত حكمة দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর হাদীছ মর্ম। আর অন্য হাদীছে

বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন কোন কবিতা হেকমত পূর্ণ উহার মর্ম হইতেছে যে, যেই সকল কবিতা হাদীছের অনুকূলে এবং ভাল উহা হিকমত। আর যাহা হাদীছের বিপরীত উহা মন্দ। উল্লেখিত হিকমত দ্বারা যে হাদীছে রসূল মর্ম ইহার একটি প্রমাণ ইহাও যে, ফিকাহ এর সহিত বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ ফিকাহ হাদীছে রসূলের নিদর্শনসমূহেরএকটি।

বলাবাহুল্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে ইয়ামন এবং ইয়ামনবাসীদের সাক্ষ্য প্রদান যে, তাহাদের মধ্যে ঈমান, হাদীছ এবং ফিকাহ রহিয়াছে। ইহা এত বড় ফযীলত যে, উহার চাইতে বড় অন্য কোন ফযীলত হইতে পারে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

৯১ حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا ابن عدى ح وحدثنى عمرو الناقد قال ثنا اسحق بن يوسف الازرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله -

হাদীছ-৯১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ)--- (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমর আন নাকিদ (রহঃ)। তাহারা----হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ---পরবর্তী অংশ উপরোল্লেখিত হাদীছেরঅনুরূপ।

৯২ وحدثنى عمرو الناقد وحسن الحلوانى قالا حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال ثنا ابى عن صالح عن الاعرج قال قال ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم اهل اليمن هم اضعف قلوبا وارق افئدة الفقه يمان والحكمة يمانية -

হাদীছ-৯২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আমর আন নাকিদ এবং হাসান আল হুলওয়ানী (রহঃ)। তাহারা উভয়ে---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমাদের নিকট ইয়ামনবাসীরা আসিয়াছে।[১] তাহারা নম্র অন্তর ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। [২] ফিকহ (দ্বীনের প্রজ্ঞা) ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়ামনবাসীদেরমধ্যেইরহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(হাদীছ নং৯০ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)

টীকা-১· اتاكم اهل اليمن । (তোমাদের নিকট ইয়ামনবাসীরা আসিয়াছে) আলোচ্য হাদীছে ইয়ামনবাসীদের এই ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা কোমল হৃদয়ের অধিকারী। আর এই স্বাতন্ত্র শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের দ্বারা অন্যান্যদের অশ্রেষ্ঠত্ব হইবার প্রমাণ করে না। বরং মানুষের স্বভাব এবং মেজাজ বিভিন্ন হয়। ফলে কাহারও উপর কোন বিশেষ গুণ প্রভাবশালী হইতে পারে। উদাহরণতঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর উপর করুণা গুণ প্রভাবশালী ছিল। শরীআতের আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে কঠোরতা করিবার গুণ হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর স্বাতন্ত্র ছিল। হযরত ওছমান (রাযিঃ)-এর উপর লজ্জাশীলতার গুণ প্রভাবশালী ছিল। হযরত আলী (রাযিঃ)-এর স্বতন্ত্র গুণ ছিল উত্তম বিচার করা। আমানত হযরত আবূ ওবায়দা (রাযিঃ)-এর স্বাতন্ত্র গুণ এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর উপর মুজাহিদা গুণ প্রভাবশালী ছিল। কাজেই এই স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনার দ্বারা অন্যান্যদের মধ্যে এই গুণ নাই বলিয়া বুঝায় না। এই ব্যাখ্যার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করিলে উথাপিত প্রশ্নাদি নিজে নিজেই দূর হইয়া যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

টীকা-২· اضعف قلوبا وارق افئدة । قلب এবং فواد শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ একই অর্থাৎ অন্তর বা হৃদয়।

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

৯৩ حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء فى اهل الخيل والابل الفدادين اهل الوبر والسكينة فى اهل الغنم ـ

হাদীছ—৯৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ)। তিনি...হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কুফ্‌রের কেন্দ্র পূর্ব দিকে। আর উচ্চস্বরে চিৎকারকারী গ্রাম্য পশুপালক ঘোড়া ও উট ওয়ালাদের মধ্যে অহংকার ও দাম্ভিকতা রহিয়াছে। আর নম্রতা রহিয়াছে বকরী পালকদের মধ্যে।[১]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

সর্বশেষ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর এরশাদঃ "কুফ্‌রের কেন্দ্র তথা মূল পূর্ব দিকে। ইহা দ্বারা কঠোর অগ্নি পূজারী কাফির দল যাহারা মদীনার পূর্ব দিকে বসবাসরত পারস্য দেশ এবং তৎসংলগ্ন আরব এলাকাসমূহের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। পারস্য দেশের লোকেরা শক্তি ও সামর্থে সবল থাকিবার দরুণ বড় অহংকারী ও দাম্ভিক ছিল। এমন কি তাহাদের কুখ্যাত রাজা সাইয়্যেদুল মুরসালীন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর পবিত্র পত্রখানা ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছিল। দাজ্জাল মদীনার পূর্ব দিকে অবস্থিত রিসতাবাযা (رستا باذ) নামক গ্রাম হইতে প্রকাশিত হইবে।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

তবে কেহ কেহ বলেন যে, فواد - قلب এর বিপরীত এবং উহা قلب এর চক্ষু। আর কেহ কেহ বলেন فواد বাতেন কল্‌বকে বলে। আর কেহ কেহ বলেন فواد কল্‌বের পর্দা। হাদীছে বর্ণিত ضعف قلوبا (দূর্বল অন্তর) মর্ম নহে যাহা হাকীমদের নিকট দোষনীয়। বরং উহার মর্ম হইতেছে যাহার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ভয়, বিনয় এবং উপদেশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে এবং কঠোরত্ব ও পাষাণত্ব হইতে পবিত্র।

অত্র পৃষ্ঠার টীকা

টীকা-১· والسكينة فى اهل الغنم (আর নম্রতা রহিয়াছে বকরী ওয়ালাদের মধ্যে) জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বকরীর স্বভাব খুবই কোমল ও নম্র। হালজোতে ব্যবহার করা যায় না। সাধারণতঃ দরিদ্রগণই উহাদের পালন করে। ইহা গর্ব করা যায় এমন সম্পদ নহে। ফলে উহাদের পালনকারীদের অন্তর বিনয়ী হয়। পক্ষান্তরে ঘোড়া ও উটের মেজায অনেকটা মন্দ। তবে খুবই মূল্যবান এবং উহাদের লালন-পালনও অধিকাংশ সম্পদশালীরা করে। ফলে উহাদের মন্দ স্বভাব এবং সম্পদের প্রাচুর্য্যের প্রভাব উহাদের পালনকারীদের অন্তরে অহংকার ও দাম্ভিকতা সৃষ্টি করে। আর কেহ কেহ বলেন যে, বকরী ওয়ালা বলিয়া ইয়ামনবাসীদের বুঝানো হইয়াছে। কারণ তাহাদের অধিকাংশই বকরী পালন করে। পক্ষান্তরে মদীনার পূর্ব দিকে বসবাসরত রবীআ ও মুযার গোত্রদ্বয় উট পালন করে।

ইমাম ইবন মাজা (রহঃ) রিওয়ায়াত করেনঃ

عن ام هانى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذى الغنم فان فيها بركة

"হযরত উম্মে হানী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, যদি জন্তু পালন করিতে হয় তবে বকরী পালন কর, কেননা উহাতে বরকত রহিয়াছে।"

তুহফাতুল আখইয়ার কিতাবে আছে যে, জন্তু জানোয়ারের সঙ্গও প্রভাব সৃষ্টি করে। মহিষ এবং উটের স্বভাব অধিকাংশ মন্দ হয় আর বকরীর স্বভাব নম্র এবং অধিকাংশ দরিদ্র লোকগণই পালন করে। এই কারণেই পয়গাম্বরগণ বকরী পালন করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, জন্তু-জানোয়ারের সহিত অত্যধিক সঙ্গ ও ঘনিষ্টতা অবলম্বনকারী উহাদের স্বভাব চরিত্রের কিছু না কিছু উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম ও অন্যান্য)

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, কেহ কেহ বলেন যে, مشرق (পূর্ব) দ্বারা পারস্য দেশকে বুঝানো উদ্দেশ্য। কারণ সেই যুগে পারস্য একটি বিরাট রাজ্য ছিল। আর কেহ কেহ বলেন, উহা দ্বারা নজদের অধিবাসী রবীআ ও মুযার গোত্রদ্বয়কে বুঝানো হইয়াছে। তাহারাও মদীনার পূর্ব দিকেই বসবাস করিত। তাহাদের মন্দ আচরণাবলীর বর্ণনা বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। আর কেহ কেহ বলেন যে, মদীনার পূর্ব দিকে অবস্থিত নজদ, ইরাক প্রভৃতি দেশে প্রথম শতকে যেই সকল মারাত্মক ফিৎনা-ফাসাদ যেমন জঙ্গে জমল, জঙ্গে সিফ্ফীন, বনূ উমাইয়্যার ফিৎনা, বনূ আব্বাসীদের পতন ও লক্ষ মুসলমানের হত্যাকাণ্ড এবং তয়মুর লঙ্গের ফিৎনা ইত্যাদি সংঘটিত হইয়াছে উহার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মদীনার পূর্ব দিকে কেবল কুফরের রাজ্যসমূহই ছিল। অনুরূপ দাজ্জালের যুগেও পূর্ব দিকেই কুফর বিস্তার লাভ করিবে। আর উভয় যুগের মধ্যবর্তী যুগসমূহে বিভিন্ন ফিৎনা-ফাসাদের উৎসস্থল হিসাবে মদীনার পূর্ব দিকেই অধিক হইতে যাইতেছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

৯৪ وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرنى العلاء عن ابيه عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة فى اهل الغنم والفخر والرياء فى الفدادين اهل الخيل والوبر

হাদীছ-৯৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতাইবা ও ইবন হুজুর (রহঃ)। তাহারা---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ ঈমান তো ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং কুফর পূর্ব দিকে। আর নম্রতা বকরী পালনকারীদের মধ্যে রহিয়াছে। আর অহংকার এবং রিয়া উচ্চস্বরকারী ঘোড়া ও উট পালনকারীদের মধ্যে রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(এই অনুচ্ছেদের উপরোল্লেখিত হাদীছসমূহ দ্রষ্টব্য)

৯৫ وحدثنى حرملة بن يحيى قال انا ابن وهب قال اخبرنى يونس عن ابن شهاب قال اخبرنى ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء فى الفدادين اهل الوبر والسكينة فى اهل الغنم -

হাদীছ-৯৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, অহংকার এবং দাম্ভিকতা (হালজোত এবং উট ও মহিষের পশ্চাতে) চিৎকারকারী গ্রামবাসীদের মধ্যে (অধিক) হইয়া থাকে।[১] আর নম্রতা রহিয়াছে বকরী পালনকারীদেরমধ্যে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(এই অনুচ্ছেদের উপরোল্লেখিত হাদীছসমূহ দ্রষ্টব্য)

টীকা-১ اهل الوبر। "وبر" উটের চুলকে বলা হয়। আর উহা উট পালকদের নিকট থাকে, ঘোড়া পালকদের নিকট থাকে না। তাই সম্ভবতঃ উহা দ্বারা ঐ সকল লোক মর্ম যাহাদের নিকট ঘোড়া ও উট উভয়ই থাকে। আল্লামা

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

৯৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ الْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ـ

হাদীছ—৯৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী (রহঃ)। তিনি---ইমাম যুহরী (রহঃ) হইতে উপরোল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তবে তিনি এই রিওয়ায়াতে এতখানি বাক্য অতিরিক্ত বলিয়াছেন— ঈমান রহিয়াছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যেই রহিয়াছে।

৯৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَنَا اَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ جَاءَ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَرَقُّ اَفْئِدَةً وَاَضْعَفُ قُلُوْبًا اَلْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالسَّكِيْنَةُ فِيْ اَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ ـ

হাদীছ—৯৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি ইয়ামনবাসীরা আগমন করিল, এই লোকদের হৃদয় খুবই কোমল এবং অন্তর খুবই নম্র হয়। ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে রহিয়াছে এবং হিকমতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যেই। আর নম্রতা বকরী পালকদের মধ্যে রহিয়াছে এবং অহংকার ও দাম্ভিকতা রহিয়াছে উচ্চস্বরকারী গ্রাম্য উট পালকদের মধ্যে যাহারা সূর্য উদয়ের দিকে (অর্থাৎ পূর্ব দিকে) বসবাস করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(এই অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

৯৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَاكُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ اَلْيَنُ قُلُوْبًا وَاَرَقُّ اَفْئِدَةً اَلْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ رَاْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ـ

হাদীছ—৯৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা এবং আবূ কুরায়ব (রহঃ)। উভয়ে---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমাদের নিকট ইয়ামনবাসীরা আগমন করিয়াছে। তাহারা অন্তরের দিক দিয়া খুবই নরম এবং হৃদয় খুবই কোমল। ঈমান রহিয়াছে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়ামনবাসীদের মধ্যে রহিয়াছে। কুফরের কেন্দ্র স্থল পূর্বদিকে।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেন, اهل الوبر। অর্থাৎ যাহারা اهل المدر। নহে। কারণ আরবীগণ اهل الحضر।(শহরবাসী)কে اهل المدر। দ্বারা বুঝাইয়া থাকেন এবং اهل البادية।(গ্রামবাসী)কে اهل الوبر। দ্বারা বুঝাইয়া থাকেন। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন ঘোড়া উল্লেখ করিবার পর وبر শব্দ লওয়া হইয়াছে অথচ ঘোড়ার وبر থাকে না। আমার প্রদত্ত ব্যাখ্যায় এই প্রশ্ন হয় না। কেননা اهل الوبر। দ্বারা গ্রামবাসী মর্ম। (যাহারা উট, ঘোড়া ও মহিষ পালন করে এবং কৃষি কাজ করে।)

٩٩ وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ـ

হাদীছ—৯৯. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন কুতায়বা বিন সাঈদ এবং যুহায়র বিন হারব (রহঃ)। উভয়ে—আ'মাশ (রহঃ)—এর সূত্রে এই সনদেই উপরোল্লেখিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। কিন্তু এই রিওয়ায়াতে "কুফরের কেন্দ্রস্থল পূর্ব দিকে" এই কথাটি উল্লেখ নাই।

١٠٠ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الشَّاءِ ـ

হাদীছ—১০০. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না—(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন বিশর বিন খালিদ (রহঃ)—তাহারা উভয়ই—আ'মাশ (রহঃ)—এর সূত্রে এই সনদেই হযরত জাবির বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তবে তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, "অহংকার ও দাম্ভিকতা উটওয়ালাদের মধ্যে এবং নম্রতা ও গাম্ভীর্যতা বকরী ওয়ালাদের মধ্যে রহিয়াছে।"

١٠١ حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ ـ

হাদীছ—১০১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহঃ)। তিনি আবূ যুবায়র হইতে, তিনি—হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ অন্তরের কঠোরতা এবং যুলুম অত্যাচার পূর্বাঞ্চলে; আর ঈমান হিজাযবাসীদের মধ্যে রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছে হিজাযবাসীদের প্রশংসা করা হইয়াছে। হিজায আরবের একটি অংশ যাহার মধ্যে মক্কা–মদীনা ও তায়িফ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেনঃ এই হাদীছ ঐ ব্যক্তিদের দলীল যাহারা বলেন যে, ইয়ামন দ্বারা মক্কা–মদীনার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কেননা মক্কা, মদীনা হিজাযের মধ্যেই শামিল রহিয়াছে। অধিকন্তু এই স্থানে হিজায দ্বারা শুধু মদীনা মর্ম হইতে পারে। অন্য হাদীছ দ্বারা ইহার তায়ীদ হয়। যেমনঃ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ অর্থাৎ "নিশ্চয় ঈমান মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে।"

বলাবাহুল্য আলোচ্য হাদীছে হিজাযবাসীদের সহিত ঈমানের সম্পর্ক করা হইয়াছে। ইহার এই মর্ম নহে যে, অন্যান্য সম্প্রদায় বা দেশের সহিত ঈমানের সম্পর্ক নাই। বরং বিশেষ ক্ষেত্রে বা অবস্থায় কোন কোন দেশ বা সম্প্রদায়ের এইরূপ প্রশংসা করা হইয়া থাকে। সুতরাং উপরোল্লেখিত হাদীছসমূহে যে "ঈমান ইয়ামনবাসীদের মধ্যে" বর্ণিত হইয়াছে, উহার সহিত কোন বিরোধ নাই।

পূর্বাঞ্চলের লোকদের অন্তর খুবই পাষাণ ও অসদাচরণীয়। ইহা দ্বারা মদীনার পূর্ব দিকে বসবাসকারী রবীআ ও মুযার কাফির গোত্রদ্বয়ের দিকে ইঙ্গিত হইতে পারে। কেননা তাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আগত লোকগণের প্রতি যুলুম অত্যাচার করিত।

আস-সিরাজুল ওহহাজ কিতাবে আছে যে, এই হাদীছের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের তিরস্কার করা হইয়াছে এবং হিজাযবাসীদের প্রশংসা করা হইয়াছে। আর ইয়ামন হিজাযের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশ পূর্বাঞ্চলের মধ্যে। অবশ্য ইহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের বিষয়। পরবর্তী সময়ে ভারত উপমহাদেশের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়াছেন। ফলে ইসলাম বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই দেশের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক বড় বড় ওলামা, ফুযালা জন্ম নিয়াছেন এবং বহু মুফাসসির, মুহাদ্দিছ যাহারা কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমল করিতেছেন। ইহা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ তিনি যাহাদেরকে চাহেনপ্রদান করেন।

বলাবাহুল্য পূর্বাঞ্চলের মধ্যে পাক-ভারত-বাংলাদেশ ছাড়াও চীন, বার্মা ইত্যাদি বহু দেশ রহিয়াছে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ করিলে দেখা যায় যে, ঈমানের দিক দিয়া পূর্বাঞ্চলসমূহের লোকগণ প্রশংসিত দেশসমূহের লোকগণ হইতে পশ্চাতেই রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তো কেবল কুফর আর কুফরই ছিল। আবার শেষ যুগে দাজ্জালও পূর্বাঞ্চল হইতে প্রকাশ হইবে। তখন কুফরী পূর্বাঞ্চলেই অধিক হইবে। আর মধ্যবর্তী সময়েও ফিৎনা-ফাসাদের দিকে অগ্রগামী রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

باب بيان انه لايدخل الجنة الا المؤمنون وان محبة المؤمنون من الايمان وان افشاء السلام سبب لحصولها ـ

অনুচ্ছেদঃ মুমিন ব্যতীত কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। মুমিনগণের ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর পরস্পর সালাম প্রদানের মাধ্যমে ভালবাসা অর্জনের উপায় হয়

١٠٢ **حدثنا** ابو بكر بن ابى شيبة قال ثنا ابو معاوية ووكيع عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا و لا ادلكم على شئ اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم ـ

হাদীছ—১০২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর পরস্পর একে অন্যকে মহব্বত না করা পর্যন্ত (কামিল) মুমিন হইতে পারিবে না। আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি বস্তু বলিয়া দিব না যাহা করিলে তোমাদের পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি হইবে? তাহা এই যে, পরস্পরের মধ্যে সালামের রীতিকে ব্যাপকতর কর। (অর্থাৎ প্রত্যেক পরিচিত ও অপরিচিত মুসলমানকে সালাম দাও।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ "তোমরা ঈমানদার হইবে না অর্থাৎ কামিল তথা প্রকৃত মুমিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পর মহব্বত রাখিবে।" পরস্পর মহব্বত রাখা কামিল মুমিনের জন্য আবশ্যক। কাজেই কামিল মুমিনগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করিতে থাকিবে তখন পরস্পর অমহব্বতকারী ব্যক্তিবর্গ তাহাদের সহিত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অবশ্য যেকোন স্তরের ঈমানের অধিকারী হইলে সেই ঈমানের বদৌলতে একবার না একবার জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরস্পর মহব্বত সৃষ্টি হইবার জন্য সহজতম ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন যে, তোমরা পরিচিত ও অপরিচিতকে ব্যাপকভাবে সালাম প্রদান কর। সালাম সম্প্রীতি সৃষ্টি হইবার উপায় এবং বন্ধুত্ব সৃষ্টির চাবিকাঠি। সালামের দ্বারা মুসলমানদের অন্তরের মধ্যে একের প্রতি অপরের ভালবাসা জন্মলাভ করে এবং উহার আলামত প্রকাশিত করে। কেননা সালাম মুসলমানদের চিহ্ন যাহা তাহাদেরকে অন্যান্য অমুসলিম জাতি হইতে পার্থক্য করিয়া প্রকাশ করে। ইহা দ্বারা কুপ্রবৃত্তি দমন এবং অন্তরে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হয়। অন্য মুসলমানগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় সহীহ বুখারীর মধ্যে হযরত আম্মার বিন ইয়াসার (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তিনটি গুণ অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে সে ঈমান অর্জন করিয়াছে। "স্বীয় নফসের উপর ইনসাফ তথা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, অন্যান্য সকলকে সালাম প্রদান এবং অভাব অনটনেও দান খয়রাত করা।"

সালামের মধ্যে অপর একটি উপকার হইতেছে যে, উহা দ্বারা ঈর্ষা, শক্রতা এবং দুশমনি দূরীভূত হয় এবং পারস্পরিক ঈর্ষা বিদ্বেষ উঠিয়া যায়, যে ঈর্ষা মানুষের নেক আ'মালকে ধ্বংস করিয়া দেয়। তবে সালাম খালেছ আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে করিবে। কুপ্রবৃত্তির কামনায় নহে, আর না কেবল স্বীয় বন্ধুবান্ধবকে বরং সকল মুসলমানকেই করিতে হইবে। (নববী)

তুখফাতুল আখইয়ার গ্রন্থে আছে যে, জান্নাত লাভ ঈমানের উপর নির্ভরশীল। আর ঈমান মহব্বতের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাত মহব্বতের উপর নির্ভরশীল। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে মহব্বত অর্জন করিবার সহজ পদ্ধতি "আস–সালামু আলাইকুম" প্রদানকে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। সালাম দ্বারা এই কারণে মহব্বত অর্জিত হয় যে, উহা কল্যাণের জন্য দু'আ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সর্ববিধ বিপদাপদ হইতে নিরাপদে রাখুন। ইহা সত্য যে, মানুষ নিজের মঙ্গলের জন্য দু'আকারীকে নিজের উত্তম বন্ধু হিসাবে গণ্য করেন এবং অনুধাবন করেন যে, সে আমাকে মহব্বত করে। হ্যাঁ, অন্যান্য প্রত্যেক বদান্যতা এবং অনুগ্রহ ও মহব্বত অর্জনের উপায় হয় বটে কিন্তু অনুগ্রহ ও বদান্যতা জগতের সকল মুসলমানদের হইতে সম্ভব নহে। আর সালাম খুবই সহজ কথা যাহা প্রত্যেক ব্যক্তি হইতেই হইতে পারে। এই কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামকেই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আফসোস যে, এখন বিস্ময়কর উল্টা যুগ আসিয়া গিয়াছে অজ্ঞতা এবং অহংকারের কারণে কিছু লোক "আস–সালামু আলাইকুম" প্রদান করিলে অসন্তুষ্ট হয় এবং ঈর্ষা পোষণ করে। মহব্বত এবং কল্যাণকামী বস্তু আজ তাহাদের অন্তরের রোগের দরুণ ঈর্ষা, বিদ্বেষের কারণ হইয়াছে।

আল্লামা মুফতী শফী (রহঃ) স্বীয় মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থে লিখিয়াছেন জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের সময় মহব্বত ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থে কোন না কোন বাক্য আদান প্রদান করিবার রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু তুলনা করিলে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, ইসলামী সালাম যতখানি ব্যাপক অর্থবোধক অন্য কোন বাক্য ততখানি নহে। কেননা ইহাতে কেবল মহব্বতেরই প্রকাশ করা হয় না, বরং উহার সহিত মহব্বতের যথার্থ হকও আদায় করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সকল প্রকার বালা–মসীবত হইতে নিরাপদে রাখুন। এই দুআটি আরবদের প্রথা মুতাবিক কেবল জীবিত থাকিবার দু'আ নহে; বরং কল্যাণময় জীবনের দু'আ। অর্থাৎ সকল প্রকার বিপদাপদ হইতে মুক্ত থাকিবার দু'আ। ইহাতে এই বিষয়েরও অভিব্যক্তি রহিয়াছে যে, আমরা ও তোমরা সকলই আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তাঁহার সম্মতি ছাড়া আমরা একে অপরের উপকার করিতে সক্ষম নহি। এই অর্থের দিক দিয়া বাক্যটি একাধারে একটি ইবাদত এবং মুসলমান ভ্রাতাকে আল্লাহ তা'আলার কথা মনে করিয়া দেওয়ার উপায়ও বটে।

এতদসঙ্গে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট মুসলমান ভ্রাতাকে সর্ববিধ বালা মুসীবত হইতে নিরাপদ রাখার দু'আ করে, সে যেন এই অঙ্গীকার করে যে, তুমি আমার হাত এবং মুখ হইতে নিরাপদ, তোমার জান–মাল ও ইজ্জত–আবরুর আমি সংরক্ষক।

ইবনুল আরাবী (রহঃ) স্বীয় আহকামুল কুরআন গ্রন্থে ইমাম ইবন উয়ায়নার এই উক্তি উদ্ধৃতি করিয়াছেনঃ

اتدری ما السلام يقول انت امن منى -

অর্থাৎ "তুমি কি জান যে, সালাম কি বস্তু? সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি বলে যে,আপনি আমার পক্ষ হইতে বিপদমুক্ত।"

সারকথা, ইসলামী সালামের মধ্যে বিরাট অর্থগত ব্যাপ্তি রহিয়াছে। যেমন (ক) ইহাতে আল্লাহ তা'আলার যিকির রহিয়াছে। (খ) অন্যকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করিয়া দেওয়া। (গ) মুসলমান ভাইয়ের প্রতি মহব্বত ও সম্প্রীতি প্রকাশ করা। (ঘ) মুসলমান ভ্রাতার জন্য সর্বোত্তম দু'আ এবং (ঙ) মুসলমান ভ্রাতার সহিত এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া যে, আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না।

বলাবাহুল্য মুসলমানগণ যদি এই বাক্যটিকে একটি সাধারণ প্রথা মনে না করিয়া ইহার প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমল করিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সমগ্র জাতির সংশোধনের জন্য ইহাই যথেষ্ট হইত। এই কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি সালাম প্রদানের জন্য অত্যধিক গুরুত্বারোপ করিয়াছেন এবং ইহাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

١٠٣ وحدثني زهير بن حرب قال ثنا جرير عن الاعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع۔

হাদীছ—১০৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ)। তিনি—আমাশ (রহঃ)—এর সূত্রে এই সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ সেই সত্তার কসম, যাহার কুদরতী হাতে আমার জান, তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।—এই হাদীছের পরবর্তী অংশ (পূর্বে উল্লেখিত) আবূ মুআবিয়া ও ওয়াকী (রহঃ)—এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

باب بيان ان الدين النصيحة

অনুচ্ছেদঃ 'নসীহত তথা আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনাই দ্বীন—এর সারগর্ভ' —এর বর্ণনা

١٠٤ حدثنا محمد بن عباد المكي قال ثنا سفيان قال قلت لسهيل ان عمرا حدثنا عن القعقاع عن ابيك قال ورجوت ان يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه ابي كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم۔

হাদীছ—১০৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ আল মক্কী (রহঃ)। তিনি ১...২...৩...৪ হযরত তামীম আদ—দারী (রাযিঃ)[৫] হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ নসীহতই (অর্থাৎ সদুপদেশ, আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনাই) দ্বীন। আমরা আরয করিলাম, কাহার জন্য (আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনা?) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উত্তরে) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য, তাঁহার কিতাবের জন্য, তাঁহার প্রেরিত রসূলের জন্য, মুসলিম শাসকদের জন্য [৬] এবং মুসলিম জনগণের জন্য।

টীকা—১. عن ابيك অর্থাৎ সুহায়লের পিতা। তাহার নাম আবূ সালিহ।

টীকা—২. ان يسقط عني رجلا অর্থাৎ সনদের মধ্যবর্তী রাবী "কা'কাআ" এর মাধ্যম বাদ পড়িবে। "আমর" এর স্থলে সুহায়ল হইবে। এইরূপ মাধ্যম কম হইলে সনদ উচ্চ হয়।

টীকা—৩. الذى سمعه منه ابى অর্থাৎ সুহায়ল (রহঃ) বলেন, আমি সঠিক পন্থায় ঐ ব্যক্তি হইতে এই হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি যাহার নিকট হইতে আমার পিতা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি হইলেন আতা বিন ইয়াযীদ আল—লায়ছী।

টীকা—৪. ثم حدثنا سفيان عن سهل অর্থাৎ সুহায়ল (রহঃ) কা'কাআ এবং স্বীয় পিতা আবূ সালিহ উভয়ের মাধ্যম কর্তন করিয়া দিয়াছেন। ফলে হাদীছের সনদ সুফিয়ানের আকাংক্ষা হইতেও অধিক উচ্চাঙ্গের হইয়া গিয়াছে।

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

نصح - হইতেছে কোন বস্তুকে ত্রুটিমুক্ত করা। ইহার মর্মার্থ, ইখলাস তথা আন্তরিকতা, সাধুতা, সদুপদেশ ও কল্যাণ কামনা। আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) স্বীয় ফতহুল মুলহিম গ্রন্থে লিখেন যে, 'নসীহতই দ্বীন' ইহা দ্বারা মুবালিগা তথা অতিশয়োক্তি প্রকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে অর্থাৎ দ্বীনের শ্রেষ্ঠ স্থিতি, আন্তরিকতা, সদুপদেশ ও কল্যাণ কামনা। যেমন হজ্জ-এর অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, আরফাই হজ্জ। তাহা ছাড়া ইহা বাহ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেননা প্রত্যেক আমলের মধ্যে যদি আমলকারীর ইখলাস তথা আন্তরিকতা না থাকে তবে উহা দ্বীনের মধ্যে গণ্য নহে। কেননা দ্বীনের যাবতীয় কাজই আল্লাহ তা'আলার জন্য হইতেহইবে।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ইহা আযীমুশ্শান হাদীছ এবং ইহার উপরই ইসলামের স্থিতি। আর কেহ কেহ বলেন, এই হাদীছখানা ইসলামের যাবতীয় বিষয়াবলীকে একত্রিতকারী ঐ চারিখানা হাদীছের মধ্যে একটি। কিন্তু এই অভিমত সহীহ নহে বরং শুধু এই হাদীছখানাই ইসলামের যাবতীয় বিষয়াবলীর কেন্দ্র ও পরিব্যাপ্ত।

ইমাম আবূ সুলায়মান খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, 'নসীহত' একটি সমবেতকারী (جامع) শব্দ। ইহার ন্যায় অন্য কোন শব্দ আরবী ভাষায় খুবই কম। ইহার অর্থ এই যে, যাহার জন্য কল্যাণ কামনা করা হয় তাহার জন্য সকল কল্যাণকে সমবেত করা। অনুরূপ فلاح শব্দটিও আরবী ভাষায় দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রকার মঙ্গলের সমবেতকারী। আর কেহ কেহ বলেন, নসীহত শব্দটি نصح الرجل ثوبه হইতে নিসৃত, অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি স্বীয় কাপড় সিলাই করিয়াছে। নসীহত তথা সদুপদেশ দানকারীর কাজকে সিলাই করিবার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সিলাই করিবার দ্বারা কাপড় যেমন দোষ-ত্রুটিমুক্ত ও সঠিক হয়, অনুরূপ নসীহত দ্বারা অন্যান্য লোকদের দোষ-ত্রুটি দূরীভূত হয় এবং সে শুদ্ধ ও নিরাপদ হয়। উহা হইতেই التوبة النصوحة (অকপট তাওবা)। গুনাহ যেন দ্বীনকে ফাটাইয়া দেয় আর তাওবা দ্বারা উহা সিলাই হয়। আর কেহ কেহ বলেন, উহা نصحت العسل (আমি মধুকে পরিস্কার করিয়াছি) হইতে নিসৃত। অর্থাৎ মধুকে মোম ও বিষ্টা হইতে পরিস্কার করিয়াছি। ইহা দ্বারা মিথ্যা ও কৃত্রিম হইতে পবিত্র কথাকে ঐ বিশুদ্ধ মধুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে যাহাকে মোম ও বিষ্টা হইতে পরিস্কার করা হয়। কিন্তু 'নসীহত' এর ব্যাখ্যায় খাত্তাবী (রহঃ) এবং অন্যান্য ওলামাগণ একটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন, উহার সংক্ষিপ্ত সার বর্ণনা করা হইতেছে।

প্রথমঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য নসীহত তথা আন্তরিকতা এই যে, তাঁহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া ঈমান আনা, তাঁহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক না করা, তাঁহার গুণাবলীতে বে-দ্বীনী অবলম্বন না করা, যত সম্পূর্ণ ও সৌন্দর্য গুণসমূহ রহিয়াছে উহার যাবতীয় তাঁহারই জন্য স্থির করা এবং তাঁহাকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করা। তাঁহার ইবাদতের জন্য যথাযথ চেষ্টা করা এবং তাঁহার নাফরমানী তথা অবাধ্যতা হইতে বাঁচিয়া থাকা। তাঁহার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বন্ধুত্ব এবং তাঁহারই জন্য শত্রুতা রাখা। যাহারা তাঁহার অনুগত বান্দা তাহাদের সহিত সম্প্রীতি ও ভালবাসা রাখা এবং যাহারা তাঁহার নাফরমান বান্দা তাহাদের সহিত শত্রুতা পোষণ করা। যাহারা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করে বা তাঁহার মনোনীত দ্বীনের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। তাঁহার ইহসান তথা অনুগ্রহ স্বীকার করিয়া শোকর আদায়কারী

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

টীকা-৫. عن تميم الدارى সহীহ মুসলিম শরীফে তামীম আদ-দারী হইতে এই রিওয়ায়াত ব্যতীত অন্য কোন রিওয়ায়াত নাই। আর সহীহ বুখারী শরীফে তামীম আদ-দারী (রাযিঃ) হইতে কোন রিওয়ায়াত বর্ণিত হয় নাই।

টীকা-৬. ولائمة المسلمين (এবং মুসলিম শাসকের জন্য) ইমাম তথা শাসনকর্তা যাহাকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার জন্য আহবান করিবে সে ব্যক্তিকেই তাহার আহবানে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব। শক্তি সামর্থ থাকিলে উহা হইতে পশ্চাতে থাকিবার ইচ্ছাধীকার নাই। কেননা গুনাহের বিষয় না হইলে ইমামের আনুগত্য করা ফরয। তাই নেক কাজে আনুগত্য করিবে না কেন? (বাহরুর রায়েক)

হওয়া। যাবতীয় কাজে সত্য, সততা ও ইখলাস তথা আন্তরিকতার উপর থাকা এবং ইহার দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া। আর ঐ সকল লোকদের বা যাহাদের উপর ক্ষমতাবান তাহাদেরকে উৎসাহ প্রদান করা। ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, এই সকল গুণাবলী দ্বারা কেবলমাত্র বান্দারই কল্যাণ অর্জিত হয় আল্লাহ তা'আলার নহে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সার্বভৌম, মহাশক্তিধর ও পূর্ণাঙ্গ পূতঃপবিত্র। কাজেই তিনি নসীহতকারীদের নসীহত হইতে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহ তা'আলার কিতাবের জন্য নসীহত তথা আন্তরিকতা এই যে, এই কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, কুরআন মজীদ মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার কালাম। ইহা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় মনোনীত রসূলের নিকট অবতীর্ণকৃত পবিত্র মহাগ্রন্থ। কোন সৃষ্টির রচিত গ্রন্থ ইহার সমতুল্য হইতে পারে না। আর না কোন সৃষ্টি ইহার অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করিতে সক্ষম। অতঃপর ইহার শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরের মধ্যে দৃঢ় রাখা। উহার হক আদায় করিয়া তেলাওয়াত করা। উহাকে সুন্দর স্বরে পড়া এবং ভাবাবেগের সহিত ইহার হরফসমূহকে উত্তমভাবে আদায় করা। যাহারা কুরআন মজীদের মধ্যে তাহরীফ তথা পরিবর্তন করিতে অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় তাহাদের প্রতিরোধ করা এবং ব্যাখ্যা দ্বারা তাহাদের বাতিল মত খণ্ডন করা। আর যাহারা কুরআন মজীদের উপর প্রশ্ন বা ঠাট্টা করে তাহাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া। যে সকল বিষয়বস্তু ইহার মধ্যে আছে উহাকে সত্যায়িত করা। ইহার আহকামের বিষয়ে সচেতন থাকা। উহার জ্ঞানসমূহ এবং উদাহরণসমূহকে উত্তমভাবে অনুধাবন করা। উহার উপদেশাবলীর উপর চিন্তা করা এবং আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুতপূর্ণ রহস্যাবলীর মধ্যে গভীর চিন্তা ও ধ্যান করা। উহার মধ্যে যে সকল আয়াত স্পষ্ট (محكم) উহার উপর আমল করা (অর্থাৎ হালাল ও হারাম বর্ণিত আয়াত এবং আহকামের আয়াতসমূহ)। আর যে সকল আয়াত মুতাশাবাহ (অর্থাৎ এতিকাদী আয়াতসমূহ) উহার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করা (অর্থাৎ উহার প্রকাশ্য অর্থের উপর বিশ্বাস করিয়া হাকীকত তথা মূলতত্ত্বের বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নিকট সোর্পদ করা। আর মুতাশাবাহ আয়াতের কোনরূপ জটিল ব্যাখ্যা অথবা পরিবর্তন অথবা অস্বীকার না করা।) কুরআন মজীদের আয়াত 'আম, খাস, নাসেখ ও মনসূখ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়া। কুরআনী জিন্দিগীর দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া।

তৃতীয়ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নসীহত তথা আন্তরিকতা এই যে, তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও প্রেরিত সত্য রসূল বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করা এবং স্বীকার করা। আর তিনি দ্বীনে শরীআতের যাহা কিছু নিয়া প্রেরিত হইয়াছেন উহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই মুতাবিক আমল করা। তাঁহার নির্দেশ পালন করা। তিনি যে সকল বিষয় হইতে নিষেধ করিয়াছেন উহা হইতে বিরত থাকা। তাঁহার (আনীত দ্বীনে শরীআতের) সাহায্য করা। যদিও তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন (তথাপি তাঁহার জীবদ্দশায় যেইরূপ সাহায্য করা বাঞ্ছনীয় ছিল অনুরূপ দ্বীনে শরীআতের সাহায্য করা)। তাঁহার প্রতি বৈরীভাব পোষণকারীদের সহিত শত্রুতা রাখা এবং তাঁহার অনুসারীগণকে ভালবাসা ও তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখা। তাঁহার মর্যাদাকে উচ্চ বুঝা এবং তাঁহার হককে শ্রদ্ধা করা। তাঁহার প্রদর্শিত পথ ও সুন্নাতকে জীবিত করা অর্থাৎ সুন্নাতের প্রচার ও প্রসার করা এবং নিজেও সুন্নাত মুতাবিক চলা। তাঁহার আনীত শরীআতের উপর যে কেহ অপবাদ লাগাইতে চেষ্টা করিবে তাহার উপযুক্ত জবাব দেওয়া এবং প্রতিহত করা। তাঁহার শরীআতের ইলমকে বিস্তার করা। তাঁহার শরীআতের বিষয়াবলীর উপর গভীর চিন্তা করা এবং উহার দিকে লোকগণকে দাওয়াত দেওয়া। শরীআতকে শিক্ষা করা এবং অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার যথাযথ চেষ্টা করা। উহার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা এবং উহা শিক্ষার সময় আদবের সহিত শিক্ষা করা অনর্থক কথা না বলা। যে দ্বীনে শরীআতের জ্ঞানের অধিকারী (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছের আলিম) তাঁহাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করা। জীবন গঠনে তাঁহার নীতি, আমল ও আখলাক অনুসরণ করা। তাঁহার পরিবার পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা রাখা। যে ব্যক্তি তাঁহার পরিবার পরিজন ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-এর সহিত বৈরীভাব ও শত্রুতা পোষণ করে সে ব্যক্তি হইতে পৃথক থাকা। আর যাহারা তাঁহার শরীআতের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করিবার অপচেষ্টায় লিপ্ত তাহাদের হইতে পৃথক

থাকা (অর্থাৎ তাহাদের সহিত অংশীদার না হওয়া) এবং তাহাদের সাহায্য না করা বরং তাহাদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করা।

চতুর্থঃ মুসলিম হাকিম তথা শাসনকর্তাদের জন্য নসীহত তথা কল্যাণ কামনা এই যে, সত্য ও হক কথায় তাহাদিগকে সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন করা। তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করা এবং সৎ পরামর্শ দেওয়া। শরীআত পরিপন্থী কোন কাজ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলে নম্রতা, ভদ্রতা ও বিনয়ের সহিত সংশোধনমূলক নসীহত করা। মুসলমানগণের ন্যায্য হক অধিকার হইতে উদাসীন ও বেখবর প্রত্যক্ষ করিলে তাহাদিগকে উহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া। তাহাদের সহিত বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা না করা এবং জনগণের অন্তর তাহাদের আনুগত্যের দিকে আসক্ত করা।

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, তাহাদের জন্য নসীহত তথা কল্যাণ কামনা ইহাও যে, তাহাদের পশ্চাতে নামায পড়া। তাহাদের সহিত থাকিয়া কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। তাহাদের নিকট যাকাতের অর্থ জমা দেওয়া। তাহাদের পক্ষ হইতে (ঘটনাক্রমে সামান্য) যুলুম, অত্যাচার ও মন্দ কাজ পাওয়া গেলে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ না করা। মিথ্যা তোষামোদ দ্বারা তাহাদেরকে অহংকারী না করা। নেক কাজ করিবার তাওফীক প্রদানের জন্য মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে তাহাদের জন্য দু'আ করা। আর এই সকল নসীহতসমূহ ঐ অবস্থায় যে, যদি মুসলমানদের ইমাম দ্বারা সরকারী কর্মকর্তা ও শাসনকর্তা ইত্যাদি মর্ম হয় যাহারা মুসলমানদের কর্মসমূহের বন্দোবস্ত করেন। আর ইহাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) আরও বলেন যে, কখনও মুসলমানদের ইমাম দ্বারা দ্বীনে শরীআতের ওলামাগণকে মর্ম নেওয়া হয়। এই অবস্থায় তাহাদের জন্য নসীহত তথা কল্যাণ কামনা এই যে, তাহাদের কথা মান্য করা যাহা কুরআন ও হাদীছের মুতাবিক হয়। তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।

পঞ্চমঃ সাধারণ মুসলমানদের জন্য নসীহত তথা সদুপদেশ এই যে, তাহাদেরকে এমন সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাহা দ্বারা তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত হইতে পারে। তাহাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া। দ্বীনে শরীআত সম্পর্কে অজানা বিষয়াদি তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। হাত ও মুখ দ্বারা তাহাদের সাহায্য সহানুভূতি করা এবং তাহাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা। তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা, বালা-মুসীবত ও অনিষ্টকে দূরীভূত করিবার প্রয়াস চালানো। তাহাদের মঙ্গলের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা। তাহাদেরকে নেক কাজের নির্দেশ করা এবং ভদ্রতা, কোমলতা ও দয়ার্দ্রতার সহিত মন্দ কাজ হইতে তাহাদেরকে বিরত রাখা। তাহাদের মধ্যে যাহারা বয়োজ্যেষ্ঠ বুজুর্গ তাহাদের সম্মান প্রদর্শন করা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া ও সদুপদেশ প্রদান করিতে থাকা। তাহাদের সহিত প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা না করা। তাহাদের সহিত হিংসা বিদ্বেষ না রাখা। আর তাহাদের জন্য উহা পছন্দ করা যাহা নিজের জন্য পছন্দনীয়। তাহাদের জন্য উহা অপছন্দ করা যাহা নিজের জন্য অপছন্দনীয়। তাহাদের জান, মাল ও ইজ্জত সম্মানের সংরক্ষণ করা। অনুরূপ যতগুলি কথা নসীহত সম্পর্কিত বর্ণনা করা হইয়াছে উহার প্রতি তাহাদিগকে দাওয়াত দেওয়া। তাহাদের শক্তি সামর্থকে ইবাদতের মধ্যে লাগাইবার চেষ্টা করা। সলফে সালেহীনের মধ্যে এমন অনেক বুজুর্গ ছিলেন যাহারা নসীহত করিতে গিয়া নিজেরা দুনিয়াবী ক্ষতিসমূহ সহ্য করিয়া গিয়াছেন।

ইবন বাত্তাল (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে নসীহতকে দ্বীন এবং ইসলাম বলা হয়। আর দ্বীনের প্রয়োগ আ'মালের উপরও হয় যেমন কথার উপর হয়। কাজেই নসীহত তথা সদুপদেশ ফরযে কিফায়া। উম্মতের প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক উহার আঞ্জাম দিলে অন্যান্য সকলের পক্ষ হইতে দায়িত্ব আদায় হইয়া যাইবে। তিনি আরও বলেন, নসীহত কেবল নসীহতকারীর স্বীয় শক্তি মাফিক তথা উপযোগী আবশ্যকীয় হয়, যখন নসীহতকারীর প্রবল ধারণা হয় যে, তাহার নসীহত গ্রহণ ও নির্দেশের আনুগত্য করিবে এবং স্বীয় নফস অনিষ্ট হইতে নিরাপদ হয় তখন নসীহত [illegible]বে। আর যদি স্বীয় নফস তথা জানের উপর কোন প্রকার অনিষ্ট ও

মসীবতের ভয় থাকে তাহা হইলে নসীহতকারীর ইচ্ছাধীন রহিয়াছে যে, তিনি নসীহত তথা সদুপদেশ ছাড়িয়া দিতে পারেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী ও ফতহুল মুলহিম)

কুরআন মজীদের মধ্যে সদুপদেশ ও কল্যাণ কামনা করা আম্বিয়া আলাইহিস সালামের দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গণ্য করা হইয়াছে।

হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তিনি (হযরত নূহ (আঃ) উত্তরে) বলিলেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি কখনও ভ্রান্ত নই; কিন্তু আমি মহান রব্বুল আলামীনের (মনোনীত) রসূল। তোমাদিগকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাইতেছি এবং তোমাদের (কল্যাণ কামনার্থে) সদুপদেশ দিতেছি, আর আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে এমন সকল বিষয় অবহিত আছি যাহা তোমরা অবগত নহে।" (সূরা আ'রাফঃ ৬১-৬২)

হযরত হুদ (আঃ) বলেনঃ

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ـ

অর্থাৎ "তিনি (উত্তরে) বলিলেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে সামান্যও নির্বুদ্ধিতা নাই, বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের (প্রেরিত) রসূল। তোমাদিগকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাইতেছি, আর আমি তোমাদের বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্খী।" (সূরা আ'রাফঃ ৬৭-৬৮)

হযরত সালেহ (আঃ) বলেনঃ

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তখন (হযরত) সালেহ (আঃ) তাহাদের কাছ হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিলেন এবং (অনুতাপ ভরে) বলিলেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ পৌছাইয়া দিয়াছিলাম এবং আমি তোমাদের কল্যাণই কামনা করিয়াছি। কিন্তু তোমরা হিতাকাঙ্খীদেরকে পছন্দই করিতেছিলে না।" (সূরা আ'রাফঃ ৭৯)

যাহা হউক, আলোচ্য হাদীছের মধ্যে নসীহত এবং কল্যাণ কামনাকে দ্বীন বলা হইয়াছে। অপর দিকে হাদীছে জিব্রাঈল (আঃ)-এর শেষাংশে ইসলাম, ঈমান এবং ইহসানের সমষ্টিকেও দ্বীন বলা হইয়াছে। উভয় হাদীছ সমন্বয় করিয়া প্রত্যক্ষ করিলে এই ফল বাহির হয় যে, ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান সবই "নসীহত" এর অংশ। কাজেই ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের সমষ্টি যেমন দ্বীন অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার প্রেরিত রসূলের হিতাকাঙ্খাও দ্বীন।

উল্লেখ্য যে, نصح لله (আল্লাহ তা'আলার জন্য নসীহত) দুই প্রকার। (১) ফরয এবং (২) নফল। ফরয ইহা যে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং তাঁহার আহকামসমূহ পালনের মধ্যে মনে প্রাণে চেষ্টা করা। যদি কোন ওযর বশতঃ আদায়ে ব্যর্থ হয় তাহা হইল এই সংকল্প রাখা যে যখনই সুযোগ হইবে তখনই উহার কাযা আদায় করা হইবে।

কুরআনে আযীযে এরশাদ হইয়াছেঃ

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ - مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ - وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ ''দুর্বল লোকদের উপর কোন গুনাহ নাই, আর না রুগ্নদের উপর, আর না সে সকল লোকদের উপর যাহাদের খরচ করিবার সামর্থ নাই, যখন এই সকল লোক আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে (এবং আন্তরিকতার সহিত আনুগত্য করে তবে) এই সকল নেক্‌কারদের প্রতি কোন প্রকার অভিযোগ নাই। আর আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।" (সূরা তাওবাঃ ৯১)

যে সকল লোকের অন্তরে نصح لله ورسوله (আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের প্রতি আন্তরিকতা) বিদ্যমান রহিয়াছে সে সকল লোক জিহাদে অংশ গ্রহণ না করিয়াও হিতাকাঙ্খীদের তালিকাভুক্ত হইতে বহির্ভূত হয় না। উল্লেখিত আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অপারগতার দরুণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আ'মাল এবং বিশেষ করিয়া জিহাদের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ফরয হইতেও অব্যাহতি (ساقط) হইতে পারে কিন্তু نصح لله এর দাবী কখনও অব্যাহতি যোগ্য নহে। একজন্য মা'যূর ব্যক্তি হইতে নামাযের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ফরযের আদায় বিলম্ব হইতে পারে বটে, কিন্তু আন্তরিক অনুতাপ এবং কাযা আদায়ের পুরাপুরি সংকল্প তাহার যিম্মা হইতে পতিত ساقط হইতে পারে না। কাজেই نصح لله এর সংক্ষিপ্তসার এই যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তোষে সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁহার অসন্তোষের বিষয়ের উপর অসন্তুষ্ট হওয়া।

নফল নসীহত এই যে, আল্লাহ তা'আলার মহব্বত স্বীয় নফস তথা জানের মহব্বতের উপর ঐ স্তরের প্রাধান্য করিয়া দেওয়া যে, যখন কোন বস্তুর মধ্যে স্বীয় নফস এবং শরীআতের প্রতিদ্বন্দ্বীতা দেখা দেয় তখন শরীআতের প্রাধান্য দেওয়া। ইহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, স্বীয় যাবতীয় আকাংক্ষিত বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের উপর উৎসর্গ করিয়া দেওয়া। (তরজমানুস সুন্নাহ)

١٠٥ وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهٖ

হাদীছ—১০৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহঃ)। তিনি····হযরত তামীম আদ-দারী (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উপরোল্লেখিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

١٠٦ وحدثني أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ نَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ نَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ نَا سُهَيْلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهٖ -

হাদীছ—১০৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন উমায়্যা বিন বিসতাম (রহঃ)। তিনি····হযরত তামীম আদ-দারী (রাযিঃ)-এর সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

١٠٧ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال نا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكوة والنصح لكل مسلم۔

হাদীছ—১০৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি---হযরত জারীর (রাযিঃ)[১] হইতে বর্ণনা করেন। হযরত জারীর (রাযিঃ) বলেনঃ আমি সালাত কায়িম করিবার, যাকাত প্রদান করিবার এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করিবার শর্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট বায়আত করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

নামায এবং যাকাতকে নির্দিষ্ট করিবার কারণ হইতেছে যে, শাহাদাতাইনের পর নামায ও যাকাতই দ্বীনের বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রোকন। তাহা ছাড়া নামায শারীরিক ইবাদত এবং যাকাত মালী ইবাদত। আর উভয়ের মধ্যেই অন্যান্য শারীরিক ও মালী ইবাদত যেমন রোযা ও হজ্জ ইত্যাদি শামিল রহিয়াছে। অধিকন্তু পরবর্তী ১০৯নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত জারীর (রাযিঃ) বলেনঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট শ্রবণ করিবার এবং আনুগত্য করিবার উপর বায়আত গ্রহণ করিলাম। ইহাতে দ্বীনে শরীআতের যাবতীয় আহকাম অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

١٠٨ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم۔

হাদীছ—১০৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, যুহায়র বিন হারব এবং ইবন নুমায়র (রহঃ)। তাহারা---হযরত জারীর বিন আবদিল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার শর্তের উপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর কাছে বায়আত গ্রহণ করিয়াছি।

ফায়দাঃ بيعت বায়আত শব্দের অর্থ বশ্যতা স্বীকার, আজ্ঞানুবর্তী হইবার অঙ্গীকার। হযরত জারীর (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বশ্যতা স্বীকার করার মানেই হইতেছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর আনীত দ্বীনে শরীআতের আজ্ঞানুবর্তী হইবার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে "বায়আত" এর মধ্যে দ্বীনে শরীআতের যাবতীয় আহকাম পালনের অন্তর্ভুক্তি রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

টীকা–১· عن جرير হযরত জারীর (রাযিঃ) হিজরী ১০ম সনের রমযান মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর খেদমতে হাযির হইয়া বায়আত হইবার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। আর কেহ কেহ বলেন যে, হযরত জারীর (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ওফাতের চল্লিশ দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার আকৃতি অতি সুন্দর ছিল বলিয়া তাহাকে এই উম্মতের ইউসুফ বলা হইত। (ফতহুল মুলহিম)

١٠٩ حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قالا حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار

হাদীছ-১০৯. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন সুরায়জ বিন ইউনুস এবং ইয়াকূব আদ-দাওরাকী (রহঃ)। তাহারা উভয়ই----হযরত জারীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বায়আত (আজ্ঞানুবর্তী হইবার অঙ্গীকার) গ্রহণ করিলাম শ্রবণ করিবার এবং মান্য করিবার উপর (অর্থাৎ আপনি যাহা কিছু বলিবেন উহা শ্রবণ করিব এবং সেই মুতাবিক আমল করিব।) অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিলেনঃ এই কথাটিও বল "আমি যতখানি সামর্থ রাখি" (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'পূর্ণাঙ্গ দয়ার্দ্রতারূপে আমাকে সাধ্যানুসারে হুকুম পালনের নির্দেশ দিলেন)। আর প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার শর্তের উপর বায়আত গ্রহণ করিয়াছি। ইয়াকূব (রহঃ) স্বীয় রিওয়ায়াতের মধ্যে ইহা বলিয়াছেন যে, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হযরত সায়্যার (রহঃ)।[১]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

হযরত জারীর (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আদেশ শ্রবণ ও মান্য করিবার উপর বায়আত গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা কিছু বলিবেন তাহা তিনি আমল করিবার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অবশ্য "বায়আত" এর হকও ইহাই। কিন্তু ইহা যে খুবই কঠিন কাজ। অনেক সময় ভুল-ত্রুটি হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই রহমাতুললিল আলামীন পরিপূর্ণ দয়ার্দ্রতায় হযরত জারীর (রাযিঃ)কে বলিয়া দিলেন যে, তোমার সংকল্প যথার্থ তবে তুমি "দ্বীন ইসলামের যাবতীয় নির্দেশ পালনের আজ্ঞানুবর্তী হইবার অঙ্গীকার-এর সহিত এই কথাটি মিলাইয়া বল যে, আমার সাধ্যানুসারে"। তাহা হইলে সাধ্যের বহির্ভূত ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য তোমার 'বায়আত' ত্রুটিপূর্ণ হইবে না।

বলাবাহুল্য হযরত জারীর (রাযিঃ)কে এই শিক্ষা প্রদানের কারণে ইসলামী শরীআতের আহকামের উপর আমল সহজ হইয়াছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বীয় উম্মতের প্রতি অত্যধিক স্নেহশীল হইবার বিষয়টি প্রমাণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ "আমি আপনাকে (রসূল রূপে) সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি।"(সূরা আম্বিয়াঃ ১০৮)

হযরত জারীর (রাযিঃ) স্বীয় 'বায়আত' এর উপর অত্যধিক গুরুত্বসহ আমল করিবার বিষয়টি হাফেয আবুল কাসিম আত-তিবরানী (রহঃ) সনদসহ রিওয়ায়াত করিয়াছেন যাহার সংক্ষিপ্ত এই যে, একদা হযরত জারীর

টীকা-১. قال يعقوب في روايته حدثنا سيار এই বাক্যে একটি সুক্ষ্ম বিষয়ের প্রকাশ করা হইয়াছে যে, হায়শাম মুদাল্লাস রাবী আর তিনি عن سيار বলিয়া হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। মুদাল্লাস রাবী যদি عن শব্দ দ্বারা হাদীছ বর্ণনা করেন তাহা হইলে উহা দলীল হয় না যতক্ষণ না অন্য সূত্রে শ্রবণ প্রমাণিত হয়। তাই ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলিয়া দিয়াছেন যে, এক সূত্রে তাদলীস হইলেও অন্য সূত্রে শ্রবণ রহিয়াছে। কারণ তিনি অত্র হাদীছ দুই জন শায়খ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন-সুরায়জ এবং ইয়াকুব (রহঃ)। রাবী 'সুরায়জ' এর সনদে حدثنا هشيم عن سيار বর্ণিত হইয়াছে এবং রাবী 'ইয়াকুব' এর সনদে حدثنا هشيم قال حدثنا سيار বর্ণিত হইয়াছে। সনদের এই পার্থক্যখানা ইমাম মুসলিম উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। উভয় বাক্য উল্লেখ করিবার কারণে আলোচ্য হাদীছে সনদ মুত্তাসিল হইয়া গেল। সুতরাং হাদীছের সনদে কোন প্রশ্ন নাই। ইহা ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর হাদীছ বর্ণনায় অত্যধিক সতর্কতার প্রমাণ। (শরহে নববী)

(রাযিঃ) নিজ গোলামকে ঘোড়া ক্রয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। তিনি তিনশত দিরহাম মূল্য ধার্য্য করিয়া একটি ঘোড়া ক্রয় করিলেন এবং মূল্য পরিশোধের জন্য বিক্রেতাকে সঙ্গে নিয়া আসিলেন। হযরত জারীর (রাযিঃ) ঘোড়ার মালিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ আপনার ঘোড়াটি তিনশত দিরহাম হইতে অধিক উত্তম, তাই আপনি উহাকে চারিশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করুন। সে আরয করিল, ইহা আপনার ইচ্ছা, আপনি যেই পরিমাণ মূল্য উপযুক্ত মনে করেন তাহাই দিন। হযরত জারীর (রাযিঃ) বলিলেনঃ আমার ধারণা যে আপনার ঘোড়াটি চারিশত দিরহাম হইতে অধিক মূল্য হওয়া উচিত। কাজেই পাঁচশত দিরহামে বিক্রয় করুন। অতঃপর অনুরূপভাবে হযরত জারীর (রাযিঃ) একশত একশত করিয়া বর্ধিত করিতে রহিলেন আর ঘোড়ার মালিক প্রত্যেক বারই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু হযরত জারীর (রাযিঃ) আপনার ঘোড়াটি ইহার চাইতে অধিক মূল্যবান বলিতে বলিতে শেষ পর্যন্ত আটশত দিরহাম পরিশোধ করিয়া উহাকে ক্রয় করিলেন। উপস্থিত লোকদের কেহ জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহা কি করিলেন? (যেখানে বিক্রেতা কম মূল্যেই সন্তুষ্ট সেখানে আপনি নিজেই বাড়াইতে বাড়াইতে অধিক মূল্য পরিশোধ করিলেন। ইহাতে আপনারতো অনেক লোকসান হইয়াছে) হযরত জারীর (রাযিঃ) জবাবে বলিলেনঃ "আমি প্রত্যেক মুসলিমের হিতাকাঙ্খী হইবার শর্তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করিয়াছি।" আর ঘোড়াটির মালিক হইলেন একজন মুসলিম। কাজেই ইহা কি হিতাকাঙ্খী হওয়া যে, সামর্থ্য থাকিতে কম মূল্য দ্বারা ঘোড়াটি ক্রয় করিয়া তাহার ক্ষতি করি? (শরহে নববী)

باب بيان نقصان الايمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية على ارادة نفى كماله ـ

অনুচ্ছেদঃ গুনাহ দ্বারা ঈমানের ক্ষতি হয় এবং গুনাহ করিবার সময় গুনাহগার হইতে ঈমান পৃথক হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা থাকে না।

১১০ حدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولاَنِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هَؤُلاَءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ـ

হাদীছ—১১০. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন হারামালা বিন ইয়াহইয়া বিন আবদিল্লাহ বিন ইমরান আত-তুজীবী (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচার করিবার সময় (কামিল) মুমিন থাকিয়া ব্যভিচার করিতে পারে না।[১] চোর ব্যক্তি চুরি করিবার সময় (কামিল) মুমিন থাকিয়া চুরি করিতে পারে না। মদ্যপায়ীও মদ্যপান করিবার সময় (কামিল) মুমিন থাকিয়া মদ্যপান করিতে পারে না। ইবন শিহাব (রহঃ) বলেন, আমার নিকট আবদুল মালিক বিন আবূ বকর বিন আবদুর রহমান হাদীছ জানান যে, আবূ বকর তাহাদের নিকট এই হাদীছ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) উল্লেখিত বিষয়সমূহের সহিত ইহাও মিলাইয়া বর্ণনা করিতেন যে, লুণ্ঠনকারী (ডাকাত) ঐ সময় (কামিল) মুমিন থাকে না যখন সে মূল্যবান সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে থাকে আর মানুষ (সহায়হীন) কেবল তাহার দিকে দৃষ্টি উঠাইয়া উঠাইয়া তাকায় (অথচ অনিষ্টের ভয়ে তাহাকে বিরত করিতে সমর্থ হয়না)।

টীকা-১.১১০ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن (ব্যভিচারী ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মুমিন থাকে না) প্রায় বিশটি হাদীছ শরীফে মুতাওয়াতির বর্ণিত হইয়াছে যে, গুনাহগার উম্মতকে ক্ষমা করা হইবে এবং কবীরা গুনাহকারী ইসলামের সীমা হইতে বহিস্কার হইবে না। এই বিষয়ে মুতাযিলারা বিরোধ করিয়াছে। তাহারা আলোচ্য হাদীছ হইতে বুঝিয়াছে যে, ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাসই অবশিষ্ট থাকে না। প্রকৃত কথা হইতেছে যে, যদি শব্দসমূহের সন্ধি ও ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনার দিকে লক্ষ্য না রাখা হয় তাহা হইলে মানুষ ভ্রান্ত আকীদার শিকার হইতে বাধ্য। এই কারণেই উসূলীনগণ লিখিয়াছেন যে, যেই সকল শব্দ প্রশংসা এবং তিরস্কারের স্থলে ব্যবহৃত হয় উহাকে মাসআলার উৎস না বুঝা চাই। যেমন আয়াত انما المشركون نجس। (নিশ্চয়ই মুশরিকরা নাপাক)—এর মধ্যে মুশরিকদের জন্য 'নাজাসত' শব্দটি তিরস্কারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইয়াছে। এই কারণেই ফকীহগণ কেবল এই শব্দের ভিত্তিতে তাহাদের উপর 'নাজাসত' এর সকল মাসআলা জারী করেন নাই। (তফহীমুল মুসলিম)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছের মর্মার্থ নির্ণয়ে হাদীছ বিশেষজ্ঞ ওলামাগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। সহীহ অভিমত হইতেছে ওলামায়ে মুহাক্কেকীনের। তাহারা হাদীছের মর্মার্থ এই বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই সকল কবীরা গুনাহ করিবার সময় তাহার পূর্ণাঙ্গ ঈমান থাকে না। আর এইরূপ ব্যবহার অনেক রহিয়াছে যে, একটি বস্তুকে নাই বলিবার দ্বারা উহা পূর্ণাঙ্গ নাই বলিয়া মর্ম গ্রহণ করা হয়। যেমন বলা হয় لا علم الا ما نفع (অর্থাৎ জ্ঞান নহে কিন্তু যাহা উপকারে আসে), لا مال الا الابل সম্পদ নহে তবে উট لا عيش الا عيش الاخرة (বিলাস নাই কিন্তু আখেরাত জীবনের বিলাস)। আর আমি এই তাবীল (সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা) এই জন্য করিয়াছি যে, হযরত আবূ যর (রাযিঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) হইতে হাদীছ বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি لا اله الا الله। (আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বূদ নাই) বলিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে যদিও ব্যভিচার করে বা চুরি করে। আর হযরত ওবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে যে,

انهم بايعوا صلى الله عليه وسلم على ان لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا الى اخره ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فاجره على الله ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب فى الدنيا فهو كفارته ومن فعل ولم يعاقب فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه

অর্থাৎ "সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) চুরি না করিবার, ব্যভিচার না করিবার এবং অন্য কোন গুনাহ না করিবার শর্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করিলেন,---। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় বায়আত পূর্ণ করিবে সে উহার ছাওয়াব আল্লাহ তা'আলার কাছ হইতে লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি এই সকল গুনাহ হইতে কোন গুনাহ করিবে, অতঃপর সে দুনিয়াতে উহার শাস্তি ভোগ করে তবে উহা তাহার গুনাহের কাফ্ফারা হইবে। আর যে ব্যক্তি এই সকল গুনাহের কোন গুনাহ করিবে অতঃপর সে যদি দুনিয়াতে বিচারের মাধ্যমে শাস্তি ভোগ না করে তাহা হইলে আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিয়া দিবেন আর ইচ্ছা করিলে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করাইবেন।

সুতরাং এই দুইখানা হাদীছ পূর্ব দৃষ্টান্তসহ এবং আল্লাহ তা'আলার এই এরশাদঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সহিত শরীক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পাপ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন।" (সূরা নিসা-৪৮)

আহলে হকদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ব্যভিচারী, চোর, দস্যু, হত্যাকারী এবং অন্যান্য কবীরা গুনাহকারী যদি শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত না হয় তাহা হইলে সে মুমিন, তবে তাহার ঈমান অসম্পূর্ণ। যদি খালেস তাওবা করে তবে কবীরা গুনাহের শাস্তি মাফ হইয়া যাইবে আর যদি সে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করে তবে তাহার ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। তিনি চাহিলে ক্ষমা করিয়া প্রথমে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলে গুনাহ পরিমাণ জাহান্নামের শাস্তি প্রদানের পর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। এই সকল প্রমাণাদি বর্তমান থাকায় আমাদিগকে আলোচ্য হাদীছ এবং উহার ন্যায় অন্যান্য হাদীছের মর্মার্থ গ্রহণে তাবীল (সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা) করিতে বাধ্য করিয়াছে। আর তাবীল না করিয়া উপায়ও নাই। কেননা যখন দুইটি হাদীছ এইরূপ বর্ণিত হয় যে, বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী তখন উহার তাবীল করা অত্যাবশ্যক এবং উভয় হাদীছ শরীফের সমন্বয় করা ওয়াজিব। অধিকন্তু এই আলোচ্য হাদীছের তাবীল খুবই স্পষ্ট। কারণ ইহা অভিধানের বহির্ভুত নহে আর না ব্যবহারের বহির্ভুত।

আর কোন কোন হাদীছ বিশেষজ্ঞ ওলামা আলোচ্য হাদীছের অর্থ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ব্যভিচারকে হারাম জানা সত্ত্বেও যদি হালাল মনে করিয়া করে অথবা চুরিকে হারাম জানা সত্ত্বেও যদি হালাল মনে করিয়া করে তাহা হইলে সে প্রকৃতভাবেই মুমিন থাকিবে না। কেননা জানিয়া বুঝিয়া দ্বীনে শরীআতের হারামসমূহকে হালাল মনে করা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সর্বসম্মত মতে কুফরী।

হাসান এবং আবূ জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী (রহঃ) বলেন, 'মুমিন থাকে না' ইহার মর্ম এই যে, প্রশংসিত নাম তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া নেওয়া হয় যেমন মুমিনগণকে আওলিয়া আল্লাহ বলা হয়। তাহাকে ইহা বলা যাইবে না বরং সে মন্দ উপাধিযোগ্য হয় যেমন, ব্যভিচারী, চোর, দস্যু, মদ্যপায়ী ও ফাসেক, ইত্যাদি। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহার অন্তর হইতে ঈমানী নূর ছিনাইয়া নেওয়া হয়। আর এই বিষয়ে একটি মারফূ' হাদীছ বর্ণিত আছে। মহলব (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যে তাহার অন্তর্দৃষ্টি থাকেনা। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, আলোচ্য হাদীছ এবং উহার ন্যায় অন্যান্য যে সকল হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে উহার উপর ঈমান লওয়া চাই এবং যেই অর্থ প্রকাশ করে উহার উপরই (ঈমান) রাখা বাঞ্ছনীয়। আর উহার মর্মার্থ নির্দিষ্টকরণে অধিক চিন্তা করা উচিত নহে। কারণ উহার সঠিক মর্মার্থ আমাদের জানা নাই। আর তিনি ইহাও বলেন যে, আলোচ্য হাদীছ শরীফের মর্মার্থ পূর্ববর্তী মুহাক্কিকগণ যাহা গ্রহণ করিয়াছেন উহাই তোমরা গ্রহণ কর।

শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, উল্লেখিত অভিমতসমূহ ছাড়াও অনেক অভিমত রহিয়াছে যাহা প্রকাশ্য নহে বরং অনেক ভুল ত্রুটিও রহিয়াছে-তাই ঐ সকল অভিমতসমূহ নকল করা হয় নাই। আর যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে সবই প্রবল ধারণাপ্রসূত মাত্র। সব চাইতে সহীহ অর্থ উহাই যাহা আমি সর্বপ্রথম বর্ণনা করিয়াছি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী)

ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ বুখারী গ্রন্থে এই হাদীছের মর্মার্থ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে কামিল মুমিন নহে আর তাহার অন্তরে ঈমানী নূর থাকে না।

١١١ وحدثنى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ يَذْكُرُ مَعَ ذِكْرِ النُّهْبَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَاتَ شَرَفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا إِلَّا النُّهْبَةَ

হাদীছ-১১১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ)। বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়ছ বিন সা'দ (রহঃ) তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না....পরবর্তী অংশ উপরোল্লেখিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই রিওয়ায়াতে نهبة। (লুঠ) শব্দটিও রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে (ذات شرف) (মূল্যবান সামগ্রী) কথাটির উল্লেখ নাই। ইবন শিহাব (রহঃ) বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন সাঈদ বিন মুসায়্যাব ও আবূ সালামাহ বিন আবদির রহমান (রহঃ)। তাহারা উভয়ই হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আবূ

বকর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই রিওয়ায়াতে النهبة। (লুঠতরাজের) কথাটির উল্লেখ করেন নাই।

١١٢ وحدثني محمد بن مهران الرازي قال اخبرني عيسى بن يونس قال نا الاوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف -

হাদীছ-১১২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন মিহরান আর-রাযী (রহঃ)। তিনি.....হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ঐ হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন যাহা উকায়ল (রহঃ) রিওয়ায়াত করিয়াছেন যুহরী হইতে, তিনি হযরত আবূ বকর বিন আবদির রহমান (রহঃ) হইতে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাতে النهبة। (লুঠ) কথাটিও বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ذات شرف (মূল্যবান) কথাটি বলেন নাই।

١١٣ وحدثني حسن بن علي الحلواني قال نا يعقوب بن ابراهيم قال نا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا وقتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا محمد بن رافع قال نا عبد الرزاق قال انا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هولاء بمثل حديث الزهري غير ان العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس اليه فيها ابصارهم في حديث همام يرفع اليه المؤمنون اعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن وزاد ولا يغل احدكم حين يغل وهو مؤمن فاياكم اياكم -

হাদীছ-১১৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী আল-হুলওয়ানী (রহঃ)। তিনি.....(সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তিনি.....এবং মুহাম্মদ বিন রাফি (রহঃ).....তাহারা সকলই হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে; তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যুহরী (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। কিন্তু আলা ও সাফওয়ান বিন সুলায়ম (রহঃ) এই দুই রাবীর বর্ণিত হাদীছে يرفع الناس اليه فيها ابصارهم (মানুষ সহায়হীন কেবল তাহার দিকে তাহাদের দৃষ্টি উঠাইয়া তাকাইয়া থাকে) বাক্যটি নাই। আর হাম্মাম (রহঃ) বর্ণিত হাদীছে يرفع اليه المؤمنون اعينهم فيها وهو ينتهبها مؤمن (লুঠকারী যখন লুঠতরাজে লিপ্ত আর মুমিনগণ স্বীয় চোখ তুলিয়া অসহায়ভাবে তাকাইয়া আছে এমতাবস্থায় সে মুমিন থাকে না,) বাক্যটি উল্লেখ রহিয়াছে। আর হাম্মাম স্বীয় রিওয়ায়াতে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, আর তোমাদের মধ্যে যে কেহ

গণীমতের সম্পদ চুরি করে[১] সে ব্যক্তি চুরি করিবার সময়ে (কামিল) মুমিন থাকে না। সুতরাং উহা হইতে তোমরা বিরত থাক, সাবধান! উহা হইতে বাঁচিয়া থাক।

১৪৭॥ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ -

হাদীছ-১১৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ)। তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচার করিবার সময় (কামিল) মুমিন থাকিয়া ব্যভিচার করিতে পারে না। চোর ব্যক্তি চুরি করিবার সময় (কামিল) মুমিন থাকিয়া চুরি করিতে পারে না। মদ্যপায়ীও মদ্যপান করিবার সময় (কামিল) মুমিন থাকিয়া মদ্যপান করিতে পারে না। কিন্তু ইহার পরও (তাহার জন্য) তাওবার দরজা খোলা রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, দ্বীনে শরীআতের বিশেষজ্ঞ ওলামাগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, মৃত্যু যন্ত্রণা আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত তাওবা গ্রহণযোগ্য। যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে مالم يغرغر (মৃত্যু যন্ত্রণা আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত)। তাওবার তিনটি রোকন। একঃ গুনাহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া। **দুইঃ** কৃত গুনাহের কারণে লজ্জিত হওয়া। তিনঃ পুনরায় এই গুনাহ না করিবার সংকল্প করা। এই তিন রোকন বিশিষ্ট তাওবাই হইতেছে খালেস তাওবা। এইরূপ তাওবা করিবার পর যদি পুনরায় ঐ গুনাহ হইয়া পড়ে তবে পূর্বের তাওবা বাতিল হইবে না। আর যে ব্যক্তি এক গুনাহ হইতে তাওবা করিয়াছে কিন্তু পরে অন্য প্রকার গুনাহ করে তবেও তাহার তাওবা সহীহ। ইহাই আহলে হকগণের সর্বসম্মত অভিমত। কিন্তু মুসলমানগণের মধ্যে কেবল মুতাযিলা (ভ্রান্ত) সম্প্রদায়ই এই মাসআলার বিরোধিতা করিয়াছে।

কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, কতক বিশেষজ্ঞ ওলামাগণ বলেন যে, অত্র হাদীছ শরীফে সকল প্রকার গুনাহের ভৎর্সনা এবং উহা হইতে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। ব্যভিচার দ্বারা ঐ সকল কবীরা গুনাহের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যাহা শাহওয়াত অর্থাৎ কামভাব হইতে সংঘটিত হয়। আর চুরি ও লুঠতরাজ দ্বারা ঐ সকল গুনাহের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যাহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের উপর যুলুম-অত্যাচার হয় এবং তাহাদিগকে অসম্মানিত করা হয় আর দুনিয়ায় নাজায়েয পন্থায় সঞ্চয় করা হয়। আর মদ্যপান দ্বারা ঐ সকল গুনাহের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যেই সকল গুনাহ আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হইতে বিরত রাখে এবং তাহার হক অধিকারসমূহ আদায় হইতে গাফিল করে। (শরহেনববী)

টীকা-১· وَلَا يَغُلُّ " يَغُلَّ " শব্দটি غلول হইতে নিসৃত। ইহার অর্থ গণীমতের সম্পদ হইতে খিয়ানত করা অর্থাৎ চুরি করা। চুরির কথা উল্লেখ করিবার পর غلول (গণীমতের সম্পদে খিয়ানত)-এর উল্লেখ বিশেষ করিয়া এই জন্য করা হইয়াছে যে, গণীমতের সম্পদ মুসলমানগণের প্রাপ্ত পবিত্র সম্পদ। আর জিহাদের সময় উহা পূর্ণভাবে দেখা শোনা এবং সংরক্ষিত না হইবার কারণে চুরি হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকে। (ফতহুল মুলহিম)

١١٥ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ ـ

হাদীছ–১১৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহঃ)। তিনি....মারফূ সনদে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচার করিবার সময় (মুমিন থাকিয়া) ব্যভিচার করিতে পারেনা।....অতঃপর (উপরোল্লিখিত) শু'বার বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

باب خصال المنافق

অনুচ্ছেদঃ মুনাফিকের স্বভাবসমূহ

١١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ نَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

হাদীছ–১১৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)....(সূত্র পরিবর্তন) এবং হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহঃ)....(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ) তিনি....হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তির মধ্যে চারিটি স্বভাব এক সাথে রহিয়াছে সে খালিস অর্থাৎ পুরোপুরি মুনাফিক; আর যাহার মধ্যে উক্ত চারিটির কোন একটি পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিবে যে, তাহার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যতক্ষণ না সে উহা পরিত্যাগ করে। (স্বভাব চারিটি হইতেছে এই যে) যখনই সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখনই চুক্তি করে ভঙ্গ করে, যখনই ওয়াদা করে খিলাফ করে, আর যখনই ঝগড়া করে অশ্লীল ব্যবহার করে। তবে রাবী সুফিয়ানের বর্ণনায় রহিয়াছে وان كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق আর যদি তাহার মধ্যে উক্ত স্বভাবসমূহের কোন একটি থাকে তবে বুঝিবে যে তাহার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব সৃষ্টি হইয়াছে (অর্থাৎ সুফিয়ানের বর্ণনায় হাদীছ শরীফে خلة শব্দের স্থলে خصلة শব্দ রহিয়াছে। আর উভয় শব্দের অর্থ একই)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

نفاق শব্দটি كتاب এর ওযনে, ইহার অর্থ কপটতা ও দ্বিমুখীভাব পোষণ করা। ইসলামী পরিভাষায় সামাজিক সুযোগ–সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখাকে নিফাক বলে। যাহারা দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করিয়াছে

তাহাদেরকে মুনাফিক বলে। মুনাফিক এক দিক দিয়া ইসলামে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়। পবিত্র কুরআন মজীদে তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে এরশাদ হইয়াছে যে,

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ

অর্থাৎ "তাহারা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত। এই দিকেও নহে ঐদিকেও নহে।" (সূরা নিসা-১৪৩)

কুরআন মজীদে যাহাদেরকে মুনাফিক বলা হইয়াছে তাহারা ছিল মদীনার এক শ্রেণীর লোক যাহারা সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিত। বস্তুতঃ তাহারা ছিল আন্তরিকভাবে ইসলামে অবিশ্বাসী কাফির। মুনাফিকরা মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বনাশের জন্য গুপ্তচর (SPY) রূপে কাজ করিত। ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন গোপনীয় তথ্যাবলী অমুসলিম শত্রুদের নিকট ফাঁস করিয়া দিত। তাহারা রাষ্ট্র ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিয়া ভীষণ ক্ষতি করিত। তাহারা ছিল মুসলমানদের গোপন শত্রু। প্রকাশ্য শত্রু হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ বটে কিন্তু গোপন শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই দুষ্কর। তাই মহান আল্লাহ তা'আলা তাহাদের গোপন ষড়যন্ত্র, দুষ্কর্ম ও পরিচয় সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহী মারফত অবহিত করিয়াছেন। এমনকি কুরআন মজীদে তাহাদের নামের উপর 'সূরা মুনাফিকূন' নামে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সূরা ও অন্যান্য বহু আয়াতে তাহাদের অপকর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

বলাবাহুল্য মুনাফিকদের অপরাধ অমার্জনীয় হইলেও পার্থিব জগতে তাহাদের উপর কোন শাস্তি বর্ণিত হয় নাই। কারণ তাহারা যেহেতু বাহ্যিকভাবে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করে, তাই যদি তাহাদের উপর শাস্তি নির্ধারিত হয় এবং সেই মুতাবিক শাস্তি দেওয়া হয় তবে মানুষেরা মনে করিবে যে, মুসলমান হইয়াও নিস্তার নাই। ইসলামের নবী স্বীয় অনুসারীদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করেন। এই ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনার কারণে তাহাদের জন্য পার্থিব কোন শাস্তি নির্ধারিত হয় নাই। কিন্তু আখিরাতে তাহাদেরকে চরম দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে। তাহাদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

অর্থাৎ "নিশ্চয় মুনাফিকদের স্থান (পরকালে) জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। তাহাদের কোন সাহায্যকারী পাওয়া যাইবে না।" (সূরা নিসা-১৪৫)

আর পার্থিব জগতে এই প্রকার মানুষের মান-সম্মান বলিতে কিছুই থাকে না। তাহারা সর্বদা অপদস্ত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় কালাতিপাত করে। কোন দিনই তাহারা সমাজের মানুষের আস্থাভাজন হইতে পারে না।

মহান রব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে সায়্যেদুল মুরসালীন মুনাফিকদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও পরিচয় সুনির্দিষ্টভাবে অবগত হইলেও তিনি সেই মুতাবিক প্রকাশ করিয়া দেন নাই। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র মুবারকও এইরূপ ছিল যে, তিনি কাহারও মন্দ বিষয় প্রত্যক্ষ করিলে বা জানিলে সুনির্দিষ্টভাবে নাম ধরিয়া বলিতেন না বরং ব্যাপকভাবে বলিয়া দিতেন যাহাতে সংশোধন হইয়া যায়। আন্তরিক বিষয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কাহারও জানার বিষয় নহে। তবে তিনি স্বীয় রসূলকে যাহা জানান। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের যে সকল স্বভাব সাধারণতঃ বাহ্যিকভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ পাইয়া থাকে সেই সকল স্বভাবের একটি চিত্র আলোচ্য হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্বভাবগুলি সমষ্টিগতভাবে প্রকৃত মুনাফিকদের স্বভাব বটে কিন্তু এই সকল মন্দ স্বভাব যাহার মধ্যে যেই পরিমাণ পাওয়া যাইবে তাহার মধ্যে সেই পরিমাণ নিফাকের প্রভাব বিস্তার করিবে।

শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের একদল ওলামা আলোচ্য হাদীছ শরীফকে এই হিসাবে জটিল বলিয়াছেন যে, অনেক সময় এই সকল স্বভাব এমন মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায় যে আল্লাহ তা'আলা ও

তাঁহার রসূলের প্রতি সন্দেহাতীত দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন। আর ওলামাগণ এই বিষয়ে ঐক্যমত হইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসসহ মুখ দ্বারা ঈমানের রোকনসমূহের স্বীকার করে অতঃপর হাদীছ শরীফে বর্ণিত চারিটি কাজ করে তাহা হইলে তাহাকে কাফির বলিয়া হুকুম দেওয়া যায় না, আর না মুনাফিক যে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

আলহামদুলিল্লাহ, আলোচ্য হাদীছ শরীফে কোন প্রকার প্রশ্ন বা জটিলতা নাই। তবে ওলামাগণ হাদীছের মর্মার্থ নির্ণয়ে বিভিন্ন অভিমত পেশ করিয়াছেন। আর মুহাক্কেকীন এবং অধিকাংশ ওলামাগণ যাহা বলিয়াছেন উহাই সর্বাধিক সহীহ ও উত্তম। তাহারা বলেন যে, আলোচ্য হাদীছের মর্মার্থ এই যে, এই সকল স্বভাব নিফাকের স্বভাব। কাজেই যাহার মধ্যে এই সকল স্বভাব বিদ্যমান থাকিবে সে স্বভাবসমূহে এবং আচার ব্যবহারসমূহে মুনাফিকদের সদৃশ্য হইবে। কারণ নিফাক হইতেছে বাহ্যিক দিক অন্তরের বিপরীত হওয়ার নাম। আর এই অর্থ কেবল এই স্বভাবসমূহের সহচরদের মধ্যেই বিদ্যমান। তাই এই সকল লোকদের মধ্যেই নিফাক প্রভাব করিবে। ইসলামের মধ্যে এই নিফাক প্রভাব করিবে না। কেননা মুসলমানতো এমন নহে যে, বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে এবং অন্তরে কুফর গোপন রাখে। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্যও ইহা নহে যে, এই স্বভাবসমূহের বহনকারী মাত্রই এমন মুনাফিক যে কাফির, যাহার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলিয়াছেন, যাহার মধ্যে চারিটি স্বভাব পাওয়া যাইবে সে খাঁটি মুনাফিক হইবে। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য যে, এই স্বভাবসমূহের কারণে মুনাফিকদের অনেক সদৃশ হইবে।

কতক ওলামা বলেন যে, যাহার মধ্যে এই সকল স্বভাব প্রাধান্য পাইবে সে মুনাফিক হইবে। আর যাহার মধ্যে ঘটনাক্রমে পাওয়া যায় কিন্তু অভ্যস্থ নহে সে উহার অন্তর্ভুক্ত নহে। হাদীছের মর্মার্থে এই মর্মই উত্তম।

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) কতক ওলামাগণের অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন যে, অত্র হাদীছ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। ফলে নিফাকের হুকুম উক্ত ব্যক্তির জন্যই নির্দিষ্ট। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও নির্দিষ্ট করিয়া অমুক মুনাফিক এইরূপ বলিতেন না বরং তিনি ইঙ্গিত করিয়া এইরূপ বলিতেন যে, ما بال اقوام يفعلون كذا (গোত্রসমূহের কি হইল যে, তাহারা এইরূপ করে) কাজেই এইস্থানে নির্দিষ্ট ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও হুকুম ব্যাপক বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকন্তু اذا حدث كذب (যখনই কথা বলে মিথ্যা বলে) বাক্যে اذا শব্দটি 'সর্বদা' ও 'চলিষ্ণু' এর উপর প্রমাণ করে। কাজেই মুনাফিক ঐ ব্যক্তিই হইবে যাহার মধ্যে এই স্বভাবসমূহ সর্বদা ও চলমানরূপে অভ্যাসে পরিণত হইবে। যেমন كان منافقا خالصًا (সে খাঁটি মুনাফিক হইবে) বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে মুমিন ব্যক্তি উক্ত স্বভাবসমূহের সহিত সম্পর্কিত হয় বটে কিন্তু তাহার ন্যায় অভ্যাসে নহে বরং কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় একবার এইরূপ করে আর একবার বাঁচিয়া থাকে। এক সময় করে অন্য সময় করে না। একটি স্বভাব পাওয়া গেলে অন্যটি পাওয়া যায় না। এইরূপ ব্যক্তিকে মুনাফিক বলা যাইবে না। আল্লামা কিরমানী (রহঃ)-এর কথায়ও উহা প্রায় নিশ্চিত বলিয়া প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, حدث এর مفعول به কে ব্যাপক অর্থ বুঝাইবার জন্য উহ্য করা হইয়াছে অর্থাৎ اذا حدث فى كل شئ كذب فيه (প্রত্যেক বিষয়ে যখনই কথা বলে, মিথ্যা বলে) মুনাফিকদের সাধারণ অভ্যাস ইহাই হইবে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহঃ) ওলামাগণের অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত নিফাক দ্বারা আমলগত (نفاق عملى) কপটতা মর্ম, বিশ্বাসগত কপটতা (نفاق اعتقادى) মর্ম নহে। যেমন অন্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে- قال عمر رض لحذيفة رض هل تعلم فىّ شيئًا من النفاق "হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নিফাকের কিছু বস্তু আমাদের মধ্যে রহিয়াছে ইহা কি তুমি জান?" এখানে নিশ্চিত যে, নিফাক দ্বারা নিফাকে আমলী মর্ম। নিফাকে এতেকাদী নহে।

এক জামাআত ওলামাগণের অভিমত যে, আলোচ্য হাদীছ শরীফে ঐ মুনাফিক মর্ম যাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল। আর তাহারা স্বীয় ঈমানে কথা প্রকাশ করিত অথচ মিথ্যা বলিত

এবং দ্বীনী আমানত খিয়ানত করিত। আর দ্বীনের বিষয়াবলীর ও উহার সাহায্যের ওয়াদা করিত অতঃপর ওয়াদার বিপরীত কর্ম করিত। ঝগড়া কলহে অশ্লীল ব্যবহার এবং অসত্য অনুসরণ করিত। এই অভিমত সাঈদ বিন যুবায়র, আতা বিন আবী রিবাহ, হাসান বসরী (রহঃ)-এর। আর ইহা হযরত ইবন আব্বাস ও ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তাহারা উভয়ই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, আমাদের অধিকাংশ ইমামগণের এই মত।

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) আরও বলেন যে, আলোচ্য হাদীছ শরীফে মুসলমানগণকে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে যাহাতে মুসলমানগণ এই সকল স্বভাব হইতে বাঁচিয়া থাকে। কারণ যাহার মধ্যে এই সকল স্বভাব স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকিবে এবং অভ্যাসে পরিণত হইবে সে প্রকৃত মুনাফিক হইয়া যাইবার প্রবল আশংকা রহিয়াছে।

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, নিফাক দুই প্রকার। এক প্রকার হইতেছে যে, ঈমানকে প্রকাশ করিয়া কুফরী গোপন রাখা। এইরূপ নিফাক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল। দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে যে, বাহ্যিকভাবে দ্বীনের বিষয়সমূহের পক্ষপাতিত্ব করা আর গোপনে উহার সংরক্ষণ ত্যাগ করা। ইহাও নিফাক কিন্তু كفر دون كفر এর ন্যায় نفاق دون نفاق অর্থাৎ নামায ত্যাগকারীকে যেমন কাফির বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা كفر دون كفر (কুফর বটে কিন্তু কট্টর কাফির নহে) মর্ম। অনুরূপ মুসলমানদের কাহারও মধ্যে নিফাকের স্বভাব বর্তমান থাকিলে তাহাকে নিফাক বলা হইবে কিন্তু ইহা দ্বারা মর্ম نفاق دون نفاق (নিফাক বটে কিন্তু প্রকৃত মুনাফিক নহে।) ইহার দরুন ইসলাম হইতে বহিষ্কার হইবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী, ফতহুল মুলহিম)

١١٧ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ـ

হাদীছ-১১৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ)। তাঁহারা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মুনাফিকের আলামত তিনটিঃ যখনই সে কথা বলে তখনই মিথ্যা বলে, যখনই ওয়াদা করে তখনই ভঙ্গ করে এবং যখনই তাহার কাছে (কোন বস্তু বা কথা) আমানত রাখা হয় তখন উহাতে খিয়ানতকরে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

المنافق। শব্দের মধ্যে الف لام। বর্ণদ্বয় عهدى অথবা جنسى হইতে পারে। যদি عهدى হয় তবে আলোচ্য হাদীছ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। আর جنسى হইলে উহার দ্বারা ব্যাপক অর্থ বুঝাইবে যে মুনাফিকের আলামত তিনটি। যাহার মধ্যে বর্ণিত তিনটি গুণ সমষ্টিগতভাবে বিদ্যমান থাকিবে সে মুনাফিক। (বিস্তারিত ব্যাখ্যা হাদীছ নং-১১৬ দ্রষ্টব্য।)

আলোচ্য হাদীছ শরীফে মুনাফিকের আলামত তিনটি বর্ণিত হইয়াছে অথচ পূর্ববর্তী হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে اربع من كن فيه كان منافقا خالصًا। যাহার মধ্যে চারিটি স্বভাব বিদ্যমান থাকিবে সে খাঁটি মুনাফিক হইবে। উভয় হাদীছে বাহ্যিক বিরোধ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। কেননা, একটি বস্তুর কখনও বিভিন্ন আলামত হয় আর প্রত্যেকটি আলামতের মধ্য হইতে একটি গুণ অর্জিত হয়। অতঃপর ঐ আলামতসমূহ আবার কখনও একই বস্তু হইতে পারে আর কখনও বিভিন্ন বস্তু। (শরহেনববী)

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) ইহার জবাব দিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে মুনাফিকদের তিনটি আলামতের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। অতঃপর চারিটির বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন সেই মুতাবিক চারিটি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অথবা, কম সংখ্যা অধিক সংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে কাজেই উভয় হাদীছে কোন বিরোধ নাই। অথবা, তিনটি স্বভাব বিদ্যমান থাকিলে খাঁটি মুনাফিক হয় আর চারিটি স্বভাব বিদ্যমান হইলে খাঁটি মুনাফিকের মধ্যে সম্পূর্ণতা সৃষ্টি হয়। (ফতহুল বারী, ফতহুল মুলহিম)

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত তিনটি আলামতের উপর যথেষ্ট ও সংক্ষিপ্তকরণের কারণ হইতেছে যে, এই তিনটি আলামত হইতে অন্যান্য আলামতের খবর হইয়া থাকে। কেননা মূল দিয়ানত অর্থাৎ সততা তিনটি তথা কথা, কাজ এবং নিয়্যাত-এর মধ্যে সীমিত। কাজেই اذا حدث كذب (যখনই সে কথা বলে তখনই মিথ্যা বলে) দ্বারা কথামূলক ষড়যন্ত্রের উপর সাবধান করা হইয়াছে। আর واذا اؤتمن خان (আর যখনই তাহার কাছে আমানত রাখা হয় তখনই উহাতে খিয়ানত করে) দ্বারা কর্মমূলক ফাসাদের উপর সতর্ক করা হইয়াছে। আর اذا وعد اخلف (যখনই সে ওয়াদা করে তখনই খিলাফ করে) দ্বারা নিয়্যাত জাতীয় ফাসাদ-এর উপর সাবধান করা হইয়াছে। কেননা ওয়াদা খিলাফ ঐ সময় মন্দ ও নিন্দিত হয় যখন ওয়াদা করিবার সময়ই উহার খিলাফ করিবার নিয়্যাত থাকে, যাহা মাকরূহে তাহরিমী। তাই ওয়াদা খিলাফি নিফাকের আলামত হওয়াও নিয়্যাতে ফাসাদ থাকিবার কারণে, এই জন্যই নিয়্যাতের ফাসাদের উপর সতর্ক করা হইয়াছে। আর যদি ওয়াদা করিবার সময় উহা পূর্ণ করিবার নিয়্যাত থাকে অতঃপর কোন অসুবিধার দরুন ওয়াদা রক্ষা করা না যায় উহাতে কোন মাকরূহ নাই আর না উহাতে কোন মন্দ রহিয়াছে। যেমন সুনানে আবী দাউদ ও সুনানে তিরমিযী শরীফে হযরত যায়দ বিন আকরাম (রাযিঃ) হইতে মরফূ' হাদীছে বর্ণিত হইয়াছেঃ

انه صلى الله عليه وسلم قال اذا وعد الرجل اخاه ومن نيته ان يفى له فلم يف له ولم يجئ للميعاد فلا اثم عليه

অর্থাৎ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের সহিত ওয়াদা করে এবং ওয়াদা রক্ষা করিবার নিয়্যাতও তাহার রহিয়াছে অতঃপর (কোন অসুবিধার কারণে) ওয়াদা রক্ষা করিতে পারে নাই এবং নির্ধারিত সময়ে আসে নাই তবে তাহার উপর কোন গুনাহ নাই।" (ফতহুল বারী ও ফয়যুল বারী)। উল্লেখ্য যে হাদীছ শরীফে ওয়াদা দ্বারা ভাল কাজের ওয়াদা মর্ম। মন্দ কাজের ওয়াদা রক্ষা না করা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহসর্বজ্ঞ।

৮ || حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ أَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ -

হাদীছ-১১৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন ইসহাক (রহঃ)। তিনি....হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মুনাফিকদের আলামতের মধ্যে তিনটিঃ যখনই সে কথা কথা বলে মিথ্যা বলে, যখনই ওয়াদা করে খিলাফ করে এবং যখনই তাহার কাছে (কোন বস্তু বা কথা) আমানত রাখা হয় সে তাহা খিয়ানত করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছ শরীফের বাক্য من علامات المنافق ثلاثة (মুনাফিকদের আলামতের মধ্যে তিনটি)

পরিবেষ্টন حصر এর উপর প্রমাণ করে না। বরং ব্যাপক অর্থই বুঝায় যে, হাদীছে উল্লেখিত তিনটি আলামত মুনাফিকদের আলামত। যাহাদের মধ্যে এই সকল আলামত বিদ্যমান থাকিবে তাহার হইতে নিফাকের আলামত প্রকাশ পাইবে। এই কারণেই আলোচ্য হাদীছ শরীফ শ্রবণে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছিল। যদিও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিন্দুমাত্রও নিফাকের স্থান ছিল না। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সাঈদ বিন যুবায়র (রাযিঃ)কে এই হাদীছ শরীফ বড়ই চিন্তান্বিত করিয়াছিল। তাই তিনি ইহা হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) এবং ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর উভয়ই জবাবে বলিলেনঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাকে যেই বিষয়টি চিন্তান্বিত করিয়াছে আমাদেরকেও উহা চিন্তান্বিত করিয়াছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিয়া বলিলেনঃ তোমাদের বিষন্নতার কি কারণ? আর আমি তো এই স্বভাবসমূহ বিশেষভাবে মুনাফিকদের বিশেষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। কাজেই আমার কথা اذا حدث كذب (যখনই সে কথা বলে মিথ্যা বলে) ইহা তো অনুরূপ যাহা আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করিয়াছেনঃ اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ এক আয়াত (যখন এই মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন বলে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ তা'আলার রসূল। আর ইহা তো আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন যে আপনি আল্লাহ তা'আলার রসূল; আর আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, নিশ্চয়ই এই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।) তোমরা কি এইরূপ? আমরা বলিলাম, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ কাজেই তোমাদের উপর এই স্বভাব বর্তাইবে না, তোমরা ইহা হইতে পবিত্র। আর আমার কথা اذا وعد اخلف (যখনই সে ওয়াদা করে খেলাফ করে) ইহা তো আল্লাহ তা'আলার ঐ এরশাদ–এর অনুরূপ যে وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِه হইতে তিন আয়াত (আর তাহাদের মধ্যে এমন কতিপয় ব্যক্তি রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ তা'আলার সহিত অঙ্গীকার করে যে, যদি আমাদিগকে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে প্রচুর সম্পদ দান করেন, তাহা হইলে আমরা অনেক দান–সদকা করিব এবং আমরা উত্তম কাজ করিব। কার্যতঃ যখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে সম্পদ দান করিলেন তখন তাহারা উহাতে কৃপণতা করিতে লাগিল এবং (আনুগত্য করা হইতে) পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল, আর তাহারা তো মুখ ফিরাইয়া রাখিবারই অভ্যস্ত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের শাস্তিস্বরূপ তাহাদের অন্তরসমূহে নিফাক (সৃষ্টি) করিয়া দিলেন, যাহা আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত থাকিবে। এই কারণে যে, তাহারা আল্লাহ তা'আলার সহিত নিজেদের ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছে, আর এই কারণে যে, তাহারা পূর্ব হইতেই মিথ্যা বলিতেছিল।) তোমরা কি এইরূপ? আমরা বলিলাম, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তোমাদের উপর এই স্বভাব প্রযোজ্য না, তোমরা ইহা হইতে পবিত্র। আর আমার কথা اذا اؤتمن خان (যখনই তাহার নিকট আমানত রাখা হয় সে তাহা খিয়ানত করে) ইহা তো ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট আয়াত নাযিল করিয়াছেন যে, اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ আয়াত (অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি এই আমানত (আমার নির্দেশাবলী) পেশ করিয়াছিলাম আসমানসমূহ, যমীন এবং পর্বতসমূহের সম্মুখে, অতঃপর তাহারা ঐ আমানত বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহা হইতে ভীত হইয়া গেল আর মানুষ উহাকে নিজের যিম্মায় গ্রহণ করিল, নিশ্চয় তাহারা (স্বীয় নফসের উপর) যুলুমকারী অজ্ঞ ছিল (এই কঠিন দায়িত্ব গ্রহণের) পরিণাম এই হইল যে, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও নারীদিগকে এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীদিগকে (তাহাদের নিকট আমানত হিসাবে রক্ষিত বস্তুর খিয়ানতের কারণে) শাস্তি দিবেন। (কারণ তাহারাই আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহের বিনষ্টকারী) পক্ষান্তরে তিনি মুমিন পুরুষ ও নারীদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিবেন। আর আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।") সুতরাং প্রত্যেক মানুষ স্বীয় দ্বীনে শরীআতের আমানতদার। সে প্রকাশ্যে ও গোপনে জানাবত হইতে গোসল করে, নামায আদায় করে এবং সাওম পালন করে। কিন্তু মুনাফিকরা এইরূপ করে না কেবল প্রকাশ্যে। তোমরা কি অনুরূপ? আমরা বলিলাম, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাজেই তোমাদের উপর এই স্বভাবও বর্তাইবে না, তোমরা ইহা হইতে পবিত্র। (উমদাতুল কারী)

নিফাক ও উহার প্রকারসমূহঃ

ইসলামের ইতিহাসে এমন একটি মারাত্মক বিপদসঙ্কুল দল অতীত হইয়া গিয়াছে যাহাকে মুনাফিক বলা হয়। মক্কায় কাফিররা তো ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন ছিল যাহারা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করিয়াছে। আর এই সকল মুনাফিক লোকেরা স্বীয় কোমর বাঁধিয়া গোপনে গোপনে ইসলামের মূলোচ্ছেদের পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহারা খাঁটি সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর ন্যায় সবকিছুই করিত। কিন্তু গোপন ষড়যন্ত্রে ইসলামের মূল কর্তনে প্রকাশ্য কাফিরদের হইতেও অনেক অগ্রগামী ছিল। হাফেয ইবন তাইমিয়া (রহঃ) স্বীয় 'কিতাবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মক্কার মধ্যে কাফিররা যেহেতু পুরোপুরি শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাই তাহাদের জন্য প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতায় কোন প্রকার ভয়ের কারণ ছিল না। কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারায় যখন ইসলামের শক্তি ও আড়ম্বর অর্জিত হইল তখন পূর্বের ন্যায় প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা ও শত্রুতা করা কাফিরদের সাহস ছিল না। এই ফলশ্রুতিতেই তাহারা তাহাদের শত্রুতার আকৃতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই স্থান হইতেই নিফাকের উৎপত্তি। অর্থাৎ প্রকাশ্যে মুসলমানদের সহিত থাকা এবং গোপনে কাফিরদের সাহায্যকারী হওয়া। যখন মুসলমানদের সহিত বসে তখন তাহাদের কথা বলে আর যখন কাফিরদের সহিত মিলিত হয় তখন স্বীয় আন্তরিক একাত্মতার বিষয়টি তাহাদের নিকট প্রকাশ করে। তাহাদের এই কুচক্রি দলকে এমন ঘোরতর অনুধাবন করা হইয়াছে যে, তাহাদের নামের উপর কুরআন মজীদের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সূরা 'আল মনাফিকুন' অবতীর্ণ হয়। ইহা ছাড়াও কুরআন মজীদের বহু আয়াতে তাহাদের অপকর্মের বিষয়ে মুসলমানগণকে সতর্ক করা হইয়াছে।

আশ্চর্য যে, কুরআন মজীদে মুনাফিকদের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ থাকা সত্ত্বেও এই দলের সঠিক অনুসন্ধান ও সন্দেহাতীত নির্ণয়করণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে। কতক লোকতো ধারণা করিয়াছেন যে, এই দল মুসলমানদেরই একটি হতভাগা দল ছিল, তবে তাহাদের ঈমানের মধ্যে কামিল মুমিনের আবেগ ছিল না। আর কতক লোক ধারণা করেন যে, তাহারা কাফিরদের কোন একটি দল ছিল, যাহারা মুসলমানদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গুপ্তচর (SPY) রূপে কাজ করিত। এই উভয় অভিমতই একটি স্পষ্ট মূলতত্ত্ব লুপ্ত থাকিবার দরুন সৃষ্টি হইয়াছে। সঠিক কথা এই যে, তাহারা কট্টর কাফিরদেরই একটি দল ছিল যাহারা জন্মগত কাপুরুষ ও ভীরু হৃদয়ের কারণে না প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করিবার ক্ষমতাবান ছিল আর না স্বীয় কুফরী অন্তরের দরুন প্রশস্ত হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণে উদার ছিল। তবে ইহা যথার্থ যে, তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে খাঁটি মুমিনও ছিলেন। ইহার দ্বারা মুনাফিকদেরকে মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কেননা কাফিরদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেও তো খাঁটি মুমিন ছিলেন। তবে কি কাফিরদেরকে মুসলমান দলের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়? সুতরাং ঘরের কেহ খাঁটি মুমিন থাকিলে অন্যদেরকে মুসলিম দলের অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না। বস্তুতঃ মুনাফিকরা কখনও অন্তর দিয়া ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তাহারা কাফিরই ছিল। হ্যাঁ, পার্থিব সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে মুসলিম বলিয়া নিজেদেরকে প্রকাশ করিত।

আর ইহাও বলা যথার্থ নহে যে, নিফাকের মূলতত্ত্ব কুফর এবং ঈমানের মধ্যবর্তী যাহার শেষ সীমা কুফর পর্যন্ত হইতে পারে। বরং নিফাক এইরূপ ঈমানী শত্রুতার নাম যাহাদের এই বিকৃত চরিত্র ও কর্মসমূহের এমন সঙ্কেত বহন করে যে, যদি তাহাদের স্বভাবসমূহ কোন মুমিন ব্যক্তি হইতে সম্পাদিত হয় তবে তাহার উপরও নিফাকের উপাধি লাগিয়া যাইবে। কাজেই নিফাকের হাকীকত ঈমান এবং কুফরের মধ্যবর্তী নহে বরং কুফর হইতেও নিকৃষ্ট অর্থাৎ জঘন্য কুফর। এই কারণেই কুরআন মজীদে তাহাদের স্থান কাফিরদের হইতে নীচে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

হাফেয ইবন তাইমিয়া (রহঃ)-এর অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহা কেবল ইসলামের উন্নতি ও প্রসারের ফলশ্রুতি ছিল। ঐ কাফিরই যাহারা মক্কায় প্রকাশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ইসলামের জাঁকজমকের পর

তাহাদের আকৃতি পরিবর্তন হইয়া যায়। তাই মুনাফিকদের ব্যাপারে ইহা বলাও ভুল যে, তাহারা কাফিরদের দল, মুসলমানগণের মধ্যে অন্য কোন স্থান হইতে আসিয়া চরবৃত্তির কাজ করিত বরং সেই কাফিরদেরই একটি নিকৃষ্ট দল যাহারা স্বীয় অন্যান্য ভাইদের ন্যায় তো ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয় নাই বরং উহার বিপরীত কুফরের অন্ধকারে থাকিয়া অপকর্মে নিমগ্ন ছিল। যেমন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর জামাআতও বাহিরের কোন দল হইতে আসেন নাই বরং কাফিরদের মধ্য হইতেই সৃষ্টি হইয়াছেন। কিন্তু তাহারা এমন সৌভাগ্যবানের জামাআত ছিলেন যাহারা জান এবং মালকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সাইয়্যেদুল মুরসালীনের জন্য উৎসর্গকারী হইয়াছিলেন এবং সাহাবা হইবার মর্যাদা লাভ করিলেন। কিন্তু যাহাদের ঈমান কেবল মুখ পর্যন্ত সীমিত ছিল এবং অন্তর কুফরী নীতিতে নিমজ্জিত ছিল তাহারা হতভাগা কাফিরদেরই সারিতে কায়িম ছিল এবং নিজেদেরকে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত রাখিতে পছন্দ করিয়াছে। কাজেই তাহাদিগকে ইসলাম স্বীয় বিশ্বাসীদের তালিকাভুক্ত কিরূপে করিবে? মুনাফিকদের দল অন্য কোন স্থান হইতে গুপ্তচর হিসাবে আসে নাই। আর না সাহাবায়ে কেরামের জামাআত অন্য কোথাও হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সহানুভূতিশীল হইয়া আসিয়াছেন। বরং এই দুই জামাআত নিজ নিজ আনুগত্যের আবেগ ও বিশ্বাসের পার্থক্যের ভিত্তিতে আরবের কাফিরদের মধ্য হইতেই সৃষ্টি হইয়াছিল। আর যাহাদের কোন প্রকার চলচ্ছক্তি ছিল না তাহারা বর্তমানেও ঐ স্থানেই বহাল ছিল যেই স্থানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের পূর্বে দণ্ডায়মান ছিল। হ্যাঁ, রিসালতের সূর্য উদয়ের পর তাহাদের অকৃতজ্ঞতার পরিণামে আরও অধিক পাকড়াও যোগ্য হইয়াছিল।

মুনাফিকরা মূলতত্ত্বের দৃষ্টিতে তৃতীয় কোন দল নহে কাফিরই ছিল। আর তাহারা ইসলামকে কেবল একটি ঢাল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাই তাহাদের বাহ্যিক মুখ সুস্থ মনে হইত কিন্তু অন্তরে ছিল কঠিন রোগ। আর ইসলামী সুস্থতার নিদর্শন এই যে, অন্তর ও অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ সবই সুস্থ এবং ইসলামী রঙ্গে রঙ্গীন দৃষ্টিতে পড়িবে। অন্তর অসুস্থ থাকিয়া কেবল অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের সুস্থতা অবশ্যই কোন কাজে আসা সম্ভব নহে। মুনাফিকের একটি মুখ যেহেতু সর্বদা সুস্থ নযরে আসে এবং মূল বাতেনী মুখ রোগ ও বিপদগ্রস্ত হয় সেহেতু তাহাদের রোগও বাহ্যিক সুস্থতার দরুন জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয় না। তাই কুরআন মজীদ তাহাদের বাহ্যিক সুস্থতার রুগ্নতাকে এই শব্দে সতর্ক করিয়াছে যে, فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (তাহাদের অন্তরে রোগ আছে।) আর অন্তর যখন রোগাগ্রস্ত হয় তখন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গে সুস্থতা মূল্যহীন। কুরআন মজীদে এরশাদ হইয়াছেঃ

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ

قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝

অর্থাৎ "(হে পয়গাম্বর!) আর আপনি যখন তাহাদেরকে দেখেন, তখন তাহাদের দেহাবয়ব আপনার নিকট খুবই প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তাহারা (বাকপটুত্বে) কথা বলে তখন আপনি তাহাদের কথা (আনন্দ ও উৎসাহে) শ্রবণ করেন। (আপনার সম্মুখে তাহারা এমন সম্বন্ধযুক্ত অবলম্বন করিয়া বসে যেন) তাহারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠ সদৃশ্য। প্রত্যেক উচ্চ স্বরকে তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে (আগত মুসীবত বলিয়া) মনে করে। তাহারাই (আপনার জানের) শত্রু। অতএব তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক হউন। আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে ধ্বংস করুক। তাহারা কোথায় বিভ্রান্ত হইতেছে।"

(সূরা মুনাফিকূন–৪)

এই আয়াতে هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ (তাহারাই আপনার জানের শত্রু, অতএব তাহাদের অনিষ্ট হইতে সতর্ক হউন।) আয়াতাংশই তাহাদের আন্তরিক চিত্র অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট। অধিকন্তু সূরা তাওবায় এই বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই দল কখনও মুসলমান ছিল না। শুধু ভয়–ভীতির দরুন মুসলমানদের সামনে বানোয়াট কথা বলে। এরশাদে এলাহীঃ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۝

অর্থাৎ "আর তাহারা আল্লাহ তা'আলার কসম করিয়া বলে যে, তাহারা (মুনাফিকরা) আপনাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাহারা আপনাদের কেহই নহে। বরং তাহারা হইতেছে কাপুরুষের দল। (তাই ভয়ে এইরূপ কথা বানাইয়া বলে)।" (সূরা তাওবা-৫৬)

সূরা বাকারা এবং সূরা নিসার মধ্যে এই ব্যাখ্যা রহিয়াছে যে, মুনাফিকদের এই বিস্মরণীয় ঈমানও সম্পূর্ণভাবে ধোকা এবং মুসলমানদের সহিত এক প্রকার প্রবঞ্চনা ছিল। সূরা মুনাফিকূনের মধ্যেও তাহাদের মিথ্যা কসমসমূহের এই উদ্দেশ্যই বর্ণনা করা হইয়াছে। اتخذوا ايمانهم جنة। "তাহারা স্বীয় মিথ্যা কসম নিজেদের জান ও মালের নিরাপত্তার জন্য কেবল একটি ঢাল বানাইয়াছিল।" অধিকন্তু তাহাদের ছল ও প্রতারণার সীমা শুধু মুসলমানগণ পর্যন্তই সীমিত ছিল না বরং তাহাদের ইইতে অতিক্রম করিয়া আল্লাহ তা'আলার সত্তা আলিমুল গায়েব এবং আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। এমনকি এই জগত হইতে অতিক্রম করিয়া হাশরের ময়দান পর্যন্ত থাকিবে।

এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ○

অর্থাৎ "নিশ্চয় মুনাফিকরা প্রবঞ্চনা করে আল্লাহ তা'আলার সহিত অথচ আল্লাহ তা'আলা এই প্রবঞ্চনার প্রতিফল তাহাদিগকে প্রদান করিবেন। আর যখন তাহারা নামাযে দাঁড়ায় তখন নিতান্ত শিথিলভাবে। শুধু লোকদিগকে দেখায় এবং তাহারা আল্লাহ তা'আলাকে অল্পই স্মরণ করে।" (সূরা নিসা-১৪২)

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছেঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ

অর্থাৎ "যেই দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সকলকে পুনরুত্থিত করিবেন, অতঃপর তাহারা আল্লাহ তা'আলার সামনে শপথ করিবে যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে।" (সূরা মুজাদিলা-১৮)

এখন রহিল তাহাদের প্রকাশ্য আ'মাল, ইহারতো ভিত্তিই বিশ্বাস এবং আস্থার উপর ছিল না বরং স্বীয় বাহ্যিক ঘোমটার শুধু একটি পক্ষপাত ছিল।

কুরআন মজীদের আয়াতে এরশাদ হইয়াছেঃ

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ إِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ○

অর্থাৎ "আর তাহাদের দান-সদকা গ্রহণ করিবার পথে ইহা ব্যতীত আর কিছুই প্রতিবন্ধক নহে যে, তাহারা আল্লাহ তা'আলার সহিত ও তাঁহার মনোনীত রসূলের সহিত কুফরী করিয়াছে, আর তাহারা নামায পড়ে না কিন্তু শিথিলতার সহিত, আর তাহারা দান সদকা করে না কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে। (তাহাদের আ'মালে কোন আন্তরিকতা নাই)।" (সূরা তাওবা-৫৪)

আয়াতে এই বিষয়ের পুরোপুরি ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে যে, মুনাফিকদের বাহ্যিক নামায ও প্রকাশ্য দান-খয়রাতের দিকে দৃষ্টি করা চাই না, উহা তো সম্পূর্ণভাবে রূহহীন। তাহাদের ঈমান না থাকিবার কারণে নামাযের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকেও ফরয মনে করে না এবং এই কারণেই ছাওয়াবের আশা ও বিশ্বাস করে না। তবে তোমরা যখন নামাযে আস তখন তাহারাও শিথিলতার সহিত আসিয়া দাড়ায়, কিন্তু বিশ্বাস ও আশা না থাকিবার কারণে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয় না বরং মানুষকে নিজেদের মুসলমানিত্ব ও মুসল্লীয়ানা দেখায়; যেন

তাহাদেরকে মুসলমান এবং মুসল্লী মনে করে। লোক দেখানো উদ্দেশ্য বলিয়া তাহারা কেবল নামাযের ভান করে। তাই নামাযের মধ্যে মৌখিকভাবে কোন যিকির পাঠ করে না। আর যে সকল নামায হইতে সরিয়া পড়া সহজ যেমন এশা ও ফজর উহা হইতে পালাইয়া থাকে। তাহারা যাকাতও অবশ্য আদায় করে কিন্তু উহার মধ্যেও কোন রূহ্ থাকে না। ইহাও আন্তরিকতাহীন লোক দেখানো নামাযের ন্যায়। হ্যাঁ, উহাতে আল্লাহ তা'আলার যিকিরের কেবল এতখানি ভাগ রহিয়াছে যতখানি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দেখ, যেমন রুকু, সিজদা। আর রুকু ও সিজদায় তসবীহ না পড়িয়া শুধু জিহ্বা নাড়াচাড়া করে যাহাতে মানুষ মনে করে তসবীহ পড়িতেছে। আর তাহাদের আন্তরিকতাহীন আমল করিবার কারণ হইতেছে যে, তাহারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলের অস্বীকারকারী কাফির।

সূরা তাওবার মধ্যে তাহাদের বক্ষস্থলে গোপনীয় বস্তুসমূহ এবং সহজাত স্বভাবসমূহের আরও অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তাহাদের চিহ্নসমূহ খোলাখুলি প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহার সারমর্ম এই যে, জিহাদের স্থানে টালবাহানা এবং সম্ভব হইলে শরীক না হওয়া। আর যদি জিহাদে শরীকও হয় তবে তাহাদের মূখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে মুসলমানগণের মধ্যে বিবাদ ও ফিৎনা সৃষ্টি করা, মুসলমানগণের আনন্দে দুঃখিত হওয়া এবং তাহাদের বিষন্নতায় আনন্দ হওয়া। নামাযে শিথিলতা এবং যাকাত আদায়ে কৃপণতা আর দ্বীনে শরীআতের উপর অযথা প্রশ্ন করিবার মধ্যে বড় চতুর। মুসলমানকে তো ছাড়ে না, আর না আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার প্রেরিত রসূলকে। দোদুল্যমানে অগ্রজ, মিথ্যা এবং ওয়াদা খেলাফী, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। নিম্ন শ্রেণীর কাপুরুষ এবং ভীতু। তাহাদের অন্তরের দিকে তাকাইলে বুঝা যায় যে, তাহাদের মধ্যে সর্বদা সন্দেহ, সংশয় ও খটকা। আর কুফরীর উপর জেদী। কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের মধ্যে যেই সকল আচরণকে অধিক স্পষ্ট করিয়া বর্ণিত হইয়াছে উহা তাহাদের আন্তরিক কুফর এবং আল্লাহ তা'আলা, তাঁহার মনোনীত রসূল ও ইসলামী জামাআতের সহিত তাহাদের ঈর্ষা ও শত্রুতার ফলশ্রুতি ছিল। ইহা এমন নহে যে, কুরআন করীম তাহাদের উপর অপবাদ দিয়াছে বরং মুনাফিকরা নিজেদের এই চতুরতাকে নিজেরাই ভালভাবে অনুভূত করিত। এই কারণেই তাহারা সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকিত যে, কখন না জানি এই চতুরতা ফাঁস হইয়া যায়। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ○

অর্থাৎ "মুনাফিকরা আশংকা করে যে, মুসলমানগণের প্রতি না এমন কোন সূরা অবতীর্ণ হইয়া পড়ে যাহা তাহাদিগকে সেই মুনাফিকদের হৃদয়ের (গোপন) কথা অবহিত করিয়া দেয়। (হে নবী!) আপনি বলিয়া দিন যে, হ্যাঁ, তোমরা বিদ্রূপ করিতে থাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সেই বিষয়কে প্রকাশই করিয়া দিবেন, যে সম্পর্কে তোমরা আশংকা করিতেছিলে।" (সূরা তাওবা -৬৪)

অবশেষে তাহাদের এই ভয় বাস্তবে পরিণত হইল এবং সূরা তাওবার মধ্যে তাঁহাদের অন্তরের কুফর এবং শত্রুতার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হইয়া গেল। উহার পর তাহাদের যত প্রতারণার অজুহাত ছিল সবই বিশ্বাসজ্ঞাতকতা বলিয়া পরিগণিত হইল।

কুরআন মজীদের প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্তরের লক্ষ্যে মুনাফিকরা পৃথক কোন দল ছিল না বরং কাফেরই ছিল। যাহারা স্বীয় দ্বিমূখী নীতি অবলম্বন এবং দুই দিকে লাভ অর্জনের জন্য বাহ্যিকভাবে মুসলমানগণের সহিত মিলিয়া থাকিত। তাই ইহা বলাও জটিল যে, মুনাফিকদের দল কাফিরদের দল ছিল না বরং ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী একটি দল ছিল। হ্যাঁ, যদি এই হিসাবে তাহাদিগকে মধ্যবর্তী দল বলা হয় যে, তাহারা নিজেদের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ হিসাবে না মুসলমান বলিবার যোগ্য ছিল আর না কাফির। তাহা

হইলে ইহা যথার্থ। কেননা,তাহাদের বাহ্যিক একটি মুখ মুসলমানের সহিত রাখা ছিল আর অন্তরের মুখ কাফিরদের সহিত ছিল। ইহাকেই কুরআন মজীদে مذبذب (দোদুল্যমান) দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। যেমন এরশাদ হইয়াছেঃ

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ

অর্থাৎ "তাহারা দোদুল্যমান (কাফির ও মুমিন) অবস্থায় ঝুলন্ত এই দিকেও নহে ঐ দিকেও নহে।"
(সূরা নিসা–১৪৩)

এই আয়াতে মুনাফিকদের আমলী যিন্দীগীর চিত্র টানা হইয়াছে, ইতেকাদী দিক নহে। কারণ এই আয়াতের প্রথমে যখন উল্লেখ রহিয়াছে যে, এই সকল লোক আল্লাহ তা'আলার সহিত প্রতারনা ও ধোকাবাজি করিতে চায় তাহা হইলে তাহাদের ইতেকাদের মধ্যে কি দোদুল্যমান হইতে পারে? এই কারণেই কুরআন মজীদের যে স্থানে তাহাদের সম্পর্কে ইসলাম শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে উহার সাথে সাথে কুফরও উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহাতে তাহাদেরকে মুসলমান বলিয়া কেহ সন্দেহ না করে।

বলাবাহুল্য মুনাফিকরা যখন মুখ দ্বারা ইসলামী কলেমা পাঠ করে, নামাযে অংশগ্রহণ করে এবং যাকাতও দেয় তাই বাহ্যিক আ'মালের লক্ষ্যে তাহাদের দিকে ইসলাম শব্দের ব্যবহার সহীহ ছিল। কিন্তু কুরআন মজীদ যখন অন্তরের কুফরীর কারণে তাহাদিগকে নির্দিষ্টভাবে কাফির গণ্য করিয়াছে তখন তাহাদিগকে কাফির বলিতে চিন্তা কেন? তবে কাহারও অন্তরের ইলম যেহেতু আমাদের জানা নাই সেহেতু আমাদের কোন হক অধিকার নাই যে, কাহারও প্রকাশ্যে বিপরীত সন্দেহ করা। এই কারণেই হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেন যে, ভবিষ্যতে কাহারও উপর এই হুকুম লাগাইবে না। ওহী অবতরণের কাল সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। ঐ সময় ওহীয়ে এলাহী যাহার সম্পর্কে নিফাকের হুকুম দিয়াছে, দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমানে মুআমেলা কেবল প্রকাশ্যের উপরই হইবে। যে ইসলামী আহকাম আদায় করিবে মুসলমান হইবে। আর যে ইহা হইতে প্রত্যাবর্তিত হইবে তাহাকে কাফির গণ্য করা হইবে। অন্তরের অবস্থা না আমাদের ইলম হওয়া সম্ভব আর না উহার ভিত্তিতে কাহারও উপর কোন হুকুম দেওয়া যাইবে। (বুখারী)

কুরআন মজীদের কোন একটি আয়াতও ইহা প্রমাণ করে না যে, মুনাফিকদের ঈমান কেবল লোক দেখানো এবং মিথ্যা ও ধোকা ব্যতীত অন্য কোন বাস্তবতা ছিল। আর তাহাদের আভ্যন্তরীণ ও অন্তরের অবস্থা অবগত হইবার পর (যাহা কুরআন মজীদ উল্লেখ করিয়াছে) এক মুহূর্তের জন্যও ইহা মানিয়া নেওয়া কঠিন যে, মুনাফিকরা ইসলামকে নিজেদের ধারণা মতেও ইসলাম কল্পনা করে। যদি এইরূপ হইত তাহা হইলে তাহাদেরকে নিকৃষ্ট স্তরের মিথ্যুক ও ধোকাবাজ গণ্য করা হইত না। মিথ্যা এবং ধোকা এই দুইটি স্বভাব বর্তমানে অনেক মুসলমানদের মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু মুনাফিকদের মিথ্যা ও ধোকা সব চাইতে বড় মন্দ কার্য হইবার কারণ ইহা ছিল যে, তাহারা স্বীয় ঈমানের ভিত্তিই উহার উপর কায়িম করিয়াছিল। তাই উহা সাধারণ ধোকা এবং মিথ্যা রহিল না যাহার বৃত্ত পরস্পর ধোকা ও মিথ্যার মধ্যে সীমিত। বরং তাহাদের প্রতারণা ও মিথ্যার ঐ আকৃতি ছিল যাহা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলের সহিতও সৃষ্টি হইয়াছিল। একটু চিন্তা করা উচিৎ যে, যে সকল গুণাবলী সৃষ্টির পরস্পরের মধ্যেও নিম্ন স্তরের অসভ্য অপদার্থ গণ্য, যদি উহাকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলের ব্যাপারেও জায়েয মনে করা হয়, তবে তাহাদের মন্দ কার্য কোন স্তরে গড়াইবে? মুনাফিকরা ছিল জঘন্য স্তরের কাফির। এখন প্রশ্ন হয় যে, যখন নিফাক এতখানি জঘন্য স্তরের কুফর ছিল তাহা হইলে হাদীছ শরীফসমূহে ইহার আলামত এতটুকু সাধারণ কেন নির্ধারণ করা হইয়াছে?

বলাবাহুল্য ঈমান এবং কুফরের যেইরূপ বিভিন্ন প্রকার রহিয়াছে অনুরূপ নিফাকেরও বিভিন্ন প্রকার রহিয়াছে। যেমন এক ঈমান কামিল ছিল আর অন্যটি নাকিস অর্থাৎ অসম্পূর্ণ। অতঃপর কামেল ঈমানের অনেক শাখাকেও ঈমান বলা হইয়াছে। আবার এক কুফর উহা ছিল যাহার পরিণাম চিরস্থায়ী জাহান্নাম। অতঃপর অনেক

নাফরমান তথা গুনাহগারের উপরও কুফর-এর ব্যবহার করা হইয়াছে। অনুরূপ নিফাকও কয়েক প্রকার। একঃ আকীদাগত নিফাক نفاق اعتقادى আর উহার বাহকই প্রকৃত মুনাফিক, যাহার বর্ণনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। অতঃপর এই দলের যে সকল মন্দ স্বভাব ছিল উহা যাহার স্বভাব হইবে হাদীছ শরীফ তাহার উপরও নিফাকের ব্যবহার করিয়াছে। কেননা এই সকল মন্দ স্বভাবসমূহ মানুষের আমানত, সাধুতা ও সততার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কারণেই উহাকে এক মুহূর্তের জন্যও ঈমানের আলামত বলা সম্ভব নহে। বরং ইহা ঐ অমনোযোগিতার পরিণাম হইয়া থাকে যাহা ভীরুতা অথবা দুনিয়ার লিপ্সার কারণে তাহার ঈমানের উপর হঠাৎ আসিয়া পড়ে। অতঃপর যতখানি এই অমনোযোগিতা প্রভাবশালী হইতে থাকিবে ততখানি উক্ত মন্দ স্বভাবসমূহ তাহার হইতে অধিক হারে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এমনকি এক সময় এমন আসিয়া যায় যে, তাহার আ'মালের মধ্যে মুনাফিকের আ'মাল ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিতে পড়ে না। তাহার আ'মালের নকসা ঠিক মুনাফিকদের আ'মালের ন্যায় হইয়া যায়। সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করিলে রক্ষা করে না, ঝগড়া করিলে হক ও না হকের মধ্যে পার্থক্য করে না। পরিশেষে এই মুসলমানের বাহ্যিক আমলও মুনাফিকদের আ'মালের মধ্যে কোন পার্থক্য অবশিষ্ট থাকে না। কেবলমাত্র তাহার অন্তঃকরণে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার প্রেরিত রসূলের উপর ঈমান থাকে আর মুনাফিকের অন্তরে ইহাও থাকে না। কিন্তু আন্তরিক শাহাদাত যেহেতু দৃষ্টি গোচর হইবার বস্তু নহে তাই হাদীছ শরীফ যেমন নামায ত্যাগকারী গুনাহগারের উপর কুফরের ব্যবহার করিয়াছে অনুরূপ মুনাফিকের স্বভাব বহনকারীকেও মুনাফিক বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু ফকীহগণ (যাহাদের চর্চার বিষয় বস্তু হইতেছে দ্বীনে শরীআতের বিধি-বিধানের সঙ্গত প্রয়োগ নির্ধারণ করা) তাহারা যদি তাহাকে মুসলমান বলিয়া হুকুম দেন তবে তাহার আ'মালের সাক্ষ্যে হুকুম বিপরীত হয়। আর যদি তাহাকে মুনাফিক বলেন তবে তাহার আন্তরিক ঈমান এই উপাধি হইতে নিষেধ করে। এই কারণে ফকীহগণ নিফাকের প্রকারভেদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর এইরূপ নিফাককে আমলগত নিফাক (نفاق عملى) বলিয়া দিয়াছেন। অবশ্য হাদীছ শরীফ এইরূপ প্রকারভেদকে পছন্দ করে না যাহাতে আ'মালী নিফাকের ভয় মানুষের অন্তর হইতে সরিয়া যায়। কিন্তু হাদীছ এবং ফিকহ-এর এই ব্যবহার পদ্ধতি পার্থক্যের লক্ষ্য যাহাই হউক আবশ্যক রহিয়াছে।

সারকথা এই যে, প্রকৃত নিফাক তো ঐ নিফাকে ই'তেকাদী, তথা নিফাকে আকবরই ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে যখন মুসলমানদের মধ্যেও মুনাফিকদের বিশেষ স্বভাব সমূহ সৃষ্টি হইতে লাগিল তখন ফিকাহবিদগণের পরিভাষায় উহাকে নিফাকে আমলী বলিয়া দিলেন। আর নিফাকে ই'তেকাদী তো ইহা যে বাহ্যিকভাবে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ, রসূলের রিসালত, ফিরিশতা, হাশর-নশর ইত্যাদির বিশ্বাস রাখিত কিন্তু অন্তরের মধ্যে উহার পুরোপুরি অস্বীকার ও অবাধ্যতা গোপনীয় হইত। এই মূলতত্ত্বকেই সূরা মুনাফিকুন ও অন্যান্য বহু আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। আর এইরূপ নিফাক কেবল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় ছিল। আর এই নিফাককেই কুরআন মজীদ কাফির বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তির ঘোষণা তাহাদের সম্পর্কেই বর্ণিত হইয়াছে।

এখন রহিল নিফাকে আমলী। ইহা হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর মতে মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরের পার্থক্যের নাম। এই হিসাবে যে অন্তরে ইসলামী আকাঈদে বিশ্বাসী কিন্তু তাহার বাহ্যিক আ'মাল ক্রটিপূর্ণ হয় সে ব্যক্তিকে আমলী মুনাফিক বলা যাইতে পারে। কেননা তাহার আমলেও বাহ্যিক অভ্যন্তরের বিপরীত হইয়াছে। হ্যাঁ, সতর্ক করিবার লক্ষ্যে তাহাকে পরিস্কার মুনাফিক বলা যাইবে। অবশ্য নিশ্চয়তা প্রতিপাদনের (تحقيق) স্থানে তাহার নিফাককে নিফাকে আমলী দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইবে। অতঃপর নামায ত্যাগকারীর উপর কুফরের ব্যবহার দ্বারা যেই উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্যই তাহাকে মুনাফিক বলিবার দ্বারা হইবে। তবে ইহার মর্ম এই নহে যে, এই ব্যাখ্যার কোন মূলতত্ত্ব নাই। ইহা শুধু উপযোগিতা আর উপযোগিতার উপরই ভিত্তি। নিশ্চিত যে, ইহারও বড় মূলতত্ত্ব রহিয়াছে। আর ইহার সঙ্কেত ইহা যে, নিফাকে আমলী সময় সময় নিফাকে হাকেকীরও কারণ হইতে পারে। যেমন কতক সময় পাপ করিতে করিতে কুফরে হাকেকীর ডঙ্কা বাজিতে পারে। যাহা হউক, ঈমানী গাছে

আ'মালে ঈমানীর স্থলে আ'মালে কুফরের সেচ কার্যের সহিত কতক্ষণ সতেজ থাকা সম্ভব হইবে? উহার মধ্যে নিফাকের রুগ্নতা সৃষ্টি হইতে পারে।

অভিধান অনুসন্ধানের দ্বারা জানা যায় যে, নিফাক এক প্রকার প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার নাম। মুনাফিকের সম্পূর্ণ যিন্দীগী যেহেতু এই মন্দ গুণের প্রতীক হয় সেহেতু তাহাকে মুনাফিক বলে। নিফাকে আকবর হউক বা নিফাকে আসগর। অভিধানের এই মূলতত্ত্ব উভয়টিই ঠিক একই স্তরে রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ যখন এই প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার চালনা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলের সহিতও চালিতে থাকে তখন উহার গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া যায়। আর এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই জন্যই সলফে সালেহীনের যুগে যখনই কাহারও সম্পর্কে গোপন ফাসাদী বলিয়া সন্দেহ হইয়াছে তখনই উহাকে ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। হযরত হাতিব বিন আবী বুলতাআ (রাযিঃ) বদরী সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার সম্পর্কে নিফাকের সামান্য সন্দেহ হওয়ায় তিনি তাঁহার সম্পর্কে কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, دعنى । ضرب عنق هذا ।। لمنا فق (আমাকে অনুমতি দিন যে, আমি এই মুনাফিকের গ্রীবা ছিন্ন করিয়া দেই।) ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, হযরত ওমর (রাযিঃ)–এর দৃষ্টিতে নিফাকের অপরাধ কোন্ স্তরের বিবেচিত হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে যদি নিফাক মানুষের কেবল ঈমানী দুর্বলতার নাম হইত তাহা হইলে কি মুসলমানের হকে তাঁহার এই কঠোর ব্যবহার মানিয়া নেওয়া হইত। জিহাদের ময়দানে যখন কোন প্রতিপক্ষের কঠোর হইতে কঠোর অপরাধের স্থলেও কেহ কলেমায়ে তাওহীদ পড়িয়া লইত অথবা কার্যতঃভাবে কোন ইসলামী আলামত প্রকাশ করিয়া দিত তখন দরবারে নবুওয়াত হইতে ঐ সময়ই মাথার উপর উথলিত তলোয়ারকেও সরাইয়া ফেলিবার হুকুম জারী হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি কখনো অজ্ঞতার মধ্যে এই কার্য পদ্ধতির বিপরীত দৃষ্টি হইত তাহা হইলে তাহার কোন ওযর আপত্তি কখনও শ্রবণ করা হইত না।

বলাবাহুল্য হাদীছ শরীফসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, কখনও কখনও স্থির প্রতিজ্ঞ জালিলুল কদর সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহ আনহুমের পবিত্র যবান হইতে স্বীয় নফস অর্থাৎ আত্মার উপরও নিফাকের অভিযোগ করিয়া আতঙ্ক হইয়াছেন। অথচ তাঁহাদের মধ্যে নিফাকের কোন প্রকার গন্ধও ছিল না বরং ইহা ছিল তাহাদের ঈমানী সম্পূর্ণতা এবং স্বীয় আ'মালের পুরোপুরি হিসাব গ্রহণের ফল। যখন একজন কামিল মুমিন স্বীয় নফসের হিসাব কঠোরভাবে গ্রহণ আরম্ভ করেন তখন তাঁহার প্রত্যেকটি গতি ও বিরামের উপর এই সন্দেহ অতিক্রম করিবে যে, না জানি, কখন উহার মধ্যে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন নিম্ন স্তরের পার্থক্য হইয়া পড়ে? এই জন্যই তাহারা স্বীয় বাহ্যিক ও আন্তরিক পবিত্রতা ও কল্যাণের উপর কখনও অহঙ্কারী হয় না। তাহারা প্রত্যেক আ'মালের মধ্যে স্বীয় নফসকে সর্বদা অভিযুক্ত করিতেই থাকেন। শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টার মধ্যেই তাহাদের পবিত্র জীবন সমাপ্ত হইয়া যায়। আর তাহারা তাহাদের স্বীয় নিরিখ মুতাবিক একটি সিজদাও রিয়াহীন করিবার মধ্যে সফলকাম হয় না। হাকীকত ইহাই যে দ্বীনে হানীফ উহাকে সহ্যও করে না যে, কোন বান্দা ইসলামী আহকামের উপর চলিবার মধ্যে দুই মুখ বিশিষ্ট থাকে। তাহার বাহ্যিক একটি আর অন্তরে অন্যটি। তাঁহারা উহাকে এমন একটি রঙ্গের দাওয়াত দিয়াছেন যাহার পর বাহ্যিক এবং অন্তরের মধ্যে চুল পরিমাণ পার্থক্যের সঙ্কুলান যেন অবশিষ্ট না থাকে। ইহাকেই ইহসানের সারমর্ম অনুধাবন করিতে হইবে, যাহার উল্লেখ হাদীছে জিব্রাঈলে বর্ণিত হইয়াছে।

যখন মানুষের মস্তিষ্কে অদৃশ্য জগতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস দৃশ্য জগতের ন্যায় সমমান হয় তখন তাহার স্বীয় আ'মাল এবং নিয়্যাতকে অভিযুক্ত করা তাহার স্বভাবে পরিণত হয়। ইহার পর তাহার ঐ উচ্চ স্থান ভাগ্য হয় যে স্থানে পৌঁছিবার পর তাহার নামায যাহাতে বিনয় ও উৎসর্গের মধ্যে সামান্যতম কোন অপূর্ণ থাকিলেও উহাকে মুনাফিকদের নামায বলিয়া অনুভব করিতে থাকেন। কতক সলফে সালেহীন হইতে বর্ণিত আছে যে خشوع النفاق ان ترى الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع "ইহা মুনাফিকের নম্রতা যে, তুমি তোমার দেহকে বিনয় দেখিবে আর অন্তরকে বিনয় দেখিবে না। মানুষের ঈমানী সম্পূর্ণতা যাহাকে হাদীছে জিব্রাঈল (আঃ)–এর মধ্যে ইহসান দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে উহার বাহ্যিক ও আন্তরিক পুরোপুরি এক রং হইবার পরই অর্জিত হয়। আর যখন

উভয়ের মধ্যে এক রং সৃষ্টি হইয়া যাইবে তখন যতখানি তাহার বাহ্যিক বিনয় ও উৎসর্গের মধ্যে নিমজ্জিত দৃষ্টি পড়িবে তাহার আন্তরিক অবস্থা উহার চাইতে অধিক নিমজ্জিত হইবে। ইহাই ঐ মূলতত্ত্ব ছিল যাহা হযরত হানযালা (রাযিঃ)-এর হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তিনি দেখিতেন যে স্বীয় পরিবার পরিজনের নিকট যাওয়ার পর তাহার অন্তরে ঐ রং থাকে না যাহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে বর্তমান থাকে। এই বিষয়টি তাহার স্বীয় বিনয় দৃষ্টির মধ্যে ততখানি পার্থক্য ও নিফাকের আকৃতি বলিয়া সন্দেহ করিলেন এবং তাহার উক্ত অনিচ্ছাকৃত পার্থক্যের বিষয়টিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আড়ম্বর দরবারে পেশ করিতে হইল। প্রকৃত অবস্থা এই যে, ইহসানের স্তরে যতই সম্পূর্ণতা অর্জিত হইতে থাকে উহার সমপর্যায়ের এক রঙ্গের শর্তসমূহও সেইরূপ কঠোর হইতে থাকে। এমন কি তাহার সাধনা চেষ্টার মধ্যে জীবন সমাপ্ত হইয়া যায়। আর যেই স্তরের আন্তরিকতা, উহার এক রঙ্গের স্বভাব অনুসন্ধানকারী হয়, উহা অর্জিত হয় না। এই কারণেই হযরত হাসান (রাযিঃ) কসম করিয়া বলিলেনঃ

مامضى مؤمن قط الا وهو من النفاق غير امن وما مضى منافق قط ولا يبقى الا وهو من النفاق آمن

অর্থাৎ "কোন মুমিন যে অতীত হইয়া গিয়াছে অথবা বর্তমানে রহিয়াছে এমন নাই যাহার অন্তরের মধ্যে স্বীয় নফস সম্পর্কে নিফাকের ভীতি না হইয়াছে। আর কোন মুনাফিক যে অতীত হইয়া গিয়াছে অথবা বর্তমানে রহিয়াছে এইরূপ নাই যে, স্বীয় নিফাকের উপর শান্তি না হইয়াছে। (অর্থাৎ যে স্বীয় নিফাক সম্পর্কে নিরাপদ রহিয়াছে)।"

এক ব্যক্তি দেখিলেন যে, হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) একদা নামায আদায় করিবার পর নিফাক হইতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাহিতেছেন। লোকটি আশ্চার্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আচ্ছা, আপনারও কি নিফাকের ভীতি রহিয়াছে? হযরত আবুদ দারদা (রাযিঃ) কসম করিয়া বলিলেন যে, মানুষ উত্তম মুমিন হয় অতঃপর কোন ফিৎনায় জড়িত হইয়া পড়ে এবং চোখের পলকে তাহার অন্তর পরিবর্তন হইয়া যায় আর সে নিফাকে পতিত হয়। (জামেউল উলূম)

সহীহ বুখারী শরীফে ইবন আবী মুলাইকা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, ত্রিশজন সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাঁহাদের সকলই স্বীয় নফসের উপর নিফাকের সন্দেহ করিতেন। তাঁহাদের কেহই ইহা বলেন নাই যে, আমার ঈমান হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ও মিকাঈল (আঃ)-এর ঈমানের মত নিফাকের ভীতি হইতে নিরাপদ।

ইব্রাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন যে, যখন আমি নিজের কথা এবং কর্মকে মিলিত করি তখন সর্বদা আমার এই চিন্তা হয় যে, কোথায়ও না আমি মিথ্যুক সাব্যস্ত হই?

ইমাম আহমদ (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, যে ব্যক্তির স্বীয় নফস সম্পর্কে নিফাকের ভীতি না হয় তাহার সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেনঃ এইরূপ কোন্ মুমিন হইতে পারে যাহার স্বীয় নফসের উপর কোন ভীতিও না থাকে? (জামেউল উলূম)

উপরোল্লেখিত মহাসম্মানিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্তবলী তো নিয়্যাত এবং আ'মালের ঐ সুক্ষ্মতা ছিল যাহার মধ্যে চুল পরিমাণ পার্থক্য ও অতি উত্তম আমল একজন মুনাফিকের আমলের ন্যায় গণ্য হইতে পারে? যাহা হউক সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)-এর ঐ সকল আশংকা ও ভীতির নিরিখ ঈমানী সম্পূর্ণতা ছিল। নিফাকের কোন প্রকারই এইখানে কোন স্থান নাই।

বলাবাহুল্য নিফাকে আমলী নিফাকের কোন পৃথক প্রকার নহে। তবে মুনাফিকদের বিশেষ আ'মালসমূহ যখন মুসলমানদের মধ্যে দৃষ্ট হইতে লাগিল তখন অনন্যোপায় হইয়া ওলামাগণ নিফাকের শ্রেণী বিভক্ত করিতে বাধ্য

হইয়াছেন। ঐ আ'মাল যাহা নিফাকে এতেকাদীর আলামত। উহাই যদি মুমিনদের মধ্যে দেখা যায় তখন উহাকে নিফাকে আমলী বলা হয়। কাজেই যদি নিফাকে এতেকাদীর অস্তিত্ব না হইত তবে নিফাকে আমলীর এই ব্যাখ্যা সৃষ্টি হইত না।

হাফেয ইবন রজব হাম্বলী (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, নিফাকে আমলী যদিও কেবল মানুষের বাহির ও ভিতরের পার্থক্যের নাম যাহার অনেক শাখা প্রশাখা নিসৃত করা সম্ভব, কিন্তু মূল কেবল পাঁচটি (১) মিথ্যা বলা, (২) আমানত খেয়ানত করা, (৩) রাগান্বিত হইলে অশ্লীল আচরণ করা, (৪) ওয়াদা রক্ষা না করা, (৫) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

(জামেউল উলূম)

এই সকল কবীরা গুনাহ সমূহের মধ্যে অতি কঠোরতা এই জন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহারা উহাকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলের ব্যাপারেও জায়েয করিয়াছিল এবং এই স্বভাবগুলিকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা হইতে এই বিষয়টি খুব স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, এই অপরাধসমূহ যাহার গুরুত্ব এতখানি ছিল না কিন্তু এমন গুরুত্ব কেন হইল? কারণ নিফাকের হাকীকত ধোকা ও প্রবঞ্চনা এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পার্থক্য। আর তাহাদের এই স্বভাবসমূহের মধ্যে প্রত্যেকটি স্বভাবই এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান। কাজেই যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ইহার প্রতিটি স্বভাব এক সাথে জমায়েত হইয়া যায় তবে উহাতে কোন সন্দেহ থাকার কথা নহে যে সে পুরোপুরি মুনাফিক হইয়া যাইবে।

প্রথমে আলোচনা করা হইয়াছে যে, কুরআন মজীদ ও হাদীছের বহুস্থানে কুফর আভিধানিক একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুরূপ হাদীছ শরীফসমূহের নিফাকও আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত। নিফাকে ই'তেকাদী হউক অথবা নিফাকে আমলী। আভিধানিক মূলতত্ত্বে উভয় প্রকারই পুরোপুরিভাবে একই অর্থে ব্যবহৃত। আসল মুনাফিকদের প্রবঞ্চনার পর্দা স্বয়ং কুরআন মজীদই পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে এবং অনেক আয়াতে তাহাদের নিফাকের হাকীকত ধোকাবাজ শব্দ দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। এখন রহিল ঐ প্রকার মুনাফিক যাহারা আল্লাহ তা'আলাকে তো ধোকা দেওয়ার ইচ্ছা করে নাই বরং তাঁহার সৃষ্টিকে ধোকা দেওয়ার বাসনা করিয়াছে, তাহাদের ব্যাপারটি হাদীছ শরীফ বর্ণনা করিয়া দিয়াছে। নিফাকের এই বিপদ সঙ্কুল প্রকার সর্বদা ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।

বলাবাহুল্য কুরআন মজীদে বর্ণিত মুনাফিকদের স্বভাবসমূহ যদি কেবল পরস্পর মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয় তাহা হইলেও উহাকে খাট করিয়া দেখা যায় না। সেই স্থানে বান্দা এবং স্রষ্টার মধ্যে হইবে? তাহারা মিথ্যা শপথ করিয়া আল্লাহ তা'আলার সহিত ওয়াদা করে যে, যদি আপনি আমাকে ধনী করেন তবে আমি আপনার রাস্তায় দান-সদকা করিব। অতঃপর ওয়াদা রক্ষা করে না এবং সে এমন স্তরের স্বার্থবাদী হইয়া পড়ে যে, সম্পদ কেবল তাহার খুশী ও নাখুশীর মেরুদণ্ড হয়, সাধারণ মুসলমানের খুশী ও নাখুশীর কোন সম্পর্ক থাকে না। অধিকন্তু তাহাদের চরিত্র ও আচরণাদি ঐ পর্যায়ে গড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রসূলের আসহাবগণের উপর সমালোচনা, টুক ধরা এবং তাহাদের উপর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা অভ্যাসে পরিণত হয়। শারীরিক ও মালী ইবাদতে এমন অমনোযোগী যে, না ইহা আদায় হয় না উহা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার এই জগতের প্রতিটি উৎসর্গের স্থলে স্বীয় জান বাঁচাইবার জন্য অজুহাত বানায়। মুনাফিকরা এই সকল স্বভাব আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূল এবং সকল মুসলমানদের সহিত এমন বিস্তৃতি করিয়াছে যে, পরিণামে তাহাদের এক একটি স্বভাব নিফাকের এক একটি আলামত গণ্য করা হইয়াছে। এইখানে কি ইহা বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব যে, কাহার সম্পর্ক সহীহভাবে আল্লাহ তা'আলার সহিত কাহার সম্পর্ক সৃষ্টির সহিত। ইহাতো কেবল নিয়্যাত ও অন্তরের বিষয়। এই কারণেই কেবল স্বভাবসমূহকেই নিফাকের আলামত গণ্য করা হইয়াছে। আর যাহার মধ্যে এই সকল স্বভাব একত্রিত হইবে তাহাকে সতর্ক করা হইয়াছে যে, এখন তাহার যিন্দিগীর নকসা ঠিক ঠিক মুনাফিকদের সদৃশ হইয়া গিয়াছে। যদি সে ঈমানের দাবীদার হয় তাহা হইলে এই নকসা তাহার জন্য উপযুক্ত নহে।

(সংক্ষিপ্ত তরজমানুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড-৪৯১-৪৯৪)

١١٩ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ-

হাদীছ—১১৯.(ইমাম মুসলিম(রহঃ)বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উকবা বিন মুকরাম আল–আম্মীয়্যু, তিনি ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ বিন কায়স আবূ যুকায়র হইতে। তিনি বলেনঃ আমি আলা বিন আবদির রহমানকে উপরোক্ত সনদে হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি। তিনি বলেনঃ মুনাফিকের আলামত তিনটি, যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান বলিয়া ধারণা করে।

١٢٠ حَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ ذَكَرَ فِيهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ-

হাদীছ—১২০. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ নাসর আত–তাম্মার এবং আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ (রহঃ)। তাহারা—হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ (রহঃ) সূত্রে হযরত আলা হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বলিয়াছেন, আর ইহাতে ইহাও উল্লেখ রহিয়াছে যে, যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান বলিয়া ধারণা করে।

باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم ياكافر

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি স্বীয় মুসলমান ভাইকে "হে কাফির" বলিয়া সম্বোধন করিল তাহার ঈমানের অবস্থার বর্ণনা

١٢١ حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال نا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قالا حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما ـ

হাদীছ—১২১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি····হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় ভাইকে কাফির বলিয়া আখ্যায়িত করে তবে সেই কুফর তাহাদের উভয়ের কোন একজনের উপর বর্তাইবে। (অর্থাৎ যাহাকে কাফির বলিয়াছে সে যদি প্রকৃতভাবে কাফির হয় তবে তো যথার্থই বলিয়াছে। কিন্তু যদি সে কাফির না হয় তবে ঐ সময় সম্বোধনকারীর উপরই কুফর প্রত্যাবর্তন করিয়া পড়িবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

মানুষের স্বীয় যবানকে হিফাযত করা অত্যাবশ্যক। কাহারও সম্পর্কে প্রমাণহীন কোন মন্তব্য করা খুবই গর্হিত কাজ। আর উহার পরিণাম অত্যন্ত বিপদজনক। কোন মুসলিম ভাইকে অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত কাফির আখ্যায়িত করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। এই সম্পর্কে আহলে হকগণের মাযহাব হইতেছে যে, মুসলমান কবীরা গুনাহের কারণে কাফির হয় না। যেমন হত্যা, ব্যাভিচার ইত্যাদি। অনুরূপ মুসলমান স্বীয় মুসলিম ভ্রাতাকে কাফির বলিয়া আখ্যায়িত করিলেও সম্বোধনকারী কাফির হইবে না, যতক্ষণ না সে দ্বীনে হককে বাতিল বলিয়া বিশ্বাস করিবে। অথচ আলোচ্য হাদীছ শরীফের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, উভয়ের একজন কাফির হইয়া যাইবে অর্থাৎ কোন মুসলমান যদি অপর কোন মুমিন ব্যক্তিকে কাফির বলে তাহা হইলে যাহাকে কাফির বলা হইয়াছে সে যদি বস্তুতই শরীআতের প্রমাণাদি দ্বারা কাফির প্রমাণিত হয় তবে তো সত্য কথাই বলিয়াছে। কিন্তু সে যদি প্রকৃতপক্ষে কাফির না হয় তবে সম্বোধনকারীর উপর কুফরের হুকুম প্রত্যাবর্তন করিবে অর্থাৎ সম্বোধনকারীই কাফির বলিয়া গণ্য হইবে। তাই আহলে হকগণ আলোচ্য হাদীছ– শরীফের বিভিন্ন জবাব প্রদান করিয়াছেন।

(১) যদি কোন মুসলমান অপর কোন মুসলিমকে কাফির আখ্যায়িত করা জায়েয বলিয়া বিশ্বাস করে তবে সম্বোধনকারী কাফির হইয়া যাইবে। কারণ শরীআতের হারামকে হালাল জানা কুফরী।

(২) আর যদি এইরূপ বলা জায়েয বলিয়া বিশ্বাস করে না, কিন্তু কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া এইরূপ বলে তাহা হইলে কুফরী প্রত্যাবর্তিত হইবার মর্ম এই যে, যাহাকে কাফির বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে তাহার অপরাধ ও গুনাহসমূহ সম্বোধনকারীর উপর প্রত্যাবর্তিত হইবে।

(৩) কাযী আয়্যায (রহঃ) ইমাম মালিক (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য হাদীছ খারেজীদের ব্যাপারে প্রযোজ্য, যাহারা মুসলমানকে কাফির বলিয়া ফতোয়া দিত। শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, এই ব্যাখ্যা দুর্বল। কেননা সহীহ মাযহাব ও অধিকাংশ আহলে হকগণের অভিমত হইতেছে যে, খারেজীরা অন্যান্য বিদআতীদের ন্যায় বিদআতী, কাফির নহে। আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেন, ইমাম মালেক (রহঃ) যখন বলিয়াছেন তখন খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা এমন কতক সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে কাফির আখ্যায়িত করিত যাহাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত এবং ঈমানের সাক্ষ্য দিয়াছেন। কাজেই খারেজীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাক্ষ্যের বিরোধিতা করিবার কারণে

কাফির হইবে। কেবল এই কারণে নহে যে, মুসলমানকে কাফির আখ্যায়িত করিবার কারণে কাফির হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, বস্তুতঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফে মুসলমানগণকে সাবধান করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন স্বীয় মুসলিম ভাইকে কাফির বলিয়া আখ্যায়িত না করে। কেননা এই হাদীছ খারেজী ও অন্যান্য বিদআতী দলের সৃষ্টির পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) সম্বোধনকারীর উপর কুফর প্রত্যাবর্তন করিবে ইহার মর্ম হইতেছে যে, তাহার পরিণাম কুফর হইবে। এই জন্য যে, যে ব্যক্তি ধারাবাহিক অধিক হারে গুনাহ করিতে থাকে তাহার জন্য ভয় আছে যে গুনাহের অশুভ পরিণাম তাহাকে কুফরী পর্যন্ত নিয়া যাইবে এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে।

এই ব্যাখ্যার সপক্ষে প্রমাণ হযরত আবূ আওয়ানা আল কিরমানী (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'মুখরিজ আলা সহীহ মুসলিম' এ বর্ণিত রিওয়ায়াতঃ

فان كان كما قال والا فقد باء بالكفر

অর্থাৎ "অতঃপর যদি যেমন বলিয়াছে তেমন হইলে ঠিকই আছে, না হয় সম্বোধনকারীর উপর কুফর প্রত্যাবর্তন করিবে।"

অন্য রিওয়ায়াতে আছে–

اذ قال لاخيه ياكافر وجب الكفر على احدهما

অর্থাৎ "যদি কেহ স্বীয় ভাইকে 'হে কাফির' বলিয়া সম্বোধন করে তাহা হইলে উভয়ের যে কোন একজনের উপর কুফর প্রত্যাবর্তন ওয়াজিব হইবে।"

(৫) কুফর প্রত্যাবর্তনের দ্বারা হাকীকতে কুফর প্রত্যাবর্তন মর্ম নহে বরং উহার মর্ম এই যে, তাহার দিকে কুফর সম্বোধন প্রত্যাবর্তন করিবে অর্থাৎ সে যখন তাহার একজন মুমিন ভাইকে কাফির বলিয়াছে ইহা এমন হইল যে, সে যেন নিজেই নিজেকে কুফর বলিয়াছে। কারণ যাহাকে কাফির বলিয়াছে সেও তাহারই ন্যায় একজন মুসলিম। সুতরাং একজন মুসলমানকে কাফির আখ্যায়িত করার মানেই হইতেছে নিজেকে নিজে কাফির আখ্যা দেওয়া।

(৬) আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, শরীআতের পরিভাষায় কুফর হইল ইসলামী শরীআতের আবশ্যকীয় জ্ঞাত বিষয়াবলীর অস্বীকার করার নাম আর শরীআতে কখনও ইহা নেয়ামতের অস্বীকার করা বা অনুগ্রহদাতার কৃতজ্ঞতা ও তাঁহার হক প্রতিষ্ঠাকে ত্যাগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে يكفرن الاحسان ويكفرن العشير অর্থাৎ "তাহারা অনুগ্রহ স্বীকার করে না এবং তাহারা স্বামীর কৃতজ্ঞ হয় না।"

সারকথাঃ যাহাকে কাফির বলা হইতেছে সে যদি শরীআতের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা কাফির প্রমাণিত হয় তাহা হইলে সম্বোধনকারী সত্য কথাই বলিয়াছে। কাজেই যাহাকে কাফির বলিয়াছে তাহার উপরই কাফির কথাটি প্রযোজ্য হইবে। আর যদি সে বস্তুতঃ কাফির নহে তাহা হইলে সম্বোধনকারীর উপর কুফর কথা এবং উহার গুনাহ পতিত হইবে। (এই ব্যাখ্যা খুবই সঠিক)। (শরহে নববী ও ফতহুল মুলহিম)

বলাবাহুল্য আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কথাকে নিয়ন্ত্রণ করা বাঞ্ছনীয়। মনে যাহা চায় সেই মুতাবিক কাহাকেও কোনরূপ মন্তব্য করা উচিত নয়। শরীআতের অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত ফতোয়াবাজি করিয়া কাহাকেও কাফির বলিয়া আখ্যায়িত করিবার পরিণামে নিজের উপরই কুফরের ফতোয়া জারী হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও গযবে পতিত হইবার প্রবল আশংকা থাকে। হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যভাবে ইসলামী শরীআতের পরিপন্থী কাফিরদের ন্যায় কাজ করে তবে তাহাকে এইরূপ বলা যায়

যে, সে কাফিরদের ন্যায় কাজ করে। ইহা বলা নাজায়েয নহে। আর শরীআতের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা কাহারও উপর কুফর প্রমাণিত হইলে এবং তাহার দ্বারা অন্যান্য মুমিনগণ বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহার সম্পর্কে কুফরী ফতোয়া দিয়া উহাকে প্রকাশ করা জায়েয আছে। যেমন বর্তমান কালের কবর পূজারী ভণ্ড পীর ফকীরদের বাহ্যিক আ'মাল ও আকীদা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, তাহারা সঠিক ইসলাম হইতে সরিয়া শিরক ও কুফরে লিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের কিছু সংখ্যক তো বিদআতী আর কিছু সংখ্যক ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছে। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় যে, এইসকল বেদআতীরা ওলামায়ে হক্কানীগণকে কাফির ফতোয়া দিয়া বেড়ায় এবং সাধারণ মুসলমানের আকীদা নষ্ট করিতেছে। এই হিসাবে হাদীছে প্রকাশ্য অর্থও প্রযোজ্য। হে করুণাময়! এই সকল দুনিয়াদার ভণ্ডদের কবল হইতে সাধারণ মুসলমানের ঈমানকে হেফাযত করুন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

১২২ وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه ـ

হাদীছ—১২২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী, ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব, কুতায়বা বিন সাঈদ এবং আলী বিন হুজর (রহঃ)। তাহারা⋯আব্দুল্লাহ বিন দীনার হইতে। তিনি হযরত ইবন ওমর (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে কোন ব্যক্তি স্বীয় (মুসলিম) ভাইকে কাফির বলিয়া সম্বোধন করিলে তবে তাহাদের উভয়ের একজন উহা (কুফর) লইয়া প্রত্যাবর্তন করিবে অর্থাৎ উভয়ের একজনের উপর কাফির কথাটি বর্তাইবে। যাহাকে কাফির আখ্যায়িত করা হইয়াছে সে যদি বস্তুতঃ যেমন বলিয়াছে তেমন হয় (তাহা হইলে তাহার উপর কুফর পতিত হইবে।) অন্যথায় কথাটি সম্বোধনকারীর উপরই প্রত্যাবর্তন করিবে। (অর্থাৎ সম্বোধনকারী কাফির হইবে)[১]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ইসলামে স্বীকৃত কোন নেক আমল করিবার ভিত্তিতে কোন কাফির ব্যক্তিকে যেমন মুসলমান বলা সহীহ নহে যতক্ষণ না সে তাওহীদ ও রিসালতে বিশ্বাসী হইবে অনুরূপ কোন মুসলমানকে কেবল তাহার মন্দ আ'মাল ও গুনাহের দরুণ কাফির বলাও সহীহ নহে যতক্ষণ না সে আকীদাগতভাবে কুফরী ঘোষণা করিবে। ইসলামী শরীআতের মধ্যে কোন মুসলমানকে কাফির বলা অথবা কোন কাফিরকে মুসলমান বলা উভয় ক্ষেত্রে একইরূপ নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। আলোচ্য হাদীছ শরীফের উদ্দেশ্য যে, গুনাহগার মুমিনকে কাফির আখ্যায়িত করিবার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করা। ইহা দ্বারা এই উদ্দেশ্য নহে যে, প্রকাশ্য কাফিরকে কাফির বলা নিষেধ।

বলাবাহুল্য বস্তুতঃ মানুষ প্রকৃতিগতভাবে খুবই দুর্বল। কাজেই সে গুনাহের দিকে ধাবিত হইতে পারে। এই অভীপ্সার কারণেই মহাশক্তিধর পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলাও মানুষকে অপারগ ও ক্ষমার্হ গণ্য করিয়াছেন এবং এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, সে যেন স্বীয় দুর্বলতার শিকারে নিরাশ না হইয়া তাওবা ও ক্ষমার আবেদনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করে। কিন্তু শিরক ও কুফরের দিকে প্রবণতা মানুষের জন্মগত প্রকৃতি নহে। ইহা প্রকৃতির

টীকা-১: والا رجعت عليه অন্যথায় কুফর কথাটি সম্বোধনকারীর উপর প্রত্যাবর্তন করিবে। অর্থাৎ সম্বোধনকারীই কাফির হইবে। (ইহার ব্যাখ্যা হাদীছ নং ১২১ দ্রষ্টব্য)।

বিপরীত। কাজেই উহার মধ্যে কাহাকেও অপারগ ও ক্ষমার্হ গণ্য করা হয় না। ইহা তো নিজ স্রষ্টার সহিত প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করা। এই কারণেই তাহাকে শত্রুদের কাতারে গণ্য করা হইয়া থাকে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে, আমাদের যুগে এই গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ শরীফের উপরও সহীহভাবে চিন্তা করা হয় না। ফলে কেহ তো কেবল দ্বীনের শাখা প্রশাখার মতবিরোধের ভিত্তিতেই একে অপরের উপর কুফরের জলছিটা আরম্ভ করিয়াছে। আর কেহ তো সর্বসম্মত কুফরী প্রমাণিত ব্যক্তিবর্গের উপরও কুফরের হুকুম দেওয়ার মধ্যে নীরবতা অবলম্বন করিতেছেন।

এই অনুচ্ছেদের হাদীছ শরীফসমূহ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের মুখ হইতে নিসৃত কথা কখনও ধ্বংস হয় না। বাহ্যতঃ ধারণা হয় যে, উহা শুধু একটি বহমান তরল পদার্থরূপ যাহা মুখ হইতে নিসৃত হইয়াছে এবং উহা জগতের বিস্তৃত খোলা স্থানে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হাদীছ শরীফ ইহা বলিয়া দিয়াছে যে, মানুষের এক একটি কথা যাহা কাহারও মুখ হইতে বাহির হয় উহা যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকে। কেবলমাত্র সম্মানিত কাতেবীনের রেজিষ্টারের মধ্যেই সীমিত নহে বরং জগতের বিস্তৃত খোলা স্থানেও।

সুনানে আবী দাউদ শরীফের মধ্যে হযরত আবূদ দারদা (রাযিঃ) হইতে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যে,

ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتاخذ يمنه ويسره فان لم يجد مساغا رجعت الى الذى لعن فان كان اهلا والا رجعت الى قائلها-

অর্থাৎ "যখন কোন ব্যক্তি কাহারও উপর অভিশাপ বা ভৎর্সনা করে তখন এই কথাটি সর্বপ্রথম আকাশের দিকে যাইতে থাকে। কিন্তু রহমতের চাহিদায় আকাশের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর সেই স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ভূমণ্ডলের দিকে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। আর ডানে বামে ঘূর্ণমান প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। কিন্তু কোথাও তাহার স্থান সঙ্কুলান হয়না। তখন বিশেষভাবে ঐ ব্যক্তির দিকে যায় যাহার প্রতি ভৎর্সনা করা হইয়াছে। যদি সেই ব্যক্তি ভৎর্সনার যোগ্য না হয় তাহা হইলে গত্যন্তর না দেখিয়া ভৎর্সনাকারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে (এবং তাহার উপরই পতিত হয়)।"

মানুষ মনে করে যে, তাহার কথাসমূহ এবং কর্মসমূহ অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় হিসাবের আওতাধীন নহে। হাদীছ শরীফ বলিয়া দিতেছে যে; মানুষের ধারণা ঠিক নহে। বরং তাহারা সৃষ্টির সেরা জীব, তাই তাহাদের স্বীয় প্রতিটি কর্মকাণ্ড এমনকি মুখ হইতে নিসৃত এক একটি বর্ণেরও হিসাব দিতে হইবে। ফকীহগণ এই মূলতত্ত্ব খুব ভালভাবে অনুধাবন করিয়াছেন। এইজন্যই তাহারা আকেল বালেগ ব্যক্তির কোন কথাকেই অনর্থক বেকার বলিয়া মনে করেন না। প্রতিটি কথারই কোন না কোন রহস্য বাহির করিয়া উহার ভিত্তিতে কোন না কোন হুকুম জারী করেন। কোন ব্যক্তিকে কাফির বলিয়া সম্বোধন করা হাসি তামাশার কথা নহে বরং বিরাট দায়িত্বের বিষয়। ইহা সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে মুখে উচ্চারণ করিবার উপযুক্ত নহে। যদিও 'হে কাফির' কেবল একটি ব্যবহারিক কথা কোন ফতোয়া নহে কিন্তু অস্থানে ইহার ব্যবহারও স্বীয় ক্রিয়া প্রদর্শন ব্যতীত থাকে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

١٢٣ | وحدثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللّٰهِ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ -

হাদীছ—১২৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ)। তিনি হযরত আবূ যর (রাযিঃ) হইতে। হযরত আবূ যর (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া স্বীয় পিতার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে পিতা বলিয়া দাবী করে সে কুফরী করিল।[১] আর যে ব্যক্তি এমন কোন বস্তুর দাবী করে যাহা তাহার নহে। তবে সে আমাদের দলভুক্ত নহে। আর সে যেন স্বীয় বাসস্থান জাহান্নামে স্থির করিয়া লইল। আর যে কেহ কোন বক্তিকে কাফির বলিয়া সম্বোধন করে অথবা আল্লাহ তা'আলার দুশমন বলিয়া ডাকে আর যদি সম্বোধিত ব্যক্তি অনুরূপ না হয় তাহা হইলে এই কুফরী কথাটি সম্বোধনকারীর উপরই প্রত্যাবর্তন করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

অত্র হাদীছ শরীফের প্রথমাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, জানিয়া বুঝিয়া স্বীয় পিতা ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিজের পিতা বলিয়া দাবী করা কুফরী। উল্লেখ্য যে, জানা সত্ত্বেও স্বীয় পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বানানো এবং অন্যের জিনিষ নিজের বলিয়া দাবী করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। আর আহলে হকগণের অভিমত হইতেছে কবীরা গুনাহের দ্বারা কোন মুমিন ইসলাম হইতে বহিস্কার হইয়া কাফির হয় না। তাই আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যা রহিয়াছে। শারেহ নববী (রহঃ) বলেন যে, ওলামাগণ এই হাদীছ শরীফের দুইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমতঃ ইহার দ্বারা ঐ ব্যক্তি মর্ম, যে স্বীয় পিতা ব্যতীত অন্যকে জন্মসূত্রে পিতা বানানো হালাল এবং জায়েয মনে করে। কারণ জ্ঞাত সত্ত্বেও শরীআতের হারাম বিষয়কে হালাল গণ্য করা কুফরী। দ্বিতীয়তঃ এই কুফর দ্বারা শরয়ী কুফর মর্ম নহে যাহা ইসলামের বিপরীত। বরং কুফর দ্বারা না-শোকর এবং অনুগ্রহ ভুলিয়া যাওয়া মর্ম। কেননা সে নিজ পিতার ইহসানকে বিস্মৃত করিয়া দিয়াছে এবং অন্যকে পিতা বানাইয়াছে। কুফর দ্বারা না-শোকর মর্মার্থ গ্রহণের উপমা অন্য হাদীছেও রহিয়াছে। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের ব্যাপারে বলিয়াছেন যে, তাহারা কুফরী করে অর্থাৎ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

আর হাদীছ শরীফের দ্বিতীয়াংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি এমন জিনিষের দাবী করে যাহা তাহার নহে সে আমাদের মধ্যে নহে এবং সে স্বীয় বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করিয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞাত আছে যে এই জিনিষটি আমার নহে চাই ইহা অন্য কাহারও হউক বা না হউক এইরূপ জিনিষের উপর দাবী করে যে ইহা আমার তাহা হইলে সে আমাদের দলভুক্ত নহে অর্থাৎ আমাদের রীতিনীতি ও তরীকার নহে। (কেননা মিথ্যা দাবী ইসলামী শানের পরিপন্থী।) এইরূপ ব্যবহার আরবী ভাষায় রহিয়াছে। যেমন পিতা নিজ ছেলের প্রতি অসন্তোষ হইয়া বলে - لست منى তুমি আমার নহে অর্থাৎ তুমি আমার রীতি ও চালচলনের মধ্যে নহে। আর জাহান্নামের ঠিকানা নির্ধারণ করিবার মর্ম এই যে, তাহার অপরাধের শাস্তি জাহান্নাম। অতঃপর যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তবে ক্ষমা করিয়া শাস্তিহীন জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন অথবা গুনাহ পরিমাণ শাস্তি দিয়া জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। তাহা ছাড়া তাওবা দ্বারাও সে ক্ষমা পাইতে পারে।

টীকা-১· সবচাইতে বড় কুফর হইতেছে যে, মানুষ স্বীয় সৃষ্টিত্বের مخلوقيت সম্পর্ক প্রকৃত স্রষ্টা হইতে ভঙ্গ করিয়া অস্রষ্টার সহিত গড়া। আর দ্বিতীয় প্রকার কুফর এই যে, শুধু মন্দ নিয়্যাতে পুত্রত্বের بنيت। সম্পর্ক নিজ জন্মদাতা পিতার স্থলে যাহার বীর্যে জন্ম হয় নাই তাহার সহিত কায়িম করা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হাদীছ শরীফের তৃতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়ের ব্যাখ্যা ১২১ নং হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। এইখানে حار শব্দের অর্থ رجع প্রত্যাবর্তন করা। আর حار এবং بار উভয় শব্দের অর্থ এক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী)

ফায়দাঃ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিজের জিনিষ নহে এমন কোন জিনিষ চাই উহাতে অন্যের হক থাকুক বা না থাকুক উহাকে নিজের বলিয়া দাবী করা হারাম। কোন ব্যক্তির জন্য এমন বস্তু গ্রহণ করা হালাল নহে যাহার মধ্যে তাহার কোন স্বত্বাধিকার নাই, যদিও হাকিম ফায়সালা করিয়া তাহাকে প্রদান করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী)

باب بيان حال ايمان من رغب عن ابيه وهو يعلم

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি জ্ঞাত সত্ত্বেও নিজ পিতাকে অস্বীকার করে তাহার ঈমানের অবস্থার বর্ণনা

১২৪ **حدثنى** هرون بن سعيد الايلى قال نا ابن وهب قال اخبرنى عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك انه سمع اباهريرة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر -

হাদীছ-১২৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন সাঈদ আল-আয়লী (রহঃ)। তিনি....হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমরা নিজ পিতা হইতে বিমুখ হইও না। (অর্থাৎ নিজ জন্মদাতা পিতাকে অস্বীকার করিয়া অন্যকে জন্মসূত্রে পিতা বানাইও না।) যে ব্যক্তি (কেবল আভিজাত্য ও প্রশংসা কুড়াইবার বাসনায়) আপন পিতা হইতে সম্পর্ক কর্তন করে।[১] (এবং কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের সহিত বংশ সম্পর্ক গড়ে) তবে ইহাও তাহার একটি কুফরী কাজ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

পিতা-মাতার ইহসান স্বীকার করা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব। তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ ও বিমূখিতা হারাম। উল্লেখ্য যে, প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় নেয়ামত ও অনুগ্রহ একান্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে। কিন্তু বাহ্যিক উপকরণের দিক দিয়া লক্ষ্য করিলে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পরে মানুষের প্রতি সর্বাধিক ইহসান ও অনুগ্রহ থাকে পিতা-মাতার। সাধারণ উপকরণসমূহের মাঝে মানুষের অস্তিত্বের পশ্চাতে পিতা-মাতাই বাহ্যিক কারণ। তাহা ছাড়া জন্মের পর হইতে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সকল কঠিন পথ ও স্তর রহিয়াছে তাহাতে

টীকা-১. رغب - رغب عن ابيه শব্দের صله যদি عن হয় তাহা হইলে উহা বিমূখ হওয়া, বর্জন করা ইত্যাদির অর্থ প্রকাশ করে। কাজেই فمن رغب عن ابيه এর মর্ম فمن ترك الانتساب وجحده অর্থাৎ অতঃপর যে বংশ সম্পর্ক কর্তন বা বর্জন করে, যেমন বলা হয় رغبت عن الشئ অর্থাৎ উক্ত বস্তুকে বর্জন করিলাম বা মকরূহ বুঝিলাম। আর رغب এর صلة যদি في আসে তখন উহার অর্থ হয় গ্রহণ, চাওয়া, বাসনা ইত্যাদি। যেমন, رغبت فيه অর্থাৎ আমি উহা গ্রহণ করিলাম বা কামনা করিলাম বা আকাংক্ষা করিলাম। (শরহে নববী)

বাহ্যতঃ পিতা-মাতাই তাহার অস্তিত্বকে টিকাইয়া রাখেন। তাহার প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের জামানতদার হইয়া থাকেন। এই জন্যই পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পিতা-মাতার হক অধিকারসমূহকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সহিত যুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এরশাদ হইয়াছেঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا -

অর্থাৎ "আর তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ তা'আলার, অন্য কাহাকেও তাঁহার সহিত শরীক করিও না। আর পিতা-মাতার সহিত সৎ ও সদয় ব্যবহার কর।" (সূরা নিসাঃ ৩৬)

অন্য আয়াতে আছেঃ

اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ

অর্থাৎ "আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর।"

মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে شكر (কৃতজ্ঞতা)-এর বিপরীত كفر (অকৃতজ্ঞ) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ

অর্থাৎ "যদি তোমরা শোকর কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে অধিক নেয়ামত প্রদান করিব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে আমার আযাব বড় কঠোর।" (সূরা ইব্রাহীম-৭)

আলোচ্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহারই মর্মার্থের ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, তোমরা স্বীয় পিতা হইতে বিমূখ হইও না। নিজ জন্মদাতা পিতা হইতে বিমূখ হওয়া অর্থাৎ পিতাকে অস্বীকার করা হারাম। তাহা ছাড়া জন্মদাতা পিতা হইতে বিমূখ হইয়া অন্যকে পিতা দাবী করিয়া বংশ সম্পর্ক কর্তন করা আরো জঘন্য হারাম। যদি কোন ব্যক্তি শরীআতের এই মাসআলা জ্ঞাত থাকা সত্বেও এইরূপ গর্হিত কাজকে হালাল বিশ্বাস করে তাহা হইলে সে প্রকৃত কাফির হইয়া যাইবে। আর যদি উহাকে হারাম বিশ্বাস করিয়াও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় সম্পাদন করে তবে তাহার কুফরী করিবার মর্ম এই যে, সে স্বীয় পিতার হক অধিকারের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়াছে। (কুফরী হওয়ার বিষয়টির বিস্তারিত ১২৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

١٢٥ حدثنى عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ نَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادُّعِىَ زِيَادٌ لَقِيْتُ اَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهٗ مَا هٰذَا الَّذِىْ صَنَعْتُمْ اِنِّىْ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ سَمِعَ اُذُنَاىَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعٰى اَبًا فِى الْاِسْلَامِ غَيْرَ اَبِيْهِ يَعْلَمُ اَنَّهٗ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ وَاَنَا سَمِعْتُهٗ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

হাদীছ-১২৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর আন নাকিদ (রহঃ)। তিনি---আবূ ওছমান (নহদী আবদুর রহমান বিন মাল) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন যিয়াদ এর ব্যাপারে দাবী করা হইয়াছিল তখন আমি আবূ বাকরা (রাযিঃ) (যিয়াদ তাঁহার মাতৃদিকের ভাই)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাহাকে বলিলাম, তোমরা ইহা কি করিয়াছ? আমি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)-এর নিকট শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, স্বয়ং আমার কর্ণদ্বয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছে যে, ইসলাম গ্রহণের পর যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া নিজের পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলিয়া স্বীকৃতি দেয় তবে তাহার জন্য জান্নাত হারাম। অতঃপর আবূ বাকরা (রাযিঃ) বলিলেনঃ এই হাদীছ তো স্বয়ং আমিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

রাবী আবূ ওছমান (রহঃ) একটি ঘটনার প্রতিবাদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ শরীফ দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন। আর হাদীছের প্রথমাংশে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা এইঃ যিয়াদ বিন ওবায়দ আছ ছকফী হযরত আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ)-এর অনুসারী ছিলেন। পরে তিনি হযরত মু'আবিয়া বিন আবী সুফিয়ান (রাযিঃ)-এর আনুগত্য গ্রহণ করেন। তাই হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ) যিয়াদকে আবূ সুফিয়ানের পুত্র এবং নিজের ভ্রাতা বলিয়া দাবী করিলেন। যিয়াদ এই দাবীর বিরোধিতা করেন নাই বরং তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন। যিয়াদের সম্মতির মাধ্যমে তিনি আবূ সুফিয়ানের পুত্র হইবার দাবীদার হিসাবে গণ্য হন। এই হিসাবে হাদীছ শরীফে উল্লেখিত لما ادعى زياد বাক্যের ادعى শব্দের د বর্ণে পেশ এবং ع বর্ণে যের দ্বারা مجهول (কর্মবাচ্য) রূপে পঠিত। অর্থাৎ ادعاه معاوية। (হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) যিয়াদকে স্বীয় ভ্রাতা বলিয়া দাবী করিল) আর কেহ কেহ ادعى শব্দটি "د" ও ع বর্ণদ্বয়ে যবর দ্বারা معروف (কর্তৃবাচ্য)রূপে পাঠ করেন। এই হিসাবে যিয়াদ কর্তা হইবে। অর্থাৎ যিয়াদ নিজেই আবূ সুফিয়ানের পুত্র বলিয়া দাবী করিলেন। ফলে তিনি হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)-এর ভ্রাতা হইলেন। কাজেই উভয় অবস্থায় অর্থাৎ পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে যিয়াদ হযরত আবূ সুফিয়ান (রাযিঃ)-এর পুত্র হইবার দাবীদার হইল। আর ইসলামী শরীআতে নিজের জন্মদাতা পিতা হইতে বিমুখ হইয়া অন্যকে পিতা বানানো হারাম ও কবীরা গুনাহ।

এই কারণেই আবূ ওছমান (রহঃ) হযরত আবূ বাকরা বিন হারেছ বিন কলদা (রাযিঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা ইহা কি করিয়াছ? উল্লেখ্য যে, যিয়াদ হযরত আবূ বাকরা (রাযিঃ)-এর বৈপিতৃয় ভাই অর্থাৎ উভয়ের মাতা একজন যাহার নাম ছিল সুমাইয়্যা এবং পিতা ভিন্ন ভিন্ন।

আবূ ওছমান হযরত আবূ বাকরা (রাযিঃ)কে এইরূপ প্রশ্ন করিবার মধ্যে দুইটি সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমতঃ তিনি হয়ত ধারণা করিয়াছেন যে, আবূ বাকরা (রাযিঃ) যিয়াদের বিষয়ে সম্মত আছেন। কারণ উভয়ের কথাবার্তার সময় পর্যন্ত আবূ ওছমান ঐ বিষয়টি অবহিত ছিলেন না যে, হযরত আবূ বাকরা (রাযিঃ) যিয়াদের বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, যিয়াদ যখন নিজেকে আবূ সুফিয়ানের পুত্র বলিয়া দাবী করিয়াছিল তখন হযরত আবূ বাকরা (রাযিঃ) উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং যিয়াদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। এমন কি তিনি শপথ করিয়াছেন যে, তাহার সহিত কখনও কথা বলিবেন না। অথবা আবূ ওছমানের জানা ছিল, তবে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন ماهذا الذى صنعتم "তোমরা ইহা কি করিয়াছ?" ইহার মর্ম এই হইবে যে, তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে যেই ঘটনা ঘটিয়াছে সেই সম্পর্কে কি করিয়াছ? কেননা ইহা তো খুবই মন্দ কাজ আর ইহার পরিণাম ফল জাহান্নামের শাস্তি। কেননা আমি হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি তাহার কর্ণদ্বয় দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ করিবার পর যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া নিজের আপন পিতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে পিতা বলিয়া স্বীকৃতি দেয় তাহার উপর জান্নাত হারাম।

বলাবাহুল্য পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, আহলে হকগণের অভিমতে মুমিন ব্যক্তি কবীরা গুনাহের কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে না বরং ক্ষমার মাধ্যমে অথবা গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর একবার না একবার জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এই কারণেই শারেহ নববী (রহঃ) বলেনঃ হাদীছ শরীফে উল্লেখিত فالجنة عليه حرام "তাহার উপর জান্নাত হারাম"-এর ব্যাখ্যা দুইভাবে হইতে পারে। (১) সে যদি স্বীয় আসল পিতা ব্যতীত অন্যকে আসল পিতা বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়াকে (শরীআতে যে হারাম ইহা জানা সত্ত্বেও) হালাল বলিয়া বিশ্বাস করে তবে সে কাফির হইয়া যাইবে। ফলে প্রকৃতভাবেই তাহার উপর জান্নাত হারাম হইবে। (২) আর যদি সে এইরূপ বলাকে হারাম বলিয়া স্বীকার করে কিন্তু কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া নিজের বংশ পরিবর্তনের মাধ্যমে দুনিয়ার অভিজাত্য অর্জনের বাসনায় মিথ্যা দাবী করে তাহা হইলে ইহার মর্ম হইবে যে, প্রাথমিক পরিত্রাণপ্রাপ্ত

মুমিনগণের সহিত জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইবে। কেননা তাহার গুনাহ বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া শাস্তিহীন জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন অথবা গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তাহা ছাড়া খাঁটি তাওবার দ্বারাও গুনাহ ক্ষমা হইতে পারে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী ও ফতহুল মুলহিম)

সিরাজুল ওহহাজ কিতাবে আছে যে, লোকেরা এই বিষয়ে বড় শিথিলতায় নিপতিত হইয়াছে। এমনকি কতক লোক অন্যদের ঔরসজাত সন্তানে পরিণত হয় অথচ সে ভালভাবে জানে যে, সে তাহার ঔরসজাত সন্তান নহে। এই প্রকার হারাম বংশের প্রসার রাজা, বাদশা, আমীর ও নবাবদের দ্বারা অধিকাংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আর কতক লোক নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা বাড়াইবার জন্য নিজেদেরকে সাইয়্যেদ বলিয়া দাবী করে অথচ তাহারা ভালভাবেই জানে যে, তাহারা হযরত ফাতিমা (রাযিঃ)-এর বংশধর নহে। কিন্তু পার্থিব জগতে মর্যাদা লাভের আকাংক্ষায় ইহার প্রবল ঝড় বহিতেছে। আর এই প্রকার বংশ সম্পর্ক কর্তনের গর্হিত ও ধ্বংসের কাজের মধ্যে সাধারণতঃ সম্পদশালী আমীর এবং অর্থহীন গরীবগণই পতিত হয়। আমীর লোকেরা স্বীয় আড়ম্বর বাড়াইবার জন্য এবং গরীবরা টাকা পয়সা লাভের জন্য এইরূপ করে। ইহা তো শয়তানের প্রভাব। সে তাহাদের বিবেককে মিটাইয়া দিয়া পথভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করে। হে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে হিদায়েতের পথে সুদৃঢ় রাখুন।

বলাবাহুল্য যাহার ঔরসজাত পুত্র তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও পিতা বানাইয়া নিজ বংশসূত্র বাপ-দাদা হইতে কর্তন করা হারাম ও কবীরা গুনাহ যাহা আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে উস্তাদ, শায়খ ও বুজুর্গগণকে রূহানী পিতা বলিয়া সম্বোধন করিবার মধ্যে কোন ক্ষতি নাই।

١٢٦ **حدثنا** ابوبكر بن ابى شيبة قال نا يحيى بن زكريا بن ابى زائدة وابومعاوية عن عاصم عن ابى عثمان عن سعد وابى بكرة كلاهما يقول سمعته اذناى ووعاه قلبى محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام -

হাদীছ-১২৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি--হযরত সা'দ ও আবূ বাকরা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়াত করেন। তাহারা প্রত্যেকে বলেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী আমার কর্ণদ্বয় শ্রবণ করিয়াছে এবং আমার অন্তর স্মরণ রাখিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা ব্যতীত অন্য কাহাকেও পিতা বলিয়া দাবী করে অথচ সে জানে যে, সে তাহার পিতা নহে, এইরূপ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম (অর্থাৎ প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধহইবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(বিস্তারিত ১২৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

باب بيان قول النبى صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

অনুচ্ছেদঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বাণী "মুসলমানকে গালি দেওয়া মহাপাপ এবং তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরী"–এর বর্ণনা

١٢٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ قَالَ زُبَيْدٌ فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَوْلُ زُبَيْدٍ لِأَبِي وَائِلٍ

হাদীছ–১২৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাককার আর রাইয়ান (রহঃ) ও আওন বিন সাল্লাম (রহঃ)...এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ)। তাহারা সকলেই যুবায়দ হইতে, তিনি আবী ওয়ায়েল (রহঃ)[১] হইতে। তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়াত করেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মুসলমানকে গালি দেওয়া (অথবা দোষত্রুটি উল্লেখপূর্বক সম্বোধন করা) ফিসক[২] (অর্থাৎ গুনাহের কাজ। এইরূপ যে করিবে সে ফাসিক) আর তাহার (মুসলমানের) সহিত ঝগড়া বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া কুফরী। বর্ণনাকারী যুবায়দ (বিন হারিছ আল ইয়ামী, উপনাম আবূ আবদির রহমান) (রহঃ) বলেন, আমি (আমার শায়খ) আবূ ওয়ায়েল (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি এই হাদীছ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে শুনিয়াছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন? তিনি (আবূ ওয়ায়েল (রহঃ)) বলিলেন, হ্যাঁ। (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর রাবী শু'বা (রহঃ)–এর বর্ণিত হাদীছে زبيد لابى وائل (যুবায়দ (রহঃ) আবূ ওয়ায়েলকে জিজ্ঞাসা করিবার) কথাটি উল্লেখ নাই।

টীকা–১· عن ابى وائل আবী ওয়ায়েল হইতে। সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত যুবায়দ (রহঃ) আবূ ওয়ায়েল (রহঃ)কে মুরজিয়াদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, حدثنى عبد الله ان النبى صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (আবূ ওয়ায়েল বলেন, আমার নিকট আবদুল্লাহ হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফিসক অর্থাৎ গুনাহের কাজ। আর তাহার সহিত মারামারিতে প্রবৃত্ত হওয়া কুফরী।) আর আবূ দাউদ আত–তায়ালিসী (রহঃ) হযরত শু'বা হইতে, তিনি হযরত যুবায়দের সূত্রে বর্ণনা করেন। হযরত যুবায়দ (রহঃ) বলেন, যখন মুরজিয়া (ভ্রান্ত) সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল তখন আমি (আমার শায়খ) হযরত আবূ ওয়ায়েল (রহঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং তাহার নিকট মুরজিয়াদের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত যুবায়দ (রহঃ) হযরত আবূ ওয়ায়েল (রহঃ)–এর নিকট মুরজিয়াদের আকীদা সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। (মুরজিয়াদের আকীদা হইল যে, ঈমানের সহিত গুনাহ কোন ক্ষতিকারক নহে।) তখন হযরত আবূ ওয়ায়েল (রহঃ) মুরজিয়াদের অভিমতের খণ্ডনে আলোচ্য হাদীছ বর্ণনা করিলেন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা মুরজিয়াদের আকীদা খণ্ডন হইয়াছে কিন্তু হাদীছের দ্বিতীয় অংশ وقتاله كفر (আর তাহার

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য হাদীছ শরীফের প্রথম অংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুসলমানকে (না-হক) গালি দেওয়া ফিসক অর্থাৎ গুনাহের কাজ। আর এই বিষয়ে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত হইতেছে যে, মুসলমানকে গালি দেওয়া ও কলঙ্কিত করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। অনুরূপ মুসলমান পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়াও হারাম এবং কবীরা গুনাহ। আর আহলে হকগণের অভিমত হইতেছে যে, কবীরা গুনাহের দ্বারা কোন মুমিন ইসলাম হইতে বহিস্কার হইয়া কাফির হয় না। যেমন শাফায়াতের হাদীছ শরীফসমূহ এবং আল্লাহ তা'আলার এরশাদঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ

(নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার সহিত শিরক করিবার গুনাহ তিনি মাফ করেন না, তাহা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ তিনি যাহাকে মাফ করিবার ইচ্ছা করেন, মাফ করিয়া থাকেন।) দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে কবীরা গুনাহ হালাল বিশ্বাস করিয়া করিলে ভিন্ন কথা। কেননা দ্বীনে শরীআতের হারাম বিষয়াবলীকে জানিয়া বুঝিয়া হালাল মনে করিলে প্রকৃত কাফির হইয়া যাইবে। সুতরাং অত্র হাদীছের দ্বিতীয় অংশ 'তাহাদের সহিত ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া কুফরী'-এর ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

(১) বহু হাদীছ শরীফে কতগুলি জঘন্য গুনাহের উপর কুফর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। নাফরমানের উপর কুফরের ব্যবহার দ্বারা প্রকৃত কুফর মর্ম নহে বরং উহা দ্বারা অকৃতজ্ঞতা মর্ম। পূর্বে উহার আলোচনা হইয়াছে। তাই শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছে কুফর দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, অনুগ্রহ, নেয়ামত ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অকৃতজ্ঞ হওয়া। অবিশ্বাসী কাফির মর্ম নহে।

(২) কবীরা গুনাহের মধ্যেও জঘন্যতার দিক দিয়া পার্থক্য রহিয়াছে। এই জঘন্যতার পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করিবার লক্ষ্যে আলোচ্য হাদীছে গালি দেওয়ার ক্ষেত্রে ফিসক এবং ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কুফর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ মারামারিতে প্রবৃত্ত হওয়া গালি দেওয়া অপেক্ষা মারাত্মক। মুসলমানকে গালি দেওয়া ও কলঙ্কিত করিবার অপরাধ কোন না কোন ভাবে যদিও সহ্য যোগ্য হয় কিন্তু ঝগড়া বিবাদের অপরাধ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

সহিত মারামারিতে প্রবৃত্ত হওয়া কুফরী)-এর বাহ্যিক অর্থ দ্বারা খারেজী (ভ্রান্ত) সম্প্রদায়ের অভিমতের সপক্ষে হয়। কারণ খারেজীদের অভিমত হইতেছে যে, গুনাহ ঈমানের ক্ষতিকারক এবং মুমিন গুনাহের কারণে ইসলাম হইতে বহিস্কার হইয়া কাফির হইয়া যায়। উত্তর এই যে, আলোচ্য হাদীছ বেদাআতীদের আকীদার খণ্ডনে অতিশয়োক্তির ক্ষেত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ফলে হাদীছে উল্লেখিত كفر শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ মর্ম নহে বরং ব্যাখ্যা রহিয়াছে। উল্লেখ্য যে, বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের সঠিক অর্থ গ্রহণে স্থান ও ব্যবহার রীতি বিবেচনা বাঞ্ছনীয়। একই শব্দ স্থান ও ব্যবহার রীতির কারণে বিভিন্ন অর্থ হয়। অধিকন্তু হাদীছ শরীফের শব্দের মর্মার্থ গ্রহণে অন্যান্য হাদীছ ও কুরআন মজীদের আয়াতের সহিত সমন্বয় বিধানের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি অত্যাবশ্যক। (বিস্তারিত জবাব অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) কাজেই আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা খারেজীগণ স্বীয় অভিমতের স্বপক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করা সহীহ নহে। (ফতহুল মুলহিম).

টীকা-২: سباب المسلم فسوق (মুসলমানকে গালি দেওয়া ফিসক অর্থাৎ গুনাহের কাজ।) سب শব্দটি ক্রিয়াবাচক (مصدر) سَبَّ - يَسُبُّ - سَبًّا - سِبَابًا আর سب শব্দের আভিধানিক অর্থ গালি দেওয়া এবং মানুষকে এমন কথায় সম্বোধন করা যাহার দ্বারা সে কলঙ্কিত হয়। ইব্রাহীম আল-হরবী বলেন السِّبَابُ اشد من السَّبِّ। (سباب শব্দটি سب হইতে মারাত্মক) سباب হইতেছে যে, কোন লোককে এমন মন্দ কথা বলা যাহা তাহার মধ্যে আছে কিংবা নাই, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে যে, তাহাকে কলঙ্কযুক্ত করা। আর কেহ কেহ বলেন السباب শব্দটি এই স্থানে القتال এর ওযনে লওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে উভয় শব্দদ্বয় باب المفاعلة হইতে হইবে। আর فسوق শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্গমন করা, বাহির হওয়া। আর শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলের আনুগত্য হইতে বাহির হওয়াকে ফিসক বলে। (শরহে নববী, ফতহুল মুলহিম)

সহ্য যোগ্য নহে। কেননা ঝগড়া-বিবাদ, অকৃতজ্ঞতা ও অবিশ্বাসের চলচ্ছক্তি। আর ইহার চরম সীমা ইসলামী সম্পর্ককে কর্তন করিয়া দিতে পারে। ফলে তাহার এই গর্হিত কাজটির পরিণামে তাহাকে প্রকৃত কুফর পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই মুসলমানগণকে মারামারি হইতে অত্যধিক সতর্ক ও ভয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি প্রকাশের জন্য কুফর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

(৩) কতক হাদীছ বিশেষজ্ঞ বলেন যে, আলোচ্য হাদীছে "কুফর" দ্বারা কুফরের আভিধানিক অর্থ মর্ম। "কুফর"-এর আভিধানিক অর্থ হইতেছে গোপন করা, ঢাকিয়া ফেলা। কেননা মুসলমানের অধিকার মুসলমানের উপর এই যে, একে অপরের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি করা এবং কাহাকেও কষ্ট প্রদান হইতে বিরত থাকা। কাজেই যখন কাহারও সহিত মারামারিতে লিপ্ত হয় তখন তাহার অধিকারকে গোপন করা হয়।

(৪) ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া কাফিরদের কাজ, মুসলমানদের কাজ নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলমানের সহিত ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হইবে সে কাফিরদের সদৃশ হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী, ফতহুল মুলহিম)

ফায়দাঃ মুসলমানগণের অনুধাবন করা উচিত যে, ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি করা কোন্ পর্যায়ের গর্হিত কাজ এবং ইহার পরিণাম কত ভয়াবহ। যাহার চরম সীমা কুফর পর্যন্ত গড়ায়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে সাধারণ ও খুটিনাটি বিষয় নিয়া মুসলমানগণ বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং দুইদলের মধ্যে গালাগালি ছড়াইয়া ঝগড়া পর্যন্ত সংঘটিত হইতেছে। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দ্বীনে শরীআতের ফরয ছাড়িবার ব্যাপারে কোন কথা নাই কিন্তু মুস্তাহাব নিয়া তুমুল ঝগড়া। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে সঠিক বুঝ দান করুন।

١٢٨ **حدثنا** أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا عَفَّانُ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ -

হাদীছ-১২৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ)---(সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহঃ)। তাহারা উভয়ই আবূ ওয়ায়েল (রহঃ) হইতে, হযরত আব্দুল্লাহ (বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

باب بيان معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

অনুচ্ছেদঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ "তোমরা আমার পরে পরস্পর একজন অপরজনের গ্রীবাসমূহে আঘাতের মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া কাফিরে পরিণত হইও না" এর অর্থের বিবরণ

١٢٩ حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

হাদীছ—১২৯. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশশার (রহঃ)। তাহারা সকলই⋯(সূত্র পরিবর্তন) এবং ওবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহঃ) তিনি⋯হযরত জারীর (বিন আবদুল্লাহ বজলী) (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়াত করেন। হযরত জারীর (রাযিঃ) বলেন যে, বিদায় হজ্জের সময় আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ লোকদিগকে চুপ করাও। (যাহাতে তাহারা দ্বীনের জরুরী কথাসমূহ শ্রবণ করিতে পারে) অতঃপর তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেনঃ তোমরা আমার পরে (অর্থাৎ এই মিনার মহাসমাবেশে অবস্থানের পরে বা ওফাতের পরে) পুনরায় পরস্পর একজন অপরজনের গ্রীবাসমূহে আঘাতের মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া কাফিরে পরিণত হইও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ইসলাম পূর্বকালে আরবরা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত দ্বীনকে ভুলিয়া নানাহ পাপাচারে লিপ্ত ছিল। গোত্রসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা কথায় কথায় অহরহ খুন খারাবী ইত্যাদি কারণে গোটা আরব নিশ্চিহ্ন হইবার কাছাকাছি হইয়া গিয়াছিল। একমাত্র ইসলামরূপ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতই তাহাদেরকে এহেন অশান্তির আগুন হইতে উদ্ধার করিয়াছে। তাহাদেরকে শতাব্দীর শত্রুতা ও প্রতিহিংসার অনল হইতে বাহির করিয়া ভাই ভাই করিয়া দিয়াছে। ইসলামে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার কোন স্থান নাই। ইহাতে কেবল সামাজিক অশান্তি ও অনৈক্যই সৃষ্টি হয়। আর অনৈক্য যে কোন জাতির ধ্বংসের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কারণ। কাজেই মুসলমানগণকে, অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড ও রীতিনীতি পরিহার করিয়া ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। সামাজিক সকল প্রকার অনাচার ও ফিৎনা ফাসাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবে। কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়া আল্লাহ তা'আলার জমিনে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন কায়িম করিবে। এই মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া বিদায় হজ্জের সময় কুরবানীর দিবসে মিনাতে অবস্থানরত অবস্থায় লক্ষাধিক মুসলমানের মহাসমাবেশে সায়্যেদুল মুরসালীন সর্বশেষ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদীর্ঘ মহামূল্যবান অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ খুতবা প্রদান করিলেন। এই খুতবায় (ভাষণে) মুসলিম উম্মাহের ভবিষ্যত কর্মনীতির উপর সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক দ্বীনী মৌলিক বিষয়াবলীর শিক্ষা দিলেন। ওছীয়াত করিলেন, উপস্থিতগণ যাহাতে অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। সেই খুতবার একটি অংশ আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা আমার (এই অবস্থানের বা ওফাতের) পরে

পুনরায় কাফিরদের চলচ্ছক্তি ও কার্য্যাদি অবলম্বন করিও না যে, পরস্পর কলহে লিপ্ত হইয়া একে অপরের গ্রীবাতে আঘাত কর। এই গর্হিত কুফরী কর্মের পরিণামে তোমাদেরকে কাফিরে পরিণত করিবে।

আলোচ্য হাদীছ শরীফের মর্মার্থের ব্যাখ্যায় শারেহ নববী (রহঃ) সাতটি অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন। (১) আলোচ্য হাদীছে কাফির দ্বারা ঐ সকল লোক মর্ম যাহারা অন্যায়ভাবে পরস্পর একে অপরের গ্রীবাসমূহে আঘাত করাকে হালাল মনে করে। শরীআতের হারামকে জানিয়া বুঝিয়া হালাল বিশ্বাসকারী নিঃসন্দেহে কাফির হইয়া যায়। (২) কুফর দ্বারা মর্ম ইসলামের হকের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া। (৩) এইস্থানে কাফির দ্বারা কাফিরদের নিকটবর্তী হওয়া মর্ম অর্থাৎ এই গর্হিত কাজ তাহাকে কুফর পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়ার আশংকা রহিয়াছে। (৪) পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হওয়া কাফিরদের ন্যায় কর্ম। (৫) কাফির দ্বারা প্রকৃত কাফির হওয়াই মর্ম। আর ইহা দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য হইতেছে যে, আমার পর কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করিও না বরং ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকিও। (৬) কুফ্‌ফার দ্বারা মর্ম যুদ্ধাস্ত্র পরিহিত হওয়া অর্থাৎ তোমরা আমার পরে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া একজন অপর জনের গ্রীবায় আঘাতের মাধ্যমে কলহে লিপ্ত হইও না। উল্লেখ্য যে, "কাফির" যুদ্ধাস্ত্র পরিহিত হওয়াকেও বলা হয়। ইহা খাত্তাবী হইতে বর্ণিত। (৭) কাফির দ্বারা মর্ম যে, তোমরা একজন অপরজনকে কাফির বলিও না। অতঃপর কুফরের অজুহাতে তাহার গ্রীবায় আঘাত করিবে। শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, এই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে চতুর্থ নম্বরে উল্লেখিত ব্যাখ্যাই উত্তম। কাযী আয়্যায (রহঃ) ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন। (শরহে নববী)

বলাবাহুল্য ইসলাম যদিও শাহাদাতাইনের নাম, কিন্তু উহার কিছু বিশিষ্ট কার্যাদি রহিয়াছে যাহাকে উহার 'আন্তরিক সাক্ষ্যের' সাক্ষ্য বলা হয়। ঐ সকল কর্মসমূহ শাহাদাতাইনের সহিত এমন গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান, যেন এই কর্মসমূহ ঈমানের একটি দেহরূপ। এইজন্যই উহাকে অবলম্বন করিয়া লওয়া ইসলাম এবং উহাকে পরিত্যাগ করা কাফিরের পদবীযুক্ত হয়। অনুরূপ কুফর যদিও ইসলামী বিশ্বাসের বিপরীত বিশ্বাসের নাম, কিন্তু কুফরী যিন্দিগীরও কিছু উপাদান আছে যাহা কতক সময় নিজে তো কাফির হয় না কিন্তু কাফির হওয়ার বাহ্যিক প্রমাণ বহন করে। হাদীছ শরীফে এই প্রকার কর্মসমূহকে কুফরী কর্ম বলিয়াছে। আর মুমিনের জন্য ইহা পছন্দনীয় নহে যে, তাহার যিন্দিগীর মধ্যে এই সকল কুফরী কর্ম দৃষ্টিতে আসিবে। ইসলাম গ্রহণের পর এই প্রকার কর্মসমূহ সম্পাদনের দ্বারা তাহাকে কাফির আখ্যায়িত করা যায় না বটে কিন্তু কুফরের ন্যায় ইসলামকে ইসলাম বলাও জটিল হইয়া দাঁড়ায়। মুসলমানদের জন্য উচিৎ যে, যেইরূপ সে শিরক ও কুফর হইতে বিরত থাকে সেইরূপ এমন কর্মসমূহ হইতেও বাঁচিয়া থাকা যাহা কুফরী যিন্দিগীর কর্মসমূহের সহিত অধিক সম্পর্কশীল হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ফায়দাঃ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ শ্রবণের ন্যায় হাদীছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্রবণের সময়ও শ্রোতাগণ চুপ থাকিয়া শ্রবণ করা ওয়াজিব। (ফতহুল মুলহিম)

١٣٠ **حدثنا** عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا اَبِىْ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

হাদীছ—১৩০. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ওবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহঃ)। তিনি---ইবন ওমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

١٣١ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض -

হাদীছ—১৩১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ) ও আবূ বকর বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী (রহঃ)। তাহারা উভয়ই...হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের সময়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমাদের জন্য আফসোস অথবা তিনি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন দুর্ভোগ তোমাদের জন্য। (সাবধান!; তোমরা আমার পরে (অর্থাৎ এই মিনার মহাসমাবেশে অবস্থানের পরে বা আমার ওফাতের পরে) পুনরায় পরস্পর একজন অপর জনের গ্রীবাসমূহে আঘাতের মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া কাফিরে পরিণত হইও না। (অর্থাৎ পবিত্র দ্বীনে ইসলামে দীক্ষিত হইবার পর কখনও কুফরী কর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করিও না।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ويحكم او قال ويلكم রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ويلكم না-কি ويحكم বলিয়াছেন রাবীর সঠিক স্মরণ নাই, তাই উভয় শব্দ বলিয়া দিয়াছেন, তবে উভয় শব্দের একটি অবশ্যই বলিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ويحكم এবং ويلكم এই দুইটি শব্দ আরবী ভাষায় যেই স্থানে ব্যবহৃত হয় সেই সম্পর্কে ওলামাগণের কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে। (১) কাযী আয়্যায (রহঃ) বলেন, এই শব্দদ্বয় আরববাসীগণ আশ্চর্য এবং বেদনার স্থলে ব্যবহার করেন।

(২) ইলমে নাহুর ইমাম সীবাওয়াই বলেন যে, ويل শব্দটি ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হইয়াছে আর ويح শব্দটি অনুগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর সীবওয়াই হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, ويح শব্দটি ধ্বংসের নিকটবর্তী ব্যক্তিকে সতর্ক করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

(৩) এই শব্দদ্বয় দ্বারা কাহারও উপর বদ-দু'আ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না বরং দয়া ও আশ্চর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

(৪) হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ويح শব্দটি রহমত অর্থাৎ দয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

(৫) হরোভী বলেন ويح ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে এমন ধ্বংসে পতিত হয়, যাহার সে উপযুক্ত নহে আর এই লক্ষ্যে সে দয়াযোগ্য হয়। তাই যেন এই শব্দ দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ উদ্দেশ্য হয়। আর যদি সে ব্যক্তি ধ্বংসের উপযুক্ত হয় তাহা হইলে ويل শব্দ ব্যবহার করা হয়। আলোচ্য হাদীছে এই শব্দ মুসলমানগণকে সতর্ক করিবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। (শরহে নববী, ফতহুল মুলহিম)

(হাদীছের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ১২৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

١٣٢ وحدثني حرملة بن يحيى قال انا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان اباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد

হাদীছ—১৩২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহঃ)। তিনি---ইবন ওমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উপরোল্লেখিত রাবী ওয়াকিদ (রহঃ)-এর সূত্রে শু'বা (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

باب اطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب والنياحة

অনুচ্ছেদঃ কাহারও বংশ সম্পর্কে কটাক্ষ করা এবং মৃতের জন্য উচ্চস্বরে বিলাপের উপর কুফর শব্দের প্রয়োগ

١٣٣ حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة قال نا ابو معاوية ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال نا ابى ومحمد بن عبيد كلهم عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان فى الناس هما بهم كفر الطعن فى النسب والنياحة على الميت ـ

হাদীছ—১৩৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)---(সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহঃ)---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মানুষের মধ্যে দুইটি স্বভাব রহিয়াছে যাহা তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা কুফরী। (এক) কাহারও বংশের প্রতি কটাক্ষ করা এবং (দুই) মৃতের জন্য উচ্চস্বরে শোকগাথা বিলাপ করা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

বংশের প্রতি কটাক্ষ করা অর্থাৎ কাহারও বংশের উপর কলঙ্ক লাগানো যে, সে ভদ্র পরিবারের নহে, অথবা সে নীচজাত, অথবা দাসীর উদরে জন্ম ইত্যাদি জাতীয় যাবতীয় কর্মসমূহ অবিশ্বাসী কাফিরদের। এইরূপ কাজে লিপ্ত হওয়া কাফিরদের অনুকরণ। কেননা জাহিলিয়্যাত যুগে আরবের কাফির ও মুশরিকরা নিজ নিজ জাতিকুল ও আভিজাত্যের উপর বড় গর্ব ও অহংকার করিত এবং অন্যান্যদের বংশের প্রতি কটাক্ষ ও কলঙ্কান্বেষণ করিত। ইহা তাহাদের স্বভাবে পরিণত ছিল। পবিত্র ইসলাম মানুষকে এই সকল গর্হিত কাজ হইতে চিরতরে মুক্ত করিয়া শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের উপহার দিয়াছে। কাজেই মুসলমানদের জন্য কোন অবস্থাতেই কাফিরদের কার্যাবলী সম্পাদন করা শোভনীয় নহে। কেননা সকল মানুষই হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততি ও বংশজাত। তাই এই দিক দিয়া সকল মানুষ সমান। আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য কেবল ইলম, ঈমান ও নেক আ'মালের ভিত্তিতেই অর্জিত হয়। আর কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় কৃত আ'মালেরই হিসাব হইবে এবং ইহার ভিত্তিতেই

পুরস্কার ও শাস্তির ফায়সালা নির্ধারিত হইবে। জাতিকুল ও বংশ মর্যাদার কোন হিসাব হইবে না আর না ইহা কোন কাজে আসিবে। মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

অর্থাৎ "হে মানব। আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী (হযরত আদম ও বিবি হাওয়া) হইতে সৃষ্টি করিয়াছি (তাই এই দিক দিয়া সকল মানুষ সমান) এবং (ইহার পর যেই পার্থক্য রাখিয়াছেন যে,) তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি ও (জাতির মধ্যে) বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছেন, (ইহা কেবল এই জন্যে) যাহাতে তোমরা পরস্পরের পরিচিত হও। (ইহাতে বিবিধ উপযোগিতা রহিয়াছে। এই জন্য নহে যে, তোমরা পরস্পরে গর্বিত হইবে। কেননা) আল্লাহ তা'আলার নিকট সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার মুত্তাকী। (পরহেযগারীর পূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে কেউ অবহিত নহে, বরং ইহা একমাত্র) আল্লাহ তা'আলা পুরোপুরি জানেন এবং পুরোপুরি খবর রাখেন। (সুতরাং তোমরা কোন বংশ মর্যাদা ও জাতিত্ব নিয়া গর্ব, অহংকার করিও না।)"(সূরা হুজরাত-১৩)

হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, পৃথিবীর মানুষের নিকট ইজ্জত সম্মান হইতেছে ধন-সম্পদের নাম। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট ইজ্জত সম্মান হইল তাকওয়া পরহেযগারীর নাম।

মৃতের জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করা অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির বিবিধ গুণাবলী উল্লেখ করিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া করিয়া শোকগাথা বিলাপ করা জাহিলিয়্যাত যুগের মানুষের প্রথা। জাহিলিয়্যাত যুগের লোকেরা স্বীয় বংশের মৃত ব্যক্তির জন্য কাহার কত বেশী লোক চিৎকার করিয়া বিলাপ করিয়াছে, জামা কাপড় ছিড়িয়াছে, কপালে আঘাত করিয়াছে, তাহা নিয়া গর্ববোধ করিত। এমনকি টাকা পয়সার বিনিময়ে ভাড়াটিয়া মহিলাদের দ্বারাও বিলাপের ব্যবস্থা করা হইত। এই সকল কর্ম দ্বারা গর্ব ও আভিজাত্য প্রকাশই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ইসলাম এহেন কর্মকে হারাম করিয়া দিয়াছে। মৃত ব্যক্তির জন্য স্বভাবগত মহব্বতের চাহিদায় অনিচ্ছাকৃত অশ্রু প্রবাহিত, আন্তরিক ব্যথিত ও শোকাহত হওয়াতে কোন দোষ নাই। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, হাদীছ শরীফে কতক কবীরা গুনাহের উপর কুফর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই উদ্দেশ্য নহে যে, মুমিন ব্যক্তি এই সকল কবীরা গুনাহ সম্পাদনের কারণে ইসলাম হইতে বহিষ্কার হইয়া কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইবে বরং ইহা দ্বারা কবীরা গুনাহের কঠোরতা প্রকাশই উদ্দেশ্য যাহাতে মুসলমানগণ কবীরা গুনাহ হইতে অত্যধিক সতর্কতার সহিত বাঁচিয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত কুফর দ্বারা মর্ম ইহাই। তবে শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছের মর্মার্থের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। (১) সব চাইতে সহীহ ও উত্তম অর্থ হইতেছে যে, বংশের প্রতি কটাক্ষ ও মৃতের জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ এই কর্মদ্বয় কাফিরদের কাজ এবং জাহিলিয়্যাত যুগের মানুষের স্বভাব চরিত্র। (২) এই প্রকার কর্ম মানুষকে কুফরীর দিকে পৌছাইয়া দেয়। (৩) কুফর দ্বারা অনুগ্রহ ও নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা মর্ম। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইসলামের মাধ্যমে যে নেয়ামত ও অনুগ্রহ দান করিয়াছেন উহার প্রতি না-শোকর অর্থাৎ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। (৪) এই কার্যদ্বয়কে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করিলে প্রকৃত কুফরী হইবে।

ফায়দাঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাহারও বংশের প্রতি কটাক্ষ এবং মৃতের জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করা জঘন্য হারাম ও কবীরা গুনাহ। (শরহে নববী ও ফতহুল মুলহিম)

باب بيان تسمية العبد الآبق كافرا

অনুচ্ছেদঃ স্বীয় মালিকের নিকট হইতে পলাতক দাসকে কাফির আখ্যায়িত করার বর্ণনা

١٣٤ - حدثني علي بن حجر السعدي قال نا إسماعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة -

হাদীছ-১৩৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর আস-সা'দী (রহঃ)। তিনি মনসূর বিন আবদির রহমান হইতে। তিনি হযরত শা'বী (রহঃ)-এর সূত্রে হযরত জারীর (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন, যে কোন দাস তাহার মনিবের নিকট হইতে পলায়ন করে সে কুফরী করিল। যতক্ষণ না সে স্বীয় মনিবের নিকট ফিরিয়া আসে। মনসূর বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম, এই হাদীছ শরীফ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই বসরায় আমার সূত্রে এই হাদীছটি মরফূ হাদীছরূপে বর্ণিত হউক তাহা আমি অপছন্দ করি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ইসলামী শরীআত মনিব এবং দাসগণের পরস্পর হক অধিকার পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে এবং ইহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে যে, উভয়ের কাহারও যেন হক নষ্ট না হয়। মনিবগণকে দাসদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর আচরণ, সাম্য ব্যবহার, কোমলতা ও দয়ার্দ্রতা প্রদর্শনের তাকীদ করা হইয়াছে, যাহার নমুনা সাহাবায়ে কেরামের কর্মসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ করা যায়। অপর দিকে দাসগণকেও উহার তাকীদ করা হইয়াছে যে, নিজ মনিবের হকসমূহের যেন স্মরণ রাখে এবং অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস ভঙ্গ এবং হক ধ্বংস করা হইতে বাঁচিয়া থাকে। আর মনিবদের ক্ষমাসুন্দর আচরণ, সাম্য ব্যবহার, কোমলতা ও দয়ার্দ্রতার প্রতিদানে যেন আনুগত্য, প্রভুভক্ত, সততা ও আমানত দ্বারা প্রদান করে। মনিবের হক অধিকারকে পদদলিত করিয়া পলায়নের রাস্তা অবলম্বন করা জঘন্য গুনাহ। এই গুনাহের পরিণামে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট শক্তভাবে পাকড়াও হইবে। হাদীছ শরীফে যেমন কতক কবীরা গুনাহের উপর কুফর শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে তেমন এইখানেও। কাজেই হাদীছে উল্লেখিত "সে কুফরী করিল" এই কথার মর্মার্থ হইতেছে যে, সে মনিবের অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞ হইল এবং তাঁহার হক অধিকার নষ্ট করিল। অকৃতজ্ঞ হওয়া ও হক অধিকার ধ্বংস করা কবীরা গুনাহ। কিন্তু যদি কোন দাস মনিব হইতে পলায়ন করাকে হালাল মনে করে তবে সে প্রকৃত কাফির হইয়া যাইবে। কারণ শরীআতের হারামকে হালাল মনে করা কুফরী (কুফর ব্যবহারের বিস্তারিত পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।)

অত্র হাদীছের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাবী মনসূর বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম এই হাদীছ শরীফ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই বসরায় আমার সূত্রে এই হাদীছটি মরফূ হাদীছরূপে বর্ণিত হউক তাহা আমি অপছন্দ করি। এই কথার মর্ম হইতেছে যে, রাবী মনসুর এই হাদীছকে শা'বী (রহঃ)-এর সূত্রে হযরত জারীর (রাযিঃ) হইতে মওকুফ (অর্থাৎ যাহার সনদসূত্র সাহাবী পর্যন্ত সমাপ্ত) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছখানা মওকুফ রিওয়ায়াত করিবার পর তিনি (মনসূর) মজলিসে উপস্থিত বিশেষ বিশেষ লোকগণের (অর্থাৎ শিষ্যগণের) নিকট শপথসহ বলিলেন যে, এই হাদীছকে আমি মওকুফ হিসাবে

বর্ণনা করিয়াছি বটে, বস্তুতঃ ইহা মরফূ হাদীছ। (অর্থাৎ এই হাদীছের সনদ সূত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।) কিন্তু আমি পরিস্কারভাবে ইহাকে মরফূ হাদীছরূপে বর্ণনা করাকে অপছন্দ করি। কারণ তখনকার সময় বসরা শহরে মুতাযিলা ও খারেজী (দুইটি ভ্রান্ত) সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। যাহারা কবীরা গুনাহকারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলিয়া বিশ্বাস করে। অধিকন্তু খারেজীগণ আরও বাড়িয়া কবীরা গুনাহকারীকে কাফির হইবার হুকুম প্রদান করে। কাজেই আমার ভয় হইল যে, যদি এই হাদীছকে হযরত জারীর (রাযিঃ)–এর সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে (মরফূ হাদীছরূপে) বর্ণনা করা হয় তাহা হইলে খারেজীগণ হাদীছের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা নিজেদের বাতিল মতবাদের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করিবে। ফলে আমি হযরত জারীর (রাযিঃ) হইতে মওকুফ হাদীছ হিসাবেই রিওয়ায়াত করি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী, ফতহুল মুলহিম)

١٣٥ **حدثنا** ابوبكر بن ابى شيبة قال نا حفص بن غياث عن داود عن الشعبى عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابق فقد برئت منه الذمة ـ

হাদীছ–১৩৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তিনি হযরত জারীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে কোন দাস (স্বীয় মনিব হইতে) পলায়ন করে তাহার হইতে (আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের) যিম্মাদারী সমাপ্ত হইয়া যায়। (অর্থাৎ ইসলামী নিরাপত্তার আওতাধীন থাকে না।)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ইসলামী শরীআত তাহাকে যে নিরাপত্তা দিয়াছিল এবং তাহার হক অধিকার প্রদান করিয়াছিল যে, মনিব তাহাকে মারধর ও আঘাত করিতে পারিবে না বা বন্দী করিয়া আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু পলায়ন করিবার পরিণামে সে এই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। ফলে এখন মনিবকে তাহাকে মারধর করিয়া শাস্তি দেওয়া বা বন্দী করিয়া রাখার ইচ্ছাধিকার দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

١٣٦ **حدثنا** يحيى بن يحيى قال انا جرير عن مغيرة عن الشعبى قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة ـ

হাদীছ–১৩৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ)। তিনি···· হযরত জারীর বিন আবদিল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, দাস যখন (স্বীয় মনিব হইতে) পলায়ন করে তখন তাহার নামায কবুল হয় না (অর্থাৎ নামাযের ছাওয়াব প্রদান করা হয়না)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ইমাম মাযরী (রহঃ) এবং তাঁহার ন্যায় কাযী আয়্যায (রহঃ) আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইহা ঐ পলাতক দাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে স্বীয় মনিব হইতে পলায়ন করাকে হালাল মনে করে, অথচ ইহা হারাম। শরীআতের হারামকে জানিয়া বুঝিয়া হালাল বলিয়া মনে করা কুফরী। ফলে তাহার নামায কবুল হয় না, আর না অন্য কোন ইবাদত। কিন্তু শায়খ আবূ আমর (রহঃ) অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যা যথার্থ। কিন্তু হাদীছের মর্মার্থ ইহা নহে বরং এই হাদীছ দ্বারা মর্ম ইহা যে, যে দাস স্বীয় মনিব হইতে পলায়ন করাকে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করে না বটে তবে পলায়ন করে তাহাকে ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং পলায়ন করা হালাল মনে করিলে তো কোন কথা নাই বরং হালাল মনে না করিয়া পলায়নকারী দাসের

নামাযও কবুল হয় না। তবে তাহার নামায কবুল না হইবার বিষয়টি নামায সহীহ না হওয়াকে অত্যাবশ্যক করে না। ফলে পলাতকের নামায সহীহ হইবে কিন্তু মকবুল নহে। নামায কবুল না হইবার উপর আলোচ্য হাদীছ শরীফই দলীল। আর নামায সহীহ এই জন্য হইবে যে, নামাযের আহকাম ও আরকান যথাযথ আদায়সহ নামায পড়িলেই সহীহ হওয়া জরুরী হয়।

উল্লেখ্য যে, নামায কবুল না হইয়া সহীহ হইবার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কেননা ছাওয়াব না হওয়াই মকবুল না হইবার নিদর্শন আর কাযা ওয়াজিব না হওয়া সহীহ হইবার নিদর্শন। তাহা ছাড়া পলাতক দাস নামায আদায় করিলে তাহার উপর নামায বর্জনের শাস্তি দেওয়া যায় না। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাহার নামায সহীহ হইয়াছে। শারেহ নববী (রহঃ) বলেন, এই ব্যাখ্যা খুবই তাৎপর্যবহ ও উত্তম। কেননা উহার উদাহরণও রহিয়াছে যে, জমহুরে ওলামা (রহঃ) বলেন যে, জবর দখল বা আত্মসাৎকৃত বাড়ী ঘরে আদায়কৃত নামায সহীহ হয় কিন্তু মকবুল হয় না অর্থাৎ ছাওয়াব দেওয়া হয় না। শারেহ নববী (রহঃ) আরও বলেন যে, আমি ফতোয়ায়ে আবী নসর-এর মধ্যে দেখিয়াছি যে, ইরাকী ওলামাগণ ইহাই বলিয়াছেন যে, জবর দখল ঘরে নামায সহীহ হয় এবং ফরয যিম্মা হইতে আদায় হইয়া যাইবে কিন্তু ছাওয়াব হইবে না। আবূ মনসূর (রহঃ) বলেন যে, খোরাসানের ওলামাগণ উহাতে মতানৈক্য করিয়াছেন। কতক ওলামা বলেন যে, নামাযই সহীহ হইবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। সহীহ এবং কবূল এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্যের বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ "কিতাবুত তাহারাতের" প্রথমাংশে করা হইবে। (শরহে নববী, ফতহুল মুলহিম)

باب بيان كفر من قال مطرنا بنوء

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বলে, "নক্ষত্র বিবর্তনের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি" তাহার কুফরীর বিবরণ।

١٣٧ - حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في اثر السماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب -

হাদীছ—১৩৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) তিনি···যায়দ বিন খালিদ আল-জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে নিয়া হুদায়বিয়া প্রান্তরে বৃষ্টিপাত হইবার পরে (খুবই প্রত্যুষে অন্ধকার অবস্থায়) ফজরের নামায আদায় করিলেন। নামায সমাপ্ত করিবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিলেনঃ তোমরা কি জান যে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন?[১] তাঁহারা (সাহাবায়ে কেরাম জবাবে) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার মনোনীত রসূলই উত্তম জানেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ আমার কতিপয় বান্দা আমার প্রতি ঈমান রাখিয়া সকালে উঠিয়াছে আর কতিপয় বান্দা উঠিয়াছে কাফিররূপে। যাহারা বলিয়াছে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও তাঁহার রহমতে বৃষ্টিপাত হইয়াছে, তাহারা আমার প্রতি বিশ্বাসী (মুমিন) এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যাহারা এইকথা বলিয়াছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের[২] প্রভাবে বৃষ্টিপাত হইয়াছে তাহারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী (কাফির) এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী (অর্থাৎ নক্ষত্রের প্রতি ঈমান গ্রহণকারী)।

টীকা-১· هل تدرون ماذا قال ربكم অর্থাৎ "তোমরা কি জান, তোমাদের রব কি বলিয়াছেন? এই বাক্যে هل শব্দটি استفهام (প্রশ্নবোধক) ব্যবহার করিয়া সতর্ক করা মর্ম। অন্য রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছেঃ الم تسمعوا ما قال ربكم الليلة - অর্থাৎ "তোমরা কি শুন নাই যে, অদ্য রাত্রে তোমাদের রব কি বলিয়াছেন" এই বাক্যদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য হাদীছ শরীফ হাদীছে এলাহী তথা হাদীছে কুদসীসমূহের একটি। সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্র হাদীছ শরীফ আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে সরাসরি বা যথাযথ ফেরেশতার মাধ্যমে গ্রহণ করিয়াছেন। (ফতহুল মুলহিম)

টীকা-২· بنوء আলোচ্য হাদীছে ব্যবহৃত نوء শব্দটির মধ্যে ব্যাপক আলোচনা রহিয়াছে। শায়খ আবূ আমর ইবনুস সিলাহ (রহঃ) উহার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বস্তুতঃ نوء নক্ষত্রকে বলা হয় না বরং نوء শব্দের অর্থ অস্ত যাওয়া, অথবা উদয় হওয়া। ইহার বিবরণ এই যে, আটাইশটি নক্ষত্র এমন আছে-যাহাদের উদয় সারা বৎসরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ও প্রসিদ্ধ আর ইহাই চন্দ্রের আটাইশ মনযিল। প্রত্যেক তের রাত্রির পর উহাদের একটি নক্ষত্র পশ্চিম আকাশে অস্ত যায় এবং উহার পরিবর্তে ঠিক ঐ সময়ই পূর্ব আকাশে অপর একটি নক্ষত্র উদয় হয়। জাহিলিয়্যাত যুগের মানুষেরা এই উভয় নক্ষত্রের মধ্যে অস্ত যাওয়া নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া বিশ্বাস করিত। তবে সামাআনী (রহঃ) বলেন যে, তাহারা এই উভয় নক্ষত্রের মধ্যে পূর্বাকাশে উদয় হওয়া নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া বিশ্বাস করিত। আর উবায়দ বলেনঃ এই স্থান ব্যতীত অন্য কোথায়ও نوء দ্বারা অস্ত যাওয়া নক্ষত্র বলিতে শুনি নাই। অতঃপর কখনও স্বয়ং নক্ষত্রকেই نوء বলা হইয়া থাকে। আবূ ইসহাক যুজাজ (রহঃ) বলেনঃ যেই নক্ষত্র পশ্চিম আকাশে অস্ত যায় উহাকে نوء বলা হয়। আর যেই নক্ষত্র পূর্ব আকাশে উদয় হয় উহাকে بارح বলা হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

যাহারা বলিয়াছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত হইয়াছে তাহারা আমার (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার) প্রতি অবিশ্বাসী কাফির। এই স্থানে 'কাফির' হওয়া সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের দুইটি অভিমত রহিয়াছে।

(১) যাহারা বিশ্বাস করে যে, নক্ষত্রের বিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত হয় এবং বৃষ্টি বর্ষণের প্রকৃত কর্তা ও কার্যকর নক্ষত্র বলিয়া বিশ্বাস করে যেমন জাহিলিয়্যাত যুগের মানুষের আকীদা ছিল তবে নিঃসন্দেহে তাহারা ইসলাম হইতে বহিষ্কার হইয়া প্রকৃত কাফির মুশরিক হইয়া যাইবে। ইহা জমহুরে ওলামায়ে কেরামের অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)ও এই মত পোষণ করেন। আর ইহা হাদীছ শরীফের বাহ্যিক অর্থ দ্বারাও বুঝা যায়। তাহা ছাড়া হাদীছের বাক্য প্রয়োগ অর্থাৎ 'কাফির' এর বিপরীত 'ঈমান' শব্দ ব্যবহার দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থানে 'কাফির' দ্বারা 'কাফির মুশরিক'ই মর্ম।

আর যাহারা বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের বিবর্তনের প্রভাবে বৃষ্টিপাত হইয়াছে; কিন্তু আকীদা বিশ্বাস করে যে, যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত কর্তা ও কার্যকর একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও রহমতেই বৃষ্টিপাত হয়। নক্ষত্রের বিবর্তন বৃষ্টিপাতের আলামত মাত্র। কারণ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুর মধ্যে বিবিধ গুণ ও স্বভাব দান করিয়াছেন। যেমন সূর্য ও চন্দ্রের আলোর মধ্যে হাজারো প্রকার গুণাগুণ ও উপকার রহিয়াছে। এই সকল উপকারের মধ্যে ইহাও যে, শস্য ও জন্তু-জানোয়ারের লালন পালন, হিসাব-নিকাশ, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি। অনুরূপ নক্ষত্ররাজিরও। কাজেই এই সকল গুণাগুণের উপর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যদি কেহ বলে যে, অমুক সময় বৃষ্টি হইবে, তাহা হইলে সে কাফির হইবে না। তবে তাহার এইরূপ বিশ্বাস করা মাকরূহ। কারণ তাহার এইরূপ বিশ্বাস ও উক্তি জাহিলিয়্যাত যুগের মানুষের বিশ্বাস ও উক্তির সহিত সামান্য হইলেও সাদৃশ্য হইয়াছে। কাজেই এই সকল মন্দ বিশ্বাস হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। অতঃপর ইহা কোন পর্যায়ের মাকরূহ এই বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। তবে সব চাইতে প্রকাশ্য অভিমত হইতেছে যে, মাকরূহ তানযীহী, ইহাতে কোন গুনাহ হইবে না।

(২) আলোচ্য হাদীছে 'কুফর' দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা মর্ম। বস্তুতঃ বৃষ্টিপাত আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত অথচ সে নক্ষত্রের প্রভাব বলিয়া উক্তি করিয়াছে। কাজেই সে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ হইয়াছে এবং প্রকৃত দাতার দানকে বিস্মৃতি করিয়া দিয়াছে আর মুখ দিয়া এমন কথা বলিয়াছে যাহা বাস্তবের বিপরীত। আর হাদীছের এই ব্যাখ্যা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে নক্ষত্রকে প্রকৃত কার্যকর বলিয়া বিশ্বাস না করে। হাদীছ শরীফে এইরূপ ব্যক্তিকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শনের জন্য কুফর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যাহাতে সে প্রত্যেক স্থানে স্বীয় প্রকৃত মালিক এবং দাতাকে স্মরণ রাখে এবং বাস্তবের বিপরীত কথা মুখ হইতে নির্গত করিয়া প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি অর্জন না করে। এই অনুচ্ছেদের সর্বশেষ হাদীছ শরীফখানাও এই ব্যাখ্যার স্বপক্ষে তায়ীদ করে। যেমন- اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر। অর্থাৎ "লোকদের কেহ তো শোকর গোজার অবস্থায় প্রভাব করিয়াছে। আর কেহ তো অকৃতজ্ঞ অবস্থায়।" এই হাদীছে شاكر এর বিপরীত كافر শব্দ ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফির দ্বারা অকৃতজ্ঞতা মর্ম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(শরহে নববী ও ফতহুল মুলহিম)

জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়নের হুকুমঃ

জ্যোতির্বিজ্ঞান সাধারণতঃ তিন প্রকারঃ (১) হিসাব বা গণনা বিষয়ক (حسابى)ঃ ইহা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ। অর্থাৎ "সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মতে চলে।" আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আয়াতে নভোমণ্ডলীয় অবদান সমূহের মধ্য হইতে বিশেষভাবে সূর্য ও চন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা বিশ্বজগতের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা এই দুইটি গ্রহের গতি ও কিরণ-রশ্মির সহিত গভীরভাবে জড়িত

রহিয়াছে। حسبان শব্দটি কাহারও কাহারও মতে ধাতু। ইহার অর্থ হিসাব। আর কাহারও মতে حساب শব্দের বহুবচন। আয়াতের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থাপনা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ মুতাবিক চালু রহিয়াছে। সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরই মানব জীবনের সকল কাজ কারবার নির্ভর করে। ইহার মাধ্যমেই দিবা-রাত্রির পার্থক্য, ঋতুর পরিবর্তন এবং মাস ও বৎসর নির্ধারিত হয়। আর حسبان শব্দটিকে حساب এর বহুবচন ধরা হইলে অর্থ এই হইবে যে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমণের পৃথক পৃথক হিসাব রহিয়াছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবের উপর সৌর ও চন্দ্র ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। আর এই সকল হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে লাখো বছর অতিক্রান্ত হইবার পরও ইহাতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় নাই।

(২) স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক (طبيعى)। যেমন সূর্য নভোমণ্ডলের কক্ষপথে বিবর্তনের দ্বারা শীত, গ্রীষ্ম ও নাতিশীতোষ্ণ ইত্যাদি ঋতুর পরিবর্তন হয়। ইহাও শরীআত বহির্ভূত নহে। কাজেই উপরোল্লেখিত দুই প্রকারের জ্ঞান শিক্ষা করাতে কোন দোষ নাই।

(৩) ধারণা বা অনুমান বিষয়ক (وهمى)। বস্তুতঃ ইহাকেই নক্ষত্র রাজি বিষয়ক জ্ঞান বা 'জ্যোতির্বিজ্ঞান' বলা হয়। ইহার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, ভূমণ্ডলে আবর্তীত আকস্মিক দুর্ঘটনাসমূহের সংযোগ ব্যাপক বা বিশেষভাবে নক্ষত্র রাজির সহিত সম্পর্ক করা শরীআতসম্মত নহে। আল মাওলা আবুল খায়ির (রহঃ) বলেন যে, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত হইতেছে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। আর কতেক ওলামায়ে কেরামের অভিমত যে, 'জ্যোতির্বিজ্ঞান' শিক্ষা করা সম্পূর্ণ হারাম নহে তবে নক্ষত্ররাজিকে কার্যকর বলিয়া বিশ্বাস করা হারাম। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন যে, গণক বা জ্যোতির্বিদদের যদি এই বিশ্বাস হয় যে, প্রকৃত কর্তা ও কার্যকর তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই কিন্তু আল্লাহ তা'আলার রীতিনীতি এই যে অবস্থাসমূহের প্রকাশ নক্ষত্ররাজির বিবর্তন ও স্থিরীকৃতের হিসাবে হইয়া থাকে তাহা হইলে উহাতে কোন দোষ নাই। আর আলোচ্য হাদীছ শরীফে ঐ ব্যক্তিকে তিরস্কার করা হইয়াছে যে স্বয়ং নক্ষত্রকে কার্যকর বলিয়া বিশ্বাস করে।

ওলামাগণ আরও বলিয়াছেন যে, নক্ষত্ররাজির বিবর্তন কোন বস্তুর উপর প্রভাব হইবার বিষয়টি যদি তাবীল তথা ব্যাখ্যা-এর মাধ্যমে বিশ্বাস করা হয় তাহা হইলে উহা হারাম। আর যদি কোন প্রকার তাবীল ব্যতীত কার্যকর বলিয়া বিশ্বাস করা হয় তাহা হইলে কুফরী।

প্রশ্ন হয় যে, অভিজ্ঞ ডাক্তার মানুষের শিরা স্পর্শ করিয়া কোন রোগের বিষয় (যাহা উৎপত্তি হয়) অগ্রিম বলিতে পারে ইহা জায়েয হয় তবে নভোমণ্ডলের নক্ষত্ররাজির বিবর্তনের দ্বারা ভূমণ্ডলের দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবার বিষয়টি যদি অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদ নক্ষত্ররাজির বিবর্তন এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে বিচরণের বিষয়টির প্রাকৃতিক নিয়মের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন দুর্ঘটনার ভবিষ্যৎবাণী করে তাহা হইলে জায়েয হইবে না কেন? উত্তর এই যে, মানুষের শিরা স্পর্শ করিয়া রোগের কথা বলিবার বিষয়টি ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভিজ্ঞতা কাজ করিয়াছে। পক্ষান্তরে চিরাচরিত নিয়ম মুতাবিক কোন কোন দুর্ঘটনার কারণ নক্ষত্ররাজির বিবর্তনের মধ্যে যদিও হইতে পারে কিন্তু ইহার স্বপক্ষে কোন দলীল নাই যে, নক্ষত্রের প্রভাবেই ভূমণ্ডলে মঙ্গল বা অমঙ্গল ইত্যাদি পতিত হয়। ইহা ইন্দ্রিয়ানুভূতি, জ্ঞান বা শ্রুত এই তিন প্রকার প্রমাণের কোন প্রমাণেই নাই।

নক্ষত্ররাজির প্রভাবের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ানুভূতির যে কোন দখল নাই, ইহা প্রকাশ্য। আর জ্ঞানভিত্তিক দলীলও নাই। কারণ নক্ষত্ররাজির বিধানাবলীর প্রায় সবগুলিই অনুমান ও ধারণা মাত্র। ইহা দ্বারা কোন ব্যক্তি দৃঢ় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না যাহার উপর ভিত্তি করিয়া হুকুম দেওয়া যায়। অধিকন্তু ইহার অধিকাংশ কালা-কানুন ধারণা প্রসূত, যুক্তিভিত্তিক নির্ধারিত হইবার ফলে উহা হইতে ভূমণ্ডলের দুর্ঘটনার বিধান নির্ণয় নির্ভরযোগ্য হয় না। কাজেই উহার ভিত্তিতে হুকুম দেওয়া মূর্খতা ব্যতীত কিছুই নহে। হযরত বুরায়দা আল-আসলামী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, "নিশ্চয় অনেক জ্ঞানের মধ্যে মূর্খতা রহিয়াছে। এই কারণেই ইহা শরীআতে ঘৃণিত।"

তবে নক্ষত্রজ্ঞান হযরত ইদ্রীস আলাইহিস সালামের মু'জিযা ছিল।

আর শ্রুত (سماعى) দলীলও নাই বরং উহার তিরস্কার বর্ণিত হইয়াছে। যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে–

عن عبد الله بن مسعود رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر اصحابى فامكسوا واذا ذكر النجوم فامسكوا واذا ذكر القدر فامسكوا

অর্থাৎ "হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, যখন আমার সাহাবীগণ সম্পর্কে আলোচনা হয় তখন তোমরা স্বীয় যবানকে সংযত রাখ (অনুপযুক্ত কথা মুখ হইতে বাহির করিও না) আর যখন নক্ষত্ররাজির আলোচনা হয় তখনও তোমরা স্বীয় যবানকে সংযত রাখিও। আর যখন তাকদীর সম্পর্কে আলোচনা হয় তখনও তোমরা স্বীয় যবানকে সংযত রাখিও।" (মু'জামাতুল কুবরা লি–তিবরানী)

আবূ ইয়ালা স্বীয় মুসনাদে, ইবন আদী স্বীয় কামিল গ্রন্থে ও খতীব স্বীয় "কিতাবুন নুজুম" গ্রন্থে হযরত আনাস (রাযিঃ)–এর সূত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিম্নোক্ত এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اخاف على امتى بعدى خصلتين تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم

অর্থাৎ "আমার (ওফাতের) পরে আমি আমার উম্মতের উপর দুইটি বিষয়ের আশংকা করিতেছি। (১) তাকদীরকে অবিশ্বাস করিবার এবং (২) নক্ষত্ররাজির প্রভাব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার (অথচ উভয়টি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীনে রহিয়াছে।)"

অন্য হাদীছে আছে–

عن ابى مالك الاشعارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع فى امتى من امر الجاهلية لايتركونهن الفخر فى الاحساب والطعن فى الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة

অর্থাৎ "হযরত আবূ মালিক আল–আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে জাহিলিয়্যাত যুগের চারিটি বিষয় রহিয়া গিয়াছে যাহা তাহারা পরিত্যাগ করিতেছে না (১) নিজের গুণের গর্ব, (২) কাহারও বংশের নিন্দা, (৩) গ্রহ–নক্ষত্র যোগে বৃষ্টি চাওয়া এবং (৪) মৃতের উপর বিলাপ করা। (সহীহ মুসলিম, বাবুল জানায়েয)

١٣٨ وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكَوَاكِبُ وَبِالْكَوَاكِبِ .

হাদীছ–১৩৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া আমর বিন সাওয়াদ আল–আমরী এবং মুহাম্মদ বিন সালামা আল–মুরাদী (রহঃ)। তাহারা....হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমাদের মহা মহিমান্বিত প্রতিপালক কি এরশাদ করিয়াছেন– তাহা কি তোমরা (গভীরভাবে চিন্তা করিয়া) দেখ নাই, তিনি বলিয়াছেন; আমি যখনই আমার বান্দার উপর কোন নেয়ামত নাযিল করি, তখনই (ইহার পরিণাম এই হইয়াছে যে,) তাহাদের এক দল প্রত্যুষে তাহা অস্বীকার করিয়া বলে নক্ষত্র এবং (অমুক) নক্ষত্রের প্রভাবে নেয়ামত আসিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(হাদীছ নং ১৩৭–এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

١٣٩ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يُنْزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ يَقُولُونَ الْكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَا وَفِي حَدِيثِ الْمُرَادِيِّ بِكَوْكَبِ كَذَا وَكَذَا ـ

হাদীছ–১৩৯. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সালামা আল–মুরাদী (রহঃ)....(সূত্র পরিবর্তন) এবং আমার বিন সাওয়াদ (রহঃ)....হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা আকাশ হইতে বরকত নাযিল করিলে মানুষের মধ্যে একদল (লোক) প্রত্যুষে তাহা অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন অথচ তাহারা বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্র (এর অস্ত বা উদয়ের প্রভাবে বৃষ্টিপাত হইয়াছে)। আর রাবী হযরত মুরাদী (রহঃ)–এর বর্ণিত রিওয়ায়াতে (الكوكب كذا وكذا) এর স্থলে بكوكب كذا وكذا "অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে" বাক্য উল্লেখ রহিয়াছে।[১]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ (হাদীছ নং ১৩৭–এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

টীকা-১· ইমাম মুসলিম (রহঃ) আলোচ্য হাদীছখানা দুইজন শায়খ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। শায়খ আমর বিন সাওয়াদ (রহঃ) স্বীয় রিওয়ায়াতে الكوكب كذا وكذا । বলিয়াছেন। শায়খ মুহাম্মদ বিন সালামা মুরাদী (রহঃ) স্বীয় রিওয়ায়াতে بكوكب كذا وكذا । বলিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই শাব্দিক পার্থক্যটুকু উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য মর্মার্থ এক। ইহা তাঁহার হাদীছ বর্ণনায় অত্যধিক সতর্কতার প্রমাণ।

١٤٠ حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال نا النضر بن محمد قال نا عكرمة وهو ابن عمار قال نا ابو زميل قال حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الاية فلا اقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون

হাদীছ–১৪০. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আব্বাস বিন আবদিল আযীম আল–আম্বরী (রহঃ)। তিনি...ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মুবারক যামানায় একদা বৃষ্টিপাত হইবার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ কতক লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী–অবস্থায় প্রভাত করিয়াছে আর কতক লোক (নেয়ামতের) অকৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অবস্থায় প্রভাত করিয়াছে। (যাঁহারা কৃতজ্ঞ) তাঁহারা বলিয়াছে ইহা (বৃষ্টিপাত) আল্লাহ তা'আলার রহমত, আর (অপর দল যাহারা অকৃতজ্ঞ) তাহারা বলিয়াছে, অমুক অমুক নক্ষত্র (نوء এর অস্ত অথবা উদয়ের প্রভাব) সত্য হইয়াছে (অর্থাৎ অস্ত যাওয়া অথবা উদয় হওয়া নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত হইয়াছে।) রাবী হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ٥ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ٥ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ٥ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ٥ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ٥ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ٥ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ٥

অর্থাৎ "অনন্তর আমি নক্ষত্ররাজির অস্তগমনের শপথ করিতেছি। আর অবশ্যই ইহা একটি মহাশপথ, যদি তোমরা জানিতে। নিশ্চয়ই ইহা এক মহাসম্মানিত কুরআন, যাহা লওহে মাহফূযে সুরক্ষিত রহিয়াছে। যাহারা পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইহা সৃষ্ট জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নাযিলকৃত। তবুও কি তোমরা এই পবিত্র বাণীকে সাধারণ কথা মনে করিতেছ? আর তোমরা মিথ্যাচারকেই তোমাদের জীবনের সম্বল করিয়া লইয়াছ?"[১] (সূরা ওয়াকিয়াহ ৭৫–৮২)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(হাদীছের ব্যাখ্যা ১৩৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

টীকা–১· فلا اقسم .... تكذبون অর্থাৎ "আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্রসমূহের অস্তগমনের অথবা উদয়াগমনের। আর নিশ্চয়ই ইহা একটি মহাশপথ যদি তোমরা চিন্তা কর....(এই পর্যন্ত এরশাদ করিলেন) আর তোমরা মিথ্যাচারকেই তোমাদের জীবনের সম্বল করিয়া লইয়াছ?" শায়খ ইবনুস সিলাহ (রহঃ) বলেনঃ এই স্থানে আয়াতসমূহ উল্লেখের এই উদ্দেশ্য নহে যে, সবগুলি আয়াতই نوء (নক্ষত্র) এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। কেননা তফসীর ইহা সমর্থন করে না বরং وتجعلون رزقكم انكم تكذبون - আয়াত খানাই نوء (নক্ষত্রে) এর ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। আর অন্যান্য আয়াতগুলি অন্য ব্যাপারে। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)–এর অন্য এক রিওয়ায়াতে কেবল এই আয়াতই উল্লেখ রহিয়াছে। এই আয়াতের তফসীর হইতেছে যে, তোমাদের কৃতজ্ঞতা অথবা তোমাদের রিযিকের কৃতজ্ঞতা অথবা তোমাদের যাবতীয় সহায় সম্বল আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে গ্রহণ কর অথচ জীবনোপায় প্রাপ্তির সংযোগ নক্ষত্ররাজির সহিত কর। (ইহা কতই না গর্হিত কাজ)। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী)

باب الدليل على ان حب الانصار وعلى رضى الله عنهم من الايمان وعلامات وبغضهم من علامات النفاق

অনুচ্ছেদঃ আনসারীগণের এবং হযরত আলী (রাযিঃ)-এর সহিত মুহাব্বত রাখা ঈমানের অংশ এবং নিদর্শন আর তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা নিফাকের আলামত হইবার দলীল

١٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُّ الْأَنْصَارِ ـ

হাদীছ-১৪১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহঃ)। তিনি---হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ মুনাফিকের চিহ্ন এবং আনসারদের সহিত ভালবাসা মুমিনের চিহ্ন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কার কুরাইশগণ ইসলাম ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং ইসলাম ও ইসলামের মূলকে নিশ্চিন্ন করিবার লক্ষ্যে যথাসম্ভব শত্রুতার কোন সূক্ষ্ম পন্থাকেই অবলম্বন করিতে ত্রুটি করে নাই। এমনকি তাহারা সাইয়্যেদুল মুরসালীন ও তাঁহার সাহাবাগণের রক্ত পিপাসু হইয়া পড়িয়াছিল। পরিশেষে উক্ত শত্রুতা এমন মারাত্মক আকার ধারণ করিল যাহার ফলে অনন্যোপায় হইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবাগণকে নিয়া হিজরত করিতে বাধ্য হইলেন। উল্লেখ্য যে, মদীনার কতক মহান অন্তরের অধিকারী সৌভাগ্যবান নতুন ইসলাম গ্রহণকারী পূর্ব হইতেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের আকাংক্ষা করিতেছিলেন এবং তাঁহার শুভাগমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলকে সেই মদীনায়ই হিজরত করিবার হুকুম দিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবাগণসহ মদীনায় হিজরত করিলেন। হিজরতের পর যেই সৌভাগ্যবান দুই সম্প্রদায় দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করিয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবাগণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কেবল আশ্রয়ই নহে;বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুহাজিরগণকে জানী ও মালী সাহায্য এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জান-মাল উৎসর্গ করিবার প্রথম নযীর স্থাপন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সেই সম্প্রদায়দ্বয় মক্কার অবিশ্বাসী কুরাইশসহ অন্যান্য কপট বিশ্বাসঘাতকদের নানাবিধ বাধা-বিপত্তি ও হুমকির সম্মুখেও নিজেদের অঙ্গীকারে অটল ও সুদৃঢ় ছিলেন এবং নিজেরা কষ্ট স্বীকার করিয়াও মুহাজির মুসলিম দ্বীনী ভাইগণের আরাম ও স্বস্তি প্রদানের জন্য যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম চয়নিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা মুসলিম মুহাজিরগণের একান্ত সাহায্যকারী ও বলিষ্ঠ সহযোগী হইয়াছিলেন। ইসলামের প্রচার, প্রসার ও উন্নতির লক্ষ্যে যাহা কিছু করিবার সব কিছুই তাঁহারা করিলেন। মক্কার কুরাইশগণ যেইখানে শত্রুতার চরম সীমায় আর তাঁহারা হইলেন বন্ধুত্বের চূড়ান্ত সীমায়। ইসলামের প্রতি তাঁহাদের এই আবেগ ও উৎসর্গের কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নাম 'আনসার' (সাহায্যকারীগণ) বলিয়া আখ্যায়িত করিলেন। মুসলমানদের সংকটপূর্ণ অবস্থায় আনসারগণ যেই মহব্বতের দৃষ্টান্ত কায়িম করিয়াছিলেন উহার প্রতিদানে মুমিন মাত্রই তাঁহাদিগকে মুহাব্বত না করিয়া পারে না। পক্ষান্তরে কাফিররা স্বভাবতই তাঁহাদের সহিত বিদ্বেষ রাখিবে। কিন্তু মদীনায় ইসলাম শক্তি ও আড়ম্বর লাভ করিবার কারণে কাফিরগণের পূর্বের ন্যায় শত্রুতা করিবার সাহস ছিল

না। তাই তাহাদের শত্রুতার পদ্ধতি পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল এবং সেইস্থান হইতেই নিফাকের উৎপত্তি। মুনাফিকরা প্রকাশ্যে মুসলমান বলিয়া দাবী করে এবং বাহ্যিকভাবে ইবাদত করে। কিন্তু অন্তরে কুফরী গোপন রাখিয়া ইসলামকে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। তাহাদের গোপন ষড়যন্ত্রের আওতাধীন মুহাজির মুসলমান যেমন ছিলেন তেমনই মুসলমান মুহাজিরদের আশ্রয় ও সাহায্যকারী আনসারগণও ছিলেন। মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে মুসলমান বলিয়া ধারণা হইবার কারণে প্রকৃত মুমিন ও বাহ্যিক মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করা বড়ই কঠিন। ফলে পবিত্র কুরআনে তাহাদের সম্পর্কে সূরা মুনাফিকুন ও অন্যান্য আয়াতে এই কুচক্রি দলের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। বহু হাদীছ শরীফে তাহাদের স্বভাব, চরিত্র এবং নিদর্শন বর্ণনা করা হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারগণের সহিত মুহাব্বত ও সুসম্পর্ককে ঈমান এবং নিফাকের তুলাদণ্ড গণ্য করিয়াছেন। কাজেই আনসারগণকে মুহাব্বত প্রকৃত মুমিন মুসলিম হইবার লক্ষণ আর তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ নিফাকের লক্ষণ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে আনসারগণকে মুহাব্বত করিবে তাহারা প্রকৃত ও খাঁটি মুমিন আর যাহারা আনসারগণের প্রতি (ইসলাম ও মুহাজির মুসলমানগণকে আশ্রয় ও সাহায্য করিবার কারণে) বিদ্বেষভাব পোষণ করিবে তাহারা মুনাফিক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

١٤٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النِّفَاقِ

হাদীছ-১৪২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল-হারিছী (রহঃ)। তিনি....হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আনসারগণের সহিত মুহাব্বত ঈমানের নিদর্শন আর তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ নিফাকের নিদর্শন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(১৪১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

١٤٣ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ نَا أَبِي قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِيٍّ سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ قَالَ إِيَّايَ حَدَّثَ

হাদীছ-১৪৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ)....(সূত্রে পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহঃ)। তাহারা উভয়ই....হযরত বারা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীগণের সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ মুমিন ব্যতীত অন্য কেহ তাহাদিগকে মুহাব্বত করিবে না এবং মুনাফিক ব্যতীত কেহ তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে না। যাহারা তাহাদিগকে ভালবাসেন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ভালবাসেন আর যাহারা তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাবে পোষণ করে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ঘৃণা করেন। হযরত শু'বা বলেন, আমি রাবী হযরত আদীকে জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কি এই হাদীছ হযরত বারা (রাযিঃ) হইতে শুনিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন? বারা নিজেই আমার নিকট এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ (১৪১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

١٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ يَعْنِيْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُبْغِضُ الْاَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

হাদীছ--১৪৪. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন **হযরত কুতায়বা বিন** সাঈদ (রহঃ)। তিনি---হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি আনসারীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারে না।

١٤٥ - وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبْغِضُ الْاَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

হাদীছ—১৪৫. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন **উছমান বিন মুহাম্মদ বিন আবী শায়বা (রহঃ)**---(সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বাকর **বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তাহারা---হযরত** আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবস তথা আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে আনসারীগণের সহিত শত্রুতা রাখিতে পারেনা।

١٤٦ - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَاَ النَّسَمَةَ اِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيَّ اَنْ لَا يُحِبَّنِيْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِيْ اِلَّا مُنَافِقٌ -

হাদীছ—১৪৬. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ বাকর বিন আবী শায়বা (রহঃ)---(সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহঃ)---হযরত যির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আলী (রাযিঃ) বলিয়াছেনঃ সেই মহান সত্তার কসম যিনি বীজ হইতে অংকুরোদগম করেন (অতঃপর উহা হইতে তৃণ জন্মান) এবং জীবকুল সৃষ্টি করিয়াছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, কেবল মুমিন ব্যক্তিই আমাকে ভালবাসিবে, আর একমাত্র মুনাফিক ব্যক্তিই আমার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

হযরত আলী (রাযিঃ) হইলেন সর্বশেষ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি রিসালতের দায়িত্ব অর্পণের পর ইসলামের প্রাথমিক সময়ে যুবকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিত্ব হইলেন হযরত আলী (রাযিঃ)। তিনি নয় বৎসর বয়সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের মাধ্যমে সাহাবী ও পরম বন্ধুত্ব স্থাপনের মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও বীর পুরুষ ছিলেন। আজীবন দ্বীনে ইসলামের সাহায্য ও সহায়তাকারী ছিলেন। এমনকি তিনি স্বীয় জান ও মাল ইসলামের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

এর সাহেবজাদী জান্নাতী মহিলাগণের নেত্রী হযরত ফাতিমা (রাযিঃ)-এর স্বামী ছিলেন। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদার ৪র্থ খলিফা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, জান্নাত তিন ব্যক্তির অর্থাৎ হযরত আলী, আম্মার ও সুলায়মান (রাযিঃ)-এর জন্য উৎসাহপূর্ণ। এই সকল বৈশিষ্ট্যাবলীর সমন্বয়ে হযরত আলী (রাযিঃ) এক মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ফলে মুমিন মাত্রই তাঁহাকে মুহাব্বত না করিয়া পারে না। বরং প্রত্যেক মুমিনেরই তাঁহার সহিত মুহাব্বত রাখা অত্যন্ত জরুরী। আলোচ্য হাদীছে তাঁহার সহিত মুহাব্বত রাখিবার বিষয়টি ঈমান ও নিফাকের তুলাদণ্ড নির্ধারণ করা হইয়াছে। তাঁহার সহিত মুহাব্বত রাখা প্রকৃত মুমিন হইবার লক্ষণ আর বিদ্বেষ পোষণ করা নিফাকের লক্ষণ।

باب بيان نقصان الايمان ينقص الطاعات وبيان اطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله تعالى ككفر النعمة والحقوق

অনুচ্ছেদঃ ইবাদতে ত্রুটি করিবার দ্বারা ঈমান হ্রাস পাওয়া এবং কুফর শব্দটি 'কুফর বিল্লাহ' ছাড়া নিয়ামত ও হুকুক অস্বীকার করার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হওয়ার বিবরণ

١٤٧ **حدثنا** مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ قَالَ اَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَاَكْثِرْنَ الْاِسْتِغْفَارَ فَاِنِّىْ رَاَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَمَا رَاَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَغْلَبَ لِذِىْ لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ قَالَ اَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَاَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهٰذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِىَ مَا تُصَلِّىْ وَتُفْطِرُ فِىْ رَمَضَانَ فَهٰذَا نُقْصَانُ الدِّيْنِ-

হাদীছ-১৪৭. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন রুম্হ বিন মুহাজির আল-মিসরী (রহঃ)। তিনি...হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমরা দান-সদকা করিতে থাক এবং বেশী বেশী ইসতিগফার কর। কেননা আমি দেখিয়াছি[১] যে, তোমাদের (মহিলাদের) মধ্যেই (পুরুষদের তুলনায়) অধিক জাহান্নামী। তখন তাহাদের মধ্য হইতে জনৈকা বুদ্ধিমতী সাহাবিয়া মহিলা[২] জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হইবার কারণ কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) বলিলেনঃ তোমরা বেশী বেশী অভিসম্পাত করিয়া থাক এবং স্বামীর (অনুগ্রহের) প্রতি কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করিয়া থাক।[৩] (আশ্চর্যের বিষয় যে,) জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীনে ত্রুটিপূর্ণ কোন সম্প্রদায়কে জ্ঞানীদের উপর তোমাদের চাইতে অধিক প্রভাব বিস্তারকারী আর কাহাকেও প্রত্যক্ষ করি নাই। প্রশ্নকারিনী (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! (আমাদের) জ্ঞান-বুদ্ধি[৪] ও দ্বীনে ত্রুটি কিসে? তিনি (সাল্লাল্লাহু

টীকা-১. فانى رأيتكن "আমি দেখিয়াছি যে, জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই তোমাদের মধ্যে।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাত্রিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, জাহান্নামীদের মধ্যে নারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত একটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সালাতুল কুসূফ' আদায় অবস্থায় "জাহান্নামে নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা" দেখিয়াছেন। অবশ্য উভয়

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেনঃ তোমাদের জ্ঞান–বুদ্ধিতে ক্রটি হইলঃ দুইজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। ইহাই (তোমাদের) জ্ঞান–বুদ্ধিতে ক্রটির প্রমাণ। আর মহিলাগণ (প্রতি মাসে) কয়েকদিন নামায হইতে বিরত থাকে (অতঃপর কাজা করিতে হয় না বলিয়া উক্ত নামাযসমূহের ছাওয়াব হইতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়) এবং রমযান মাসে রোযা ভঙ্গ করে। (অতঃপর কাজা করিতে হয় বটে কিন্তু অন্যান্য ইবাদতকারী মুমিনদের সহিত ফযীলতপূর্ণ সময়ে আদায় করিতে পারে নাই বলিয়া রোযার পূর্ণ ছাওয়াব লাভ করিতে পারে না। অবশ্য ইহা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধান বলিয়া কোন গুনাহ হইবে না বটে কিন্তু ছাওয়াবে তো ঘাটতি হইল।) ইহাই দ্বীনের দিক দিয়া ক্রটি।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ

বর্ণনাতে কোন বিরোধ নাই। সম্ভবতঃ একবার তিনি মিরাজের রাত্রিতে দেখিয়াছেন। অতঃপর সালাতুল কুসূফ আদায় অবস্থায় দেখিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

টীকা–২. "جَزْلَةٌ" শব্দটি 'জীম' বর্ণে যবর এবং 'যা' বর্ণে জযম। অর্থাৎ জ্ঞান–বুদ্ধি ওয়ালী বুদ্ধিমতী। ইবন দরীদ (রহঃ) বলেন الجزلة হইতেছে عقل (জ্ঞান–বুদ্ধি) এবং وقار। (গাম্ভীর্য)। এই জনৈকা সাহাবিয়া মহিলা (রাযিঃ)–এর অত্র প্রশ্নই বুদ্ধিমতী হইবার প্রমাণ বহন করে। এই কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশংসা স্বরূপ বলিয়াছেনঃ

نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يفقهن فى الدين

"শুভ মহিলা আনসারী মহিলাগণ, দ্বীনের বিষয় অনুধাবনের ব্যাপারে লজ্জা তাহাদের বাধা হইয়া দাঁড়ায় না।"
(ফতহুল মুলহিম)

টীকা–৩. وتكفرن العشير "আর তোমরা স্বামীর (অনুগ্রহের) নাফরমানী করিয়া থাক। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেনঃ হাদীছ শরীফের এই অংশ স্বামীর হক অধিকারের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ বহন করে। দলীল হইতেছে যে, অন্য এক হাদীছে স্বামীর হক অধিকারসমূহের মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ

لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها

অর্থাৎ "আমি যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে সিজদা করিবার নির্দেশ দিতাম তাহা হইলে মহিলাকে নির্দেশ দিতাম যে, সে যেন নিজ স্বামীকে সিজদা করে।" (কিন্তু ইসলামী শরীআতে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহাকেও সিজদা করা হারাম ও জঘন্য পাপ।) এই অর্থের দৃষ্টিতেই বিভিন্ন গুনাহের মধ্য হইতে স্বামীর অকৃতজ্ঞতাকে (كفران العشير) নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কেননা স্বামীর হক স্ত্রীর উপর 'হক্কুল্লাহ'–এর নিকটবর্তী। কাজেই মহিলা যখন নিজ স্বামীর হক অধিকারের অগুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকে তখন ইহাই প্রমাণ করে যে, তাহারা আল্লাহ তা'আলার হক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অসতর্কতা অবলম্বন করিবে। এই কারণেই স্বামীর অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে কুফর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। তবে এই 'কুফর' দ্বারা দ্বীন ইসলাম হইতে বাহির হইবে না। সুতরাং "কুফর" শব্দের ব্যাপক (مطلق) অর্থতো 'কুফর বিল্লাহই'। আর উহা ব্যতীত অন্যান্য জঘন্য কবীরা গুনাহ যাহা কুফর বিল্লাহ–এর নিকটবর্তী উহার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

এই সম্পর্কে আল্লামা আযহারী (রহঃ) বলেনঃ 'কুফর বিল্লাহ' সাধারণতঃ চারি প্রকার। যে ব্যক্তি এই চারি প্রকারের যে কোন একটিরও বাহক হইবে তাহার মাগফিরাত হইবে না।

প্রথমঃ অস্বীকার (انكار) অর্থাৎ যে মুখ ও অন্তর উভয় দিক দিয়া অস্বীকারকারী হয় এবং তাহার নিকট তাওহীদ সম্পর্কে যাহা কিছু উল্লেখ করা হয় সে উহা না চিনে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

অর্থাৎ "নিশ্চয়, যাহারা কাফির হইয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য উভয়ই সমান আপনি তাহাদিগকে ভয় দেখান বা না দেখান। তাহারা ঈমান আনিবে না।"
(সূরা বাকারা–৬)

বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

ইসলামী শরীআতে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের হক অধিকারসমূহ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। তুলনামূলকভাবে স্বামীগণ স্ত্রীদের উপর অনেক অনুগ্রহ করিয়া থাকেন যাহার পক্ষপাত করা স্ত্রীদের জন্য খুবই জরুরী। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু এরশাদ দ্বারা উক্ত হক অধিকারসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহার সংরক্ষণ সম্পর্কে মহিলাদেরকে বিশেষভাবে তাকীদ করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ মহিলা নিজ স্বামীর হক অধিকারসমূহের মর্যাদা দেয় না বরং অকৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। স্বামী স্বীয় স্ত্রীর সহিত যেই সকল সৌন্দর্য ব্যবহার করে এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখে উহাতে ত্রুটি বিচ্যুতি বাহির করে এবং সৌহার্দপূর্ণ আচার ব্যবহারকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া উল্টা উহা ভৎর্সনা ও বিদ্রুপের চিহ্ন বানায় এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর এই অকৃতজ্ঞতাই মহান রব্বুল আলামীনের পাক দরবারে শাস্তির কারণ হইবে।

বলাবাহুল্য আলোচ্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের উক্ত অশুদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাসকে চিহ্নিত করিবার দ্বারা এই উদ্দেশ্য নহে যে, তাহাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করিয়া কলঙ্কিত করা। বরং ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে যে, তাহাদিগকে সংশোধন করা এবং ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাকীদ করা। আর এই অশুদ্ধ অভ্যাস হইতে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোন মহিলা হইতে ইহা সম্পাদন হইয়া পড়ে তাহা হইলে কি করিতে হইবে উহার প্রতিষেধকও বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে, উহার ক্ষতিপূরণ হইল দান-

---

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ.

এই আয়াতে الذين كفروا। অর্থাৎ "যাহারা তাওহীদের সাথে কুফরী করিয়াছে এবং উহার পরিচিতি অস্বীকার করিয়াছে" তাহাদেরকে আপনি ভয় দেখান বা না দেখান উভয়ই সমান, তাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে না।

দ্বিতীয়ঃ মিথ্যা প্রতিপাদন করা ও জানা সত্বে অস্বীকার করা (جحود) অর্থাৎ যে অন্তরের দিক দিয়া তো চিনে (এবং সত্যায়িত করে) এবং মুখ দিয়া স্বীকার না করে। যেমন-ইবলিস, বলআম এবং উমাইয়্যা বিন আবীস সলত-এর কুফরী।

তৃতীয়ঃ অবাধ্যতা ও শত্রুতা (عناد) অর্থাৎ যে অন্তরে চিনে এবং মুখেও স্বীকার করে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাওহীদের উপর ঈমান গ্রহণ না করে এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া ইসলামের সীমায় প্রবেশ না করে। যেমন আবূ তালিবের কুফরী।

চতুর্থঃ কপটতা (نفاق) অর্থাৎ যে মুখ দিয়া স্বীকৃতি দেয় কিন্তু অন্তরে অস্বীকার করে যেমন মুনাফিকদের কুফরী।

আলোচ্য হাদীছে কুফর দ্বারা উপরোল্লেখিত চারি প্রকার কুফর মর্ম নহে বরং কুফর দ্বারা মর্ম হইতেছেঃ যে ব্যক্তি মুখ দিয়া তাওহীদ ও রিসালতের স্বীকার করে এবং অন্তর দিয়াও দৃঢ় বিশ্বাস করে এইরূপ মুমিন যদি কবীরা গুনাহ যেমন হত্যা, ভূমণ্ডলে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা ইত্যাদি করে তাহা হইলে শরীআতে কখনো উপরোল্লেখিত চারি প্রকার কুফর ব্যতীতও জঘন্যতম কবীরা গুনাহ, হুকুক পালনে অসতর্কতা ও নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে কুফর শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন আলোচ্য হাদীছে এবং অন্যান্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) كفر دون كفر (কুফর বটে কিন্তু প্রকৃত কুফর নহে) বাক্য দ্বারা বুঝাইয়াছেন। (উমদাতুলকারী, ফতহুল মুলহিম)

টীকা-৪· عقل (জ্ঞান-বুদ্ধি) শব্দটি অভিধানে حمق। (নির্বুদ্ধিতা)-এর বিপরীত। উহার বহুবচন عقول ইহার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। কতকের মতে উহার স্থান মস্তিষ্ক আর কতকের মতে উহার স্থান অন্তর। প্রথম অভিমত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর এবং দ্বিতীয় অভিমতটি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর। আর কেহ কেহ বলেন যে, উহার বাসস্থান মস্তিষ্ক এবং কার্যপ্রণালী অন্তর। ইহার ভিত্তিতে আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেনঃ عقل (জ্ঞান-বুদ্ধি) হইতেছে একটি নৈপুণ্য (جوہر) যাহাকে আল্লাহ তা'আলা মস্তিষ্কে সৃষ্টি করিয়াছেন আর তিনি উহার উজ্জ্বলতা অন্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে উহার দ্বারা কাহারও মাধ্যমে অদৃশ্যকে অনুধাবন করা যায় এবং পর্যবেক্ষণ দ্বারা অনুভূত বিষয় সমূহকে আয়ত্ব করা যায়। মুতাকাল্লেমীনের নিকট 'আকল' ইলমকে বলে। আর কতকের মতে প্রয়োজনীয় ইলমকে আকল বলে। আর কতকের মতে আকল একটি শক্তি যাহার দ্বারা মূলতত্ত্বসমূহের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। (ফতহুল মুলহিম)

খয়রাত এবং বেশী বেশী ইসতিগফার করা। দান খয়রাতের নির্দেশ এইজন্য দিয়াছেন যে, সদকার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ থামিয়া যায় এবং তাঁহার শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবার উপায় হয়। কেননা হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, কিয়ামত দিবসে হিসাব-নিকাশ ও বিচারকার্য হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় দান-খয়রাতের ছায়াতলে থাকিবে। এক হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ

اتقوا النار ولو بشق تمرة

অর্থাৎ "তোমরা জাহান্নামের আযাব হইতে বাঁচ, চাই এক টুকরা খেজুর সদকা করিবার দ্বারাই হউক না কেন।"

এই সম্পর্কে মহান করুণাময় আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

ان الحسنات يذهبن السيئات

অর্থাৎ "নিশ্চয় সৎ কাজ পাপ কাজকে দূর করিয়া দেয়।"

ইমাম আবদুল্লাহ মাযহারী (রহঃ) বলেনঃ আলোচ্য হাদীছে যে মহিলাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ত্রুটির কথা বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত এরশাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছেঃ

أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰىهُمَا الْأُخْرٰى

অর্থাৎ "যাহাতে একজন (মহিলা) যদি ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে একজন (মহিলা) অপর জন (মহিলা)কে স্মরণ করিয়া দেয়।" (সূরাবাকারা-২৮২)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় যবত ও হিফয শক্তির কমতি রহিয়াছে।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এরশাদ করিয়াছেনঃ দ্বীনে হ্রাস থাকিবার কারণ হইতেছে যে, তাহারা হায়িয অবস্থায় নামায আদায় করিতে পারে না এবং রোযা ভঙ্গ করে। ইহাকে কেহ কেহ জটিল বুঝিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাতে কোন জটিলতা নাই। কেননা দ্বীন, ইসলাম এবং ঈমান এক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আর ইবাদতকেও ঈমান এবং দ্বীন বলা হয়। সুতরাং ইহা যখন প্রমাণিত হইল তখন যাহার ইবাদত অধিক তাহার ঈমান ও দ্বীন শক্তিশালী আর যাহার ইবাদত কম তাহার ঈমান ও দ্বীন দুর্বল।

বলাবাহুল্য দ্বীনে হ্রাস কখনও গুনাহের কারণে হইয়া থাকে, যেমন কোন ব্যক্তি নামায, রোযা ইত্যাদি ওয়াজিব ইবাদতসমূহ কোন প্রকার ওযর ব্যতীত তরক অর্থাৎ ছাড়িয়া দেয়। আর কখনও গুনাহ হয় না (তবে ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হয়) যেমন জুমুআ ও জিহাদ ইত্যাদি ইবাদত ওযর থাকিবার কারণে কোন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নহে, তাহা সে ছাড়িয়া দেয়। এই কারণেই হায়িযা মহিলা হায়িয অবস্থায় নামায তরক করিবার কারণে গুনাহ হইবে না, আবার ছাওয়াবও হইবে না। ফলে অন্যান্য মুসল্লীদের তুলনায় তাহার ছাওয়াব কম হইবে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, হায়িয অবস্থায় তরককৃত নামাযের ছাওয়াব হইবে না কেন? অথচ রুগ্ন ও মুসাফির ব্যক্তি সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় যেই সকল নফল ইবাদত পালন করিত তাহা রোগ ও মুসাফির অবস্থায় আদায় না করিয়াও পূর্বের সমপরিমাণ ছাওয়াব পাইয়া থাকে।

উত্তর এই যে, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হায়িয অবস্থায় তরককৃত নামাযের ছাওয়াব দেওয়া হইবে না। কারণ রুগ্ন ব্যক্তি ও হায়িযা মহিলার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। পার্থক্য এই যে, রুগ্ন ও মুসাফির ব্যক্তি নফল ইবাদতকে নিয়মানুবর্তিতার সহিত আদায় করিবার নিয়্যাতসহ আদায় করিতেছিল, আর তাহারা ইহার যোগ্য বটে। কিন্তু হায়িযা মহিলা এইরূপ নহে বরং তাহার নিয়্যাত হইতেছে যে, হায়িয অবস্থায় নামায তরক করিবে। তাহা ছাড়া হায়িয অবস্থায় নামায আদায় করার নিয়্যাত করাও হারাম। কাজেই হায়িযা মহিলার উদাহরণ হইল ঐ মুসাফির ও রুগ্ন ব্যক্তির ন্যায় যে মুকীম ও সুস্থ অবস্থায় নিয়্যাতসহ নিয়মানুবর্তিতার সহিত নফল

ইবাদত পালন করে নাই। কখনও নফল আদায় করিয়াছে আবার কখনও তরক করিয়াছে। এইরূপ মুসাফির ও রুগ্ন ব্যক্তি যদি সফর ও রোগ অবস্থায় নফল আদায় না করে তাহা হইলে মুকীম ও সুস্থ অবস্থায় অনিয়মানুবর্তিতায় আদায়কৃত নফল ইবাদতের সমপরিমাণ ছাওয়াব পাইবে না। তবে আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন যে, হায়িযা মহিলা হারামকে বর্জন করিবার কারণে ছাওয়াব পাওয়ার যোগ্য। কেননা, হায়িযের সময়কালে হায়িযা মহিলার জন্য নামায পড়া হারাম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

দুই হাদীছ শরীফের সমন্বয়

আলোচ্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের ব্যাপারে এরশাদ করিয়াছেন যে, তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীনে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। অথচ অন্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদকরিয়াছেনঃ

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران واسية بنت مزاحم

অর্থাৎ "পুরুষদের মধ্যে (জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীনে) কামিল অর্থাৎ সম্পূর্ণতার সংখ্যা অনেক। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মরিয়ম বিনতে ইমরান ও আসিয়া বিনতে মযাহিম ব্যতীত (জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীনে) কামিল নাই।"

অন্য হাদীছে চারিজন মহিলার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) রিওয়ায়াত করিয়াছেনঃ

عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العلمين باربع مريم بنت عمران واسية امراة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم-

অর্থাৎ "হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ জগতের মহিলাদের মধ্যে চারিজনই যথেষ্ট। মরিয়ম বিনতে ইমরান, আসিয়া যাওজায়ে ফিরাউন, খাদিজা (রাযিঃ) বিনতে খুয়াইলাদ এবং ফাতিমা (রাযিঃ) বিনতে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

ইহার উত্তরে বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ "মহিলা সম্প্রদায়ের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীনে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে।" ইহা অধিকাংশ হিসাবে হুকুম দিয়াছেন। কাজেই উহা হইতে কোন কোন ব্যক্তিবর্গ (افراد) বহির্ভূত রহিয়াছেন। কেননা ইহার সংখ্যা বিরল বিধায় উল্লেখযোগ্য নহে। অধিকন্তু কোন জাতির উপর ব্যাপক হুকুম প্রদান করিবার দ্বারা ইহা অত্যাবশ্যক নহে যে, সেই জাতির প্রতিটি একক বস্তুর উপরও প্রযোজ্য হইবে। (শরহে নববী, ফতহুল মুসলিম)

ফায়দাঃ আলোচ্য হাদীছ শরীফ হইতে অনেক বিষয় জানা যায়।

(১) দান-খয়রাত, সৎ কর্মাবলী ও অধিকহারে ইসতিগফার করার প্রতি উৎসাহ দান।

(২) নেক কর্ম দ্বারা গুনাহ দূর হইয়া যায়।

(৩) স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাহার ইহসান ভুলিয়া যাওয়া কবীরা গুনাহ। কারণ, স্বামীর অকৃতজ্ঞতার পরিণামে জাহান্নামের শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। আর কবীরা গুনাহের দরুণই জাহান্নামের আযাব হইয়া থাকে।

(৪) অভিসম্পাত করা একটি গুনাহ কিন্তু কবীরা গুনাহ নহে। এই কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ "তোমরা বেশী বেশী অভিসম্পাত করিয়া থাক।" সগীরা গুনাহ অধিক করিবার দ্বারা

কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। অন্য হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ "মুসলমানের প্রতি অভিসম্পাত করা তাহাকে হত্যা করার সমতুল্য। তাই বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত হইয়াছেন যে, কাহারও প্রতি অভিসম্পাত করা হারাম। অভিসম্পাত (لعنت)-এর আভিধানিক অর্থ হইলঃ দূর করিয়া দেওয়া, বাহির করা। শরীআতের পরিভাষায় কাহাকেও আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে দূর করিবার দু'আ করা। আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে দূর করিবার দু'আ করা জায়েয নহে যতক্ষণ না তাহার অবস্থা বা সর্বশেষ অবস্থা দৃঢ়ভাবে জানা থাকে। এই জন্যই বিশেষজ্ঞ ওলামাগণ বলেন যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করা বৈধ নহে, চাই সে মুসলমান হউক বা কাফির। এমনকি জন্তু-জানোয়ারের উপরও অভিসম্পাত করা জায়েয নাই।

হ্যাঁ, যদি শরীআতের প্রমাণাদি দ্বারা জানা যায় যে, সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে যেমন আবূ জাহল অথবা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যেমন ইবলিস, তাহা হইলে অভিসম্পাত করা দোষণীয় নহে।

তবে মন্দ গুণাবলীর উপর অভিসম্পাত করা হারাম নহে। স্বয়ং হাদীছ শরীফে কতক অপগুণ বিশিষ্টদের প্রতি অভিসম্পাত করা হইয়াছে। যেমন ঐ মহিলা যে চুল (পরচুল) সংযোগ করিয়া দেয় এবং করিয়া লয়, শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যে চামড়ার উপর খুদিয়া নকশা বানায় এবং বানাইয়া লয়, সুদখোর ও সুদদাতা, চিত্রশিল্পী, অত্যাচারী, ফাসিক, কাফির, ভূমির সীমা পরিবর্তনকারী, যে দাস স্বীয় মুনিব ব্যতীত অন্যকে মুনিব বানায়, যাহারা নিজ জন্মসূত্রের পিতা ব্যতীত অন্যকে আসল পিতা বানায়, যাহারা ইসলামী শরীআতে বিদআতের সৃষ্টি করে এবং বিদআতিদের সাহায্যকারী ইত্যাদি অপগুণ বিশিষ্টদের প্রতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করিয়াছেন।

(৫) কুফর (كفر) শব্দের প্রয়োগ প্রকৃত অবিশ্বাসী কাফির ছাড়াও কোন কোন কবীরা গুনাহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে এই কুফর দ্বারা ইসলাম হইতে বহিষ্কার মর্ম নহে বরং গুনাহের মারাত্মকতা প্রকাশই উদ্দেশ্য। যেমন স্বামীর অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতাকে কুফরী বলা হইয়াছে অথচ ইহা কবীরা গুনাহ। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কতক কবীরা গুনাহের উপর কুফর শব্দ ব্যবহৃত হয়। কাজেই পূর্ববর্তী যেই সকল হাদীছ শরীফে কবীরা গুনাহের উপর কুফর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে উহার তাবীল অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমরা যাহা বলিয়াছি উহা সহীহ হইবার প্রমাণ বহন করে।

(৬) জ্ঞান-বুদ্ধি (عقل) কম-বেশী হয় অনুরূপ ঈমানও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। নেক আ'মাল অধিক হইলে ঈমান মজবুত তথা শক্তিশালী হয় এবং আ'মালে ত্রুটি থাকিলে ঈমান হ্রাস পায়। (অবশ্য হাকীকতে ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না)।

(৭) ইমাম ও হাকিম নিজ প্রজাবর্গকে নসীহত করা, গুনাহ হইতে ভয় প্রদর্শন করা এবং ইবাদতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

(৮) কোন বিষয় অনুধাবন করিতে সক্ষম না হইলে ছাত্র স্বীয় উস্তাদের নিকট এবং প্রজাবর্গ নিজ ইমাম তথা বাদশাহের নিকট জিজ্ঞাসা করা বা প্রশ্ন করা জায়েয।

(৯) রমযান মাস না বলিয়া শুধু রমযান বলাও সহীহ। যদিও রমযান মাস বলাই অধিক ভাল।

١٤٨ وحدثنيه ابو الطاهر قال انا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الاسناد مثله -

হাদীছ—১৪৮. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর উপরোল্লিখিত হাদীছ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন আবূ তাহির (রহঃ)। তিনি....ইবনুল হাদি হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ফায়দাঃ ابن الهاد। "ইবনুল হাদি" এর আসল নাম ইয়াযীদ বিন আবদিল্লাহ বিন উসামা। উসামা-ই হইলেন ইবনুল হাদি। কারণ তিনি রাত্রিতে অগ্নি প্রজ্জলিত করিতেন যাহাতে মেহমান ও মুসাফিরগণ তাহার বাড়ীর দিকে যাইতে পারেন। তিনি মেহমান ও মুসাফিরগণকে অত্যন্ত সেবাযত্ন সহকারে পানাহার করাইতেন। সেই কারণে উসামা "ইবনুল হাদি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (শরহে নববী)

١٤٩ حدثنا الحسن بن علي الحلواني و ابو بكر بن اسحق قالا حدثنا ابن ابي مريم قال انا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن المقبري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم -

হাদীছ—১৪৯. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী আল-হুলওয়ানী (রহঃ) এবং আবূ বকর বিন ইসহাক (রহঃ) উভয়ে....আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে। (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতায়বা বিন সাঈদ এবং ইবন হুজর (রহঃ) তাহারা....হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইবন ওমর (রাযিঃ) কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

باب اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلوة

অনুচ্ছেদঃ নামায পরিত্যাগকারীর উপর কুফর শব্দের প্রয়োগ–এর বিবরণ

١٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ۔

হাদীছ–১৫০. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহঃ)। তাহারা...হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যখন বনী আদম সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করিয়া সিজদায় পতিত হয়[১] তখন শয়তান কাঁদিতে কাঁদিতে দূরে সরিয়া পড়ে এবং বলিতে থাকে, হায়। আমার দুর্ভাগ্য, আর আবূ কুরায়ব (রহঃ)–এর রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, (শয়তান বলিতে থাকে) হায়রে দুর্ভাগ্য। বনী আদমকে সিজদার নির্দেশ দেওয়া হইল, অতঃপর সে সিজদা করিল। তাই ইহার বিনিময়ে তাহার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হইল আর আমাকে সিজদা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা অস্বীকার করিলাম; পরিণামে আমার জন্য নির্ধারিত হইয়াছে জাহান্নাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

কুরআন মজীদে মুমিনগণের মাহাত্ম্য ইহাই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করে এবং সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে তখন অহংকার ও ঔদ্ধত্য হইতে বাঁচিয়া পরম করুণাময় রব্বুল আলামীনের দরবারে সিজদায় পতিত হইয়া নিজ দাসত্ব ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। আল্লাহ তা'আলার স্মরণের মাহাত্ম্য তাহাদের অন্তর আচ্ছাদন করিয়া রাখে, ফলে তাহারা সিজদায় পতিত হইয়া স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা সম্বলিত তাসবীহ পাঠ করে যাহা দাসত্ব প্রকাশের চূড়ান্ত চিহ্ন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাহবূব বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা দিয়া এরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔

অর্থাৎ "নিশ্চয় আমার আয়াতসমূহের প্রতি কেবল তাহারাই বিশ্বাস স্থাপন করে যাহাদেরকে যখনই এই সকল আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়া দেওয়া হয় তখনই তাহারা সিজদায় পতিত হয় আর তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা স্তুতি করিতে থাকে এবং তাহারা (ঈমান গ্রহণের কারণে) অহংকার করে না।" (সূরা সিজদা–১৫)

হাফিয শামসুদ্দীন বিন আল–কাইয়্যিম (রহঃ) স্বীয় রিসালা كتاب الصلوة واحكام تاركها এর মধ্যে লিখিয়াছেন যে,

---

টীকা–১. قوله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدة রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বাণী "বনী আদম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে তখন সিজদায় যায়" ইহার অর্থ হইতেছে সিজদার আয়াত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। এই হাদীছ শরীফ হানাফী মতাবলম্বীগণের দলীল যে, সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করিলে সিজদা ওয়াজিব। আর মালেকী ও শাফেয়ী (রহঃ)–এর মাযহাব মতে তিলাওয়াতে সিজদা সুন্নাত। (শরহে নববী)

মহান আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির ঈমান নাই বলিয়াছেন যাহার সামনে আল্লাহ তা'আলার আয়াত স্মরণ করিয়া দিলে তাহাদের প্রতিপালকের স্বপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থায় সিজদায় লুটিয়া পড়ে না। আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের স্মরণ করানোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্মরণ করানো হইতেছে নামাযের আয়াতসমূহের স্মরণ করানো। তাই যাহাকে নামাযের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সে যদি উহা গ্রহণ না করে এবং নামায আদায় না করে তবে সে আয়াতসমূহের প্রতি মুমিন তথা বিশ্বাসী হইল না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণকে (ইকামতে সালাতের দরুণ) বিশেষত্ব দান করিয়াছেন যে, তাহারা আহলে সুজূদ।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেনঃ উল্লিখিত আয়াতে সম্ভবতঃ ঐ ব্যক্তির ঈমান নাই বলিয়াছেন, যে গর্বস্ফীত হইয়া সিজদায় পতিত হওয়াকে অস্বীকার করে, যেমন আল্লাহ তা'আলার এরশাদঃ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (আর তাহারা অহংকার করেনা) উহার দিকে ইঙ্গিত করে। আর অহংকার করাই অভিশপ্ত ইবলিসের কাজ এবং তাহার কুফরীর মূল কারণও ছিল ইহাই যাহা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত এরশাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ "সে (ইবলিস) নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করিল এবং অহংকার প্রদর্শন করিল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ـ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ـ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ـ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا ـ فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা বলিলেনঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়াছি তখন কিসে তোমাকে সিজদা করিতে বারণ করিল? ইবলিস (ভুল বা অপরাধ স্বীকারের স্থলে গর্বস্ফীত হইয়া) বলিল, আমি তাহার হইতে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন আর তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি দ্বারা। (ইহা হইতেছে ইবলিস উত্তম হইবার শয়তানী যুক্তির প্রথম অংশ। আর অনুল্লেখিত যুক্তির বাকী অংশগুলি হইতেছে আগুন আলোকময় হওয়ার কারণে মাটি হইতে উত্তম।[১] অনুত্তমকে সিজদা করা উত্তমের পক্ষে অনুচিত। তাই আমি উত্তম হওয়ায় অনুত্তমকে সিজদা করি নাই।) আল্লাহ তা'আলা বলিলেনঃ তুমি এই স্থান হইতে যাও। এই স্থানে তোমার অহংকার করিবার কোন অধিকার নাই। (এই স্থান কেবল অনুগতদের জন্য, কাজেই) তুমি এই স্থান হইতে বাহির (দূর) হইয়া যাও। নিশ্চয় তুমি (এই অহংকারের দরুন) হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছ।" (সূরাআ'রাফ-১২-১৩)

এই আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ইবলিস কাফির হইয়া যাওয়ার মূল কারণ ছিল আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বিরোধিতা ও মুকাবিলা করা। অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ তা'আলা) যাহার প্রতি সিজদা করিতে আমাকে হুকুম দিয়াছেন; সে আমার সিজদা লাভের যোগ্যই নহে। এমন হঠকারিতা নিঃসন্দেহে কুফরী।

আর আমাদের কথা হইতেছে সিজদা বা নামায অলসতা ও শ্রমবিমুখতায় পরিত্যাগ করার ব্যাপারে।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই পর্য্যায়ে আলোচ্য হাদীছ শরীফ উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, কতক কর্ম পরিত্যাগের দরুণ বান্দা কাফির হইয়া যায়, হয়তঃ প্রকৃতভাবে অবিশ্বাসী কাফির অথবা নামে কাফির। কেননা

টীকা-১৷ نَار 'আগুন'ঃ নূর ও ধোঁয়ার মিশ্রিতরূপ আগুন। নূর অংশ আলোকময় উত্তম বটে কিন্তু ধোয়া মিশ্রিত থাকায় সে উত্তমতা অবশিষ্ট থাকে না। আর যেখানে নূরের তৈরী ফেরেশতা সিজদা করিল সেখানে তাহার যুক্তি উত্থাপন করা দাম্ভিকতা ছাড়া কিছু নহে। অধিকন্তু যে সকল গুণের কারণে বস্তু উত্তম হয় সে সকল গুণাবলী মাটির মধ্যেই অধিক। যেমন আমানতদারী, দানশীলতা, ধৈর্য্যধারণ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে আগুনের মধ্যে ধ্বংস করার নিকৃষ্ট গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং যুক্তির ভিত্তিতেও সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, মাটি আগুন হইতে উত্তম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

শয়তান সিজদা না করিবার কারণেই কাফির হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۔ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ "আর আমি যখন হযরত আদম (আঃ)কে সিজদা করিবার জন্য ফিরিশ্‌তাগণকে হুকুম দিলাম, তখন একমাত্র ইবলিস ব্যতীত সকলই সিজদা করিল, সে (হুকুম) পালন করিতে অস্বীকার করিল এবং অহংকার প্রদর্শন করিল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।" (সূরা বাকারা-৩৪)

কাজেই যে ব্যক্তি নামায ফরয হইবার বিষয়টি অস্বীকার করিয়া পরিত্যাগ করিবে সে কাফির হইয়া ইসলাম ধর্ম হইতে বাহির হইয়া যাইবে। তবে যদি সে ইসলামের প্রাথমিক যুগে নতুন মুসলমান হয় এবং সে ইসলামী আহকাম সম্পর্কে অনবহিত হয় তাহা হইলে কাফির হইবে না। ইহা মুসলিম উম্মাহ-এর সর্বসম্মত অভিমত।

আর যে ব্যক্তি নামায ফরয হইবার বিষয়টি বিশ্বাস করে এবং স্বীকারও করে কিন্তু অলসতা ও ঢিলামী করিয়া নামায তরক করে যেমন বর্তমান যুগের বহু লোকের অবস্থা, এই প্রকার লোক কাফির হইবে কি হইবে না এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ওলামাগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে।

ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহুরে ওলামায়ে কেরামের মতে সে কাফির হইবে না বটে কিন্তু ফাসিক হইবে। তাহাকে তাওবা করিতে বলা হইবে। অতঃপর যদি সে তাওবা করে এবং নামায পড়িতে আরম্ভ করে তবে ভাল, না হয় মুসলিম হাকিম তাহাকে শাস্তি প্রদানে তলোয়ার দিয়া হত্যা করিবার নির্দেশ দিবেন। যেমন বিবাহিত ব্যাভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হয়।

তাহারা হত্যার স্বপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত এরশাদ দ্বারা প্রমাণ দিয়াছেনঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۔

অর্থাৎ "অতঃপর যদি তাহারা তাওবা করিয়া লয় এবং নামায কায়িম করে ও যাকাত আদায় করে তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও।" (সূরা তাওবা-৫)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دمائهم واموالهم

অর্থাৎ "লোকদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি যতক্ষণ না তাহারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রসূল এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, যদি এইগুলি করে তাহা হইলে আমার পক্ষ হইতে তাহাদের জান এবং মালের নিরাপত্তা লাভ করিবে।"

সলফে সালেহীনের এক জামাআত যেমন হযরত আলী (রাযিঃ), ইমাম আহমদ (রহঃ), আবদুল্লাহ বিন মুবারক ও ইসহাক বিন রাহওয়াই (রহঃ) প্রমূখের অভিমত হইতেছে যে, নামায পরিত্যাগকারী কাফির হইয়া যাইবে। তাহাদের দলীল এই অনুচ্ছেদের পরবর্তী হাদীছঃ

عن جابر رضـ يقول سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلوة

অর্থাৎ "হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন; আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি; নিশ্চয় বান্দা এবং শিরক কুফরের মধ্যে সংযোগকারী বস্তু হইতেছে নামায পরিত্যাগ করা।"

অন্য হাদীছে আছেঃ من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছাড়িয়া দেয়, সে কাফির হইয়া যায়।"

ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ), আহল কূফাদের এক জামাআত এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর অনুসারী আল মাযনী (রহঃ) প্রমূখের অভিমত হইতেছে যে, নামাযে বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি অলসতায় নামায না পড়ে তবে সে কাফির হইবে না আর না তাকে হত্যা করা যাইবে বরং তাহাকে নামায না পড়া পর্যন্ত শাস্তি দিবে এবং বন্দী করিয়া রাখিবে।

নামায তরককারী কাফির না হইবার দলীল হইতেছে আল্লাহ তা'আলার এরশাদঃ

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার সহিত শিরক করার গুনাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করেন না, তাহা ছাড়া অন্য গুনাহ আল্লাহ তা'আলা যাহাকে মাফ করিবার ইচ্ছা করেন মাফ করিয়া থাকেন।" (সূরা নিসা-৪৮)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ

من قال لا اله الا الله دخل الجنة

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বিশ্বাসসহ পাঠ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।"

অন্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছেঃ

من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنة

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর নিশ্চিত বিশ্বাসসহ ইনতিকাল করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।"

অন্য হাদীছে আছেঃ

لايلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে এই দুইটি কথা (তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য)-এর উপর বিশ্বাস রাখিয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থিত হইবে সে জান্নাত হইতে বঞ্চিত হইবে না।"

উপরোল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কবীরা গুনাহকারী কাফির হইবে না। বরং গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ বা ক্ষমার মাধ্যমে পরিত্রাণ পাইবে।

আর নামায ফরয হইবার বিষয়টির বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি নামায ছাড়িয়া দেয় তাহাকে হত্যা করা যাইবে না। উহার প্রমাণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছঃ

لايحل دم امرى مسلم لا باحدى ثلث

অর্থাৎ "তিন বিষয়ের একটি বিষয় ব্যতীত মুসলমানের রক্তপাত হালাল নহে।"

উক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে নামায তরককারীর কথা নাই। কাজেই নামায তরককারীকে হত্যা করা যাইবে না।

ইমাম মালিক (রহঃ) ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) প্রমূখের হত্যার সপক্ষে দলীলের জবাব এই যে, বান্দা নামায পরিত্যাগ করিবার কারণে ঐ শাস্তির উপযুক্ত হয় যাহা কাফিরদের হয় অর্থাৎ হত্যা। অথবা যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগকে হালাল মনে করে। হারামকে হালাল বিশ্বাস করা কুফরী যাহার শাস্তি হত্যা।

সলফে সালেহীনের মধ্যে হযরত আলী (রাযিঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) প্রমুখের নামায তরককারী কাফির হইবার সপক্ষে দলীলের জবাব এই যে, যে ব্যক্তি নামায ফরয হইবার বিষয়টি অস্বীকার করিয়া তরক করে অথবা নামায তরক করা হালাল মনে করে অথবা নামায পরিত্যাগকারীর পরিণাম 'কুফর' অথবা তাহার কর্মটি কাফিরদের কর্মের ন্যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী, ফতহুল মুলহিম)

সারকথাঃ শরীআতের পরিভাষায় কঠোর গুনাহকে কেবল কঠোরতার প্রেক্ষিতেই কুফর বলিয়া দেওয়া হয়। আমাদের নিজেদের পরিভাষায়ও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। উদাহরণঃ কাহাকেও কোন নিকৃষ্ট কাজ করিতে প্রত্যক্ষ করিলে আমরা বলিয়া দেইঃ তুমি একেবারে চামার অথচ সে মোটেই চামার নয়। এই ক্ষেত্রে তীব্র ঘৃণা এবং সংশ্লিষ্ট কাজটির নিকৃষ্টতা প্রকাশই উদ্দেশ্য। সুতরাং من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ছাড়িয়া দেয় সে কাফির" এবং এই জাতীয় অন্যান্য হাদীছসমূহের ক্ষেত্রেও এই অর্থ বুঝিতে হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ফায়দাঃ মহান রব্বুল আলামীনের সামনে আমলগতভাবে দাসত্বের চূড়ান্ত প্রকাশই দ্বীন ও দুনিয়ায় সফলকামের নিশ্চয়তা প্রদান করে। ইবলিস নিজ যাবতীয় ইলম ও চূড়ান্ত উপাসনায় উপনীত হওয়া সত্ত্বেও অন্তরে অহংকার স্থান দিয়া আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে অস্বীকার করায় আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। আর তাহার অতীতের জ্ঞান ও ইবাদত কোনই কাজে আসে নাই। হাদীছের প্রথমাংশে ইহাই বলা হইয়াছে যে, ইবলিস বনী আদমের সিজদার নির্দেশ পালনের পরিণাম অবগত হইয়া আফসূস করে যে, তাহার জন্য দাসত্ব প্রকাশ, সাধুতা ও আন্তরিকতার চাবি হইয়া গিয়াছে। আর সে আমার হাতের পাঞ্জা বা থাবা হইতে বাহির হইয়া আল্লাহ তা'আলার রহমতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, পরিণামে সে জান্নাত ও উহার নেয়ামতসমূহ ভোগ করিবারদাবীদারহইবে।

সময় অতীত করিয়া ইবলিসের এই অনুতাপ নিষ্ফল। হাদীছ শরীফে উহার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির চাহিদা ইহা যে, সে নিজ পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং বুঝিয়া শুনিয়া পা রাখিবে আর সময় থাকিতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও তাঁহার আহকামসমূহের উপর পুরোপুরি আমল করিবে যাহাতে তাহার উপকারে আসে। এই কয়েক দিনের জিন্দিগী এবং সংক্ষিপ্ত জীবনের সময়কাল যদি অবাধ্যতা বা অলসতার দরুণ অতীত হইয়া যায় তাহা হইলে সময় হারাইয়া অনুশোচনা করিলে কোন ফল হইবে না। বরং ইবলিসের ন্যায় মূল্যহীন অনুতাপ ছাড়া আর কিছুই নহে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

১৫১ وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا الْأَعْمَشُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ -

হাদীছ-১৫১. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহঃ)। তিনি--আ'মাশ (রহঃ)-এর সূত্রে এই সনদে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তবে তিনি ইহাতে (فابيت فلى النار বাক্যের স্থলে) বলিয়াছেনঃ فعصيت فلى النار "আমি নাফরমানী করিলাম ফলে আমার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হইয়াছে।" (উভয় বাক্যের মর্মার্থ এক)।

١٥٢ حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن ابى شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى اخبرنا جرير عن الاعمش عن ابى سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلوة ـ

হাদীছ—১৫২. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামিমী (রহঃ) এবং ওছমান বিন আবী শায়বা (রহঃ)। তাঁহারা—আবূ সুফিয়ান (তালহা বিন নাফে') হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত জাবির (বিন আবদিল্লাহ) (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিঃ নিশ্চয় বান্দা এবং শিরক—কুফরের মধ্যে সংযোগকারী বস্তু হইতেছে নামায পরিত্যাগ করা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

মানুষের ঈমান ও বিশ্বাস, দাসত্ব ও বিনয় ব্যক্তকরণ এবং আল্লাহ তা'আলার একত্বে বিশ্বাসী হইবার কার্যতঃ সাক্ষ্য এবং শিরক ও কুফর হইতে কার্যতঃ অসন্তুষ্টির সব চাইতে প্রসারিত ঘোষণা নামাযের মাধ্যমে হইয়া থাকে। এই কারণেই ইসলামী শরীআতে নামাযের পদমর্যাদা ঈমান প্রকাশের ভিত্তিস্বরূপ গণ্য হইয়াছে। আর ইহাই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকরণীয় মনোগ্রাম হিসাবে গণ্য। কেননা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)—এর যুগে কুফর এবং ইসলামের মধ্যকার পরিচয়ের আলামত নামাযই গণ্য হইত।

জামি' তিরমিযী শরীফে প্রসিদ্ধ তাবঈ হযরত আবদুল্লাহ বিন শকীক (রহঃ) হইতে বর্ণিত যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) নামায ছাড়া অন্য কোন বস্তু পরিত্যাগ করাকে কুফরের চিহ্ন গণ্য করিতেন না।

হযরত আবূদ দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ছাড়িয়া দেয় সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জিম্মাদারী হইতে বাহির হইয়া যায়।

বস্তুতঃ নামায যাবতীয় কল্যাণের মূল আর ইহার পদমর্যাদা যাবতীয় মন্দের উপর তালাস্বরূপ। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে নামায যাবতীয় নির্লজ্জ ও অন্যায় কার্য হইতে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত—৪৫)

নিয়মানুবর্তীতার সহিত নামায আদায়ের বরকতে অন্তর হইতে গুনাহের ময়লা এইরূপ দূর হইয়া যায় যেইরূপ ময়লাযুক্ত কাপড়ের ময়লা সাবান দিয়া ধৌত করিবার দ্বারা দূর হইয়া যায়। পর্যায়ক্রমে তাহার অন্তর আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ পরিষ্কার হইয়া পূণ্যের নূর গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয় এবং উত্তম কার্যাবলী করিবার প্রতি বান্দার অন্তরে প্রবল ইচ্ছা সৃষ্টি হইতে থাকে। পূর্বে অসঙ্কোচে যে সকল মন্দ কার্যাবলী অহরহ করিয়া বসিত নামায নিয়মানুবর্তীতায় আদায়ের ফলে এখন সে সকল মন্দ কার্যাবলী করিবার ধারণাতেই লজ্জা অনুভূত হইতে থাকে। এইরূপে মন্দ কার্যাবলীর দরজায় তালা লাগিয়া যায় আর অপর দিকে কল্যাণের দরজা খুলিয়া যায়।

সহীহ মুসলিম শরীফের এক রিওয়ায়াতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ নামাযরত অবস্থায় বান্দা স্বীয় প্রতিপালকের সব চাইতে অধিক নৈকট্যের অবস্থা, আর উহা হইতেছে সিজদায় অবনত অবস্থায়। কাজেই সিজদারত অবস্থায় অধিক দু'আ প্রার্থনা কর।

আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় হইতেছে যে, বান্দা স্বীয় কথায় ও কার্যে প্রার্থনা ও দাসত্বের প্রকাশ করা আর ইহার সর্বোত্তম প্রকাশ স্থান হইল নামায। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলার নিকট নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম।

নামায ও উহার রুকন সিজদা বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়। উল্লেখ্য যে, নামাযের মধ্যে চারি রকমের কার্য রহিয়াছে যথা– দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদা করা। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি মানুষ অভ্যাসগতভাবে নিজস্ব প্রয়োজনেও করে এবং নামাযের মধ্যে ইবাদত হিসাবেও করে। কিন্তু রুকু–সিজদা এমন কাজ যাহা মানুষ কখনো অভ্যাসগতভাবে করে না, বরং তাহা কেবল ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট। এই জন্য এই দুইটিকে শরীআতে মুহাম্মদীতে ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত করে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও উদ্দেশ্যে তাহা করা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু রুকু–সিজদার মধ্যে সিজদার মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে। তাহা ছাড়া সিজদা আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয় হইবার বিষয়ে এতখানি বলাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আঃ)কে ফিরিশতাগণের নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন তখন উক্ত পরিচিতির হেতুই সিজদায় পতিত হইবার হুকুম হইয়াছে। আর আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ বনী আদম (আঃ)কে যখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জাতে–এলাহীর পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন তখন তাহাদের জন্যও সিজদানির্ধারণকরিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বাণী

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلوة

ইহার মর্মার্থ হইতেছে যে, ব্যক্তিকে কুফর–শিরক হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার বস্তু হইল নামায পরিত্যাগ না করা। অতঃপর ব্যক্তি যদি নামায পরিত্যাগ করে তখন তাহার এবং কুফর–শিরকের বাধা অবশিষ্ট থাকে না বরং উহাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ শিরক ও কুফর এবং ঈমানের মধ্যকার পার্থক্য রেখা অঙ্কনকারী বস্তু হইল নামায নিয়মানুবর্তীতার সহিত আদায়। নামাযের পদমর্যাদা একটি দেয়াল বা পর্দাস্বরূপ যাহা ব্যক্তি এবং কুফর–শিরকের মধ্যবর্তী বাধাযুক্ত থাকে। কিন্তু বান্দা যখন নামায পরিত্যাগ করে তখন উক্ত বাধাযুক্ত বস্তু ধ্বংস হইয়া বান্দা কুফর–শিরকের মুখে পতিত হয় এবং এক পর্যায়ে সে কুফরে প্রবেশ করে। কাজেই নামায পরিত্যাগ কর্মটি বান্দা এবং শিরক–কুফরের মধ্যে সেতু বন্ধনস্বরূপ।

উল্লেখ্য যে, শিরক ও কুফর কখনও একই অর্থে ব্যবহৃত। আর উহা হইল আল্লাহ তা'আলার অবিশ্বাসী হওয়া। আর কখনও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টে ব্যবহৃত হয়। ইহা এইরূপ যে, শিরক (شرك) শব্দটি বিশেষ করিয়া ঐ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যাহারা আল্লাহ তা'আলার স্বীকারোক্তিসহ মূর্তি বা অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর পূঁজা করে। যেমন কুফ্ফারে কুরাইশ। সুতরাং 'কুফর' শব্দটি শিরক হইতে ব্যাপক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

কতক বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম এই হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে,ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে, নামাযকে অস্বীকার করিয়া পরিত্যাগ করা। আর নামাযকে অস্বীকারকারী কাফির। ইহা মুসলিম উম্মাহ–এর সর্বসম্মত অভিমত।

বলাবাহুল্য নামায পরিত্যাগকারী কাফির হইবে অথবা হইবে না এই বিষয়ে আয়িম্মায়ে কেরাম (রহঃ)–এর মতানৈক্য ১৫০ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হইয়াছে। এই বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এইখানে উক্ত মাসআলার একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি যাহা আল্লামা শামসুদ্দীন বিন আল–কাইয়্যিম (রহঃ) স্বীয় 'কিতাবুস সালাত ও আহকামে তারেকেহা'–এর মধ্যে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লামা ইবন আল–কাইয়্যিম (রহঃ) যাহা লিখিয়াছেন উহার সার সংক্ষেপ এই যে, এই মাসআলা সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য ঈমান ও কুফরের হাকীকত কি, এই বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। তাই ইহার পর কাফির হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে যেই ফায়সালা হইবে উহাই সঠিক হইবে। যাহা হউক, কুফর ঈমান একটি অপরটির বিপরীত, যদি একটি দূর হয় অপরটি আগমন করে। আর যখন ঈমানের মূল ও অনেক শাখা রহিয়াছে আর প্রত্যেক শাখার উপর ঈমানের প্রয়োগ হয়। তাই নামায ঈমানের মধ্য হইতে, অনুরূপ যাকাত, হজ্জ, রোযা এবং বাতেনী আ'মাল যেমন লজ্জা, তাওয়াক্কুল, আল্লাহ তা'আলার ভয় এবং আল্লাহ তা'আলার

দিকে মনোযোগ ইত্যাদির উপর ঈমানের প্রয়োগ হয়। সর্বশেষ কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা হইতে অপসারণ করাও ঈমানের শাখাসমূহের একটি শাখা হিসাবে গণ্য। আর এই সকল শাখাসমূহের মধ্যে এমন মূল শাখা রহিয়াছে যাহার বিয়োগে ঈমানই চলিয়া যায়। যেমন শাহাদত শাখাটি। আর কতক শাখা এমন আছে যাহার বিয়োগে ঈমান যায় না যেমন কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা হইতে অপসারণ করা। রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করার শাখাটি তরক করিলেও ঈমান যাইবে না। আর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অনেক শাখা রহিয়াছে যাহার মধ্যে কতক তো এমন আছে যাহা পদমর্যাদায় শাহাদত শাখাটির সহিত মিলিত ও নিকটবর্তী। আর কতক এমন আছে যাহা পদমর্যাদায় কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা শাখাটির সহিত মিলিত এবং উহার নিকটবর্তী। অনুরূপ কুফরেরও মূল এবং অনেক শাখা রহিয়াছে। কাজেই ঈমানের শাখা ঈমান এবং কুফরের শাখা কুফর। লজ্জা ঈমানের শাখা এবং লজ্জাহীন কুফরের শাখা। সত্য ঈমানের শাখাসমূহের একটি শাখা আর মিথ্যা কুফরের শাখাসমূহের একটি শাখা। আর নামায, যাকাত, হজ্জ ও রোযা ঈমানের শাখা এবং উহাদের পরিত্যাগ করা কুফরের শাখা। আল্লাহ তা'আলা যে সকল বিধি-বিধান নাযিল করিয়াছেন উহা মুতাবিক ফায়সালা করা ঈমানের শাখা আর উহা মুতাবিক ফায়সালা না করা কুফরের শাখা। মোট কথা যাবতীয় গুনাহ কুফরের শাখা যেমন যাবতীয় পূণ্য ও নেক কাজসমূহ ঈমানের শাখা।

অতঃপর ঈমানের শাখাসমূহ দুই প্রকারঃ কথামূলক (قولية) এবং কর্মমূলক (فعلية)। অনুরূপ কুফরের শাখাসমূহও দুই প্রকারঃ কথামূলক ও কর্মমূলক। ঈমানের কথামূলক শাখাসমূহের একটি শাখা যাহা দূর হইবার দ্বারা ঈমান দূর হওয়া ওয়াজিব হয় এবং কর্মমূলক শাখাসমূহের এমন শাখা আছে যাহা দূর হইবার কারণে ঈমান দূর হওয়া ওয়াজিব হয়। অনুরূপ কুফরের কথামূলক এবং কর্মমূলক শাখা রহিয়াছে যাহার কারণে মানুষ প্রকৃত কাফির হইয়া যায়। যেমন ইচ্ছাকৃত কুফরী বাক্য মুখ দিয়া নিসৃত করিয়া কুফরী প্রকাশ করা। ইহা কুফরের কথামূলক শাখাসমূহের একটি শাখা। আর মূর্তিকে সিজদা করা, কালামুল্লাহ-এর অসম্মান করা, ইহা কুফরের কর্মমূলক শাখাসমূহ হইতে। ইহাই হইতেছে মূল শাখা। বলাবাহুল্য এইস্থানে অপর একটি মূল বস্তু রহিয়াছে। আর উহা হইতেছে হাকীকতে ঈমান কথা ও কর্মের মধ্যে মিশ্রিত। কথা আবার দুই প্রকার (১) অন্তরের কথা, যেমন বিশ্বাস, (২) মুখের কথা, যেমন কলেমা-ই-ইসলাম মুখ দিয়া বলা। অতঃপর কর্ম (عمل) দুই প্রকার। (১) অন্তরের আমল, যথা আন্তরিক নিয়্যাত ও আন্তরিক ইখলাস এবং (২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। যখন কোন ব্যক্তি হইতে এই চারিটি বস্তু দূর হইয়া যাইবে তখন সে ব্যক্তির ঈমান সম্পূর্ণভাবে চলিয়া যাইবে। আর যদি আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস দূর হইয়া যায় তাহা হইলে অন্যান্য অংশ কোন ফায়দা দিবে না।

অনুরূপ কুফরও দুই প্রকার (১) আমলগত কুফর (كفر عمل) এবং (২) অবাধ্য ও অবিশ্বাসী কুফর (كفر جحود وعناد)। অবাধ্য ও অবিশ্বাসী কুফর হইল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে তাঁহার মনোনীত রসূল যাহা কিছু শরীআতের বিধি-বিধান নিয়া আসিয়াছেন উহা সম্পর্কে অবহিত হইবার পরও অবাধ্য, অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপাদন-পূর্বক কুফরী করা। এই প্রকার কুফরী সর্ব দিক দিয়া ঈমানের বিপরীত।

আর আমলগত কুফরী (كفر عمل) আবার দুই প্রকারঃ প্রথমতঃ যাহা ঈমানের বিপরীত। যেমন মূর্তিকে সিজদা করা, কিতাবুল্লাহ-এর অসম্মান করা, নবীকে হত্যা করা এবং তাঁহাকে গালি দেওয়া। এই সকল কার্যাবলী দ্বারা মানুষ প্রকৃত কাফির হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ যাহা ঈমানের বিপরীত নহে, যেমন আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধি-বিধান, বিশ্বাসী ব্যক্তি সেই মুতাবিক ফায়সালা না করা এবং নামায ফরয বলে বিশ্বাসী ব্যক্তি নামায তরক করা। ইহা কর্মগত কুফরী। কারণ এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে বান্দা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধি-বিধান, বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি করার এবং নামায ফরয বলিয়া বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি করার মধ্যে আন্তরিক বিশ্বাস পাওয়া গিয়াছে যাহা ঈমানের মূল শাখা। আর যাবতীয় গুনাহ যেহেতু কুফরীর শাখা সেহেতু আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধি-বিধান মুতাবিক ফায়সালা না করা এবং নামায তরক করা কুফরের শাখা। বিশ্বাসগত ঈমানী মূল শাখার সহিত আমলগত কুফরী একত্রিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, আমলগত ঈমান আমলগত কুফরের বিপরীত এবং

বিশ্বাসগত ঈমান বিশ্বাসগত কুফরের বিপরীত। আর আমলগত কুফর বিশ্বাসগত ঈমানের বিপরীত নহে! তাই উভয় এক সাথে পাওয়া যাইতে পারে। ইহাকেই كفر دون كفر (কুফর বটে কিন্তু প্রকৃত কুফর নহে) দ্বারা বুঝানোহয়।

আল্লাহ তা'আলার এরশাদঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

(যে সকল লোক আল্লাহ তা'আলা যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তাহারাই কাফির)–এর তফসীর সম্পর্কে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি বলেন, ইহা কুফর বটে কিন্তু ঐ ব্যক্তির ন্যায় নহে যে আল্লাহ তা'আলা, তাঁহার ফেরেশতা, তাঁহার কিতাব এবং তাঁহার মনোনীত রসূলের অবিশ্বাসী কাফির। অন্য বর্ণনাতে আছে এই কুফর দ্বারা দ্বীন ইসলাম হইতে বহিষ্কার হইবে না। আর ওকী বলেন, তিনি সুফিয়ান হইতে, তিনি ইবন জুরাইহ হইতে, তিনি আতা হইতে বর্ণনা করেন كفر دون كفر (কুফর বটে প্রকৃত কুফর নহে)। আর হযরত আতা যাহা বলিয়াছেন উহা কুরআন মজীদ জ্ঞাত ব্যক্তির জন্য স্পষ্ট। কারণ আল্লাহ তা'আলা শরীআতের বিধি–বিধান মুতাবিক ফায়সালা না কারী হাকিমকে কাফির বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলের উপর যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা অস্বীকারকারীকেও কাফির আখ্যা দিয়াছেন। অথচ এই দুই প্রকার কাফির সম–মানের নহে। কাজেই আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত বিধি–বিধান সত্য নহে, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া এই সকল বিধি–বিধানের বিরুদ্ধে ফায়সালা করা কুফর। কিন্তু সত্য বিশ্বাস করিবার পর যদি কার্যতঃ বিপরীত করা হয় তবে উহা হইবে আমলী কুফর তথা গুনাহ ও পাপ।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মুসলিমকে গালি দেওয়া ফিস্‌ক তথা পাপ এবং তাহাকে হত্যা করা কুফরী। এই হাদীছ শরীফে মুসলিমকে হত্যা করা এবং তাহাকে গালি দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন এবং জঘন্যতার দিকে লক্ষ্য করিয়া উভয়ের একটিকে কুফর না বলিয়া ফিস্‌ক বলিয়াছেন আর অপরটিকে কুফর। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থানে কুফর দ্বারা আমলী কুফর মর্ম নেওয়াই উদ্দেশ্য, ইতিকাদী কুফর নহে। এই কুফর দ্বারা সে ইসলাম হইতে বহিষ্কার হইবে না যেমনভাবে ব্যভিচারী, চোর, মদখোর, প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদানকারী প্রভৃতি কবীরা গুনাহকারী দ্বীনে ইসলামের সীমা হইতে সম্পূর্ণভাবে বাহির হইবেনা।

এক হাদীছ শরীফে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ

خمس صلوات كتبهن الله على العباد من اتى بهن كان له عند الله عهد ان يدخل الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়া দিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথ আদায় করিবে তাহার জন্য আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রহিয়াছে যে, তিনি তাহাকে জান্নাতে দাখিল করাইবেন। আর যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে না তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন ওয়াদা নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি দিবেন অথবা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।"

এই হাদীছে নামায পরিত্যাগকারীর যে শাস্তির কথা বলা হইয়াছে উহা কবীরা গুনাহের জন্য হয়। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'নামায তরককারী কাফির' বর্ণিত হাদীছেও "কাফির" দ্বারা আমলগত কুফরীই বুঝানো উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য কবীরা গুনাহের ক্ষেত্রে কুফর শব্দটি ব্যবহৃত হইবার কারণ হইতেছে যে, শরীআতের পরিভাষায় কঠোর গুনাহকে শুধু কঠোরতার প্রেক্ষিতেই কুফর বলিয়া দেওয়া হয়।

শিরকও (شرك) দুই প্রকার। এক প্রকার শিরক যাহার কারণে বান্দা দ্বীনে ইসলাম হইতে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কার হইয়া কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়। উহা হইল শিরকে আকবর (شرك اكبر)। দ্বিতীয় প্রকার শিরকে যাহার কারণে বান্দা দ্বীনে ইসলাম হইতে বহিষ্কার হয় না। উহা হইল শিরকে আসগর (شرك اصغر) বা ক্ষুদ্র শিরক। ক্ষুদ্র শিরকে তাওহীদের বিপরীত নহে। ফলে উহা ঈমানের সহিত মিলিত হইতে পারে, যেমন রিয়া তথা লোক দেখানোইবাদত।

আল্লাহ তা'আলা শিরকে আকবর সম্পর্কে এরশাদ করেনঃ

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

অর্থাৎ "নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অংশী স্থির করিবে, তবে তাহার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন এবং তাহার বাসস্থান হইবে জাহান্নাম।" (সূরা মায়েদা-৭২)

এই শিরকে আকবরই হইতেছে বিশ্বাসগত শিরক যাহা সম্পূর্ণভাবে তাওহীদের বিপরীত। তাই আকীদা বা বিশ্বাসগত শিরকের দ্বারা বান্দা দ্বীনে ইসলাম হইতে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কার হইয়া কাফির মুশরিক হয়।

আল্লাহ তা'আলা শিরকে আসগর তথা ক্ষুদ্র শিরক যেমন, রিয়া (তথা লোক দেখানো মনোভঙ্গী) সম্পর্কে এরশাদ করেনঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔

অর্থাৎ "অতএব, যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভের আকাংক্ষা রাখে তবে সে যেন নেক কাজ করিতে থাকে এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে অপর কাহাকেও শরীক না করে।" (সূরা কাহাফ-১১০)

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছেঃ

মাহমুদ বিন লবীদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়টির সর্বাধিক আশংকা করি তাহা হইতেছে 'শিরকে আসগর' অর্থাৎ ক্ষুদ্র শিরক। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ক্ষুদ্র শিরক কি? তিনি জবাবে বলিলেনঃ রিয়া। (অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা)। (মুসনাদে আহমদ)

এই কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত এরশাদ দ্বারা শিরকে আসগর বুঝানো উদ্দেশ্য হইবে।যেমন-

من حلف بغير الله فقد اشرك

অর্থাৎ " যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নাম ব্যতীত অন্য কাহারো নামে কসম করে, তবে সে ব্যক্তি শিরক করিল।" (সুনানে আবী দাউদ ও অন্যান্য)

কারণ ইহা জানা বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলার নাম ব্যতীত অন্য কাহারও নামে শপথকারী দ্বীন ইসলাম হইতে বহিষ্কার হইবে না। আর না তাহার উপর কুফরের হুকুম দেওয়া যায়। এই জন্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদীছে বলিয়াছেনঃ

الشرك فى هذه الامة اخفى من دبيب النمل

অর্থাৎ "এই উম্মতের মধ্যে শিরক পিপিলিকার চলাচল হইতেও অধিক গোপন রহিয়াছে।"

এই সকল হাদীছ শরীফসমূহের প্রতি সুক্ষ্ম দৃষ্টি করিলেই প্রতীয়মান হয় যে, কিভাবে শিরক ও কুফরের প্রকারভেদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, একটি দ্বীন হইতে বহিষ্কার করিয়া কুফরের দিকে নিয়া যায় আর অপরটি দ্বীন হইতে বহিষ্কার করে না। বরং ক্ষুদ্র শিরক তাওহীদের সহিত মিলিত হইতে পারে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আর অধিকাংশ লোক যাহারা আল্লাহ তা'আলাকে মানিয়াও থাকে কিন্তু এইভাবে যে, তাহারা শিরকও করিয়া থাকে।" (সূরা ইউসূফ–১০৬)

এই আলোচনা হইতে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, একজন ব্যক্তির ঈমানের সহিত আমলী কুফর এবং তাওহীদের সহিত ক্ষুদ্র শিরক মিলিত হইতে পারে। তাহা ছাড়া ঈমানের সহিত আমলী নিফাক, ফিসক, যুলুম প্রভৃতি কবীরা গুনাহও একত্রিত হইতে পারে। কাজেই কোন মুমিন ব্যক্তি যদি আমলী কুফর, ক্ষুদ্র শিরক, আমলী নিফাক, ফিসক, যুলুম ও অন্যান্য কবীরা গুনাহকে হারাম বিশ্বাস করে, অতঃপর উহা করে তবে সে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম হইতে পুরোপুরি বহিষ্কার হইবে না বরং নাকিসে মুমিনরূপে মুসলমান থাকিবে। ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব যাহা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)–এর অভিমতের সারমর্ম। আর সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)ই ছিলেন কিতাবুল্লাহ, সুন্নাত, ইসলাম, কুফর ও ইহার বিধানাবলী সম্পর্কে উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক বিশেষজ্ঞ। পরবর্তীগণ তাহাদের মর্মার্থ পূর্ণভাবে অনুধাবনে সক্ষম হইতে পারে নাই বলিয়া দুইটি দল হক হইতে সরিয়া গিয়াছে। একদল অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, কবীরা গুনাহের দরুণ বান্দা দ্বীন ইসলাম হইতে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কার হইয়া যাইবে এবং তাহারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হইবে আর অপর দল অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, কবীরা গুনাহ মুমিন বান্দাকে কোন ক্ষতি করিবে না বরং সে কামিল মুমিন থাকিবে। তাহাদের এক দল তো সীমা অতিক্রম করিয়াছে আর অপর দল যুলুম করিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতকে মধ্যম পন্থা অবলম্বনে সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাদের অভিমত হইতেছে নামায তরক ও অন্যান্য কবীরা গুনাহ করিবার দরুণ বান্দা মহাপাপী ও শাস্তিযোগ্য হইবে এবং পাপী মুমিন হিসাবে গণ্য হইবে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করিয়া পরিত্রাণ দিবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (শরহে নববী, ফতহুল মুলহিম–সংক্ষিপ্ত)

١٥٣ حدثنا ابو غسان المسمعي قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلوة ـ

হাদীছ–১৫৩. (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান আল–মিসমাঈ (রহঃ)। তিনি–আবূয যুবাইর (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি হযরত জাবির বিন আবদিল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, আমি (হযরত জাবির (রাযিঃ)) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিঃ বান্দা এবং শিরক–কুফরের মধ্যে সংযোগকারী বস্তু হইতেছে নামায পরিত্যাগ করা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ

(১৫২ নং হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

তৃতীয় খণ্ডে কিতাবুল ঈমানের অবশিষ্ট